

মার্ক টোয়েন গল্পসমগ্র



মার্ক টোয়েন গল্পসমগ্র

The Complete Short Stories Of MARK TWAIN

Translated by: Manindra Dutta

মার্ক টোয়েন গল্পসমগ্র

অখণ্ড রাজ সংস্করণ

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

তুলি-কলম: ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

তুলি-কলম

প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ ১৪০২, এপ্রিল ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ: বইমেলা ১৪১৪, ফেব্রুয়ারী ২০০৮

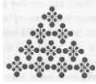
প্রকাশক: কল্যাণব্রত দত্ত || তুলি-কলম || ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

অক্ষর বিন্যাস: এস টি লেজার ইউনিট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক: এসার গ্রাফিক, ১সি, গৌর লাহা স্ট্রিট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ: নীল দত্ত || অলংকরণ : রাজা দত্ত

প্রাপ্তিস্থান: সাহিত্য তীর্থ || ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩



মার্ক টোয়েন প্রসঙ্গে

আসল নাম স্যামুয়েল ল্যাংহর্ণ ক্লিমেন্স; কিন্তু যে নামে তাঁর বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি সেটি ছদ্মনাম-মার্ক টোয়েন। এই ছদ্মনাম গ্রহণের একটু ইতিহাস আছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার কথা। ক্লিমেন্স তখন সাংবাদিকতা ও রস-রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিখ্যাত সংবাদপত্র "এণ্টারপ্রাইজ"-এর সঙ্গে জড়িত। একদিন তাঁর মনে হল একটি ভাল ছদ্মনাম চাই। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ই তাঁর পূর্ব-পরিচিত বৃদ্ধ নৌ-চালক ক্যাপ্টেন সেলার্স-এর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। ক্লিমেন্স-এর মনে পড়ে গেল, ক্যাপ্টেন সেলার্স নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন-"মার্ক টোয়েন।" নামটি তাঁর মনে ধরল। এর একটি নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে। কথাটার অর্থ "নিরাপদ জলরাশি।" অন্ধকার সমুদ্রের বুকে চলতে চলতে যে কোন নাবিকের কানে নামটি বড়ই শ্রুতিসুখকর। ২রা ফ্রেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি রচনাতেই ক্লিমেন্স-এর এই ছদ্মনাম সর্বপ্রথম স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মহাকালের পথ ধরে সেই ছদ্মনাম আজ আসল নামের গণ্ডীকে অতিক্রম করে সর্বমানবের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে।

স্যামুয়েল ল্যাংহর্ণ ক্লিমেন্স-এর জন্ম ১৮৩৫ খৃস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর, আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে। ছোট বেলায় সকলে তাকে ডাকত "ক্ষুদে স্যাম" বা "স্যামি" বলে। নদীতীরবর্তী ছোট শহর হ্যানিবল্-এ তার শৈশব কেটেছে। নদী, নৌকো ও স্টিমার নিয়ে সে এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ। ছোট্ট স্যামির চোখে স্বপ্নের অঞ্জন। পরবর্তী কালে মার্ক টোয়েন লিখেছেন: "যখন সে দেখে বাষ্পীয় যানগুলি অনবরত যাতায়াত করছে অথচ একবারও সে তাতে চড়তে পারছে না, তখন একটি ছোট ছেলের মনের অবস্থা কি রকম হয় তা কল্পনাও করা যায় না।" সেই কল্পনা কিন্তু একদিন বাস্তবে রূপ নিল। ক্ষুদে স্যামের জীবনের অন্য অনেক দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্যে সেও একটি। তাঁর বয়স তখন সবে ন'বছর। বেশ কতকগুলি যাত্রীবাহী স্টিমার হ্যানিবল-এ এসে ভিড়ল। স্যামিও চুপি চুপি তার একটিতে উঠে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে সোজা হাজির হল ডেকে। স্টিমার ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। ঘাট ছেড়ে স্টিমার মাঝ নদীতে পড়ল। স্যামির স্টিমারে চড়ার স্বপ্ন সফল হল। হামাগুড়ি দিয়ে ডেকের তলা থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণভরে দেখতে লাগল প্রকৃতির অপরূপ শোভা। মুষলধারে শুরু হল বৃষ্টি। হামাগুড়ি দিয়ে ফের ঢুকল ডেকের তলায়। কিন্তু পা-জোড়া বেরিয়ে রইল। একটি খালাসি দেখতে পেয়ে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে বের করল। আর ঠিক পরের ঘাটেই স্টিমার থেকে নামিয়ে দিল। হ্যাঁ, মার্ক টোয়েনের "দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইয়ার" বইয়ের বেশীর ভাগ পাঠকই যা অনুমান করেন সেটাই ঠিক-স্যাম ক্লিমেন্সই টম সইয়ার-একেবারে হুবহু এক।

ঘটনার বিপুল বৈচিত্র্যের যে নক্ষত্র-দীপ্তিতে মার্ক টোয়েনের জীবনের আকাশ ঝলমল করে, তারই প্রতিফলন আমরা দেখি তার সাহিত্য-কৃতিতে। Gilded Edge, The Adventures of Tom Sawyer, Huckleberry Fin, Life on the Mississipi, The Innocents Abroad, A Tramp Abroad, Roughing it প্রভৃতি বইয়ের পাতা ওল্টালে তার বিচিত্র রস ও রসিকতার অন্তরালে মার্ক টোয়েনের কটাক্ষ-রসায়িত হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি কোন চক্ষুস্মান পাঠকেরই দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

বিচিত্র মার্ক টোয়েনের জীবনের ইতিহাস। আট বছর ছাপাখানার শিক্ষানবীশ, চার বছর মিসিসিপি নদীতে স্টিমারের পাইলট, নেভাদার দুর্গম অঞ্চলে খনির সন্ধানে অক্লান্ত অভিযাত্রী, ভার্জিনিয়া সিটি-তে সংবাদপত্রের প্রতিবেদক হিসাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ, ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজাত মহলে যাতায়াত ও সাহিত্য-রচনার পাথেয় সঞ্চয়-চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ জীবন বৈচিত্র্যে ও সাফল্যে সমান সমুজ্জ্বল। চল্লিশ বছর ধরে তার সৃষ্টিশীল লেখনী থেকে অজস্র ধারায় ঝড়ে পড়েছে উপন্যাস, ছোট গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী ও রম্যরচনার রসমধুর ফসল। লেখনীর মত তার রসনায়ও ছিল নিকষে কণক-দীপ্তির আশ্চর্য বিচ্ছুরণ-সভাকক্ষে বক্তা হিসাবে যেমন ছিলেন জনপ্রিয়, তেমনি ছিলেন ভোজসভার বৈঠকী বাচন-ভঙ্গীতে পারঙ্গম। ছিলেন একাধারে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের সুহৃদ, অনেক রাজার সহচর, বিশ্বপর্যটক, খ্যাতিমান গল্পকার, প্রেমিক স্বামী ও স্নেহময় পিতা।

অনেকের মতেই মার্ক টোয়েন আমেরিকার সাহিত্য-কুল-তিলক। "A man, a very great man, a national monument." আমেরিকার নোবেল-পুরুস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছেন, "হাক্‌ল্‌বেরি ফিন" থেকেই মার্কিন সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাঁর সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনায় অগ্রসর হবার আগে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচকের সতর্ক-বাণী অবশ্য স্মর্তব্য: "Twain

is a dangerous man to write about. Unless you approach him With a sense of humour, you are lost. You cannot dissect a humorist upon a table. Your first stroke will kill him and make him a tragedian. You must come to Twain with a smile. That is his prerogative: that he can make you do so or fail. A great American critic wrote a study of Twain which was brilliant. The only trouble With it was he thought he was describing somebody else-himself, probably. The critie did not have a sense of humour, and his error was comparable to that of the tone-deaf critic who wrote on Beethoven. God forbid that I should try to dissect Mark Twain." ঈশ্বর দয়া করুন, সে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় যেন আমরাও না ব্রতী হই। তার পরিবর্তে মার্ক টোয়েনের প্রথম বিখ্যাত গল্প "কালাভেরাস জেলার কুখ্যাত লাফানে ব্যাঙ" থেকে শুরু করে "যে-মানুষ হ্যাড্‌লিবুগ-এর চরিত্র হনন করেছিল" পর্যন্ত মোট তেতাল্লিশটি গল্পের পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর আমরা রসিক পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলাম। এই সব গল্পের গুণাগুণ যার যার মনের নিকষ-পাষাণে ঘসে তারাই পরখ করে দেখুন। আমরা শুধু প্রসঙ্গত এইটুকুই বলতে পারি উল্লিখিত দুটি বিশ্ববিখ্যাত গল্প ছাড়াও "Cannibalism in the cars." "Legend of Capitolive Venus." "The Esquimau Maiden's Romance," "The Death Disk." "Was it Heaven or Hell." ও "A Dog's Tale"-এর মত গল্প কোন দেশের সাহিত্যের খুব বেশী লেখা হয় নি। একটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ-প্রসঙ্গ শেষ করছি: "His stories are an important part of our literary heritage-..Twain is our writer closest to folklore, our teller of fairy tales. The Jumping Frog story is a living American fairy tale acted out annually in Calaveras Country..Who are our short-story writers? Irving, Hawtharne, Poe. James, Melville, O. Henry, Bret Harte, Hemingway, Faulkner, Porter..Twain ranks high among them.

এবার মার্ক টোয়েন প্রসঙ্গের শেষ কথা-একটি মহৎ জীবনের অবসান মুহূর্তের কথা। তাঁর জীবনীকার আলবার্ট বিজেলো পাইন-এর জবানীতেই সে বিবরণ শোনা যাক:....১৯১০ খৃস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল সকাল বেলা। তাঁর মন তখনও পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। বিছানায় শুয়ে নিজের বই থেকে খানিকটা পড়লেন। আমাকে বললেন দুটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ফেলে দিতে। তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম। তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন। আমার প্রতি এই তাঁর শেষ কথা। ....সারাটা বিকেল তন্দ্রায় ডুবে রইলেন; ক্রমে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলন; আর কখনও আমাদের দেখলেন না। সাড়ে ছ'টা নাগাদ ডাঃ কুইণ্টার্ড লক্ষ্য করলেন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই মৃদু হয়ে আসছে। যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। মাথাটা একপাশে হেলে পড়ল; একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে মিলিয়ে গেল-চুয়াত্তরটি ঘটনাবহুল বছর ধরে যে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল তা চিরকালের মত থেমে গেল!

পরিশেষে বলি, মার্ক টোয়েনের অননুকরণীয় তথা অসরল বাক্য-ভঙ্গীকে বাংলায় ভাষান্তরিত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি; কতটা সফল হয়েছি সে বিচার পাঠকের। ভাষান্তরের অনিবার্য ত্রুটি যেন গল্পকারকে স্পর্শ না করে, আমার শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।

"মার্ক টোয়েন গল্পসমগ্র" প্রকাশ প্রসঙ্গে বন্ধুবর ডক্টর বিষ্ণু বসুর সহায়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি; কল্যাণীয়া ঈশিতার সহায়তার কথাও এখানে উল্লেখ্য।

-শ্রীম

|| সুদর্শন ||
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জি রোড,
কলকাতা-৪২

ক্যালাভেরাস জেলার কুখ্যাত লাফানে ব্যাঙ

The Notorious Jumping Frog of Calaveras Country

আমার জনৈক বন্ধু প্রাচ্য দেশ থেকে আমাকে একখানি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির অনুরোধক্রমেই সৎ স্বভাবের অতিভাষী বুড়ো সাইমন হুইলার-এর সঙ্গে দেখা করি, এবং বন্ধুর অনুরোধমত আমার বন্ধুর বন্ধু লিওনিডাস ডব্লু. স্মাইলির সম্পর্কে খোঁজ-খবর করি। তারই ফলাফল এখানে লিপিবদ্ধ করছি। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়েছে যে, লিওনিডাস ডব্লু. স্মাইলি একটি কাল্পনিক নাম; এ রকম কোন লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুর কোন দিন কোন পরিচয় ছিল না; তার মতলব ছিল, বুড়ো হুইলারকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলেই কুখ্যাত জিম স্মাইলি-র কথা তার মনে পড়ে যাবে, এবং এমন কিছু অতিশয় বিরক্তিকর স্মৃতি-রোমন্থনের দ্বারা সে আমাকে পাগল করে ছাড়বে যেটা আমার পক্ষে যেমন দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর, তেমনই অপ্রয়োজনীয়। এই যদি তার মতলব হয়ে থাকে তো সেটা হাসিল হয়েছে।

এঞ্জেল-এর একটা ধ্বংসপ্রায় খনি-শিবিরের বিধ্বস্ত শুঁড়িখানার বাথরুমের স্টোভের পাশে সাইমন হুইলার আরাম করে ঝিমুচ্ছিল। সেই অবস্থায় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। দেখলাম, লোকটি মোটাসোটা, মাথায় টাক; প্রশস্ত মুখখানিতে একটা শান্ত সরলতার আভাষ। জেগে উঠে সে আমাকে স্বাগত জানাল। তাকে বললাম, আমার জনৈক বন্ধু আমাকে পাঠিয়েছে তার ছেলেবেলার বড় আদরের বন্ধু লিওনিডাস ডব্লু. স্মাইলি-রেভারেণ্ড লিওনিডাস ডব্লু. স্মাইলি সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর করতে।বন্ধুটি শুনেছে যে ধর্মসভার এই তরুণ সদস্যটি এক সময় এঞ্জেল-এর শিবিরের বাসিন্দা ছিল। আরও বললাম, মিঃ হুইলার যদি রেভারেণ্ড লিওনিডাস ডব্লু. স্মাইলি সম্পর্কে কোন তথ্য আমাকে জানাতে পারেন তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব।

সাইমন হুইলার আমাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ার দিয়ে আমার পথটা আরাম করে বসে আমাকে লক্ষ্য করে যে একঘেয়ে বিবরণটি ছুড়ে মারল পরবর্তী অনুচ্ছেদে সেটি লিপিবদ্ধ করা হল। সে একবারও হাসল না, ভুরু কুঁচকাল না, প্রথম পংক্তিটি যে সুরে শুরু করল সেই একই সুরে একটানা বলে গেল, কখনও গলার স্বরের এতটুকু পরিবর্তন ঘটল না, কোন সময়ই তার উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়ল না; বরং এই অন্তহীন বিবরণের ভিতরে সব সময়ই এমন একটা আকর্ষণীয় আগ্রহ ও আন্তরিকতার স্পর্শ লেগে রইল যাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, তার কাহিনীতে যে হাস্যকর বা উদ্ভট কিছু থাকতে পারে একথা কল্পনা করা তো দূরের কথা, সে এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করেছে এবং এর দুই নায়ককে চাতুরীর ব্যাপারে অতি-মানবিক প্রতিভা বলে স্বীকার করছে। আমি তাকে যেমন ইচ্ছা কথা বলে যাবার সুযোগ দিলাম; একবারও তার কথায় কোন রকম বাধা দিলাম না।

"রেভ.লিওনিডাস ডব্লু. হুম, রেভারেণ্ড লি-দেখুন. জিম স্মাইলি নামক একজন লোক একসময় '৪৯-এর শীতকালে-অথবা '৫০-এর বসন্তকালেও হতে পারে-ঠিক যে কোন্ সময় আমার সঠিক মনে নেই-এখানে থাকত; তবু এই দুটো সময়ের যে কোন একটা সময়ে যে হবে সেটা আমার মনে আছে এই জন্যে যে, সে যখন প্রথম এই শিবিরে আসে তখনও বড় নালাটা কাটা শেষ হয় নি; কিন্তু সে যাই হোক, ও রকম একটা অদ্ভুত মানুষ আমি আর দেখি নি। যে কোন বিষয় নিয়ে যে কোন সময়ই সে বাজি ধরতে প্রস্তুত। শুধু একজন প্রতিপক্ষ পেলেই হল।আর তাও না পেলে সে নিজেই প্রতিপক্ষ সেজে বসত। অন্য লোকের যাতে সুবিধা, তাতেই তারও সুবিধা; মোট কথা হল, একটা বাজি হওয়া চাই, আর তা হলেই সে খুসি। কিন্তু লোকটির কপাল ছিল ভাল-অসাধারণ ভাল; প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাজিতে তারই জিত হত। যে কোন সুযোগেই সে বাজি ধরতে রাজি হত; এমন কোন জিনিস নেই যা নিয়ে সে বাজি ধরত না; আর আগেই তো বললাম, যে কোন পক্ষেই সে বাজি ধরতে রাজি হত। কোথাও একটা ঘোড়-দৌড় হলে সেখানেই সে ছুটে গেল; হল কুকুরের লড়াই তো তার উপরেই বাজি ধরল; বিড়ালের লড়াই হচ্ছে, তাতেও বাজি; যদি মুরগির লড়াই হয় তো তাতেও বাজি, আরে, দুটো পাখি যদি বেড়ার উপর বসে থাকে, তাহলে সেখানেও সে বাজি ধরবে কোন্ পাখিটা আগে উড়ে যাবে তার উপরে; অথবা শিবিরের কোন সভা হলে সে নির্ঘাৎ সেখানে হাজির হবে আর পার্সন ওয়াকার-এর উপর বাজি ধরবে, কারণ তার বিচারে সেই সেখানকার শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদ্ বক্তা, আর লোকটি আসলেও তাই এবং ভাল মানুষও। যদি দেখতে পায় যে কোন ভ্রমণকারী কোথাও রওনা হচ্ছে, অমনি সে বাজি ধরতে লোকটার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে কত সময় লাগবে, সে কোথায় যাচ্ছে; আর আপনি যদি তার সঙ্গে বাজি লড়েন তাহলে তার গন্তব্স্থল কোথায়, আর সেখানে পৌঁছতে তার কত সময় লাগছে সেটা জানবার জন্য সে হয়তো মেক্সিকো পর্যন্ত তার পিছনে ধাওয়া করবে। এখানকার অনেক ছেলেই সেই স্মাইলিকে দেখেছে, এবং তার সম্পর্কে আপনাকে অনেক কিছু বলতেও পারে। কি জানেন, বিষয়বস্তুটা তার কাছে কিছুই নয়-যে কোন বিষয়েই সে বাজি ধরতে প্রস্তুত। একবার পার্সন ওয়াকার-এর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন, বেশ অনেক দিনের অসুখ; মনে হল তাকে আর বাঁচানো যাবে না; একদিন সকালে ওয়াকার এখানে এল, আর সেও এসে

হাজির। সে জানতে চাইল, ভদ্রমহিলা কেমন আছেন; স্মাইলি বলল, ঈশ্বরের অসীম করুণায় এখন সে অনেকটা ভাল, আর এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে; কিন্তু কিছু না ভেবেচিন্তেই স্মাইলি বলে উঠল, 'দেখুন, আমি আড়াই বাজি রাখছি, তিনি ভাল হবেন না।'

"এই স্মাইলির একটা ঘোটকি ছিল-ছেলেরা সেটাকে বলত পনেরো মিনিটের ঘুড়ি; তারা অবশ্য ঠাট্টা করেই বলত, কারণ সেটার গতি ওর চাইতে বেশীই ছিল। সেই ঘোড়া নিয়েই সে বাজিও জিতত, যদিও সেটা ছিল অত্যন্ত ধীরগতি, এবং সব সময়ই তার শ্বাসকষ্ট, বা বদমেজাজ, বা ক্ষয়রোগ, বা কোন না কোন রোগ লেগেই থাকত। তাকে দু'শ' বা তিনশ' গজ এগিয়ে দৌড় শুরু করবার ব্যবস্থা করে দেওয়া সত্ত্বেও অন্য ঘোড়াগুলো তাকে কাটিয়ে চলে যেত; কিন্তু সব সময়ই একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা অত্যন্ত উত্তেজিত ও বেপরোয়া হয়ে উঠত, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, পা ফাঁক করে ছুটতে শুরু করত, কখনও পা ছুঁড়ত বাতাসে, কখনও বা পাশের বেড়ায়, কখনও আ-র-ও বেশী ধূলো উড়িয়ে, কখনও হেঁচে-কেশে-নাক ঝেড়ে আ-র-ও বেশী শব্দ করে-এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে ঠিক ঘাড়ে-ঘাড়ে অন্য সব ঘোড়াকে মেরে বেরিয়ে যেত।

"তার একটা ছোট্ট কুকুরের বাচ্চা ছিল; তাকে দেখলে আপনার মনে হবে তার মূল্য এক সেণ্টও নয়। কিন্তু যেই তার উপর বাজি ধরা হল অমনই সে যেন আর একটা কুকুর হয়ে যেত; তার নীচের চোয়ালটা স্টিমবোটের গলুইয়ের মত বেরিয়ে আসত; দাঁতগুলো বেরিয়ে এসে অগ্নিকুণ্ডের মত ঝকঝক করে উঠত। প্রথমে অন্য কুকুরটা তাকে নাস্তানাবুদ করে তুলত, কামড়ে দিত। দু'তিনবার উল্টে ফেলে দিত, আর অ্যাণ্ড জ্যাকসন-কুকুরের বাচ্চাটার নাম-খুসি মনেই সে সব কিছু মেনে নিত যেন এ ছাড়া অন্য কিছু সে আশাই করে নি-বাজির টাকা ক্রমে দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণতর হতে হতে একেবারে চরমে উঠল; আর তখনই অকস্মাৎ সে অপর কুকুরটার পিছনের পায়ের হাঁটুর কাছটা কামড়ে ধরত-কি জানেন, ঠিক কামড়াত না, চেপে ধরে ঝুলে থাকত যতক্ষণ না তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হত। স্মাইল এই ভাবে বার বার বাজি জিততে লাগল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একবার তাকে এমন একটা কুকুরের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া হল যার পিছনের পা-ই ছিল না, কারণ পিছনের দুটো পা-কেই করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল। লড়াই বেশ অনেকদূর এগিয়েছে, বাজির অংক চড়্‌চড়্‌ করে বেড়ে গেছে, আর সেও তার প্রিয় জায়গায় কামড় দিতে গিয়ে দেখল তার পিছনের পা-ই নেই; তা দেখেই বেচারি ভড়কে গেল, বিস্মিত হল, এবং এতদূর নিরুৎসাহ বোধ করল যে লড়াইতে জিতবার কোন চেষ্টাই করল না; ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে সে শোচনীয়ভাবে ঘায়েল হল।সে স্মাইলির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন বলতে চাইল যে দোষটা তো তারই; কারণ লড়াইতে তার একমাত্র ভরসাই হল পিছনের পা, আর মনিব তাকে এমন একটা কুকুরের সঙ্গে লড়িয়ে দিল যার পিছনের পা-ই নেই তো সে কামড় বসাবে কোথায়। তারপরই দু'-এক পা খুঁড়িয়ে হেঁটেই সে মাটিতে পড়ে গেল ও মরে গেল। বাচ্চাটা বড় ভাল ছিল; অ্যান্ড্রু জ্যাকসন-এর কথাই বলছি; বেঁচে থাকলে নাম করতে পারত, কিন্তু তার মধ্যে মাল ছিল, প্রতিভা ছিল-আমি জানি, কারণ সে তো মুখে কিছু বলতে পারে না; প্রতিভা না থাকলে একটা কুকুর কখনও এ রকম অদ্ভুতভাবে লড়াই করে জিততে পারে না। তার সেই শেষ লড়াই ও তার ফলাফলের কথা মনে হলেই আমার খুব দুঃখ হয়।

"দেখুন, এই স্মাইলির কুকুরের বাচ্চা, মোরগের বাচ্চা, বিড়ালের বাচ্চা-এক কথায় বাজি ধরবার মত সব কিছুই ছিল। আপনি যাই নিয়ে হাজির হন না কেন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবেন না। একদিন সে একটা ব্যাঙ ধরে সেটাকে বাড়ি নিয়ে গেল; বলল, সেটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করবে। সত্যি, তিন-তিনটে মাস সে আর কোন কাজ করল না; পিছনের উঠোনো গিয়ে ব্যাঙটাকে লাফানো শেখাতে লাগল। আর বাজি ধরে বলতে পারি, সেটাকে শিখিয়ে তবে ছেড়েছিল। পিছন থেকে একটুখানি টিপে দিল, আর পরমুহূর্তেই দেখবেন যে ব্যাঙটা ফুল্‌কো লুচির মত বাতাসে ঘুরছে-দেখবেন সে একটা ডিগবাজি খেল, অথবা শুরুটা ভালভাবে হলে দুটো ডিগবাজিও খেতে পারে, তারপর নেমে এসে বিড়ালের মত চারপায়ে ঠিক বসে পড়বে। মাছি ধরার ব্যাপারে সে তাকে এতই ওস্তাদ করে তুলেছিল, আর অনবরত তাকে দিয়ে সে কাজটা এত বেশী অনুশীলন করিয়েছিল যে চোখে পড়ামাত্রই সে মাছিটাকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলত, একটাও পালাতে পারত না। স্মাইলি বলত, ভাল করে শেখাতে পারলে একটা ব্যাঙ সব কাজ করতে পারে-তার সে-কথা আমি বিশ্বাস করি। আরে, আমি যে নিজে দেখেছি এই মেঝের উপর ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারকে-ব্যাঙটার নাম ছিল ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার-রেখে সে গুন্‌গুন্‌ করে বলত, 'মাছি ড্যানিয়েল, মাছি', আর অমনি চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে একলাফে সোজা ওই কাউণ্টারের কাছে গিয়ে মাছিটা ধরে পুনরায় একতাল কাদার মত থপ করে মেঝেতে বসে পড়ে এমনভাবে পিছনের পা দিয়ে মাথার একটা দিক চুলকোত যেন সে এমন কিছু করে নি যা অন্য কোন ব্যাধ করতে পারে না। এত গুণী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ব্যাঙটা খুবই নম্র ও সরল স্বভাবের। আবার সমতল জায়গায় লাফ-ঝাঁপের কথা যদি বলেন, এক লাফে সে যতটা জমি পার হতে পারত তার জাতের অন্য কাউকে সেটা করতে আপনি কখনও দেখেন নি। সমান জায়গায় লাফানোটাই ছিল তার মোক্ষম কেরামতি,

আর তাই সে ক্ষেত্রে স্মাইলি তার উপর বাজির অংক ধরত প্রাণ খুলে। ঐ ব্যাঙটা নিয়ে স্মাইলির গর্বের সীমা ছিল না, আর তা তো হতেই পারে, কারণ যে সব লোক দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরছে তারাই বলে যে তারা যত ব্যাঙ দেখেছে তাদের মধ্যে এটাই সেরা।

"দেখুন, একটা জাফরি-কাটা বাক্সের মধ্যে স্মাইলি ব্যাঙটাকে রাখত; মাঝে মাঝে সেটাকে শহরতলিতে নিয়ে গিয়ে বাজি ধরত। একদিন একটা লোক-শিবিরে সে ছিল নবাগত-তাকে বাক্সটা শুদ্ধ দেখতে পেয়ে বলল:

'আপনার ঐ বাক্সে কি আছে বলুন তো?'

"আর স্মাইলি বেশ নিরাসক্ত গলায় বলল, 'তা কাকাতুয়া হতে পারত, ক্যানারি পাখি হতে পারত, হতে পারত কিন্তু হয় নি-এতে আছে একটা ব্যাঙ।'

"লোকটা সেটাকে হাতে নিল, ভাল করে দেখল, এদিক ওদিকে ঘোরাল তারপর বলল, 'হুম-এই। তা এটা কি করতে পারে?'

"স্মাইলি সহজভাবেই জবাব দিল, 'একটা কাজ খুব ভালই করতে পারে-ক্যালাভেরাস জেলার যে কোন ব্যাঙকে লাফানোয় হারিয়ে দিতে পারে।'

"লোকটা আবার বাক্সটা হাতে নিল, অনেকক্ষণ ধরে ভালভাবে দেখল, তারপর সেটা স্মাইলিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি তো এই ব্যাঙটার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব দেখছি না যাতে অন্য ব্যাঙ থেকে এটা বিশেষ ভাল কিছু হতে পারে।'

স্মাইলি বলল, 'হয় তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। হয় তো আপনি ব্যাঙ চেনেন, অথবা চেনেন না; হয় তো এ বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ, অথবা হয় তো আপনি নেহাৎই শিক্ষানবীশ। সে যাই হোক, আমার বিশ্বাস আমার কাছে; তবে ক্যালাভেরাস জেলার যে কোন ব্যাঙ-কে সে যে লাফে হারিয়ে দিতে পারে সে বিষয়ে আমি চল্লিশ ডলার বাজি রাখতে রাজী আছি।'

"লোকটা এক মিনিট কি যেন ভাবল, তারপর দুঃখের সঙ্গে বলল, 'দেখুন,আমি এখানে নতুন এসেছি, আর আমার সঙ্গে কোন ব্যাঙ-ও নেই; কিন্তু আমার যদি একটা ব্যাঙ থাকত, তো আপনার সঙ্গে বাজি লড়তাম।"

"তখন স্মাইলি বলল, 'খুব ভাল কথা-খুব ভাল কথা-আপনি এক মিনিট আমার বাক্সটা ধরুন, আমি গিয়ে আপনার জন্য একটা ব্যাঙ নিয়ে আসছি।' তখন নবাগত লোকটা বাক্সটা হাতে নিল, স্মাইলির চল্লিশ ডলারের সঙ্গে নিজের চল্লিশ ডলার যোগ করল, আর তারপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

"এইভাবে অনেকক্ষণ বসে বসে সে নানা কথা ভাবতে লাগল। তারপর ব্যাঙটাকে বের করে তার মুখটা হাঁ করিয়ে একটা চামচ দিয়ে 'পাখি-মারা' ছর্‌রা গুলি তার পেটের মধ্যে ভরে দিল-একেবারে থুত্‌নি পর্যন্ত ভরপেট-এবং তারপর সেটাকে মেঝেতে ছেড়ে দিল। ওদিকে স্মাইলি জলাভূমিতে নেমে কাদার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাঙ ধরে সেটাকে এনে লোকটার হাতে দিয়ে বলল:

'এবার আপনি যদি তৈরি হয়ে থাকেন তাহলে এটাকে ড্যানিয়েল-এর পাশে এমনভাবে বসিয়ে দিন যাতে দুটোর সামনের থাবা এক সারিতে থাকে। লাফানোর নির্দেশটা আমিই দেব।' তারপর সে বলল, 'এক-দো-তিন-ছোটো!' সে ও নতুন লোকটা পিছন থেকে ব্যাঙ দুটোকে টিপে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যাঙটা তড়িঘড়ি লাফাতে শুরু করল; কিন্তু ড্যানিয়েল একবার হাঁসফাঁস করল, গলাটা বাড়াল-এইভাবে-একজন ফরাসীর মত, কিন্তু তাতেও কিছু হল না-সে নড়তেই পারল না; সে যেন গির্জার মত মাটির সঙ্গে আটকে আছে; সে একটুও নড়তে পারল না; মনে হল যেন তাকে বেঁধে সেখানে নোঙর ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্মাইলি খুবই অবাক হল, বিরক্তও হল, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি হল কিছুই বুঝতে পারল না।

"লোকটা টাকাটা নিয়ে পা বাড়াল। দরজাটা পার হবার সময় কাঁধের উপর দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলটা বাড়িয়ে ড্যানিয়েলকে দেখিয়ে সে আবার বলল, ইচ্ছা করেই বলল, 'আমি তো এই ব্যাঙটার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব দেখছি না যাতে এটা অন্য ব্যাঙয়ের চাইতে



ভালকিছু হতে পারে।'

স্মাইলি অনেকক্ষণ ধরেই মাথা চুলকোচ্ছিল আর ড্যানিয়েল-এর দিকে তাকাচ্ছিল; শেষটায় বলল, 'ব্যাঙটার যে কি হল ভেবে অবাক হচ্ছি-ওটার নিশ্চয় কিছু হয়েছে-কেমন যেন ঢিলেঢালা দেখাচ্ছে।' তারপর ব্যাঙটার গলা ধরে তুলে বলে উঠল, 'আরে, এ যে দেখছি পাঁচ পাউণ্ড ওজন হয়েছে!' তখন সেটাকে উল্টো করে ধরতেই সে দুই মুঠো-ভর্তি গুলি উগরে দিল। এতক্ষণে আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে সে রাগে পাগল হয়ে উঠল-ব্যাঙ্টাকে নামিয়ে রেখে ছুটল লোকটার পিছনে। কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। আর-"

[এই সময় সামনের উঠোন থেকে কে যেন সাইমন হুইলার-এর নাম ধরে ডাকল, আর সে ব্যাপার কি জানবার জন্য উঠে দাঁড়াল।] যেতে যেতে আমার দিকে ফিরে বলল, "যেখানে আছেন সেখানেই বসে থাকুন, বিশ্রাম করুন-আমার এক সেকেণ্ডের বেশী লাগবে না।"

কিন্তু, আপনারা যদি অনুমতি করেন, তো আমি মনে করি যে উদ্যমশীল বাউণ্ডুলে জিম স্মাইলির এই ইতিহাসের অনুবৃত্তি রেভ. লিওনিডাস ডব্লু. স্মাইলি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য আমাকে দিতে পারবে না; কাজেই আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

দরজার কাছেই হুইলার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে ফিরে আসছিল। আমার পথ আটকে দিয়ে সে আবার শুরু করল:

"দেখুন, এই স্মাইলির একটা হল্‌দে এক-চক্ষু গরু ছিল; সেটার কোন লেজ ছিল না, আর-"

যাই হোক, আমার না ছিল সময়, না ছিল আগ্রহ, তাই দুঃখী গরুর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা না করেই আমি বিদায় নিলাম।

১৮৬৫

একটি খারাপ ছোট ছেলের গল্প

The Story of the Little Boy

একদা একটি খারাপ ছোট ছেলে ছিল; তার নাম ছিল জিম-যদিও লক্ষ্য করলে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের সব রবিবার-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক খারাপ ছোট ছেলেদের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জেমস্ বলে ডাকা হয়। আশ্চর্য হলেও এটা কিন্তু সত্যি যে এই ছেলেটিকে জিম বলেই ডাকা হত।

তার কোন রুগ্ন মা-ও ছিল না-এমন ধর্মপরায়ণা মা যার ক্ষয় রোগ আছে; কবরে গিয়ে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারলেই যে সুখী হত, কিন্তু ছেলের প্রতি অত্যাধিক ভালবাসার জন্য এবং সে চলে গেলে পাছে বিশ্ব-সংসার তার ছেলের প্রতি কঠোর ও উদাসীন ব্যবহার করে এই ভয়ে সে মরতেও পারছিল না। রবিবারের পাঠ্যপুস্তকে অধিকাংশ খারাপ ছেলেরই নাম থাকে জেমস্, তাদের মা থাকে রুগ্ন, তারা ছেলেকে বলতে শেখায় "এবার আমি নত হই" ইত্যাদি, মিষ্টি বিষণ্ণ সুরে গান গেয়ে তাদের ঘুম পাড়ায়, তারপর চুমো খেয়ে শুভ রাত্রি জানিয়ে তাদের বিছানার পাশেই নতজানু হয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু এই ছেলেটির বেলায় সবই অন্য রকম। তার নাম জিম, আর তার মায়েরও ওসব কিছুই ঘটে নি-ক্ষয়রোগ বা সে ধরনের কিছুই না। মা ছিল শক্ত-সমর্থ, ধর্মপরায়ণা মোটেই নয়; আর জিমকে নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তাও ছিল না। সে বলত, ছেলেটা যদি ঘাড় ভেঙেই বসে, তাহলেই বা ক্ষতি কি। সে সব সময়ই চড়-চাপড় মেরে জিমকে ঘুম পাড়াত, আর কখনও চুমো খেয়ে তাকে শুভ রাত্রি জানাত না; বরং তাকে ছেড়ে যাবার সময় হলে তার কানে একটা চপেটাঘাত করত।

একবার এই খারাপ ছোট ছেলেটি খাবার ঘরের চুরি করে সেখানে ঢুকে বেশ কিছুটা জ্যাম বাগিয়ে নিল, আর পাত্রটাকে এমনভাবে আলকাতরা দিয়ে ভরে রাখল যাতে তার মা তফাৎটা টের না পায়; কিন্তু তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে কোন তীব্র ভাবের উদয় হল না এবং কেউ তার কানে কানে বলল না, "মার কথা না শোনা কি ঠিক? এ কাজ করা কি পাপ নয়? ভাল মায়ের জ্যাম যারা চুরি করে খায় সেই সব ছোট খারাপ ছেলেরা কোথায় যায়?" আর তার পরেও সে কিন্তু একাকী নতজানু হয়ে বসে এরকম দুষ্টুমি আর কখনও করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল না, এবং খুসিভরা হালকা মনে উঠে মার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল না, তার কাছে ক্ষমাও চাইল না; আর মা-ও গর্ব ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে দুই চোখ ভিজিয়ে তাকে আশীর্বাদ করল না। না; পাঠ্যপুস্তকের অন্য সব খারাপ ছেলেদের বেলায়ই তাই হয়ে থাকে; কিন্তু খুবই আশ্চর্য যে জিমের বেলায় ঘটল ঠিক অন্যরকম। সে জ্যামটা খেয়ে ফেলল, তার নিজস্ব অশালীন ভঙ্গিতে বলল যে জিনিসটা খাসা হয়েছে; তারপর আলকাতরা ফেলে দিয়ে হেসে বলল যে এ কাজটাও খাসা হল, মন্তব্য করল যে ব্যাপারটা যখন সত্যি জানতে পারবে তখন বুড়িটা খুব চেঁচামেচি করবে; মা যখন সত্যি সত্যি ব্যাপারটা জানতে পারল তখন সে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল, মা-ও তাকে নির্মমভাবে চাবুক মারল, আর সেও নিজে নিজেই কেঁদে ভাসাল। এ ছেলেটির বেলায় সব কিছুই অদ্ভুত-পাঠ্যপুস্তকের খারাপ জেমস্দের বেলায় যা যা ঘটে থাকে তার বেলায় ঘটল তার ঠিক উল্টোটা।

একবার সে মালিক অ্যাকর্ন-এর আপেল গাছে চড়েছিল আপেল চুরি করতে। তার পা ভাঙল না, গাছ থেকে পড়ে তার হাত ভাঙল না, মালিকের বড় কুকুরটা তাকে আঁচড়ে কামড়ে দিল না, আর সেও কয়েক সপ্তাহ রোগশয্যায় ধুঁকতে ধুঁকতে অনুশোচনা করে একসময়ে ভাল হয়ে গেল না। না, না; যত ইচ্ছা আপেল চুরি করে সে বহাল তবিয়তে নীচে নেমে এল; কুকুরটার মোকাবিলা করবার জন্যও সে তৈরিই ছিল; সেটা যখন তেড়ে এল তখন সে একটা ইট মেরে তাকে আচ্ছা করে ঘায়েল করল। সত্যি, খুব আশ্চর্য-যে সব ছোট মিষ্টি বইতে ঝকঝকে মলাট থাকে, আর থাকে পাখির লেজের মত কোট, ঘণ্টা-বসানো টুপি ও খাটো পাৎলুন পরা পুরুষ এবং বগলের নীচ পর্যন্ত কোমর-তোলা বন্ধনীহীন পোশাক পরা মহিলাদের ছবি, তাতে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা কখনও ঘটে না। রবিবার-বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইতেও এ সবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

একবার সে মাস্টারমশাইয়ের পেন্সিল-কাটা ছুরিটা চুরি করেছিল। ধরা পড়লে চাবুক খেতে হবে এই ভয়ে সেটাকে জর্জ উইলসন-এর টুপির মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিল-বেচারি বিধবা উইলসন-এর এই ছেলেটি খুবই নীতিবাগীশ, গ্রামের সেরা ছেলে, সব সময় মায়ের কথা শোনে, কখনও মিথ্যা কথা বলে না, ভালভাবে লেখাপড়া করে, আর রবিবার-বিদ্যালয়টিকে খুবই ভালবাসে। ছুরিটা যখন তার টুপির ভিতর থেকে গড়িয়ে পড়ল তখন বেচারি জর্জ যেন অপরাধীর মতই মাথাটা নীচু করে রইল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল, আর দুঃখিত মনে মাস্টারমশাই তাকেই চুরির দায়ে দায়ী করে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হতেই একজন পাকা-চুল "শান্তির অধিকর্তা" সেখানে হাজির হয়ে বলে উঠল, "এই মহৎ ছেলেটিকে ছেড়ে দিন-ভয়ে জড়সড় হয়ে ওই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আসল অপরাধী! স্কুলের বিরতির সময়

আমি স্কুলের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর আমাকে কেউ দেখতে না পেলেও আমি চুরিটা দেখে ফেলেছি।" তারপরে কিন্তু জিমকে মারধোর করা হল না, আর সেই মাননীয় অধিকর্তাও সাশ্রুনয়নে স্কুল সম্পর্কে কোন বক্তৃতা দিল না। বা জর্জের হাত ধরে বলল না যে এই সব ছেলেই তো প্রশংসার যোগ্য। অথবা সে মাননীয় ব্যক্তিটি জর্জকে সঙ্গে করে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলল না যে আজ থেকে সে এই বাড়িতেই থাকবে, আপিস ঝাড়বে, আগুন জ্বালাবে, খবর আদান-প্রদান করবে, কাঠ কাটবে, আইন পড়বে, এবং তার স্ত্রীকে সংসারের সব রকম কাজে সাহায্য করবে, এবং তার পরেও যে বাড়তি সময় তার থাকবে তখন সে খেলাধূলা করবে, মাসে চল্লিশ সেন্ট করে পাবে ও সুখে থাকবে না; এ রকমটা বইতে ঘটতে পারে কিন্তু জিম-এর বেলায় ঘটে নি। কোন "শান্তির অধিকর্তা" হঠাৎ উদয় হয়ে সে ব্যাপারে নাক গলায় নি; ফলে আদর্শ বালক জর্জ-এর কপালে জুটল চাবুক, আর জিম হল খুসি, কারণ, আপনারা তো জানেন, নীতিবাগীশ ছেলেগুলোকে জিম ঘৃণা করত। জিম বলত, "এই সব ম্যাদামারা ছেলেগুলোকে" সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এই খারাপ অবহেলিত ছেলেটি এই ধরনের বাজে ভাষাই ব্যবহার করত।

কিন্তু সব চাইতে অবাক কাণ্ড ঘটল যখন রবিবারে নৌকো চালাতে গিয়েও জিম জলে ডুবে মরল না, এবং অন্য এক রবিবারে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের মুখে পড়েও তড়িতাহত হল না। আরে, রবিবার-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে আপনি আজ থেকে আগামী বড়দিন পর্যন্ত যতই খুঁজে দেখুন না কেন এ রকম ঘটনা আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। আরে না, না; সেখানে আপনি দেখতে পাবেন, খারাপ ছেলেগুলো যখনই রবিবারে নৌকো চালাতে যায় তখনই জলে ডুবে যায়; আর খারাপ ছেলেগুলো রবিবারে যখনই মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের মুখে পড়ে তখনই তরিতাহত হয়। নৌকোতে খারাপ ছেলেরা থাকলেই সে নৌকা রবিবারে উল্টে যাবেই; আর "সাবাথ" দিবসে খারাপ ছেলেরা মাছ ধরতে গেলে ঝড় উঠবেই। জিম কেমন করে এর হাত থেকে রেহাই পেল সেটাই আমার কাছে এক রহস্য।

একটা মন্ত্র যেন জিম-এর জীবনকে সব সময়ই ঘিরে থাকে-নিশ্চয়ই তাই হবে। কোন কিছুই তাতে আঘাত করতে পারে না। এমন কি একবার জানোয়ারদের মেলায় গিয়ে সে একটা হাতির শুঁড়ে তামাক গুঁজে দিয়েছিল, অথচ হাতিটা শুঁড় দিয়ে তার মাথাটা ধরে আছাড় মারে নি। "একোয়া ফোর্টিস্" (নাইট্রিক এসিড) খেয়ে ফেলে নি। বাবার বন্দুকটা চুরি করে "সাবাথ" দিবসে শিকার করতে গিয়ে সে নিজের তিনটে বা চারটে আঙ্গুল গুলিতে উড়িয়ে দেয় নি। রেগে গিয়ে সে ছোট বোনটির মাথায় ঘুষি মেরেছিল, কিন্তু তার ফলে সারা গ্রীষ্মকাল যন্ত্রণায় কাতড়াতে কাতড়াতে মুখে ক্ষমার মধুর বাণী উচ্চারণ করে বোনটি মারাও যায় নি, বা তার ফলে তার ভগ্নহৃদয় দ্বিগুণ দুঃখে উদ্বেলিতও হয় নি। না; বোনটি সেরে উঠেছিল। অবশেষে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে সাগরে চলে গিয়েছিল; আর ফিরে আসে নি; এ জগতে তখন সে একেবারে একা, বিষণ্ণচিত্ত। তার প্রিয়জনরা গির্জার শান্ত প্রাঙ্গণে ঘুমিয়ে পড়ল, তার ছেলেবেলাকার দ্রাক্ষালতা শোভিত বাড়িটা ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। না, একদিন সে বাড়ি ফিরে এল সানাইওলার মত মদে চুর হয়ে, আর প্রথমেই গিয়ে উঠল স্টেশনের ঘরে।

ক্রমে সে বড় হল বিয়ে করল, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হল, এবং একদিন রাতে কুড়ুলের ঘায়ে সকলেরই মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিল; তারপর সর্ব প্রকারের অসৎ উপায়ে ও ফাঁকিবাজির সাহায্যে সে অনেক টাকা করল; আজ সে নিজ গ্রামের সব চাইতে নারকীয় অসৎ ও পাজি লোক; কিন্তু সকলেই তাকে সম্মান করে; সে আইনসভার সদস্যও হয়েছে।

কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, রবিবার বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইতে এমন কোন খারাপ জেমস্-এর কথা লেখা নেই যার ভাগ্য মন্ত্রপূত জীবনের অধিকারী এই পাপী জিম-এর মত অতি বিচিত্র।

১৮৬৫

গাড়িতে নরমাংস ভোজন

Cannibalism in the Cars

সম্প্রতি আমি সেন্ট লুইস্ গিয়েছিলাম। ইণ্ডিয়ানা-র অন্তর্গত টেরে হটে-তে গাড়ি বদলাবার পর বছর চল্লিশেক, অথবা পঞ্চাশও হতে পারে, বয়সের একটি নম্র, উদার-দর্শন ভদ্রলোক কোন এক স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠে আমার ঠিক পাশেই বসল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমরা সহজভাবে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। লোকটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রীতিপদ বলে মনে হল। আমি ওয়াসিংটন থেকে আসছি শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে বিভিন্ন জননেতা ও কংগ্রেসের ব্যাপারে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল; শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে আমি এমন একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছি যে রাজধানীর রাজনৈতিক জীবনের সব অলি-গলির খবর রাখে; এমন কি সেনেটের সদস্য এবং জাতীয় আইন সভার প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মধারা পর্যন্ত তার নখ-দর্পণে। ইতিমধ্যে দুটি লোক মুহূর্তের জন্য আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল; একজন অপর জনকে বলল:

"হ্যারিস, আমার এ কাজটা যদি করে দাও, তাহলে আমি কোন দিন তোমাকে ভুলব না বাবা।"

আমার নতুন বন্ধুটির চোখ দুটি খুসিতে চক্চক্ করে উঠল। মনে হল, কথাগুলি যেন তার কোন সুখ-স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। তার পরেই তার মুখটা চিন্তাচ্ছন্ন-প্রায় বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমার দিকে ফিরে বলল, "আপনাকে একটা গল্প বলছি; আমার জীবনের একটি গুপ্ত অধ্যায় আপনার কাছে মেলে ধরছি-ঘটনাগুলি ঘটবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত কারও কাছে সে অধ্যায়ের কথা বলি নি। মন দিয়ে শুনুন, আর কথা দিন যে আমার গল্পের মাঝখানে বাধা দেবেন না।"

জানালাম যে তা দেব না, আর সেই লোকটিও কখনও সোৎসাহে, আর কখনও বিষণ্ণচিত্তে, কিন্তু সব সময়ই আবেগ ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিম্নলিখিত আশ্চর্য এক অভিযানের কথা বলতে লাগল।

১৮৫৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর আমি সেণ্ট লুইস থেকে শিকাগোগামী সন্ধ্যার ট্রেনটায় যাত্রা করলাম। সব মিলিয়ে যাত্রী ছিল মাত্র চব্বিশ জন। কোন মহিলা বা শিশু ছিল না। সকলেরই মন-মেজাজ ভাল; শীঘ্রই পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। মনে হল, যাত্রাটা বেশ সুখেরই হবে; আমার ধারণা, শ্রীঘ্রই যে আতংকের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে তার তিলমাত্র আশংকাও কোন যাত্রীর মনে ছিল না।

রাত ১১টা নাগাদ খুব বরফ পড়তে শুরু করল। ছোট গ্রাম ওয়েল্ডেন পার হবার কিছু সময় পরেই আমরা এক ভয়ংকর বৃক্ষহীন বিস্তীর্ণ তৃণভূমির নির্জনতার মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে শুরু করে সুদূর "জুবিলি উপনিবেশ" পর্যন্ত সেই জন-বসতিহীন নির্জনতা লীগের পর লীগ (১ লীগ=প্রায় ৩ মাইল) প্রসারিত। গাছপালা নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বিক্ষিপ্ত কোন পাথরের বাধা পর্যন্ত নেই, সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন বাতাস সেই সমতল মরুভূমির উপর দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ করে বয়ে চলেছে, আর পড়ন্ত বরফের কুঁচিগুলি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের সফেন তরঙ্গশীর্ষ হতে নিক্ষিপ্ত তুষারকণার মত ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছে; বাইরে ঘন হয়ে বরফ পড়ছে; ট্রেনের গতিবেগ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় বুঝতে পারছি যে সেই বরফের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে ইঞ্জিনের অসুবিধাও ক্রমেই বাড়ছে। বস্তুত, একসময় ট্রেনটা প্রায় থেমেই পড়ল, লাইনের উপর বরফের স্তূপ জমে জমে বড় বড় কবরের আকার ধারণ করেছে। কথাবার্তায় ভাঁটা পড়ল। ফুর্তির পরিবর্তে দেখা দিল গভীর উদ্বেগ। জন-বসতি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এই নির্জন তৃণভূমিতে বরফের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সকলের মনেই দেখা দিল, আর তার বিষণ্ণ প্রভাব সকলের উপরেই ছড়িয়ে পড়ল।

সকাল দুটো নাগাদ চারদিকের সব গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার অস্বস্তিকর তন্দ্রাটুকুও ভেঙে গেল। মুহূর্তের মধ্যে এই বিপজ্জনক সত্যটি আমার সামনে ঝল্সে উঠল যে বরফের স্তূপের মধ্যে আমরা সকলেই বন্দী হয়ে পড়েছি। "সকলে উদ্ধার-কার্যে লেগে যান।" সকলেই লাফিয়ে উঠে কাজে নামল। একটি মুহূর্তের বিলম্ব সকলেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে এই চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি যাত্রী বেরিয়ে এল সেই উন্মত্ত রাত্রির ঘন অন্ধকার বরফের ঢেউ ও প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে। বেল্চা, হাত, কাঠের বোর্ড-বরফ সরাবার মত যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেল তাই নিয়ে আসা হল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য: অর্ধেক ঘন অন্ধকারে আর অর্ধেক ইঞ্জিনের "রিফ্লেক্টার"-এর অত্যুজ্জ্বল কড়া আলোয় একদল উন্মাদপ্রায় মানুষ জমাট বরফের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র একটি ঘণ্টার মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেল যে আমাদের এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একটা বরফের স্তূপ কেটে পরিষ্কার করতে না করতেই

ঝড়ের বেগে এক ডজন স্তূপ লাইনের উপর জমে উঠছে। অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল যখন দেখা গেল বরফের সঙ্গে সর্বশেষ প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে ইঞ্জিনের চাকাটাও ভেঙে গেছে। আমাদের সামনে এখন যদি একটা খোলা লাইনও থাকে তাহলেও আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহে, দুঃখে শ্রান্ত মনে সকলে গিয়ে গাড়িতে ঢুকলাম। স্টোভের পাশে জমায়েত হয়ে গম্ভীরভাবে পরিস্থিতির পর্যালোচনা শুরু করলাম। সঙ্গে কোন রকম খাদ্য নেই-এটাই প্রধান বিপদ। কাঠ যথেষ্ট আছে, কাজেই জমে যাবার ভয় নেই। সেটা আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আলোচনার শেষ নিরুৎসাহব্যঞ্জক হলেও কণ্ডাক্টর-এর পরামর্শই শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া হল; অর্থাৎ এরকম বরফের মধ্যে পঞ্চাশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া মানেই মৃত্যু। সাহায্যের জন্য কাউকে পাঠানো সম্ভব নয়, আর পাঠালেও সাহায্য আসবে না। কাজেই উদ্ধার অথবা অনাহার যাই ঘটুক না কেন আমাদের তাই মেনে নিতে হবে, যথাসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে! এই কথাগুলি যখন উচ্চারিত হল তখন সেখানে উপস্থিত অতি বড় শক্তিমান লোকের বুকের ভিতরটাও মুহূর্তের জন্য ঠাণ্ডায় শির্‌শির্ করে উঠেছিল।

বাতাসের ওঠা-নামার ফাঁকে ফাঁকে গাড়িটা সম্পর্কে নানা মৃদু আলোচনা শোনা যাচ্ছিল। আলোগুলো ক্রমেই ম্লান হয়ে এল; আর সেই নির্জন প্রান্তরে পরিত্যক্ত অধিকাংশ মানুষ কাঁপা-কাঁপা আলোছায়ার মধ্যে বসে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল-সম্ভব হলে বর্তমানকে ভুলতে, পারলে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করতে লাগল।

সেই চিরন্তন রাতটি-সত্যি সে রাত আমাদের কাছে চিরন্তন বলেই মনে হয়েছিল-শেষ পর্যন্ত শেষ ঘণ্টায় উপনীত হল; শীতল, ধূসর ঊষা দেখা দিল পূর্ব দিগন্তে। বাইরের আলো আরও বাড়লে যাত্রীরা চলাফেরা শুরু করল, দেখা দিল জীবনের লক্ষণ; তারা কপালের উপর থেকে ঝোলানো টুপিগুলো সরিয়ে দিল, জমে-যাওয়া হাত-পা টান-টান করল, জানালা দিয়ে বাইরের নিরানন্দ প্রকৃতির দিকে তাকাল। সত্যি নিরানন্দ!-কোথাও জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই, নেই একটিও মনুষ্য বসতি; বিস্তীর্ণ সাদা মরুভূমি ছাড়া কিছু নেই; বাতাসের তাড়া খেয়ে বরফের চাঁই ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে; বরফের ঘূর্ণি-ঝড় মাথার উপরকার আকাশকে ঢেকে দিয়েছে।

সারাটা দিন গাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম। মুখে কথা নেই, শুধু চিন্তা আর চিন্তা। আবার একটি দীর্ঘায়ত ভয়ঙ্কর রাত-আর ক্ষুধা।

আবার একটি ঊষা-নৈঃশব্দ্য, বিষণ্ণতা ও জীবনক্ষয়ী ক্ষুধায় ভরা একটি দিন, যা থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই তারই জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষা। অস্থির তন্দ্রা নিয়ে এল রাত-সঙ্গে এল ভোজের স্বপ্ন-জেগে উঠলেই ক্ষুধার যন্ত্রণা।

চতুর্থ দিনটি এল আর চলে গেল-তারপর পঞ্চম দিন! পাঁচটি দিনের ভয়াবহ বন্দী জীবন! প্রতিটি চোখে বন্য ক্ষুধার ঝলকানি। সে দৃষ্টিতে বিপদের অর্থবহ সংকেত-এমন কিছুর আভাষ যা প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে অস্পষ্টভাবে-এমন কিছু যা এখনও কারও জিভ কথায় উচ্চারণ করতে সাহস করছে না।

ষষ্ঠ দিন চলে গেল-সপ্তম দিনের ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়ল এমন একদল ক্ষীণপ্রাণ, বীভৎসদর্শন, আশাহীন মানুষের উপর যারা আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এইবার তার প্রকাশ ঘটবে! সে জিনিস প্রতিটি অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল অবশেষে প্রত্যেকের ঠোঁট থেকে সেটা লাফিয়ে পড়তে প্রস্তুত! প্রকৃতির উপর চাপ চরমে উঠেছে-এবার তাকে পরাজয় মানতে হবে। দীর্ঘকায়, কিম্ভুৎদর্শন, ম্লান-মুখ মিনেসোটা-র রিচার্ড এইচ গ্যাস্টন উঠে দাঁড়াল। সকলেই বুঝল কি ঘটতে চলেছে। সকলেই প্রস্তুত-সব আবেগ, সব উত্তেজনা থেমে গেছে-একটু আগেও যে সব চোখে ছিল উন্মত্ততা এখন তাতে নেমে এসেছে একটি শান্ত, চিন্তাশীল গাম্ভীর্য।

"ভদ্রজনরা: আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না! সময় প্রত্যাসন্ন! আমাদের স্থির করতে হবে, অন্য সকলের খাদ্য জোগাতে আমাদের মধ্যে কাকে মরতে হবে!"

ইলিনয়-এর মিঃ জন জে. উইলিয়ামস্ দাঁড়িয়ে বলল: "ভদ্রজনরা-আমি টেনেসি-র রেভ. জেমস্ সয়ারকে মনোনীত করছি।"

ইণ্ডিয়ানা-র মিঃ উইলিয়ম ডব্লু. অ্যাডাম্স্ বলল: "আমি মনোনীত করছি নিউইর্য়ক-এর মিঃ ড্যানিয়েল স্লোট্-কে।"

মিঃ চার্লস্ জে. ল্যাংডন: "আমি মনোনীত করছি সেন্ট লুইস-এর মিঃ স্যামুয়েল এ. বোয়েন-কে।"

মিঃ স্লোট। "ভদ্রজনরা-নিউ জার্সি-র জন এ. ভ্যান নোস্ট্রাণ্ড-এর স্বপক্ষে আমি অস্বীকৃতি জানাতে চাই।"

মিঃ গ্যাস্টন: "কোন আপত্তি না থাকলে এই ভদ্রলোকের ইচ্ছা গৃহীত হতে পারে।"

মিঃ ভ্যান নোস্ট্রাণ্ড আপত্তি করায় মিঃ স্লোট-এর পদত্যাগ বাতিল হয়ে গেল। মেসার্স সয়ার ও বোয়েন-এর আপত্তিত্ত ঐ একই কারণে বাতিল হয়ে গেল।

ওহিয়ো-র মিঃ এ. এল. বাস্কম: "আমি প্রস্তাব করছি মনোনয়নের ব্যবস্থা এখানেই শেষ হল; এবার এই সভায় ব্যালট-এর সাহায্যে নির্বাচন শুরু হোক।"

মিঃসয়ার: "ভদ্রজনরা-এই সভার কার্য-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমি আন্তরিক প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সমস্ত বিচারেই এটা নিয়মবহির্ভূত ও অনুপযুক্ত। তাই আমি প্রস্তাব করছি, এই সব কিছু এখনই বাতিল করে দিয়ে এই সভার একজন চেয়ারম্যান ও তাকে সাহায্য করবার জন্য উপযুক্ত অফিসারবর্গ নির্বাচন করা হোক, আর একমাত্র তখনই আমরা সুষ্ঠ ভাবে এই কাজে অগ্রসর হতে পারব।"

আইওয়া-র মিঃ বেল: "ভদ্রজনরা-আমি আপত্তি জানাচ্ছি। আইন-কানুন ও আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি আঁকড়ে থাকবার সময় এটা নয়। সাতদিনের বেশী আমাদের কারও পেটে খাবার পড়ে নি। অলস আলোচনায় ব্যয়িত প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের কষ্ট বাড়ছে। যে সমস্ত মনোনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে আমি খুসি-আমার বিশ্বাস, এখানে উপস্থিত সকলেই খুসি-আর আমি তো ভেবে পাই না কেন আমরা এই মুহূর্তেই দু'একজনকে নির্বাচিত করব না। আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই-"

মিঃ গ্যাস্টন: "এতে আপত্তি উঠবে, আর নিয়মমতে একদিন আটকে যাবে; ফলে যে বিলম্বটা আপনি এড়াতে চাইছেন সেটাই ঘটবে। নিউ জার্সি থেকে আগত ভদ্রলোক-"

মিঃ ভ্যান নোস্ট্রাণ্ড: "ভদ্রজনরা-আপনাদের মধ্যে আমি নবাগত; যে সম্মান আপনারা আমাকে দিয়েছেন আমি তাই চাই নি এবং আমি সংকোচ বোধ করছিজ-"

আলাবামা-র মিঃ মর্গ্যান: "পূর্ব প্রস্তাবটিই আমি উত্থাপন করছি।"

প্রস্তাব গৃহীত হল; আর কোন বিতর্ক হতে দেওয়া হল না। অফিসার নির্বাচনের প্রস্তাবই পাশ হয়ে গেল, আর তদনুসারে মিঃ গ্যাস্টন চেয়ারম্যান, মিঃ ব্লেক সেক্রেটারি, মেসার্স হলকম্ব, ডায়ার ও বল্ডুনকে নিয়ে একটি মনোনয়ন কমিটি এবং নির্বাচনের কাজে কমিটিকে সাহায্য করবার জন্য মিঃ আর. এম. হাউল্যাণ্ডকে সহায়ক হিসেবে নির্বাচন করা হল।

তারপর আধ ঘণ্টার জন্য বিরতি হল; কিছুটা দলগত প্রচারকার্য চলল। হাতুড়ির শব্দে সদস্যরা মিলিত হলে কমিটি সভার সামনে কেন্টাকি-র মিঃ জর্জ ফার্গুসন, লুসিয়ানা-র মিঃ লুসিয়েন হার্মান ও কলরাডো-র মিঃ ডব্লু. মেসিক-এর নাম সুপারিশ করে তাদের প্রতিবেদন পেশ করল। সে প্রতিবেদন গৃহীত হল।

মিসৌরি-র মিঃ রজার্স: "মিঃ প্রেসিডেন্ট-প্রতিবেদনটি যখন যথারীতি সভার সামনে পেশ করা হয়েছে তখন আমি এই মর্মে একটি সংশোধনী আনছি যে, মিঃ হেরমান-এর নামের পরিবর্তে আমাদের সকলের কাছে সসম্মানে পরিচিত সেন্ট লুইস-এর মিঃ লুসিয়াস হ্যারিস-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে লুইসিয়ানা থেকে আগত ভদ্রলোকটির মহৎ চরিত্র ও মর্যাদা সম্পর্কে আমি কোন রকম কটাক্ষপাত করছি-মোটেই তা নয়। এখানে উপস্থিত যে কোন ভদ্রলোকের মতই তাকে আমি শ্রদ্ধা করি- সম্মান করি। কিন্তু তাই বলে এ সত্যকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না যে, আমরা যে সাতটা দিন এখানে রয়েছি সেই সময়ের মধ্যে আমাদের অন্য যে কোন লোকের চাইতে তার দেহের মাংসই বেশী হ্রাস পেয়েছে-এ সত্যকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না যে, অবহেলা বশতই হোক আর গুরুতর কোন ত্রুটির জন্যই হোক যে লোকের শরীরে পুষ্টিগুণ এত কম তার উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক তথাপি তাকে ভোট দিয়ে কমিটি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারেন নি-"

চেয়ার: "মিসৌরি থেকে আগত ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করুন। নিয়মানুগ পদ্ধতিতে ভিন্ন অন্য কোন ভাবে কমিটির কর্ম-ক্ষমতায় সন্দেহ

প্রকাশ করবার অনুমতি চেয়ার দিতে পারেন না। এই ভদ্রলোকের প্রস্তাব সম্পর্কে সভা কি মনোভাব নিতে চান?"

ভার্জিনিয়ার মিঃ হ্যালিডে: "আমি আর একটি সংশোধনী তুলে বলতে চাই, মিঃ মেসিক-এর পরিবর্তে ওরিগন-এর মিঃ হার্ভে ডেভিসের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হোক। আপনারা হয় তো বলবেন, সীমান্ত-জীবনযাত্রার দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে মিঃ ডেভিস একটু কঠোর প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ভদ্রজনরা, এটা কি চারিত্রিক কঠোরতা নিয়ে দোষ ধরবার সময়? তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করবার এটা কি সময়? না, আমরা চাই পরিমাণ-পদার্থ, ওজন, পরিমাণ-এই তো এখন প্রধান বিচার্য বিষয়-বুদ্ধিমত্তা নয়, প্রতিভা নয়, শিক্ষা নয়। আমি জোরের সঙ্গে আমার প্রস্তাবটি রাখছি।"

মিঃ মর্গ্যান (উত্তেজিতভাবে): "মিঃ চেয়ারম্যান-এই সংশোধনী প্রস্তাবের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। ওরিগন-এর এই ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ, তাছাড়া তিনি হাড়-গোড়েই মোটা-মাংসে নয়। ভার্জিনিয়া থেকে আগত ভদ্রলোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, পেট ভরে খাবার বদলে আমরা কি ঝোল খেতে চাই? তিনি কি আমাদের ছায়া দেখিয়ে ভোলাতে চান? একটি অরিগনীয় ভূত দেখিয়ে তিনি কি আমাদের দুর্দশাকে উপহাস করতে চান? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, চারদিকের এই সব উদ্বেগকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে, আমাদের বিষাদ-ক্লিষ্ট চোখ রেখে, অনেক প্রত্যাশায় উদগ্রীব এইসব মানুষের বুকের ধ্বনি শুনে, তারপরও কি এই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকটিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের এই পরিত্যক্ত অবস্থা, আমাদের অতীব দুঃখ, আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এসব কিছু জেনেও তিনি কি নিষ্ঠুরের মত এই ভগ্নস্তূপ, এই ধ্বংসস্তূপ, এই স্খলিত-পদ বৃদ্ধ, ওরিগন-এর তীর হতে বিতাড়িত দড়ির মত রস-কসহীন এই বাউণ্ডুলে লোকটাকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবেন? কখনও না!" [হর্ষধ্বনি]

সংশোধনী প্রস্তাবটিকে ভোটে দেওয়া হল; অগ্নিস্রাবী বিতর্কের পর সেটি বাতিল হয়ে গেল। প্রথম সংশোধনী অনুসারে মিঃ হ্যারিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। তারপর ব্যালট গ্রহণ শুরু হল। পাঁচটি ব্যালটে কোন নিস্পত্তি হল না। ষষ্ঠ ব্যালটে মিঃ হ্যারিস নির্বাচিত হল; শুধু নিজের ভোটটি ছাড়া আর সব ব্যালটই তার স্বপক্ষে পড়ল। নির্বাসিত হল; শুধু নিজের ভোটটি ছাড়া আর সব ব্যালটই তার স্বপক্ষে পড়ল। সে তখন প্রস্তাব করল, এই নির্বাচন ধ্বনি-ভোটে সমর্থিত হতে হবে; ফলে এবার তার নিজের ভোটটি বিপক্ষে পড়ায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল।

মিঃ র্যাডওয়ে প্রস্তাব করল, এবার অন্য প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটের ব্যবস্থা হোক এবং তারপরে প্রাতরাশের ব্যাপারে নির্বাচন হোক। প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

প্রথম ব্যালটে ভোট সংখ্যা হল সমান সমান; অর্ধেক সদস্য একজনকে সমর্থন করল তার যৌবনের জন্য, বাকি অর্ধেক অন্যজনকে সমর্থন জানাল তার বিশাল চেহারার জন্য। প্রেসিডেন্ট তার "কাস্টিং" ভোট দিল দ্বিতীয় প্রার্থী মিঃ মেসিক-এর স্বপক্ষে। এই সিদ্ধান্তের ফলে পরাজিত পার্থী মিঃ ফার্গুসন-এর বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল, নতুন করে ব্যালটের দাবী জানাবার কথাও উঠল, কিন্তু সেই গোলমালের মধ্যেই সভার কাজ মুলতুবি রাখার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ হল।

নৈশ ভোজনের আয়োজনের দরুন ফার্গুসন-উপদলের মনোযোগ তাদের বিক্ষোভের আলোচনা থেকে সরে গেল এবং পরে যখন আবার সে ক্ষোভ জানাবার সময় হল তখন মিঃ হ্যারিস-এর সম্মতি ঘোষণার আনন্দে সে সব চিন্তা হাওয়ায় উড়ে গেল।

ট্রেনের পিছনের আসনগুলোকে দিয়ে চমৎকার খাবার টেবিল বানানো হল; সাতটি যন্ত্রণাদায়ক দিন যে চমৎকার আহার্যের স্বপ্ন আমরা দেখেছি তার জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে আমরা বসে গেলাম। মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা আগে আমরা কী ছিলাম, আর এখন কী হয়েছি! ছিলাম আশাহীন, বিষণ্ণ-নয়ন, দুঃখ, ক্ষুধা, তীব্র উৎকণ্ঠায় বেপরোয়া; আর এখন কৃতজ্ঞতা, গাম্ভীর্য, প্রকাশের অতীত আনন্দ। আমার বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনে সেটাকেও মধুরতম মুহূর্তে বলে মনে করি। আমাদের বন্দীশালাকে ঘিরে বাতাসে গর্জন করে ফিরছে, বরফের ঝড় বইছে; কিন্তু তাতে এখন আর আমাদের কোন কষ্টই হচ্ছে না। হ্যারিসকে আমার ভাল লেগেছিল। হয় তো তার প্রতি আরও সদয় ব্যবহার করা যেত, কিন্তু এ ব্যাপারে হ্যারিসও তো আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতই ছিল; এতে সেও তো আমার মতই সন্তোষ লাভ করেছিল। মেসিকও ভালই ছিল, যদিও স্বাদটা একটু চড়া, কিন্তু প্রকৃত খাদ্য-গুণ ও নরম মাংস হিসাবে হ্যারিসকেই আমার পছন্দ। মেসিক-এর স্বপক্ষেও অনেক কিছু বলার ছিল-সে-কথা আমি অস্বীকার করি না, বা অস্বীকার করতে চাইও না-কিন্তু প্রাতরাশের খাদ্য হিসাবে একটি বুড়ি মা অপেক্ষা বেশী উপযুক্ততা তার ছিল না-মোটেই না স্যার। লিকলিকে? তা তো বটেই! আর

শক্ত? সত্যি, খুবই শক্ত! সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না-সে রকম কিছু আপনি কখনও কল্পনা করতে পারবেন না।

"আপনি কি বলতে চান যে-"

"দয়া করে আমার কথায় বাধার সৃষ্টি করবেন না। প্রাতরাশের পরে নৈশাহারের জন্য আমরা নির্বাচিত করলাম ডেট্রয়ট্ থেকে আগত ওয়াকার নামধারী একজনকে। সে লোকটি খুব ভাল ছিল। পরবর্তীকালে তার স্ত্রীকে সে কথা আমি লিখেছিলাম। বিরল বস্তু, কিন্তু খুব ভাল। পরদিন সকালে প্রাতরাশের জন্য পেলাম আলাবামা-র মর্গ্যান-কে। আজ পর্যন্ত যত সুন্দর মানুষকে নিয়ে টেবিলে বসেছি সে ছিল তাদের অন্যতম-সুদর্শন, শিক্ষিত, রুচিবান, কয়েকটি ভাষা অনর্গল বলতে পারে-যথার্থ ভদ্রলোক, সত্যি যথার্থ ভদ্রলোক আর বিশেষভাবে রসালো। নৈশাহারের জন্য পাওয়া গেল ওরিগন-এর ভদ্রলোককে: লোকটি এ একেবারে বাজে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না-বুড়ো, অস্থিসার, শক্ত। শেষ পর্যন্ত আমি তো বলেই ফেললাম, ভদ্রজনরা, আপনারা যা খুসি করতে পারেন, কিন্তু আমি আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকব। তখন ইলিনয়-এর গ্রাইম্স্ও বলল, "ভদ্রজনরা, আমিও অপেক্ষা করব। কিছু 'বস্তু' দেখে যখন কাউকে নির্বাচিত করবেন তখন এসে আবার আপনাদের সঙ্গে বসব।" অচিরেই বোঝা গেল যে, ওরিগন-এর ডেভিস-কে নিয়ে সকলেই অসন্তুষ্ট; কাজেই হ্যারিসকে পাবার পর থেকে যে সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নির্বাচনের দাবী করা হল এবং তার ফলে জর্জিয়ার বেকার নির্বাচিত হল। সেও ছিল চমৎকার! ঠিক আছে, ঠিক আছে-এরপর একে একে পেলাম ডুলিট্লকে, হকিন্সকে ও ম্যাক্এল্রয়কে (ম্যাক্এল্রয় সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ উঠেছিল, কারণ সে ছিল অত্যন্ত বেঁটে আর লিকলিকে); তারপর পাওয়া গেল পেন্রড, দুই স্মিথ, বেইলি (বেইলির ছিল একটা কাঠের পা, কাজেই তার সবটাই লোকসান; তবে তা ছাড়া বেশ ভালই ছিল), একটি ভারতীয় বালক, একজন বাজনাদার ও বাক্মিন্স্টার নামে একজন ভদ্রলোককে-লোকটি ছিল বাউণ্ডুলে ভবঘুরে; সঙ্গী হিসাবে অথবা প্রাতরাশ হিসাবেও কোন কর্মের নয়। তারপরই এল ত্রাণ-ব্যবস্থা।"

"তাহলে শেষ পর্যন্ত বহুবাঞ্ছিত ত্রাণ-ব্যবস্থা এল?"

"হ্যাঁ, নির্বাচনের ঠিক পরেই একটি উজ্জ্বল, সূর্য-ওঠা সকালে ত্রাণ-ব্যবস্থা এসে পৌঁছল। সেদিন নির্বাচিত হয়েছিল মারফি; আমি জোর গলায় বলতে পারি তার চাইতে ভাল কিছু হতে পারত না। কিন্তু যে ট্রেন আমাদের উদ্ধারের জন্য এসেছিল সেই ট্রেনেই জন মারফি আমাদের সঙ্গেই বাড়ি ফিরে এল এবং বেঁচে-বর্তে থেকে হ্যারিস-এর বিধবাকে বিয়ে করল-"

"সে কার বিধবা-"

"যাকে আমরা প্রথম নির্বাচিত করেছিলাম। মারফি সেই বিধবাকে বিয়ে করে এখনও সুখে, সমৃদ্ধিতে ও সসম্মানের বেঁচে আছে। আহা, সে যেন এক উপন্যাস স্যার-যেন একটি রোমান্স! কিন্তু এখানেই আমাকে নামতে হবে স্যার; নমস্কার। যদি কখনও আমার এখানে দু'একটা দিন কাটিয়ে যাবার সুযোগ করতে পারেন, তাহলে আপনাকে পেয়ে খুশি হব। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে স্যার; আপনার প্রতি আমার স্নেহ জন্মেছে। কি জানেন স্যার, হ্যারিসকে যেমন ভাল লেগেছিল, আপনাকেও তেমনই ভাল লেগেছে। অচ্ছা স্যার, শুভদিন; আপনার যাত্রা মধুময় হোক।"

সে চলে গেল। জীবনে কখনও এতদূর অভিভূত, দুঃখিত ও বিমূঢ় বোধ করি নি। কিন্তু সে চলে যাওয়াতে মনে মনে খুসিই হলাম। ভদ্র ব্যবহার ও নরম কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও যতবার সে দুটি ক্ষুধার্ত চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়েছে ততবারই আমি কেঁপে উঠেছি; আর যখন শুনলাম যে তার বিপজ্জনক স্নেহ আমার উপর পড়েছে এবং তার বিচারে আমি স্বর্গত হ্যারিস-এর সঙ্গে একই শ্রদ্ধার আসনের অধিকারী তখন আমার বুকের ভিতরটা বুঝি বা স্তব্ধ হয়েই গিয়েছিল।

আমার সে বিমূঢ়তা বর্ণনার অতীত। তার কথায় আমার সন্দেহ হয় নি; তার বিবরণ সত্যের যে আন্তরিকতার ছাপ ছিল তার একটি বর্ণকেও অবিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু তার বিবরণের ভয়াবহতা আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল; আমার সব চিন্তা-ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল। দেখলাম কণ্ডাক্টরটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে বললাম, "ঐ লোকটি কে?"

"এক সময় উনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। বেশ ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু একবার তিনি ট্রেনে যেতে বরফ-ঝড়ে পড়েন এবং অনাহারে প্রায় মরতে বসেন। বরফের ঠাণ্ডায় তাঁর শরীরে এত ঘা হয়েছিল, এমনভাবে জমে গিয়েছিলেন, এবং না খেতে পেয়ে এতই শুকিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপরেই দু'তিন মাসের জন্য তার মাথার গোলমাল দেখা দেয়। এখন

তিনি ভাল হয়ে গেছেন, কিন্তু একটি বিশেষ বিষয়ের উন্মত্ততা (monomania) তাকে পেয়ে বসেছে। সেই পুরনো দিনের কথা উঠলে গাড়ি-বোঝাই সব মানুষকে একে একে খাইয়ে শেষ না করে তিনি কখনও থামেন না। এতক্ষণে সবাইকে খতম করে ফেলতেন, কিন্তু তাকে যে এখানেই নামতে হল। সব নামগুলি বর্ণমালার মত তার একেবারে মুখস্থ। একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর সকলকে খাওয়ানো শেষ হয়ে গেলে তিনি সব সময়ই বলেন: "তারপর আবার যথারীতি প্রাতরাশের সময় হলে বিরোধী পক্ষে কেউ না থাকায় আমিই যথাসময়ে নির্বাচিত হলাম; আর তারপরে কোন আপত্তি না ওঠায় আমি পদত্যাগ করলাম। আর তাই আজ আমি এখানে হাজির আছি।"

এতক্ষণ একটি রক্তভৃষ্ণাতুর মরমাংসাশীর সত্যিকারের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে একটি উন্মাদের নিরীহ কল্পনায় বোনা কাহিনী শুনছিলাম মাত্র, এটা জানতে পেরে একটা অবর্ণনীয় স্বস্তি অনুভব করলাম।

১৮৬৮

নায়াগারায় একটি দিন

A Day at Niagara

নায়াগারা জলপ্রপাত একটি অত্যন্ত উপভোগ্য ভ্রমণ-কেন্দ্র। হোটেলগুলি চমৎকার; ভাড়াও অত্যধিক নয়। এখানকার চাইতে মাছ ধরবার বেশী সুযোগ দেশের আর কোথাও নেই; বস্তুত, এখানকার সমান সুযোগ -সুবিধাও আর কোথাও নেই। কারণ অন্য যে কোন স্থানে নদীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাছ ধরার সুবিধা কম-বেশী থাকে, কিন্তু নায়াগারায় সব জায়গাই সমান, কারণ সেখানে কোন জায়গায়ই মাছ বড়শি খায় না, আর তার ফলে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে কোথাও যাবারই দরকার হয় না; বাড়ির কাছেই হোক আর দূরেই হোক, অসফলতা যে সর্বত্রই সমান হবে সেটা তো জানা কথা। এই সুবিধার কথাটা কিন্তু এখনও জনসাধারণকে যথাযথভাবে জানানো হয় নি।

গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা থাকে; পায়ে হাঁটার ও গাড়ির পথ থাকে আরামদায়ক; মোটেই ক্লান্তি আসে না। প্রপাত "সারবার" জন্য য়াত্রা করে প্রথমেই মাইল খানেক গাড়িতে গিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নায়াগারা নদীর সংকীর্ণতম অংশটাকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করতে সামান্য কিছু টাকা দিন। একটা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে রেলপথটাকে এমনভাবে "কেটে" নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে ক্রুদ্ধ নদীটা তার নীচ দিয়েই সফেন গর্জনে ছুটে চলেছে। এখানে প্রায় দেড়শ" ফুট নীচে নেমে আপনি জলের একেবারে তীরে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। সে কাজটা করা হয়ে গেলে কিন্তু অপনি অবাক হয়ে ভাববেন এমন কাজ করলেন কেন; কিন্তু তখন আপনি অনেক দেরী করে ফেলেছেন।

রক্তে শিহরণ জাগানো ভঙ্গীতে গাইড আপনাকে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলবে, কেমন করে সে দেখেছিল, "মেইড অব্ দি মিষ্ট" নামক ছোট স্টীমারটা প্রথমে স্রোতের মুখে নেমে গেল-উচ্ছ্বসিত স্রোতের মধ্যে প্রথমে একটা চাকা অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর গেল দ্বিতীয়টা, একসময় ধোঁয়ার চোঙটাই সম্পূর্ণ উল্টে গেল, তারপর তক্তাগুলো ভেঙে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে লাগল-এবং তার পরেও ছ' মিনিটে সতেরো মাইল, কি সতেরো মিনিটে ছ'মাইল, আমার সঠিক মনে নেই, পথ অতিক্রম করবার অবিশ্বাস্য কার্যটি সমাধা করে স্টীমারটি শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই রয়ে গেল। সে যাই হোক, ব্যাপারটাও খুবই অসাধারণ। বিভিন্ন যাত্রীদলকে পরপর ন' বার ঐ একই কাহিনী যেভাবে সে বলে যায়, কখনও একটি কথা বাদ পড়ে না, বা একটি পংক্তি ও অঙ্গভঙ্গীরও বদল হয় না, তা শুনলে প্রবেশ-মূল্য হিসাবে যা দেওয়া হয় সেটা পুষিয়ে যায়।

তারপর ঝুলন্ত সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিন-দু' শ' ফুট নীচে নদীর বুকে ছিট্‌কে পড়ার সম্ভাবনা এবং উপরকার রেল-পথটা মাথার উপর ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা-এই দুই সম্ভাবনার দুঃখকে সমানভাবে ভাগ করে নিন। যে কোন একটি সম্ভাবনাই যথেষ্ট অস্বস্তিকর। কিন্তু দুটো মিলিয়ে যোগফল যা দাঁড়ায় সে তো চরম সুখহীনতার নামান্তর।

কানাডার দিকে ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে দাঁড়ানো ফটোগ্রাফারদের দীর্ঘ সারির সামনে দিয়ে যখন গাড়ি চালিয়ে যাবেন, তখন দেখতে পাবেন মহান নায়াগারার অস্পষ্ট পটভূমিতে আপনার নিজের ও আপনার ধ্বংসোন্মুখ গাড়ি ও মালপত্রের ছবি তুলে কোন মাসিক পত্রিকার সাড়ম্বর প্রচ্ছদপট তৈরি করবার জন্য ফটোগ্রাফাররা প্রস্তুত হয়েই আছে; আর এ ধরনের অপরাধকে সাহায্য ও সমর্থন করবার মত নীতিভ্রষ্ট মানুষের সেখানে অভাব নেই।

যে কোন দিন এইসব ফটোগ্রাফারদের হাতে আপনি দেখতে পাবেন অনেক বাবা ও মায়ের, জনি ও বাব্ ও সিস-এর, যা কোন পল্লীগ্রামের ভাই-বোনের জমকালো সব ছবি-মুখে অর্থহীন হাসি, অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে গাড়িতে উপবিষ্ট, আর যে মহান দৃশ্যের আত্মা ওই বিচিত্র রামধনু, প্রচণ্ড গর্জন যার বাণী, মেঘে-মেঘে আবৃত যার মুখমণ্ডল, তার সম্মুখে ত্রাসে-আতংকে অবসন্ন-দৃষ্টি সব মানুষের দল। নিজের বিস্ময়কর তুচ্ছতাকে উজ্জ্বল আলোর সামনে তুলে ধরবার জন্য নায়াগারাকে পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহার করায় সত্যিকারের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটা করতে হলে এক প্রকার অতিমানবিক আত্ম-সংযম প্রয়োজন।

"অশ্বক্ষুর প্রপাত" (Horseshoe Fall)-এ প্রচণ্ড জলস্রোত দেখে দেখে যখন মনে হবে এর তুলনা নেই তখন নতুন ঝুলন্ত সেতু বেয়ে আপনি যাবেন "আমেরিকায়", এবং তীর বরাবর যেতে যেতে দেখতে পাবেন "পবন গুহা" (Cave of the winds)।

এখানে গাইডের নির্দেশ মত গায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে ওয়াটার-প্রুফ জ্যাকেট ও ওভার-অল পরে নিলাম। পোশাকটা

বিচিত্র, কিন্তু সুন্দর নয়। অনুরূপ পোশাক-পরিহিত গাইড আমাকে নিয়ে একটা ঘোড়ানো সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। সিঁড়িটা ঘুরেই চলেছে, আমরাও নেমেই চলেছি। চলতে চলতে একসময় তার অভিনবত্ব গেল হারিয়ে এবং কোন রকম খুসি হবার আগেই একসময় সিঁড়িটা শেষ হয়ে গেল। আমরা তখন পাহাড়ের একেবারে নীচে নেমে গিয়েছি, কিন্তু তখনও নদীর সমতল থেকে আমরা বেশ খানিকটা উঁচুতে।

এবার আমরা একখানা তক্তার একটা ঠুন্‌কো সেতুর উপর দিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে এগোতে লাগলাম; একটা নড়বড়ে কাঠের রেলিং আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; দুই হাতে আমি সেটাকে আঁকড়ে ধরে চলেছি-ভয় পেয়েছি বলে নয়, সে রকমটা ইচ্ছা হয়েছিল তাই। ইতিমধ্যে পথটা আরও খাড়াই, সেতুটা আরও ঠুন্‌কো হয়েছে, আর "আমেরিকান জল-প্রপাতের" উচ্ছ্বসিত জল-কণার ধারা ক্রমেই বাড়তে বাড়তে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল; ক্রমেই আমরাও হাতড়াতে হাতড়াতেই এগোতে লাগলাম। এবার জলপ্রপাতের পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড বাতাস ধেয়ে এল; মনে হল, আমাদের বুঝি সেতুর উপর থেকে উড়িয়ে নিয়ে নিচের পাথর ও জলস্রোতের উপর আছড়ে ফেলবে। বললাম, আমি বাড়ি ফিরে যাব; কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমরা তখন উপর থেকে বজ্রের গর্জনে ধেয়ে-ধেয়ে জলরাশির বিরাট প্রাচীরের একেবারে নীচে এসে দাঁড়িয়েছি; সেই নির্মম গর্জনের মধ্যে কোন কতা বলাই বৃথা।

পরমুহূর্তেই সেই প্রবল জলস্রোতের পিছনে গাইডটি অদৃশ্য হয়ে গেল, আর সেই গর্জনে বিমূঢ়চিত্ত, সেই বাতাসে অসহায়ভাবে তাড়িত এবং জলধারার তীক্ষ্ণ শরে আহত অবস্থায় আমিও তার পিছু নিলাম। চারদিক অন্ধকার। সংগ্রামক্ষুব্ধ বাতাস ও জলের এমন উন্মত্ত দাপাদাপি, গর্জন, আর হাহাকার এর আগে কখনও আমার কানকে এভাবে বধির করে তোলে নি। মাথাটা নীচু করলাম; মনে হল অতলান্তিক মহাসাগর বুঝি আমার পিঠের উপর আছড়ে পড়ল। মনে হল, পৃথিবীটা বুঝি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জলের ধারা এমন হিংস্রভাবে নেমে আসছে যে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাথা তুলে মুখটা হাঁ করলাম, আর অমনি "আমেরিকান জলপ্রপাতে"র সবটাই যেন আমার গলার মধ্যে ঢুকে গেল। তখন নড়াচড়া করলেই মৃত্যু। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, সেতুটা শেষ হয়ে গেছে, এবার আমাদের পা ফেলতে হবে পিচ্ছিল খাড়া পাথরের উপর। জীবনে কখনও এতদূর আতংকিত বোধ করি নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাকে পেরিয়ে গেলাম এবং পরিষ্কার দিনের আলোয় পৌঁছে গেলাম; সেখানে দাঁড়িয়ে ফেনায়িত, তরঙ্গ-সংকুল পতনশীল জলরাশির এক নতুন জগৎকে সামনে দেখতে পেলাম। যখন দেখতে পেলাম সেখানে কত জল, আর সে কী ভয়ংকর, তখন ওরই পিছনে গিয়েছিলাম ভেবে আমার দুঃখ হতে লাগল।

মহাপ্রাণ "লাল মানুষ" সব সময়ই আমার বন্ধু ও প্রিয়। গল্পে, উপকথায় রোমান্সে তার কথা পড়তে আমি ভালবাসি। তার অনুপ্রেরণাশীল বিচক্ষণতা, অরণ্যে-পর্বতে তার উদ্দাম মুক্ত জীবন, তার চারিত্রিক মহত্ত্ব, আর অলংকারবহুল গম্ভীর ভাষা, শ্যামা রূপসীর প্রতি তার উদার সাহসিক ভালবাসা, তার পোশাক ও সামরিক সজ্জার বর্ণবহুল জাঁকজমক-এ সব কিছু পড়তেই আমি ভালবাসি। বিশেষ করে তার পোশাক ও সামরিক সজ্জার বর্ণবহুল জাঁকজমকের কথা। যখন দেখতে পেলাম নায়াগারা জলপ্রপাতের দোকানগুলিতে থরে থরে সাজানো রয়েছে সুন্দর সন্দর সব "ইণ্ডিয়ান" মালা, সুন্দর সুন্দর চামড়ার জুতো, তেমনই সুন্দর সব খেলনা-মানুষ যারা বাহুতে ও শরীরের নানাস্থানে গর্ত করে সেখানে অস্ত্রশস্ত্র রাখে, আর যাদের পা দেখতে পাখির মত, তখন আমার মন খুসিতে ভরে উঠল। বুঝতে পারলাম, শেষ পর্যন্ত আমি মহৎ "লাল মানুষ"টির মুখোমুখি দাঁড়াতে চলেছি।

দোকানের একটি মহিলা করণিক সত্যি সত্যি আমাকে বলল যে তার দোকানের সব ভাল ভাল পুরাতত্ত্ব-মূর্তিই "ইণ্ডিয়ান" দের তৈরি; জলপ্রপাতের আশেপাশে তারা অনেকে বাস করে; তারা খুবই বন্ধুপরায়ণ এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাতে বিপদের কিছু নেই। ঠিক তাই; লুনা দ্বীপে যাবার সেতুটার কাছে এগিয়ে যেতেই একটি মহৎ অরণ্য-সন্তানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। একটা গাছের নীচে বসে একমনে সে একটা মালার থলি তৈরি করে চলেছে। মাথায় ঝোলানো টুপি, মুখে একটা ছোট কালো পাইপ। আমাদের মেয়েলি সভ্যতার বিষময় সংস্পর্শে এসে "ইণ্ডিয়ান"রা এই ভাবেই তাদের স্বাভাবিক জাঁকজমকের বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলেছে। তার সঙ্গে এই ভাবে আমি কথা বললাম:

হোয়াক-ও হোয়াক-এর ওয়াহু-ওয়াং-ওয়াং কি সুখে আছেন? মহান "বিচিত্র বজ্র" কি যুদ্ধে যাবার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, না কি অরণ্য-গর্বিনী কালো মেয়ের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে আছেন? শক্তিমান "সাকেম" কি শত্রুর রক্তপান করতে ইচ্ছুক, না কি মালার থলি তৈরি করেই খুসি? অতীত গৌরবের মহান অবশেষ-মহামান্য ধ্বংসস্তূপ, কথা বল, উত্তর দাও!'

সে উত্তর দিল:

"আরে এ তো মুই, ডেনিস হলিগ্যান, যাকে তুমি লণ্ঠন-মুখো মাকড়সাঠ্যাং নোংরা শয়তান "ইজিন" বলে ভুল করতেছ। মোজেস-এর সামনে যে বাঁশি বাজিয়েছিল তার দিব্যি, আমি তোমাকে খেয়ে ফেলাব!"

সেখান থেকে চলে এলাম।

ঘুরতে ঘুরতে "টেরাপিন টাওয়ার"-এর কাছে একটি শান্ত আদি অধিবাসিনী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঝালরওয়ালা ও গুটি-বসানো হরিণের চামড়ার জুতো ও পায়ের পট্টি পরে সুন্দর সুন্দর পসরা নিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। এইমাত্র একটা কাঠের সেনাপতি বানিয়ে ধনুকটা ভরে দেবার জন্য তার পেটের ভিতরে একটু ফুটো করতে লেগেছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তাকে বললাম:

"অরণ্য-কন্যাটির মন কি খারাপ? হাস্যময়ী বেঙাচি কি সঙ্গীহীনা? তার বংশের সভাকক্ষের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ায় এবং পূর্বপূরষদের বিলীন গৌরবের জন্য সে কি শোকমগ্না? অথবা তার সাহসী "বিদ্যুৎভুখ" বীরটি যে অরণ্যে শিকার করতে গেছে তার বিষণ্ণ অন্তর কি সেই সুদূরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে? আমার মেয়েটি নীরব কেন? এই ম্লান-বদন অপরিচিতের প্রতি সে কি রাগ করেছে?"

মেয়েটি বলল:

"আরে বাবা, তুমি বিড্ডি ম্যালেন-কে গালাগালি করছ কেন? ওসব ছাড়, নইলে তোমার শুট্কো দেহটা জলপ্রপাতের মধ্যে ছুড়ে দেব, শিকনি-ঝরা দুশমন কোথাকার!"

সেখান থেকেও কেটে পড়লাম।

বললাম, "এদের কখনও ঘাটাতে আছে! লোকেরা বলে ওরা খুব শান্তশিষ্ট; কিন্তু চেহারা দেখলে তো বলতে হয় সকলেই রণরঙ্গে মেতেছে।"

আরও একবার তাদের সঙ্গে ভাই-ভাই সম্পর্কে পাতাতে চেষ্টা করলাম-শুধু একবার। তাদের একটা দলকে দেখতে পেলাম বড়ে একটা গাছের নীচে বসে জুতো তৈরি করছে। বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় তাদের বললাম:

"মহান লাল মানুষরা, সাহসী বীররা, উদার "শাসেম"রা, সেনাপতিরা, পদস্থ মাক্-ও-মাক্রা, অস্ত সূর্যের দেশ থেকে আগত ম্লান-মুখ এই মানুষটি তোমাদের অভিবাদন জনাচ্ছে! হে পরোপকারী গন্ধগোকুল-হে পর্বত-ভুখ-হে গর্জনকারী ঝড়ো হাওয়া-হে কাঁচ-চক্ষু সর্দার বালক-সমুদ্রের ওপার থেকে আগত ম্লান-মুখ মানুষটি তোমাদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছে! যুদ্ধ ও মহামারী তোমাদের লোকক্ষয় করেছে, তোমাদের এককালের গর্বোদ্ধত জাতিকে ধ্বংস করেছে। 'পোকার' এবং 'সেভেন-আপ' খেলা, আর তোমাদের গৌরবদীপ্ত পূর্বপুরুষদের কাছে অজানা সাবানের পিছনে ব্যর্থ আধুনিক অর্থব্যয় তোমাদের টাকার থলিতে ভাঙন ধরিয়েছে। সরল মনে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করায় তোমরা বিপদে জড়িয়ে পড়েছ। সরল ভালমানষেমির দরুন মিথ্যা ভাষণ তোমাদের সুনামকে কলংকিত করেছে। তোমরা যাতে মাতলামির সুখে বিভোর হয়ে আদিম রণ-কুঠার দিয়ে তোমাদের পরিবারকে হত্যা করতে পার সেজন্য তোমরা হুইস্কির ব্যবসাতে নেমেছ; তারই ফলে তোমাদের পোশাকের সেই বিচিত্র জৌলুশ বিদায় নিয়েছে, আর তার জায়গায় উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোয় দেখা দিয়েছ তোমরা-নিউ ইয়র্ক-এর শহরতলির ইতর লোকদের কাছ থেকে ধার করা পোশাক গায়ে চড়িয়ে। কী লজ্জা! স্মরণ কর তোমাদের পূর্বপুরুষদের! স্মরণ করে তাদের মহান কার্যাবলী" স্মরণ কর 'আংকাস'-কে!-আর 'লাল কোর্তা'-কে!-আর 'দিবস-গহ্বর'-কে!-আর হুপ্ডিডুড্লড্ডু'-কে। তাদের সফলতাকে অনুসরণ কর! হে মহান বর্বরের দল, হে বিখ্যাত বাউণ্ডুলের দল, আমার পতাকার তলে তোমরা সমবেত হও-"

"ওটাকে মার!" হতভাগাকে আছড়ে মার!" "পুড়িয়ে মার!" "ফাঁসিতে ঝোলাও!" "জলে ডুবিয়ে মার!"

অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। শুধু দেখলাম হঠাৎ বাতাসে ঝল্সে উঠল মুগুর, ইঁট, ঘুষি, গুটির ঝুড়ি, জুতো-সবকিছু

নিয় সকলে একসঙ্গে আমাকে মারতে উদ্যত হল। পর মুহূর্তেই তাদের গোটা উপজাতিটাই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার অর্ধেক পোশাক ছিঁড়ে নিয়ে গেল, আমার হাত-পা ভাঙল; একটা আঘাতে আমার মাতাটাকে কফির পাত্রের মত চ্যাপ্টা করে দিল, আর সেই আঘাতের সঙ্গে অপমানকে জুড়ে দিতে তারা আমাকে নায়াগারা জলপ্রপাতের উপর ছুঁড়ে দিল; আমি ভিজে গেলাম।

উপর থেকে প্রায় নব্বুই কি একশ' গজ নীচে আমার গায়ের বাকি পোশাক একটা মাথা বের-করা পাথরে আটকে গেল; ডুবতে ডুবতেও কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। শেষ পর্যন্ত ছিটকে পড়লাম জলপ্রপাতের নীচেকার সাদা ফেনার রাজ্যে-সেখানকার ফেনায়িত জলরাশি আমার মাথা ছাড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। একটা ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে গেলাম। তার মধ্যে ভেসে ভেসে চুয়াল্লিশ বার ঘুরলাম-একখণ্ড কাঠের পিছনে ছুটে ছুটে সেটাকে ধরে ফেললাম-ঘূর্ণিটাকে এক পাক দিতে আধ-মাইল পথ বার হতে হয়-তীরের একই ঝোঁপকে ধরতে চুয়াল্লিশবার চেষ্টা করলাম-আর প্রতিবারই এক চুলের জন্য সেটা নাগাল এড়িয়ে গেল।

অবশেষে একটি লোক হাঁটতে হাঁটতে এসে সেই ঝোপটার পাশে বসল। পাইপটা মুখে দিল, দেশলাই ধরাল, এবং সেটাকে বাতাস থেকে আড়াল করে ধরে একটা চোখ রাখল আমার দিকে, আর অন্য চোখটা রাখল দেশলাইয়ের দিকে। হঠাৎ এক ঝলক বাতাস এসে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে দিল। পরের বার যখন আমি ঘুরে সেখানে এলাম তখন সে বলল:

"দেশলাই আছে?"

"হ্যাঁ; আমার অন্য জামায়। দয়া করে আমাকে উঠতে সাহায্য কর।"

"সেটি হচ্ছে না।"

আবার ঘুরে এসে বললাম:

"একটি ডুবন্ত মানুষের এই আপাত-অন্যায় কৌতূহল মার্জনা কর; তোমার-এই অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝিয়ে বলবে কি?"

"আনন্দের সঙ্গে। আমি করোনার। আমার জন্য তাড়াহুড়া করো না। তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু আমার যে একটা দেশলাই চাই।"

আমি বললাম: "আমার জায়গায় এস। আমি গিয়ে তোমাকে একটা এনে দিচ্ছি।"

এ প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করল। তার এই বিশ্বাসের অভাব আমাদের সম্পর্ককে শিথিল করে দিল, আর আমিও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। স্থির করলাম, আমার যদি কিছু ঘটেই যায় তাহলে সে-ঘটনার সময়টাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করব যাতে আমি গিয়ে "আমেরিকা"-র দিককার বিরোধী করোনারের হাতে পড়তে পারি।

শেষ পর্যন্ত একজন পুলিশের লোক এগিয়ে এল এবং তীরবর্তী লোকদের কাছে সাহায্যের জন্য চীৎকার করে তাদের শান্তি ভঙ্গ করার অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করল। জজসাহেব আমাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করল, কিন্তু তাতে আমারই সুবিধা হল। আমার টাকা ছিল আমার পাঁৎলুনের মধ্যে, আর আমার পাঁৎলুনটা ছিল "ইণ্ডিয়ান"-দের হেফাজতে।

এইভাবে আমি পার পেয়ে গেলাম। এখন আমি অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় শুয়ে আছি। সংকটজনক হোক আর না হোক, শুয়ে যে আছি সেটা অন্তত ঠিক। আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা, কিন্তু তার পূর্ণ বিবরণ আমি এখনও দিতে পারছি না, কারণ ডাক্তার এখনও তার ফর্দ তৈরি করে নি। আজ সন্ধ্যায় সেটা প্রকাশ করবে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত সে মনে করে যে আমার ক্ষতের মাত্র ষোলটি মারাত্মক। অন্যগুলো নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।

মনের সঠিক অবস্থা ফিরে এলে আমি বললাম:

"ডাক্তার, নায়াগারা জলপ্রপাতে যে 'ইণ্ডিয়ান"-রা দানার কাজ করে ও জুতো তৈরি করে তারা তো ভয়ংকর উপজাতীয় লোক। তারা



কোথা থেকে এসেছে?"

"লিমেরিক থেকে বৎস।"

১৮৬৯

ক্যাপিটল-এর দেবী ভিনাস-এর উপকথা

Legend the Capitoline Venus

অধ্যায় ১

[স্থান: রোমের জনৈক শিল্পীর স্টুডিও]

"ওঃ জর্জ, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"তোমার হৃদয়কে ধন্যবাদ মেরি, সে কথা আমি জানি-কিন্তু তোমার বাবার এমন কঠিন-হৃদয় কেন?"

"জর্জ, তিনি আমাদের ভালই চান, কিন্তু তাঁর কাছে আর্ট হল বোকামি-তিনি শুধু বোঝেন তেল-নুন-লক্ড়ি। তিনি মনে করেন, তুমি আমাকে না খাইয়ে রাখবে।"

"তাঁর জ্ঞানকে ভুল বুঝো না-এতে প্রেরণায় ইঙ্গিত রয়েছে। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার অধিকারী ভাস্কর হয়ে না খেয়ে থাকার চাইতে কেন আমি অর্থবান হৃদয়হীন মুদি হলাম না?"

"প্রিয় জর্জ, হতাশ হয়ো না-যে মুহূর্তে তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলার জমাতে পারবে তখনই তাঁর সব বাধা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।"

"পঞ্চাশ হাজার দানব! বাছারে, আমার যে ঘর-ভাড়াই বাকি পড়েছে!"

অধ্যায় ২

[স্থান: রোমের একটি বাড়ি]

"মাই ডিয়ার স্যার, বাজে কথা বলে লাভ নেই। তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু ভালবাসা, আর্ট ও অনাহারের একটা ঘণ্টর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না-আমার বিশ্বাস এর বাইরে আর কিছু তোমার দেবার নেই।"

"স্যার, আপনার কথা আমি মানছি যে আমি গরিব। কিন্তু খ্যাতি কি কিছুই নয়? আর্কান্সাস-এর মাননীয় বেল্লামি ফুড্ল বলেন যে আমেরিকার যে নতুন মূর্তি আমি তৈরি করেছি সেটি ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন; তিনি বিশ্বাস করেন যে একদিন আমার নাম বিখ্যাত হবেই!"

"ধ্যেৎ! আর্কান্সাস-এর সেই গাধাটা এ সবের কি বোঝে? খ্যাতি কিছুই নয়-শ্বেত পাথরের যে কাকতাড়ুয়া তুমি বানিয়েছ তার বাজারদরটাই হল আসল কথা। ওটা বানাতে তোমার ছ'মাস সময় লেগেছে, আর একশ' ডলারেও তুমি ওটা বেচতে পারবে না। না স্যার-আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেখাও, তবেই আমার মেয়েকে পেতে পার-নইলে সে বিয়ে করবে যুবক সিস্পারকে। টাকাটা তুলতে তোমাকে ছ'মাস সময় দিলাম। গুড মর্ণিং স্যার।"

"হায়! কী দুঃখ আমার!"

অধ্যায় ৩

[স্থান: স্টুডিও]

"হায় জন, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু আমি সব চাইতে দুঃখী মানুষ।"

"তুমি একটি বোকা।"

"আমেরিকার এই প্রতিমূর্তিটি ছাড়া আমার ভালবাসার বস্তু আর কিছুই নেই-আর দেখ, সেই আমেরিকার শ্বেতপাথরের অকরুণ মুখেও

আমার প্রতি কোন সহানুভূতি নেই-সে মুখ কত সুন্দর, অথচ কী হৃদয়হীন!"

"তুমি একটি পুতুল!"

"ওঃ জন!"

"তুমি একটি অকর্মণ্য! তুমি বলেছিলে না টাকাটা তুলবার জন্য ছ'মাস সময় পেয়েছ?"

"আমার এই দুঃখে আমাকে উপহাস করো না জন। ছ'শ' বছর সময় পেলেই বা কি লাভ হত? আমার নাম নেই, টাকা নেই, মুরুব্বি নেই, সময় দিয়ে আমি কি করব?"

"ইডিয়ট! কাপুরুষ! খোকা! টাকাটা তুলতে ছ' মাস সময় পেয়েছিলে অথচ পাঁচ মাসেই হত!"

"তুমি কি পাগল হলে?"

"ছ' মাস-যথেষ্ট। আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তুলে দেব।"

"তুমি কি বলছ জন? এত মোটা টাকা তুমি কেমন করে তুলবে?"

"তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি? আমি যা করব তাই মেনে নেবে-এই মর্মে আমাকে কথা দেবে কি? প্রতিজ্ঞা করবে কি যে আমার কাজে কোন দোষ ধরবে না?"

"আমার মাথা ঘুরছে-বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে-কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

জন একটা হাতুড়ি নিয়ে ইচ্ছা করে 'আমেরিকা'-র নাকটা ভেঙে দিল! আরও একটা আঘাতে তার দুটো আঙুল ভেঙে মেঝেতে পড়ল-আর একটা আগাত, কানের খানিকটা ভেঙে পড়ল-আর একটা, পায়ের একসার আঙুল বিকৃত, বিধ্বস্ত হয়ে গেল-আর একটা, হাঁটুর নীচ থেকে বাঁ পা-টা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

জন টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জর্জ তার সম্মুখস্থ ভগ্ন, বিকৃত দুঃস্বপ্নের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আর তারপরেই মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

ইতিমধ্যে জন একখানা গাড়ি নিয়ে ফিরে এল, ভগ্ন-হৃদয় শিল্পী ও ভগ্ন-পদ মূর্তিটাকে গাড়িতে তুলল, তারপর শান্তভাবে আস্তে শিস দিতে দিতে গাড়ি চালিয়ে দিল। শিল্পীকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে সে মূর্তিটাকে নিয়ে "তারা বুইরিনালিস" বরাবর গাড়িকে হাঁকিয়ে দিল।

অধ্যায় ৪

[স্থান: স্টুডিও]

"আজ বেলা দু'টোয় ছ'মাস শেষ হবে! হায়, কী যন্ত্রণা! আমার জীবনের সব আলো নিভে গেছে। এর চাইতে আমার মৃত্যুও যে ছিল ভাল। কাল কিছু খাই নি। আজও প্রাতরাশ খাই নি। কোন খাবার ঘরে ঢুকবার সাহস পর্যন্ত হয় নি। আর ক্ষুধা?-সে কথা বলো না। মুচি তাগাদা দিয়ে মেরে ফেলছে-দর্জি তাগাদা দিচ্ছে-বাড়িওলা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার অবস্থা শোচনীয়। সেই ভয়ংকর দিনের পর থেকে আর জনের দেখা নেই। বড় রাস্তায় যখন প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সে মিষ্টি করে হাসে, কিন্তু পাথরের মত কঠিন-হৃদয় বুড়ো বাপের হুকুমে তাকে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। দরজায় আবার কে ধাক্কা দিচ্ছে? কে আমাকে কষ্ট দিতে এসেছে? নিশ্চয় সেই মুচি শয়তান। ভিতরে এস!"

"আহা, মাননীয় মহাশয় সুখে থাকুন-ভগবান আপনার উপর প্রসন্ন হোন! প্রভুর জন্য নতুন একজোড়া জুতো এনেছি-আহা, দামের কথা বলবেন না, তাড়াহুড়ার কিছু নেই, মোটেই নেই। মহান প্রভু যদি আমার কাছ থেকেই সব সওদাপত্র করেন তাহলে গর্ববোধ করব-আহা, বিদায়!"

"স্বয়ং জুতো বয়ে এনেছে" টাকাও চায় না! নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল, আর মহামান্য বলে সম্মান করে গেল! আমাকে খদ্দের রাখতে কী আকুতি! পৃথিবীর শেষ দিন কি ঘনিয়ে এল? আর তাও কি না-ভিতরে আসুন!"

"ক্ষমা করবেন সিনর, আপনার জন্য এক প্রস্থ নতুন পোশাক এনেছি-"

"ভিতরে আসুন!!"

"বিনা অনুমতিতে প্রবেশের জন্য পূজ্যপাদের কাছে হাজার বার ক্ষমা চাইছি। কিন্তু নীচে আপনার জন্য সুন্দর একটি বাসা-বাড়ি বানিয়েছি-এই বাজে খুপ্‌রি আপনার উপযুক্ত নয়-"

"ভিতরে আসুন!!"

"বাছা আমার, এ মেয়ে তোমারই! মুহূর্তের মধ্যেই সে এখানে হাজির হবে। তাকে তুমি গ্রহণ কর-বিয়ে কর-ভালবাস-সুখী হও!-ঈশ্বর তোমাদের দু'জনকে আশীর্বাদ করুন! হিপ, হিপ, হুর-"

"ভিতরে আসুন!!!"

"ওঃ জর্জ, প্রিয় আমার, আমরা বেঁচে গেছি-কিন্তু দিব্যি করে বলছি, কেন আর কি ভাবে এটা ঘটল আমি জানি না!"

অধ্যায় ৫

[স্থান: একটি রোম্যান কাফে]

একদল মার্কিন ভদ্রলোক "ইল্ স্ল্যাঙ্গহোয়াঙ্গার ডাই রোমা" সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ থেকে নিম্নলিখিত অংশটি পড়ছিল ও অনুবাদ করছিল:

"আশ্চর্য আবিষ্কার!-ছ'মাস আগে বেশ কয়েক বছর যাবৎ রোমের বাসিন্দা সিনর জন স্মিথ নামক জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক রাজকুমারী বর্ঘিস-এর কোন দেউলিয়া আত্মীয়ের কাছ থেকে সিপিও পরিবারের সমাধির ঠিক ওপারে কাম্পানা অঞ্চলের একখণ্ড ছোট জমি খুব অল্প দামে ক্রয় করেছিলেন। পরে মিঃ স্মিথ সরকারী মহাফেজখানার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে গিয়ে সেই জমিখণ্ড জর্জ আর্নল্ড নামক একজন গরিব মার্কিন শিল্পীর নামে হস্তান্তর করে দিয়ে বলেন যে, দীর্ঘকাল আগে সিনর আর্নল্ড-এর সম্পত্তির ব্যাপারে আকস্মিকভাবে তার যে আর্থিক ক্ষতি তিনি করেছিলেন তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বেচ্ছায় তিনি এ কাজ করছেন এবং আরও বলেন যে, নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে তিনি সিনর-এর হয়ে ঐ জমিন প্রয়োজনীয় উন্নতিসাধনও করে দেবেন। চার সপ্তাহ আগে সেই জমিতে প্রয়োজনীয় খোঁড়াখুঁড়ি চালাবার সময় সিনর স্মিথ মাটির নীচ থেকে এমন একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করেছেন যেমনটি রোমের প্রাচুর্যপূর্ণ শিল্পভাণ্ডারে এর আগে কখনও যুক্ত হয় নি। অপূর্ব সেই নারীমূর্তির গায়ে যদিও অনেক ধুলোবালি লেগেছে, যদিও তাতে কালের ছোপ পড়েছে, তথাপি সেই মনোমুগ্ধকর নারী-মূর্তির দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। মূর্তিটির নাক, হাঁটুর নীচ থেকে বাঁ পা-টা, একটা কান, ডান পায়ের আঙুল ও এক হাতের দুটো আঙুল হারিয়ে গেছে; তা সত্ত্বেও মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য ভাল অবস্থায় আছে। সরকার পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটির সামরিক দখল নেওয়া হয়েছে, শিল্প-সমালোচক, পুরাতত্ত্ববিদ, ও গির্জার কর্তৃপক্ষদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে; তারাই এই মূর্তিটির মূল্য নিরূপণ করবেন এবং যে জমিতে এটি পাওয়া গেছে তার মালিককে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে সেটাও স্থির করবেন। গতকাল রাত পর্যন্ত ব্যাপারটাকে একান্ত গোপন রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কমিশনের বৈঠক বসেছে। আলোচনা হয়েছে। গত রাতে তারা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেছেন যে মূর্তিটি ভিনাস-এর এবং খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কোন অজ্ঞাত কিন্তু মহৎ প্রতিভাধর শিল্পীর সৃষ্টি। তারা মনে করেন, পৃথিবীর মানুষ যে সব শিল্পী-কর্মের খবর রাখে এটি তার মধ্যে সব চাইতে নিখুঁত শিল্প-সৃষ্টি।

"মধ্যরাতে তারা আবার বৈঠকে বসে স্থির করেন যে এই ভিনাস-মূর্তিটির মূল্য এক কোটি ফ্রাঁর মত মোটা অর্থ। রোমের আইন ও প্রথা অনুসারে যেহেতু কাম্পানা অঞ্চলে প্রাপ্ত যে; কোন শিল্প-কর্মের অর্ধেক মালিক সরকার স্বয়ং, সুতরাং মিঃ আর্নল্ড-কে পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ দাম দিয়ে এই সুন্দর মূর্তিটির স্থায়ী দখল নেওয়া ছাড়া সরকারের আর কিছু করার নেই। আজ সকালে ভিনাস-এর মূর্তিটি কে "ক্যাপিটল"-এ স্থানান্তরিত করা হবে; সেটি এখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে। আর দুপুর বেলা রাজকোষের উপর পরম পবিত্র পোপের নির্দেশক্রমে ঐ কমিশন সিনর আর্ণল্ড-এর সঙ্গে দেখা করে ঐ পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে তুলে দেবেন!"

সকলের সমস্বরে: "ভাগ্য! এরই নাম ভাগ্য!"

অপর একটি কণ্ঠস্বর: "ভদ্রমহোদয়গণ! আমি প্রস্তাব করছি, আসুন এই মুহূর্তে আমরা একটি মার্কিন জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি গঠন করি এবং ওয়াল স্ট্রীট-এর সঙ্গে যোগাযোগক্রমে এখানকার জমি উদ্ধারকৃত মূর্তিসমূহ ক্রয় করি।"

সকলে-"প্রস্তাব গৃহীত হল।"

অধ্যায় ৬

[স্থান: রোমের ক্যাপিটল-দশ বছর পরে]

"প্রিয়তমা মেরি, পৃথিবীর মধ্যে এটাই সবচাইতে বিখ্যাত মূর্তি। এই সেই বিখ্যাত 'ক্যাপিটলাইন ভিনাস' যার কথা তুমি কত না শুনেছ। এখন অবশ্য মূর্তিটির ক্ষয়-ক্ষতিগুলি 'পুনরুদ্ধার' (অর্থাৎ মেরামত) করেছে রোমের বিখ্যাত সব শিল্পীরা-আর এই মহৎ শিল্প-কর্মের কিছু কিছু সামান্য মেরামতি কাজ করেছে বলেই যতদিন পৃথিবী আছে ততদিন তাদের নামও বিখ্যাত হয়ে থাকবে। কী অশ্চর্য কথা-এই স্থান! সুখে অতিবাহিত দশটি বছর আগে যে দিন এখানে শেষ দাঁড়িয়েছিলাম সেদিন আমি ধনী ছিলাম না-পকেটে একটা সেন্ট ও ছিল না। অথচ রোম যাতে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ পরাকৃর্তির অধিকারিণী হতে পারে, সেজন্য সেদিন আমার কত কিছুই না করার ছিল।"

"বহুজনপূজিত, বিখ্যাত ক্যাপিটালাইন ভিনাস-আর কী তার দাম! এক কোটি ফ্রাঁ!"

"হ্যাঁ-আজ তাই।"

"দেখ জর্জি, কী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সে প্রতিমূর্তি!"

"তাতো বটেই-কিন্তু সেই মহাপুরুষ জন স্মিথ যেদিন মূর্তিটির পা ভেঙেছিল ও নাক থ্যাঁতা করেছিল তার আগে যা ছিল তার তুলনায় ঐ তো কিছুই নয়। বুদ্ধিমান স্মিথ! প্রতিভাধর স্মিথ!-মহান স্মিথ! আমাদের সব সুখের সৃষ্টিকর্তা! শোন! ঐ শাঁই-শাঁই শব্দের অর্থ বোঝে কি? মেরি, ঐ বাচ্চাটার খুংড়ি কাশি হয়েছে। তুমি কি বাচ্চাদের যত্ন নিতে কোন দিন শিখবে না?"

সমাপ্তি

রোমের ক্যাপিটাল-এ ক্যাপিটালাইন ভিনাস আজও আছে; আজও সে মূর্তি সর্বাপেক্ষা মনোরম ও বিখ্যাত শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে সারা পৃথিবীর গর্বের বস্তু। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি কখনও আপনি নিজে তার সামনে গিয়ে দাড়ান, আর তাকে নিয়ে যথারীতি আবেগবিহ্বল হয়ে ওঠেন, তাহলে এর উৎপত্তির সত্যিকারের গোপন ইতিহাস যেন আপনার সে আনন্দকে নষ্ট করে না দেয়-আর যখন পড়বেন যে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সিরাকিউজ-এর নিকট, বা অন্য কোন জায়গার কাছে, একটি বিরাট শিলীভূত মনুষ্যমূর্তি মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে, তাহলেও কথাটা গোপন রাখবেন-আর যে বার্নাম তাকে কবর দিয়েছিল সে যদি প্রচুর দাসে সেটা আপনার কাছে বিক্রি করতে চায়, তাহলে কিনবেন না। তাকে সোজা পোপের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

মন্তব্য: "শিলীভূত দানব" -এর বিখ্যাত জোচ্চুরি যে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এই রেখা-চিত্রটি সেই সময় লেখা হয়েছিল।

১৮৬৯

টেনেসি-তে সাংবাদিকতা

Journalism in Tennessee

ডাক্তার আমাকে বলেছিল দক্ষিণ অঞ্চলের আবহাওয়ায় আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, আর সেই জন্যই আমি টেনেসি-তে চলে গেলাম। সেখানে "মর্ণিং গ্লোরি অ্যাণ্ড জনসন কাউন্টি ওয়ার-হুপ"-এ সহযোগী সম্পাদকের চাকরিটাও পেয়ে গেলাম। কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখলাম, প্রধান সম্পাদক একটা তিন-পাওয়ালা চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইন কাঠের টেবিলে পা তুলে দিয়ে বসে আছে। ঘরে আরও একটা পাইন কাঠের টেবিল ও একখানা কষ্টকর চেয়ার ছিল! দুটোই খবরের কাগজ, ছেঁড়া কাগজ ও পাণ্ডুলিপিতে অর্ধেক ঠাসা। বালি-ভর্তি একটা কাঠের বাক্সও ছিল; সেটাও সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ও "ওল্ড সোলজার"-এ বোঝাই। আর ছিল একটা স্টোভ; তার পাল্লাটা উপরের কব্জার সঙ্গে ঝুলে আছে। প্রধান সম্পাদকের পরনে লম্বা লেজওয়ালা কালো সুতির ফ্রককোট ও সাদা সুতির প্যান্ট। পায়ে পরিষ্কার কালি-করা ছোট জুতো। একটা দুমড়ানো শাল, আঙুলে বড় শিলা-আংটি, অপ্রচলিত খাড়া কলার, আর ঝুলে-পড়া চৌখুপিকরা নেকারচিফ। পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারে ১৮৪৮ সালের। সিগারেট টানতে টানতে সে একটা শব্দের কথা ভাবছিল আর মাথার চুল টানছিল। এমন ভয়ংকরভাবে সে চোখ-মুখ কুঁচকাচ্ছিল যে আমার মনে হল সে একটা জটিল সম্পাদকীয় প্রবন্ধের খসড়া তৈরি করছে। সে আমাকে বলল, সবগুলো খবরের কাগজ একসঙ্গে নিয়ে সেগুলো ভাল করে পড়ে তার দরকারী সারাংশ নিয়ে "টেনেসি সংবাদপত্রের মর্ম-কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলতে।

আমি এই রকম লিখলাম:

টেনেসি সংবাদপত্রের মর্মকথা

"অর্ধ সাপ্তাহিক 'আর্থকোয়েক'-এর সম্পাদকগণ বালিহ্যাক রেলপথ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। বুজাউভিল-কে পাশ কাটিয়ে পাওয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য নয়। বরং জায়গাটিকে তারা এই রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে মনে করেন, আর তাই জায়গাটিকে উপেক্ষা করবার কোন ইচ্ছা তাদের থাকতে পারে না। আশা করি, 'আর্থকোয়েক'-এর ভদ্রমহোদয়গণ সানন্দে এই ভুলটুকু সংশোধন করে নেবেন।

'হিগিন্সভিল থাণ্ডারবোল্ট অ্যাণ্ড ব্যাট্‌ল্‌ক্রাই অব ফ্রীডম'-এর সুযোগ্য সম্পাদক জন ডব্লু. ব্লোসম, এস্কোয়ার, গতকাল এই শহরে এসেছেন। তিনি 'ভ্যান বুরেন হাউস'-এ উঠেছেন।

আমরা বলতে চাই যে 'মাডস্প্রিংস্ মর্ণিং হাউল' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুটি ভ্যান ওয়ার্টার-এর নির্বাচনের সংবাদটি সঠিক নয় বলে যে মন্তব্য করেছেন সেটা ভুল। আশা করি আমাদের এই বক্তব্য তার কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি তার ভুল ধরতে পেরেছেন। নির্বচনের অসম্পূর্ণ ফলাফলের জন্যই যে তিনি ভুলটি করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্ল্যাথার্সভিল শহরে তার প্রায় অচল রাস্তাগুলিকে নিকলসন পাথর দিয়ে পাকা করে দেবার জন্য নিউ ইয়র্ক-এর কতিপয় ভদ্রলোকের সঙ্গে চুক্তি করবার চেষ্টা করছে জেনে আমরা আনন্দিত। 'দি ডেউলি হুররা" পত্রিকা এই ব্যবস্থাকে খুবই জরুরী বলে বর্ণনা করে এর চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।"

আমার পাণ্ডুলিপিকে গ্রহণ, সংশোধন বা বর্জনের জন্য প্রধান সম্পাদকের কাছে পেশ করলাম। সেটা দেখতে দেখতে তার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। পাতাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে তার মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল। সহজেই বোঝা গেল পরিস্থিতি ভাল নয়। এমন সময় লাফিয়ে উঠে সে বলল:

"বজ্র ও বিদ্যুৎ! আপনি কি মনে করেন, এই সব গুরুদের সম্পর্কে আমি এভাবে কথা বলব? আপনি কি মনে করেন আমার, গ্রাহকরা এই সব বাজে মাল সহ্য করবে? দিন আমাকে কলমটা!"

একটা কলম যে এত ভয়ংকরভাবে কাটাকুটি করতে পারে, বা এমন নিরংকুশভাবে অন্য কারও ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ পদের উপর

চেয়ে বেড়াতে পারে তা আগে কখনও দেখি নি। সে যখন এইভাবে তার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন কে যেন তাকে লক্ষ্য করে খোলা জানালা দিয়ে গুলি করল।

সে বলে উঠল, অন্য কারও ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ পদের উপর চেয়ে বেড়াতে পারে তা আগে কখনও দেখি নি। সে যখন এইভাবে তার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন কে যেন তাকে লক্ষ্য করে খোলা জানালা দিয়ে গুলি করল।

সে বলে উঠল, "ওঃ, ওই তো 'মরাল ভল্‌কানো' পত্রিকার সেই শয়তান স্মিথ-কাল তার আসবার কথা ছিল।" দ্রুত হাতে বেল্ট থেকে নৌ-বাহিনীর রিভলবারটা তুলে নিয়ে সেও গুলি ছুঁড়ল। উরুতে গুলি লেগে স্মিথ পড়ে গেল। ফলে স্মিথ-এর দ্বিতীয়বার গুলি করার চেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল এবং একটি অপরিচিত লোককে পঙ্গু করে দিল। সেই লোক আমি। একটা আঙুল স্রেফ উড়ে গেল।

তখন প্রধান সম্পাদক আবার আমার লেখাটার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজে লেগে গেল। কাজটা সবে শেষ হয়েছে এমন সময় একটা হাত-বোমা স্টোভের পাইপ বেয়ে নেমে এমনভাবে ফাটল যে স্টোভটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। যা হোক, একটা টুকরো ছিটকে এসে আমার দুটো দাঁতকে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন ক্ষতি হল না।

"স্টোভটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল," প্রধান সম্পাদক বলল।

আমারও যে সেই মত সেটা জানালাম।

"ঠিক আছে। এ কাজ যে করেছে তাকে আমি চিনি। তাকে ঠিক হাতের মধ্যে পাব। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই এ সব জিনিস লিখতে হয়।"

পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিলাম। মোছামুছি, কাটাকাটি ও রদ-বদলের পরে তার যা চেহারা দাঁড়িয়েছে তাতে তার মা থাকলে সেও তাকে চিনতে পারত না। এখন লেখাটা এই রকম দাঁড়িয়েছে:

টেনেসি সংবাদপত্রের মর্মকথা

"অর্ধ সাপ্তাহিক '।আর্থকোয়েক' পত্রিকার মেরুদণ্ডহীন মিথ্যাবাদীর দল পুনরায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় পরিকল্পনা বালিহ্যাক রেলপথ প্রসঙ্গে একদল মহৎ ও উদ্যোগশীল মানুষের বিরুদ্ধে তাদের নীচ জঘন্য মিথ্যার পশরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই উদ্যোগে বুজার্ডভিলকে উপেক্ষা করা হচ্ছে-এই ধারণাটি তাদের নির্বোধ মস্তিক-অথবা তাদের মস্তকের যে জায়গাটাকে তারা মস্তিষ্ক বলে মনে করে সেখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তাদের সরীসৃপসুলভ দেহে যে গো-চর্মের কশার আঘাত তাদের একান্ত প্রাপ্য তা থেকে নিজেদের বাঁচাতে হলে তারা যেন অবিলম্বে এই মিথ্যা প্রচারকে প্রত্যাহার করে নেয়।

'হিগিন্সভিল থাণ্ডারবোল্ট অ্যাণ্ড ব্যাট্‌ল-ক্রাই অব ফ্রীডম' পত্রিকার সেই ব্লসম নামক গাধাটি পুনরায় এখানে হাজির হয়ে ভন বুরেন-এ ঘাস খাচ্ছে।

আমরা বলতে চাই, 'মাড্‌স্প্রিংস্‌ মর্ণিং হাউল' পত্রিকাটির নির্বোধ বদমাশটি তার স্বাভাবিক অমৃতভাষণের প্রবৃত্তিবশেই গেয়ে বেড়াচ্ছে যে ভ্যান ওয়ার্টার নির্বাচিত হন নি। সত্য প্রচার, সর্ব প্রকার মূলোচ্ছেদ করা, জনসাধরণের নৈতিক চরিত্র ও আচরণেকে সুশিক্ষিত করা, সংস্কৃতিবান করা, উন্নত করা, এবং মানুষকে আরও ভদ্র, আরও ধর্মানুগ করে তোলা, এবং সর্বতোভাবে মানুষকে মহত্তর, পবিত্রতর ও আরও সুখী করাই সাংবাদিকতার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট আদর্শ; অথচ হীন-চরিত্র বদমাশটি অনবরত মিথ্যারটনা, কুৎসাপ্রচার, অকারণ কটুক্তি ও অশালীন ব্যবহারের দ্বারা সেই মহান মর্যাদার অপহ্নব ঘটাচ্ছে।

ব্ল্যাথার্সভিল শহর নিকলসন পাথরের পাকা রাস্তা চাইছে-চাইছে আরও একটি করে কারাগার ও অনাথ আশ্রম। যে এক ঘোড়ার শহরে আছে মাত্র দুটি মদের ভাঁটি, একটা কামারশালা, আর আর ঐ তেল-মালিশ করা খোসামুদে সংবাদপত্র 'ডেইলি হুর্‌রা'-হায়রে; সেখানে আবার পাকা রাস্তার স্বপ্ন; আর ঐ যে পায়ে-হাঁটা ফড়িং বাকনার যে 'হুর্‌রা' সম্পাদনা করে, সে আবার তার স্বভাবসিদ্ধ অক্ষমতাবশত এ ব্যাপারে গাধার মত চেঁচাতে শুরু করেছে আর ভাবছে না জানি কত বড় বুদ্ধিমানের মতই কথা বলছে।"

"ঠিক এইভাবে লিখতে হয়-যেমন সঠিক তেমনই লংকার ঝাল।"

ঠিক সেই সময় একটা থান ইট জানালার কাঁচ ভেঙে আমার পিঠে এসে পড়ল। আমি ছিট্কে একপাশে সরে গেলাম-ব্যথাও পেলাম।

প্রধান বলল, "ওটা নিশ্চয় কর্নেল হবে। দু'দিন ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছি। এক্ষুণই এসে পড়বে।"

ঠিক তাই। অশ্বারোহী সৈনিকদের রিভলবার হাতে কর্নেল দরজায় দেখা দিল।

বলল, "এই বাজে কাগজখানা যিনি সম্পাদনা করেন সেই কাপুরুষের সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য কি আমার হয়েছে স্যার?"

"তা হয়েছে। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন স্যার। সাবধানে বসবেন, চেয়ারের একটা পা কিন্তু নেই। আমি কি পচা মিথ্যাবাদী কর্নেল ব্ল্যাথারস্কাইট টেকুমেশ-এর সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি?"

"ঠিক ধরেছেন স্যার। আপনার সঙ্গে একটি ছোটখাট হিসাব মিটিয়ে নিতে চাই। আপনার যদি সময় হয় তাহলে এখনই শুরু করি।"

"অবশ্য 'আমেরিকায় নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির উৎসাহজনক অগ্রগতি'র উপর লেখা প্রবন্ধটি শেষ করতে এখনও আমার বাকি আছে; তা হোক, ও নিয়ে কোন তাড়া নেই। শুরু করুন।"

মুহূর্তের মধ্যে দুটো পিস্তল একসঙ্গে ভীষণ শব্দে গর্জে উঠল। প্রধানের একগাছি চুল নষ্ট হল, আর আমার উরুর মাংসের মধ্যে কর্নেলের বুলেটের ভবলীলা সাঙ্গ হল। কর্নেলের বাঁ কাঁধটা খানিকটা কেটে গেল। তারা আবার গুলি ছুড়ল। এবার দু'জনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, কিন্তু আমার প্রাপ্য আমি পেলাম-আমার বাহুতে গুলি লাগল। তৃতীয়বার গুলি চালানোর ফলে দু'জনই সামান্য আহত হলাম, আর আমার আঙুলের গাঁট কেটে গেল। তখন আমি বললাম, যেহেতু এটা একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং আমার পক্ষে আর এতে অংশ নেওয়াটা ভাল দেখায় না, সেজন্য বাইরে গিয়ে আমি একটু হেঁটে বেড়াতে চাই। কিন্তু দুটি ভদ্রলোকই আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে জানাল যে আমার উপস্থিতি কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না।

তারপর তারা নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল, আর আমি আমার ক্ষতস্থানগুলি বাঁধবার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে তারা আবার নতুন উৎসাহে গুলি ছুড়তে শুরু করল, আর প্রতিটি গুলিই বেশ কার্যকর হল-কিন্তু এখানে বলা দরকার যে ছ'টা গুলির পাঁচটার ফলই ভোগ করতে হল আমাকে। ষষ্ঠ গুলিতে কর্নেল মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সহাস্যে বলল যে তাকে এখন বিদায় নিতে হবে কারণ শহরের অন্যত্র তার কাজ রয়েছে। মুর্দাফরাসের কাছে কি ভাবে যাওয়া যায় সেই খোঁজ-খবর নিয়ে সে চলে গেল।

প্রধান আমার দিকে ফিরে বলল, "খাবার সময় সে আবার এসে হাজির হবে। আর আমাকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনি যদি প্রুফগুলো দেখে দেন এবং খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাহলে উপকৃত হব।"

খদ্দেরদের দেখাশোনা করার কথা ভেবে কিছুটা সংকোচবোধ করলেও এইসব গুলি-গোলার শব্দে আমি এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে কোন কথাই মুখ দিয়ে বের হল না।

সে বলতে লাগল, "তিনটে নাগাদ জোন্স আসবে-তাকে আচ্ছা করে চাবকাবেন, গিলেস্পি হয়তো আরও আগে আসবে-তাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবেন-ফার্গুসন আসবে চারটে নাগাদ-তাকে খুন করবেন-বাস, আজকের মত এই কাজ। তারপরেও যদি হাতে সময় থাকে তো পুলিশদের নিয়ে একটা গরম-গরম প্রবন্ধ লিখতে পারেন-বড় সাহেবকে একহাত নেবেন। চামড়ার চাবুকগুলো টেবিলের নীচে আছে; অস্ত্রশস্ত্র আছে দেরাজে-বারুদ আছে ঐ কোণে-তুলো ও ব্যাণ্ডেজ রয়েছে ওখানকার খোপে। দুর্ঘটনা কিছু ঘটলে নীচে সার্জন ল্যান্সেট-এর কাছে যাবেন।"

সে তো চলে গেল। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তারপর তিন ঘণ্টা ধরে যে বিপদের ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল তাতে আমার সব শান্তি, সব আনন্দ মিলিয়ে গেল। গিলেস্পি এসে আমাকেই জানালা দিয়ে ছুড়ে দিল। জেন্সও যথাসময়েই হাজির হল, আর যখন তাকে চাবুক মারতে গেলাম তখন উল্টে সে কাজটা সেই তার হাতে নিয়ে নিল। তালিকার বাইরে জনৈক নবাগতের সঙ্গে সংঘর্ষে

আমার খুলিটাই উড়ে গেল। টমসন নামক আর একজন নবাগত আমাকে একেবারে তুলো-ধোনা করে রেখে গেল। এবং শেষপর্যন্ত এক দঙ্গল সম্পাদক, দলত্যাগী, রাজনীতিক ও গুণ্ডার ক্রুদ্ধ বাহিনী এসে এমনভাবে গালাগালি শুরু করল এবং আমার মাথার উপর এমনভাবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঘোরাতে লাগল যে বাতাসে শুধু ইস্পাতের ঝলকানিই চোখে পড়তে লাগল; পর্যুদস্ত অবস্থায় এককোণে সরে গিয়ে একখানা কাগজে চাকুরীতে ইস্তফা-পত্র লিখতে গিয়েছি এমন সময় একদল উৎসাহী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে প্রধান সম্পাদক এসে হাজির হল। তখন এমন একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নারকীয় কাণ্ডকারখানা শুরু হয়ে গেল যার বিবরণ কোন মানুষের হাতের কলম-তা সে কলম ইস্পাতের তৈরি হলেও-দিতে পারে না। গুলি করা হল, হাত-পা কাটা হল, উড়িয়ে দেওয়া হল, জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলা হল। খিস্তি-খেউড়ের ঝড় বয়ে গেল; চলল বেপরোয়া যুদ্ধের নাচ। তারপরেই সব শেষ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব চুপচাপ। রক্তাক্ত প্রধান সম্পাদক ও আমি বসে পড়ে মেঝেতে ছড়ানো রক্তাপ্লুত ধ্বংসস্তূপ দেখতে লাগলাম।

সে বলল, "একবার অভ্যাস হয়ে গেলে এ সব দেখতে আপনার ভালই লাগবে।"

আমি বললাম, "আমাকে মাফ করতে হবে; হয় তো কিছুদিন পরে আপনার পছন্দমাফিক লেখা আমি লিখতে পারব; কিছুটা অনুশীলন করলে এবং ভাষাটা ভাল করে শিখে নিলে নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, সে ধরনের লেখার ক্ষমতার আবার কতকগুলি অসুবিধা আছে। সেটা তো আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন। জোরদার লেখা যে মানুষকে উন্নত করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ফলে মানুষের যে রকম অতি আগ্রহের সৃষ্টি হয় সেটা আমি চাই না। আজ যে রকমটা ঘটেছে এ ধরনের বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আমি আরাম করে লিখতে পারি না। চাকরিটা আমার খুবই পছন্দ, কিন্তু এখানে থেকে খদ্দেরদের মোকাবিলা করাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। স্বীকার করছি, অভিজ্ঞতাগুলি বেশ নতুন ও মনোগ্রাহী, কিন্তু তার ফলাফলটা সমুচিতভাবে বণ্টিত হয় না। কোন ভদ্রলোক জানালা দিয়ে গুলি করলেন আপনাকে, আর খোঁড়া হই আমি; স্টোভের পাইপ বেয়ে একটি বোমার খোল নেবে আসে আপনার তুষ্টিবিধানের জন্য, আর স্টোভের পাল্লাটা ঢুকে যায় আমার গলায়; বন্ধু হাজির হয় আপনার সঙ্গে কুশ-বিনিময় করতে, আর বুলেটের গর্তে চিত্র-বিচিত্র হয়ে ওঠে আমার চামড়া; আপনি চলে যান খেতে, আর জোন্স এসে আমাকে চাবুক মারে, গিলেস্‌পি আমাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে দেয়, টমসন আমার জামা-কাপড় খুলে নেয়; অপরিচিত লোক এসে পুরনো বন্ধুর মত মাথায় চাঁটি মেরে খুলিটাই উড়িয়ে দেয়; আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেশের যত বদমাশের দল রণসাজে সেজে এসে হাজির হয়ে আমার যেটুকু অস্তিত্ব তখনও অবশিষ্ট থাকে তার উপর রণ-কুঠার চালায়। মোট কথা, আজকের মত এমন মজার দিন আমার জীবনে আর কখনও আসে নি। না; আপনাকে আমার ভাল লেগেছে; ভাল লেগেছে খদ্দেরদের সঙ্গে আপনার অবিচলিত শান্ত আচরণ, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন আমি এতে অভ্যস্ত নই। দক্ষিণীরা বড় বেশী আবেগপ্রধান; নবাগতের প্রতি দক্ষিণী আতিথেয়তার প্রাচুর্য বড়ই বেশী। যে কয়টি অনুচ্ছেদ আজ আমি লিখেছি, এবং যার উপর আপনার সক্ষম হাতে টেনেসীয় সাংবাদিকতার মর্মকথার আন্তরিক স্পর্শ লেগেছে, তার ফলে আর একটি ভীমরুলের চাকেও নিশ্চয় খোঁচা লাগবে। সেই সম্পাদকের দল এখানে আসবে-ক্ষুধার্ত হয়ে আসবে, আর প্রাতরাশের জন্য নিশ্চয় কারও খোঁজ করবে। কাজেই আপনাকে জানাই বিদায়-সম্ভাষণ। সে উৎসবে উপস্থিত থাকবার বাসনা আমার নেই। স্বাস্থ্যের জন্য দক্ষিণে এসেছিলাম, আবার সেই একই কারণে ফিরে যাচ্ছি; টেনেসীয় সাংবাদিকতা আমার পক্ষে বড়ই গুরুপাক।"

তারপর দু'জনেই দুঃখিত মনে বিদায় নিলাম; আমি বাসা নিলাম হাসপাতালে।

১৮৬৯

একটি আশ্চর্য স্বপ্ন

A Curious Dream

[একটি নীতি-বাক্য সহ]

গত রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। মনে হল, আমি যেন দরজার সিঁড়িতে [কোন বিশেষ শহরে হয় তো নয়] বসে স্মৃতিচারণা করছি; তখন রাত প্রায় বারোটা কি একটা। আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুন্দর। বাতাসে কোন মানুষের শব্দ শোনা যাচ্ছে না, এমন কি পায়ের শব্দও নয়। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসা কোন কুকুরের ফাঁকা ঘেউ-ঘেউ ডাক এবং ততোধিক দূর থেকে আসা তার অস্পষ্টতর জবাব ছাড়া আর কোন শব্দই সেই মৃত্যুস্তব্ধ তাকে বিঘ্নিত করছে না। এমন সময় শুনতে পেলাম পথ দিয়ে যেন একটা কংকালের খট্‌-খট্‌ আওয়াজ এগিয়ে আসছে; ভাবলাম, কোন নৈশ গায়ক দলের কাঠের খঞ্জনির শব্দ। এক মিনিট পরেই টুপি-পরা এবং শতছিন্ন ছাতাপরা শবাবরণে অর্ধেক শরীর ঢাকা একটা লম্বা কঙ্কাল বড় বড় পা ফেলে আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তারার অস্পষ্ট ধূসর আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ঘাড়ে একটা কীটে-কাটা শবাধার ও হাতে একটা বাণ্ডিল। খট্‌-খট্‌ শব্দটা যে কিসের সেটা বুঝতে পারলাম; হাঁটবার সময় হাড়ের জোড়গুলিতে ঠোকাঠুকি লেগে এবং দু'পাশের পাঁজরের উপর কনুই ঠুকে যাওয়ায়ই শব্দটা হচ্ছিল। বলতে পারি, বিস্ময় বোধ করেছিলাম। চিন্তা-ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে এই অশরীরী আবির্ভাব কিসের হতে পারে সেটা বুঝে উঠবার আগেই আরও একজনের আসার শব্দ পেলাম-কারণ সেই খট্‌-খট্‌ শব্দটা আমার চেনা হয়ে গেছে। একটা শবাধারের দুই-তৃতীয়াংশ তাঁর কাঁধে, আর পায়ের ও মাথায় দিককার কিছু তক্তা তার বগলে। খুবই ইচ্ছা হল তার মাথার ঢাকনার নীচ দিয়ে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু যেতে যেতে চোখের গর্তের ভিতর থেকে যে ভাবে সে তাকাল এবং বেরিয়ে-আসা দাঁতের পাটি যে ভাবে দেখাল তাতে মনে হল তাকে না আটকানোই ভাল। সে চলে যেতে না যেতেই আবার সেই শব্দ কানে এল এবং আবছা আলোর ভিতর থেকে আর একটি কঙ্কাল বেরিয়ে এল। মাথায় একটা ভারী কবরের পাথর বয়ে আনতে সে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছে; দড়িতে বাঁধা একটা নোংরা শবাধারকে সে টেনে নিয়ে চলেছে। আমার কাছে পৌঁছে সে দু'এক মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল; তারপর ঘুরে আমার কাছে এসে বলল:

"এটাকে একটু নামিয়ে দেবে কি?"

কবরের পাথরটাকে নামিয়ে মাটিতে রাখতে গিয়ে দেখলাম তার উপরে নাম লেখা রয়েছে "জন বাক্সটার কপম্যান্‌ হার্স্ট", আর মৃত্যুর তারিখ লেখা রয়েছে "মে, ১৮৩৯"। মৃত লোকটি শান্তভাবে আমার পাশে বসে পড়ল এবং হাত তুলে করোটিটা মুছল-পূর্বেকার অভ্যাসবশতই কাজটা সে করল, কারণ তার হাত থেকে কোন ঘাম ঝরতে দেখলাম না।

বাকি শবাবরণটুকু টেনে নিয়ে চিন্তিতভাবে চোয়ালটা হাতের উপর রেখে সে বলল, "খুব খারাপ"। তারপর বাঁ পা-টা হাঁটুর উপর তুলে শবাধারের ভিতর থেকে একটা মরচে-পড়া নখ বের করে গোড়ালির হাড়টাকে অন্যমনস্কভাবে চুলকোতে লাগল।

"কি খুব খারাপ বন্ধু?"

"ওঃ, সব কিছু সব কিছু। মনে হয় না মরাই ছিল ভাল।"

"আমাকে অবাক করলে তো। এ কথা বলছ কেন? কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে কি? ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার? এই শবাবরণ-এই ছেঁড়া কম্বলের দিকে তাকিয়ে দেখ। কবরের পাথরটাকেও দেখ। সব ভেঙে-চুরে গেছে। এই লজ্জাজনক পুরনো শবাধারটা দেখ। চোখের সামনে একটা লোকের সব সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর জিজ্ঞাসা করছ, ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে কিনা? আগুন আর গন্ধক!"

আমি বললাম, "শান্তি হও, শান্ত হও। এটা খুবই খারাপ-নিশ্চয় খুব খারাপ। তবে এ পরিস্থিতিতে এ সব জিনিস নিয়ে তুমি যে মাথা ঘামাবে তা ভাবতে পারি নি।"

"দেখ প্রিয় মহাশয়, মাথা আমি সত্যি ঘামাচ্ছি। আমার গর্বে আঘাত লেগেছে-বলতে পারি, আমার আরাম বিঘ্নিত হয়েছে-ধ্বংস হয়েছে। যদি অনুমতি কর তো আমার ইতিহাস তোমাকে বলব-এমনভাবে বলব যাতে তুমি বুঝতে পার", মাথার আবরণটাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বেচারি কংকাল কথাগুলো বলল।

"বলে যাও", আমি বললাম।

"এখান থেকে একটা কি দুটো ব্লক আগে এই রাস্তারই একটা পুরনো লজ্জাজনক কবরখানায় আমি থাকি-এই যা, ঠিক ভেবেছিলাম উপস্থিতিটা সরে যাবে! নীচের দিক থেকে তিন নম্বর পাঁজরটা বন্ধু তোমার কাছে যদি থাকে তাহলে একটা দড়ি দিয়ে যদি আমার শিরদাঁড়ার সঙ্গে ওটা বেঁধে দাও, অবশ্য রূপোর তার হলেই ভাল হয়, কারণ ঘসে-মেজে রাখলে সেটা অনেকদিন টেকে আর দেখতেও ভাল হয়-ভাব তো, শুধুমাত্র উত্তরপুরুষের উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে এই ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া, ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া!" আর বেচারি ভূতটা এমনভাবে দাঁত কড়মড় করে উঠল যে আমার গা গুলিয়ে উঠল, আমি কাঁপতে লাগলাম-কারণ কংকালের গায়ে মাংস বা চামড়া না থাকায় ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। "ঐ পুরনো কবরখানায় আমি থাকি; তিরিশ বছর ধরে আছি। আমি বলছি, আজ সব কিছুই বদলে গেছে। প্রথম যেদিন আমার এই পুরনো শ্রান্ত দেহটাকে ওখানে রেখেছিলাম, সেদিন দুশ্চিন্তা, দুঃখ, উদ্বেগ, সন্দেহ ও ভয়ের হাত থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেয়ে গেলাম এই মধুর চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে একটা লম্বা ঘুমের আশায় শরীরটাকে টান-টান করে দিয়েছিলাম, আর শুয়ে শুয়ে কান পেতে পরম সন্তোষের সঙ্গে শুনছিলাম সমাধি-খননকারীর কাজের শব্দ, শবাধারের উপর প্রথম এক কোদাল মাটি ফেলা থেকে শুরু করে ক্রমেই অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টভাবে আমার নতুন বাসভবনের ছাদটাকে পিটিয়ে সমান করে দেওয়ার শব্দ পর্যন্ত-আঃ! সে কী আরাম! হায়রে! আজ রাতে যদি সে রকমটা আর একবার ঘটত!" আমার স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায়ই একটা হাড়-সর্বস্ব হাত সশব্দে আমাকে একটা থাপ্পড় মেরে বসল।

"হ্যাঁ মশাই, তিরিশ বছর আগে আমি ওখানে শুয়েছিলাম, আর বেশ সুখেই ছিলাম। কারণ তখন এটা ছিল গ্রামাঞ্চল-বড় বড় গাছপালা ছিল, ফুল ছিল, বাতাস ছিল; অলস বাতাসে পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি উঠল; কাঠবিড়ালিরা আমাদের উপরে ও চারপাশে ঘুরে বেড়াত; কীটপতঙ্গরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত; আর সেই স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যকে পাখিরা গানে গানে ভরে দিত। আহা, মৃত্যুর পরে দশটি বছর তখন কী আমারেই কাটত! সব কিছুই মনোরম। প্রতিবেশীরাও ছিল ভাল; যে সব মৃত ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি থাকত তারা সকলেই ছিল শহরের সেরা পরিবারের লোক। উত্তরপুরুষরা তখন আমাদের জগতের কথা ভাবত। তারা আমাদের কবরগুলোকে খুব ভাল অবস্থায় রাখত; বেড়াগুলোকে নিখুঁতভাবে মেরামত করত, উপরকার বোর্ডটাকে রং করে বা চুণকাম করে রাখত, আর মরচে ধরতে বা নষ্ট হতে শুরু করলেই সেটা বদলে নতুন বোর্ড লাগিয়ে দিত; স্মৃতি-ফলকগুলোকে সোজা অবস্থায় রাখত, রেলিংগুলোকে ঝকঝকে করে রাখত, গোলাপের ঝাড় ও অন্যান্য ঝোপ-ঝাড়কে কেটে-ছেঁটে সুন্দর করে রাখত; আ রাস্তাগুলোকে সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাথর দিয়ে বেঁধে দিত। কিন্তু সেদিন আর নেই। বংশধররা আমাদের ভুলে গেছে। আমার এই বুড়ো হাতে উপার্জন করা টাকায় তৈরি মস্ত বড় বাড়িতে বাস করে আমার নাতি, আর আমি ঘুনোই এমন একটা অবহেলিত কবরে যেখানে আক্রমণকারী কীটরা আমার শবাবরণকে কেটে কেটে সেখানে বাসা তৈরি করে! আমি এবং আমার যে বন্ধুরা এখানে শায়িত রয়েছে তারাই এই সুন্দর শহরের পত্তন ও সমৃদ্ধি সাধন করেছি, আর আমাদের সেই সব বড়লোক সন্তানরা আজ আমাদের এমন একটা বিধ্বস্ত কবরখানায় ফেলে রেখেছে যাকে দেখে প্রতিবেশীরা অভিশাপ দেয় আর অপরিচিতরা নাক সিঁটকোয়। সেকাল আর একালের তফাৎটা দেখ-যেমন ধর: আমাদের সবগুলি কবরই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; মাথার উপরকার বোর্ডগুলো পুরনো হয়ে ভেঙে পড়েছে; রেলিংগুলো যেন এক পা আকাশে তুলে এদিক-ওদিক দুলছে; আমাদের স্মৃতি-ফলকগুলি ক্লান্তিতে হেলে পড়েছে; কবরের পাথরগুলো নৈরাশ্যে মাথা নীচু করে আছে; কোন রকম সাজ-সজ্জাই আর এখন নেই-গোলাপ নেই, ফুলের কেয়ারি নেই, পাথরে বাঁধানো পথ নেই; নয়নসুখকর কোন কিছুই নেই; এমন কি যে রং-হীন কাঠের বেড়াটা একদিন অন্য জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গ থেকে ও অসতর্ক পদক্ষেপের হাত থেকে আমাদের পবিত্রতাকে রক্ষা করত, সেটা ভেঙে পড়ে রাস্তার উপর ঝুলছে, আর তার ফলে আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর বিশ্রাম স্থানের উপর সকলের ঘৃণার দৃষ্টি আরও বেশী করে পড়েছে। তাছাড়া আমাদের এই দারিদ্র্য ও দুরবস্থাকে এখন আমরা অরণ্যের আড়ালেও ঢেকে রাখতে পারি না, কারণ শহর তার শীর্ণ হাত আমাদের বাসস্থানের দিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে।

"এবার তাহলে বুঝতে পারছ-দেখতে পারছ ব্যাপারটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বংশধররা যখন আমাদেরই টাকায় প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে আমাদেরই চারপাশে, তখন মাথার খুলি ও হাড়কে একত্রে রাখতে আমাদের করতে হচ্ছে কাঠের সংগ্রাম। শুনলে

অবাক হবে, আমাদের কবরখানায় এমন একটা কবরও নেই যেটা দিয়ে জল না পড়ে। রাতের বেলা বৃষ্টি হলেই আমাদের বেরিয়ে এসে গাছে উঠতে হয়-কখনও বা গলার নীচে ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়লে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। যে কোন বৃষ্টি-ঝরা রাতে বারোটার পরে যদি সেখানে যাও তাহলে দেখতে পাবে, আমাদের মধ্যে অন্তত পনেরো জন একহাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলে আছি, হাড়ের জোড়গুলি ভীষণভাবে শব্দ করছে, আর আমাদের পাঁজরের ভিতর দিয়ে বাতাস শোঁ-শোঁ করে বয়ে চলেছে। অনেক দিনই তিন-চার ঘণ্টা আমাদের এই ভাবে কাটাতে হয়, আর তারপরে ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে নীচে নেমে আসি এবং পরস্পরের মাথার খুলি ধার করে নিয়ে যার যার কবর খুঁড়ে বের করে নেই-আমি মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ধরছি, তাহলেই তুমি দেখতে পাবে খুলির মধ্যে কত পুরনো শুকনো মাটি জমে আছে-এর ফলে অনেক সময়ই মাথাটা কত যে ভারী লাগে! হ্যাঁ মশাই, অনেক দিনই ভোর হবার ঠিক আগে যদি তুমি সেখানে হাজির হও তাহলে দেখতে পাবে যে আমরা কবরের মাটি খুঁড়ছি, আর আমাদের শবাবরণগুলোকে বেড়ার উপর শুকোবার জন্য মেলে রেখেছি। আরে, একদিন আমার একটা চমৎকার শবাবরণ সেখান থেকে চুরিই হয়ে গেল-স্মিথ নামে এক মক্কেল সেটা নিয়ে গেল। ওই দূরের একটা গরীব মানুষদের কবরখানায় সে থাকে। আমার এ কথা মনে করবার কারণ কি জান? যেদিন আমি প্রথম তাকে দেখি সেদিন তার গায়ে একটা চৌখুপি শার্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কিন্তু নতুন কবরখানার একটা সামাজিক মিলন-অনুষ্ঠানে যখন তাকে শেষ বারের মত দেখলাম তখন সেই ছিল সমবেত সকলের মধ্যে সবচাইতে সেরা পোশাকে সজ্জিত মৃতদেহ-আর এটাও খুবই অর্থপূর্ণ যে আমাকে দেখেই সে সেখান থেকে চলে গেল; আবার সম্প্রতি এখানকার একটি বুড়ি তার শবধারটিই খুইয়েছে-সাধারণত কোথাও গেলে সেটাকে সে সঙ্গে করেই নিয়ে যায়, কারণ তার শ্লেষ্মার ধাত, আর রাতের বাতাস বেশী গায়ে লাগলেই তার সেই বাতের ব্যথাটা চাড়া দেয় যার প্রকোপেই তার মৃত্যুটা ঘটেছিল। তার নাম হচ্‌কিস্-আন্না মাটিল্ডা হচ্‌কিস্-তুমি হয় তো তাকে চিনতেও পার। সামনের দুটো দাঁত এখনও আছে; বেশ লম্বা, কিন্তু এখন অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে, বাঁ দিকে পাঁজরের একটা হাড় নেই; মাথার বাঁ দিক থেকে এক গুছি বিবর্ণ চুল ঝুলে আছে, এক গুছি আছে মাথার ঠিক উপরে ডান কানের দিকটা ঘেঁসে; নীচের চোয়ালটা তার দিয়ে বাঁধা, আর বাঁ হাতের একটা ছোট হাড় কখন লড়াই করতে উড়ে গেছে; হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়িভাবে ভেঙে নাকের ছিদ্র দুটো আকাশের দিকে তুলে এক ধরনের ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে-হয় তো কোথাও না কোথাও তাকে দেখেছ?"

"ঈশ্বর না করুন!" অনিচ্ছাকৃতভাবে কথাটা বলেই অপ্রস্তুত বোধ করলাম। তাড়াতাড়ি নিজের এই কঠোরতাকে শুধরে নিয়ে বললাম, "মানে আমি শুধু বলতে চাই যে সে সৌভাগ্য আমার হয় নি; ইচ্ছা করে তোমার বন্ধুর সম্পর্কে কোন রকম অসৌজন্যমূলক কথা আমি বলতে পারি না। তুমি বলছিলে যে তোমার শবাবরণটি চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন যেটা তোমার গায়ে রয়েছে তার ছিন্ন দশা দেখেও তো মনে হয় যে একসময় এটা খুব দামীই ছিল। তাহলে-"

আমার অতিথির মুখমণ্ডলের শুকনো হাড় ও কুঁচকানো চামড়ার একটা ভৌতিক পরিবর্তন দেখা দিল; মুচকি হেসে বেশ চতুর ভঙ্গীতে সে জানাল যে বর্তমান পোশাকটি যখন তার গায়ে উঠেছে ততক্ষণে পার্শ্ববর্তী কবরখানার জনৈক ভূতের একটি পোশাক খোয়া গিয়েছে। ব্যাপারটা বোধগম্য হল। তবু তার মুখভঙ্গী-বিশেষ করে তার হাসি আমার ভাল লাগছিল না। তাই তাকে কথা চালিয়ে যেতেই বললাম।

কংকাল বলতে লাগল, "হ্যাঁ বন্ধু যা বললাম সেটাই প্রকৃত অবস্থা। দুটি পুরনো কবর-একটিতে আমি থাকতাম, আর একটি খানিকটা দূরে-আমাদের বর্তমান বংশধরদের দ্বারা এতদূর অবহেলিত হয়েছে যে তাতে আর বাস করা যায় না। কংকালের নিজস্ব অসুবিধা তো আছেই-আর এই বর্ষায় সেটা কম কথা নয়-বর্তমান অবস্থায় সম্পত্তিরও বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে। হয় আমাদের অন্যত্র চলে যেতে হবে, আর না হয় চোখের সামনে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখতে হবে। তুমি হয় তো বিশ্বাস করবে না, তবু এ কথা সত্য যে আমার পরিচিত কারও শবাধারই এখন ভাল অবস্থায় নেই। পাইন কাঠের বাক্সে বোঝাই হয়ে ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে যারা এখানে আসে সেই নীচু শ্রেণীর লোকেদের কথা আমি বলছি না; আমি বলছি তোমাদের সেই সব উঁচু মাপের রূপোর কারুকার্য করা শবাধারের কথা যেগুলো কালো পালক মাথায় পরা শোভাযাত্রার আগে আগে আসে, আর যারা ইচ্ছামত কবরের জায়গা বেছে নিতে পারে-অর্থাৎ জার্ভিস, ব্লেড্‌সু ও বার্লিংদের কথাই আমি বলছি। সেই সবই আজ ধ্বংসের মুখে। তারাই ছিল আমাদের মধ্যে সব চাইতে শাঁসালো লোক। অথচ এখন তাদের দিকে তাকাও-একেবারেই রসহীন আর দারিদ্র্যপীড়িত। একজন ব্লেড্‌সু তো জনৈক পরলোকগত নাপিতের কাছে দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বদলে তার স্মৃতি-ফলকটাই বেচে দিল। অথচ একটি মৃতদেহের কাছে তার স্মৃতি-ফলকটিই সব চাইতে গর্বের বস্তু। তার উপর খোদাই করা কথাগুলি পড়তে সে ভালবাসে। কোন রকম অভিযোগ না করেই বলছি, আমার বংশধররা এই পুরনো পাথরটা ছাড়া আমার কবরে যে আর কিছুই দেয় নি তাতে আমার প্রতি খুবই খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে-তার উপরে আবার এই

পাথরে কোন রকম গুণকীর্তনই লেখা নেই। একসময় এই পাথরটার গায়ে লেখা ছিল-

'উপযুক্ত পুরস্কারই সে পেয়েছে'

লেখাটা দেখে প্রথমে খুবই গর্ববোধ হয়েছিল, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই দেখতাম আমার কোন পুরনো বন্ধু এখানে এলেই রেলিং-এর ভিতরে থুত্‌নিটা গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে এটা পড়ত আর তারপরে মুচকি হেসে খুসি মনে ফিরে যেত। কাজেই ঐ বোকাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই লেখাটা আমি মুছে ফেলে দিলাম। কিন্তু একটি মৃত মানুষ তার স্মৃতি-ফলক নিয়ে খুবই গর্ববোধ করে। ঐ তো দূরে আধা ডজন জার্ভিস তাদের পারিবারিক স্মৃতি-ফলকটি সঙ্গে নিয়েই চলে যাচ্ছে। একটু আগে স্মিথরাও চলে গেল তাদের স্মৃতি-ফলক নিয়ে। আরে, হিগিন্স যে, বিদায় পুরনো বন্ধু! উনি হলেন মেরিডিথ হিগিন্স-'৪৪ সালে মারা গিয়েছিলেন-কবরখানায় আমাদের দলেই ছিলেন-খুব পুরনো পরিবার-ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব-আমার কথা শুনতে পায় নি বলেই জবাব দিল না। আর তাই তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। ওকে দেখলে তোমারও ভাল লাগত। ও রকম বিকৃত, গাঁট-খোলা কংকাল তুমি কখনও দেখ নি। সে যখন হাসে, মনে হয় দুটো পাথরে ঘসাঘসি হচ্ছে, কিন্তু লোকটি খুব আমুদে। সে এমনভাবে কথা বলে যেন কেউ জানালার কাঁচের উপর নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। হেই জোন্স! উনি হলেন বুড়ো কলম্বাস জোন্স-তার শবাচ্ছাদন তৈরি করতেই ব্যয় হয়েছিল চারশ' ডলার-স্মৃতি-ফলকটার জন্য ব্যয় হয়েছিল সাতাশ শ'। '২৬ সালের বসন্তকালের কথা। তখনকার দিনের পক্ষে সে এক এলাহি ব্যাপার। সব জায়গা থেকে মৃতরা এসে ভিড় করেছিল তার তৈজসপত্রাদি দেখতে। ঐ যে একটি কংকাল একা একা চলেছে, বগলে একটুকরো বোর্ড, হাঁটুর নীচেকার পায়ের একটা হাড় নেই, সঙ্গেও কিচ্ছু নেই-দেখতে পাচ্ছ? উনি হলেন বার্স্টো ডালহৌসি-যত লোক আমাদের কবরখানায় ঢুকেছে তাদের মধ্যে কলম্বাস জোন্সের পরে তিনিই ছিলেন সব চাইতে পরিপাটি সাজে সজ্জিত। আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। আমাদের বংশধরদের কাছে যে ব্যবহার পাচ্ছি তা আর আমরা সইতে পারছি না। তারা নতুন নতুন কবরখানা খুলছে, কিন্তু আমাদের ফেলে রেখেছে অনাদৃত অবস্থায়। কিছু রাস্তা তারা মেরামত করে, কিন্তু আমাদের রাস্তায়, বা আমাদের জিনিসপত্রে কখনও হাত দেয় না। আমার শবাধারটিই দেখ-অথচ আমি বলছি এক সময়ে এটা একটা দেখবার মত আসবাব ছিল-শহরের যোন কোন বসবার ঘরে রাখলে এটা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যদি চাও তো এটা তোমাকে দিতে পারি-এটাকে মেরামত করার সামর্থ্য আমার নেই। তলাকার কাঠটা নতুন লাগিয়ে নিও, উপরের কাঠটাও কিছুটা পাল্টাতে হবে, বাঁ দিকে একটা নতুন পটি বসিয়ে দিও, তাহলেই দেখতে একেবারে খাসা হবে। ধন্যবাদ দিতে হবে না-ওকথা বলো না-তুমি আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছ, তাই আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করবার আগেই আমার যা কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে যাব। এই চাদরটা আমার বড়ই প্রিয়, তুমি যদি চাও-চাও না? বেশ, তোমার যেমন মর্জি, আমি শুধু ন্যায়পরায়ণ ও উদার হতে চেয়েছিলাম-আমার মধ্যো নীচতা পাবে না। বিদায় বন্ধু এবার আমাকে যেতে হবে। জানি না-হয়তো অত রাতে আমাকে অনেকটা পথ চলতে হবে। শুধু একটি কথা নিশ্চিত জানি, আমি এবার যাত্রীদলে ভিড়েছি, ঐ পুরনো কবরে আর আমাকে ঘুমুতে হবে না একটা সম্মানজনক বাসস্থান না পাওয়া পর্যন্ত আমি চলতেই থাকব, তাতে যদি নিউ জার্সি পর্যন্ত পা চালাতে হয় তাও সই। সকলেই চলেছে। গত রাতের জমায়েতেই স্থির হয়েছে চলে যেতে হবে; তাই সূর্য উঠবার সময় হলে দেখা যাবে পুরনো গোরস্থানে একটা হাড়ও পড়ে নেই। হেলো, ঐ যে জনাকয় ব্লেড্‌সু যাচ্ছে; তুমি যদি পাথরটা তুলে নিতে একটু সাহায্য কর তাহলে আমিও ওদের দলে যোগ দিতে পারি। ওরা খুব বড় বংশের লোক। বিদায় বন্ধু"

কবরের পাথটাকে ঘাড়ে নিয়ে ভাঙা শবাধারটাকে টানতে টানতে সে শোভাযাত্রার সঙ্গে যোগ দিল; বেশ আন্তরিক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তার দানকে আমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। যতদূর মনে হয় দু'ঘণ্টা ধরে এই বিষণ্ণ সমাজপরিত্যক্তের দল তাদের জিনিসপত্র নিয়ে সেখান দিয়ে যেতে লাগল, আর আমি বসে বসে করুণার চোখে তাদের দেখতে লাগলাম। তাদের মধ্যে যে দু'একজন অপেক্ষাকৃত যুবক এবং যাদের চেহারাও অতটা বিধ্বস্ত নয় তারা রেলপথের মাঝ রাতে চলাচলকারী ট্রেনের খোঁজ-খবর করল; মনে হল বাকিরা রেলপথের কোন খবরই রাখে না; তারা বিভিন্ন শহরে ও নগরে যাবার রাস্তাঘাটের হদিস জানতে চাইল; তার মধ্যে অনেক শহর-নগরের নামই এখন আর মানচিত্রে পাওয়া যাবে না, দীর্ঘ ত্রিশ বছর আগেই সেগুলি মানচিত্র থেকে এবং পৃথিবী থেকেও উধাও হয়ে গেছে। ঐ সব শহর-নগরের কবরখানার বর্তমান অবস্থা কেমন, আর মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুনাম তাদের আছে কিনা-সে সম্পর্কেও তারা খোঁজ-খবর নিল।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করল; এই সব গৃহহারাদের জন্য আমার মনে সহানুভূতিও জাগল। যেন এ সবই বাস্তব ঘটনা, যেন আমি মোটেই স্বপ্ন দেখছি না এমনিভাবে জনৈক মৃত যাত্রীকে আমার মনোভাব জানিয়ে বললাম, এই বিচিত্র ও একান্ত

দুঃখদায়ক অভিযানের একটি বিবরণ প্রকাশ করবার ইচ্ছা আমার মাথায় ঢুকেছে; আরও বললাম, যদিও এর যথাযথ বর্ণনা আমি করতে পারব না, তবু মৃতদের প্রতি যাতে এতটুকু অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে আমি সতর্ক থাকব। কিন্তু একজন প্রাক্তন নাগরিকের রাজকীয় ধ্বংসাবশেষ আমার ফটকের উপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলল:

"ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। যে কবরখানা ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি তাকে যারা এতদিন সহ্য করেছে, আজ সেই সব কবরখানায় যারা অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল তাদের সম্পর্কে যে যাই বলুক তাও তারা অবশ্য সহ্য করতে পারবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মোরগ ডেকে উঠল, আর সেই ভৌতিক শোভাযাত্রা অদৃশ্য হয়ে গেল, একটু করো ন্যাকড়া বা একখানি হাড়ও সেখানে পড়ে রইল না। আমার ঘুম ভেঙে গেল; দেখলাম, বিছানার বাইরে মাথাটা বেশ খানিকটা ঝুলিয়ে আমি শুয়ে আছি-এ অবস্থাটা হয় তো নীতি-বাক্য সমন্বিত স্বপ্ন দেখার পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু কাব্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

মন্তব্য: পাঠক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, তার নিজের শহরের কবরখানার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা যদি ভাল থাকে, তাহলে এই স্বপ্ন তার শহরের বিরুদ্ধে মোটেই দেখা হয় নি; এ স্বপ্ন-বিবরণ বিশেষভাবে এবং একান্ত তিক্ততার সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী শহরের বিরুদ্ধেই লিপিবদ্ধ করা হল।

১৮৭০

বিখ্যাত গো-মাংস চুক্তির আসল ঘটনা

The Facts in the Great Beef Contract

যে ব্যাপারটি জনসাধারণের মনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, অনেক তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল, এবং বিকৃত প্রতিবেদন ও বেপরোয়া মন্তব্যের দ্বারা উভয় মহাদেশের সংবাদপত্রের পাতা ভরে তুলেছিল, সে ব্যাপারে আমার যৎসামান্য অবদান যা ছিল সেটাকেই যথাসম্ভব অল্প কথায় জাতির সামনে উপস্থিত করতে চাই।

এই দুর্বিপাকজনক বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে-আর এখানে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনের প্রতিটি ঘটনার যথোচিত প্রমাণ পাওয়া যাবে সাধারণ সরকারের মহাফেজখানায়।

নিউ জার্সি-র চেমুং জেলা-র রটরডামনিবাসী মৃত জন উইল্‌সন ম্যাকেঞ্জি সাধারণ সরকারের সঙ্গে ১৮৬১ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ এই মর্মে একটি চুক্তি করেছিল যে জেনারেল শেরমান-কে মোট ত্রিশ পিপে গো-মাংস সে সরবরাহ করবে।

খুব ভাল কথা।

গো-মাংসের যোগান নিয়ে সে শেরমান-এর উদ্দেশে যাত্রা করল, কিন্তু সে যখন ওয়াশিংটন-এ পৌঁছল তখন শেরমান মানাসাস-এ চলে গেছে; সুতরাং সেও গো-মাংসসহ সেখানে হাজির, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে; তার খোঁজে ন্যাশভিল গেল, ন্যাশভিল থেকে চাট্টানুগাতে, আর চাট্টানুগা থেকে আটলান্টা-কিন্তু কোথাও তাকে ধরতে পারল না। আটলান্টা থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করে সে সোজা সমুদ্রপথে তার পিছু নিল; এবারও তার পৌঁছতে কয়েকটা দিন দেরি হয়ে গেল; কিন্তু যখন সে শুনতে পেল যে শেরমান "কোয়েকার সিটি" জাহাজে চেপে "পবিত্র দেশ" পরিভ্রমণে যাচ্ছে, তখন সেও জাহাজে চেপে বেইরুট যাত্রা করল; মনে ইচ্ছা, শেরমান-এর আগেই সেখানে পৌঁছে যাবে। গো-মাংস নিয়ে জেরুজালেম-এ পৌঁছে সে জানতে পারল, শেরমান মোটেই "কোয়েকার সিটি"-তে চাপে নি; রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য সমতল অঞ্চলে চলে গেছে। আমেরিকায় ফিরে এসে সে রকি পর্বতমালার উদ্দেশে যাত্রা করল। আটষট্টি দিন ধরে কঠোর পথ-পরিক্রমার পরে সে যখন শেরমান-এর হেড কোয়ার্টারের চার মাইলের মধ্যে পৌঁছল তখন রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে আক্রমণ করে কুড়ুল দিয়ে তার মাথার চামড়া তুলে নিল, আর মাংসটাও হাতিয়ে নিল। একটা পিপে বাদে আর সবই তারা নিয়ে গেল। শেরমান-এর সৈন্যরা সেই পিপেটা দখল করে নিল, আর এই ভাবে মরতে মরতেও সেই সাহসী অভিযাত্রী তার চুক্তিটি আংশিকভাবে পূর্ণ করল। দিন-পঞ্জীর আকারে যে উইল সে রেখে গিয়েছিল তাতে ঐ চুক্তি-নামাটাকে সে তার ছেলে বার্থোলোমিউ ডব্লু-কে দান করে গেল। বার্থোলোমিউ ডব্লু-ও নিম্নলিখিত বিলটি তৈরি করে রেখে মারা গেল:

খাদত যুক্তরাষ্ট্র সরকার-

প্রাপক নিউ জার্সির জন উইলসন ম্যাকেঞ্জি (মৃত)

দং জেনারেল শেরমান-এর জন্য ত্রিশ ব্যারেল

গোমাংসের মূল্য ১০০ ডলার হিঃ.......... ৩০০০ ডলার

যোগ-ভ্রমণ ও পরিবহন ব্যয়............ ১৪,০০০"

মোট .... ১৭,০০০ ডলার

পাওনা বুঝিয়া পাইলাম।

সে তো মারা গেল; কিন্তু চুক্তি-নামাটা দিয়ে গেল উইলিয়ম জে. মার্টিনকে; সেও বিলের টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে করতেই মারা গেল। সে ওটা দিয়ে গেল বার্কার জে. অ্যালেনকে, আর সেও টাকা আদায়ের কাজে লেগে গেল। কিন্তু তার আগেই সে মারা গেল।

বার্কার জে. অ্যালেন সেটা দিয়ে গেল অ্যান্‌সন জি. রোজার্সকে; বিলের টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে করতে সে নবম হিসাব-পরীক্ষকের আপিস পর্যন্ত এগোল; এমন সময় সমতাবিধায়ক মহান যমরাজ বিনা পরোয়ানায় হঠাৎ এসে তার পথও আটকে দিল। সে বিলটা রেখে গেল তার এক আত্মীয় কনেক্‌টিকাট-এর "প্রতিহিংসাপরায়ণ" হপকিন্স-এর কাছে। সে টিকে রইল চার সপ্তাহে দু' দিন; কিন্তু তার মধ্যেই সে কাজের মধ্যে এতদূর এগিয়ে গেল যে দ্বাদশ হিসাবরক্ষক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তার উইলে সে ঐ চুক্তির বিলটা দিয়ে গেল তার খুড়ো "সদানন্দ" জনসনকে। কিন্তু নামেই সদানন্দ। তার শেষ কথাগুলি হল: "আমার জন্য কেঁদ না-আমি যেতেই চাই।" বেচারি! সে সত্যি চলে গেল। তারপর সাতটি লোক উত্তরাধিকারসূত্রে সে চুক্তি-নামাটা পেল, আর সাতজনই মারা গেল। শেষ পর্যন্ত সেটা এল আমার হাতে। ইণ্ডিয়ানা-র বেথ্‌লেহেমে হুবার্ড নামক আমার এক আত্মীয়ের মারফতই আমার হাতে এল। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি আমার উপর বিরূপ ছিলেন; কিন্তু শেষ সময়ে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, সব কিছু ক্ষমা করলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে গোমাংসের চুক্তি-নামাটা আমাকে দিলেন।

ঐ সম্পত্তিটা আমার হাতে আসার আগে পর্যন্ত এই হল তার ইতিহাস। এ ব্যাপারে আমার যা ভূমিকা এবার সেটাকেই সরাসরি জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। গো-মাংসের চুক্তি-পত্র, মাইল হিসাবে ভাড়া ও যাতায়াত খরচের হিসাব-সব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করলাম।

সে বলল, "আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?"

আমি বললাম, "মহাশয়, ১৮৬১ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ নিউ জার্সি-র চেমুং জেলার রটরডাম নিবাসী মৃত জন উইলসন ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে সাধারণ সরকারের চুক্তি হয়েছিল যে তিনি জেনারেল শেরমানকে মোট ত্রিশ পিপে গো-মাংস সরবরাহ করবেন-"

এখানেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রেসিডেণ্ট সদয়ভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে তার কাছ থেকে বিদায় দিল। পরদিন আমি স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করলাম।

সে বলল, "বলুন?"

আমি বললাম, "মহামান্য মহাশয়, ১৮৬১ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ নিউ জার্সি-র চেমুং জেলার নিবাসী মৃত উইলসন ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে সাধারণ সরকারের চুক্তি হয়েছিল যে তিনি জেনারেল শের্‌মানকে মোট ত্রিশ পিপে গো-মাংস সরবরাহ করবেন-"

"বাস, ওতেই হবে স্যার, ওতেই হবে; গো-মাংসের দরুণ চুক্তির ব্যাপারে এই আপিসের কিছুই করার নেই।"

অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে পরদিন নৌ-বিভাগীয় সচিবের সঙ্গে দেখা করলে সে বলল, "তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন; আমার দেরি করিয়ে দেবেন না।"

আমি বললাম, "মহামান্য মহাশয়, ১৮৬১ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ নিউ জার্সির চেমুং জেলার রটরডামনিবাসী মৃত জন উইলসন ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে সাধারণ সরকারের চুক্তি হয়েছিল যে তিনি জেনারেল শেরমানকে মোট ত্রিশ পিপে গো-মাংস সরবরাহ করবেন-"

দেখুন, এই পর্যন্ত বলেই আমাকে থামতে হল। জেনারেল শেরমান-এর দরুন গো-মাংসের চুক্তির ব্যাপারে তারও কিছু করবার নেই। আমি ভাবলাম, এ তো বড় আশ্চর্য সরকার। মনে হল, সরকার যেন গো-মাংসের দামটা না দেবার চেষ্টাই করছে। পরদিন গেলাম আভ্যন্তরীণ বিভাগীয় সচিবের কাছে।

বললাম, "মহামান্য মহাশয়, ১৮৬১ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ-"

"ওতেই হবে। আপনার কথা আগেই শুনেছি। আপনার ঐ কুখ্যাত গো-মাংস চুক্তি-পত্র নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ুন। সেনাবাহিনীর খাদ্যের ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ বিভাগের কিছুই করবার নেই।"

চলে গেলাম। কিন্তু এবার আমিও বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম, ওদের পিছনে লেগেই থাকব। যতক্ষণ না এই চুক্তির ব্যাপারে একটা ফয়সালা হয় ততক্ষণ এই ছিদ্রান্বেষী সরকারের প্রতিটি বিভাগে হানা দেব। হয় বিলের টাকা আদায় করব, আর না হয় তো আমার পূর্বগামীদের মতই সে চেষ্টায়ই প্রাণপাত করব। পোষ্টমাস্টার-জেনারেলকে আমন্ত্রণ করলাম; কৃষি বিভাগকে ঘেরাও করলাম; প্রতিনিধি সভার স্পীকারকে পথের মাঝখানে পাকড়াও করলাম। গো-মাংসের সামরিক চুক্তির ব্যাপারে তাদের কারও কিছু করবার নেই। পেটেন্ট আপিসের কমিশনারকে ধরে বললাম, "শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ১৮৬১ সালের-"

"জাহান্নামে যাক! শেষ পর্যন্ত ওই আগুনে গো-মাংস চুক্তি নিয়ে আপনি এখানে হানা দিয়েছেন? সেনাবাহিনীর দরুণ গো-মাংসের চুক্তির ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই।"

"খুব ভাল কথা-কিন্তু গো-মাংসের দামটা তো কাউকে না কাউকে দিতেই হবে। আর সেটা এখনই দিতে হবে, নইলে এই পেটেন্ট আপিস ও এখানকার সব কিছু আমি বাজেয়াপ্ত করে নেব।"

"কিন্তু প্রিয় মহাশয়-"

"তাতে কোন তফাৎ হচ্ছে না মশায়। সেই গো-মাংসের দায় পেটেণ্ট আপিসের, এটা আমার কথা; আর দায় হোক বা না হোক, পেটেণ্ট আপিসকেই দামটা দিতে হবে।"

বিস্তারিত বিবরণে কাজ নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হল। পেটেণ্ট আপিস জিতল। কিন্তু আমি খানিকটা সুবিধা পেয়ে গেলাম। আমাকে বলে দেওয়া হল, ট্রেজারি বিভাগই হল আমার সঠিক জায়গা। সেখানে গেলাম। আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরে ট্রেজারির প্রথম প্রভুর কাছে যাবার অনুমতি মিলল।

বললাম, "অতি গম্ভীর ও অতি শ্রদ্ধেয় মহামান্য সিনর, ১৮৬১ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ জন উইলসন ম্যাক-"

"ওই যথেষ্ট। আপনার কথা শুনেছি। ট্রেজারির প্রথম হিসাব পরীক্ষকের কাছে চলে যান।"

তাই গেলাম। সে আমাকে পাঠাল দ্বিতীয় হিসাব-পরীক্ষকের কাছে। দ্বিতীয় পাঠাল তৃতীয়ের কাছে, আর তৃতীয় পাঠাল শস্য-গোমাংস বিভাগের প্রথম কম্পট্রোলারের কাছে। এতদিনে কাজ শুরু হল। সে হিসাবের খাতা ও সব খুচরো কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখল, কিন্তু গো-মাংস-চুক্তির কোন কার্য-বিবরণ খুঁজে পেল না। ঐ একই বিভাগের দ্বিতীয় কম্পট্রোলারের কাছে গেলাম। সেও হিসাবের বই ও খুচরো কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু ফল কিছু হল না। তবে আমি উৎসাহ বোধ করলাম। সেই এক সপ্তাহে আমি সে বিভাগের ষষ্ঠ কম্পট্রোলার পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম; পরের সপ্তাহে পার হলাম "দাবী বিভাগ" আর তৃতীয় সপ্তাহে "ফেলে-রাখা চুক্তি" বিভাগের কাজও শেষ করে ফেললাম এবং "বাতিল হিসাবের বিভাগ" পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সেখানকার কাজ শেষ করলাম তিন দিনে। আর একটিমাত্র স্থান বাকি। "খুচরো ব্যাপার"-এ কমিশনারকে ঘেরাও করলাম। বরং বলা উচিত তার করণিককে ঘেরাও করলাম-কারণ কমিশনার নিজে সেখানে ছিল না। সে ঘরে ষোলটি সুন্দরী তরুণী খাতা খুলে কি যেন লিখছিল, আর সাতটি সুযোগ্য তরুণ করণিক তাদের কেমন করে লিখতে হবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছিল। তরুণীরা পিছন ফিরে হাসছিল, আর করণিকরাও পাল্টা হাসিতে তার জবাব দিচ্ছিল; সকলেই বিয়ে-বাড়ির মত হাসি-খুসিতে মশগুল। দু'তিনটি করণিক খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল; তারপর আবার যথারীতি পড়তে লাগল, কেউ কোন কথা বলল না। যাই হোক, আমার এই ঘটনাবহুল অভিযানে চতুর্থ সহকারী ছোট করণিক থেকে শুরু করে, "শস্য-গো-মাংস ব্যুরো"-র প্রথম আপিসে পদার্পণের দিন থেকে "বাতিল হিসাব বিভাগ"-এর শেষ আপিসটি ছেড়ে আসা পর্যন্ত আগাগোড়াই এ-ধরনের কর্ম-তৎপরতায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। এতদিনে এ সব কাজে আমি এতখানি দক্ষতা অর্জন করেছি যে দুই অথবা তিনবারের বেশী পা বদল না করেই কোন একটা আপিসে ঢুকে কোন করণিক এসে আমার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

এইভাবে চারবার পা বদল করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার পরে আমি পাঠরত একটি করণিককে বললাম:

"বিখ্যাত যাযাবর মহাশয়, মহান্ তুর্কী কোথায় আছেন?"

"আপনি কি বলছেন মশাই? আপানি কি বলতে চান? যদি এই ব্যুরোর প্রধানের কথা বলেন থাকেন তো বলি, তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"আজ কি তিনি হারেম পরিদর্শনে যাবেন?"

যুবকটি কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিল। কিন্তু এ সব করণিকদের ব্যাপার-স্যাপার আমি জানি। নিউইয়র্ক থেকে আমি আর একটি ডাক আসার আসার আগে যদি তার কাগজ পড়া শেষ হয়ে যায় তাহলেই আমি নিরাপদ। তার কাছে আর মাত্র দু'খানি খবরের কাগজ পড়তে বাকি আছে। কিছুক্ষণ পরেই দু'খানি শেষ করে একটা হাঁই তুলে সে জানতে চাইল আমি কি চাই।

"সুবিখ্যাত ও সম্মানিত অকর্মা: ১৮৬১ সালের-"

"আপনি তো সেই গো-মাংস চুক্তির লোক। আপনার কাগজপত্র দিন।"

কাগজপত্র নিয়ে অনেকক্ষণ দে সে নিজের সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত সেই গো-মাংস চুক্তির হারানো দলিল-দস্তাবেজ সে খুঁজে পেল-যে পাহাড়ের উপর আমার অনেক পূর্বসুরী মাথা খুঁড়ে মরেছে সেটার হদিস সে বের করল। আমি খুবই অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার আহ্লাদও হ'ল-কারণ এর পরেও আমি বেঁচে রয়েছি। আবেগের সুরে বললাম, "ওটা আমাকে দিন। এবার সরকার একটা ফয়সালা করবেই।" আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে জানাল, এখনও কিছু কাজ বাকি আছে।

বলল, "জন উইলসন ম্যাকেঞ্জি কোথায়?"

"মৃত।"

"কখন তিনি মারা গেছেন?"

"তিনি মোটেই মারা যান নি-তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।"

"কি ভাবে?"

"আদিবাসীদের কুড়ুলে।"

"কে কুড়ুল মেরেছিল?"

"কেন, কোন রেড ইণ্ডিয়ানই নিশ্চয়। আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন নি যে কোন রবিবার-বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ কাজ করেছে?"

"না। তাহলে একজন রেড ইণ্ডিয়ান, কি বলেন?"

"তাই।"

"তার নাম কি?"

'তার নাম? তার নাম তো জানি না।"

"নামটা অবশ্য জানতে হবে। কুড়ুল চালাতে কে দেখেছিল?"

"আমি জানি না।"

"আপনি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না?"

"তা যে ছিলাম না সে তো আমার চুল দেখেই বুঝতে পারছেন। আমি অনুপস্থিত ছিলাম।"

"তাহলে আপনি কি করে জানলেন যে ম্যাকেঞ্জি মৃত?"

"কারণ ঐ সময়ে তিনি নির্ঘাত মারা গিয়েছিলেন। আর সেই থেকে তিনি যে মৃত অবস্থায়ই আছেন সে কথা বিশ্বাস করবারও যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তুত, তিনি যে মারা গেছেন সেটা আমি জানি।"

"আমরা প্রমাণ চাই। সেই কুড়ুলধারীকে এনেছেন?'

"এ রকম কথা কখনও আমার মাথায় আসে নি।"

"সেই কুড়ুলধারীকে আনতেই হবে। রেড ইণ্ডিয়ান ও কুড়ুলধারীকে হাজির করতেই হবে। এই সব দিয়ে যদি ম্যাকেঞ্জির মৃত্যু প্রমাণ করা যায় তবেই আপনি কমিশনের সামনে আপনার পরীক্ষিত দাবী-পত্র পেশ করতে পারবেন এবং তার ফলে কাগজপত্র যে গতিতে অগ্রসর হতে থাকবে তাতে আপনার ছেলেমেয়েরা হয় তো তাদের জীবিতকালে সে টাকা পেয়ে ভোগ করতে পারবে। কিন্তু লোকটির মৃত্যুকে প্রমাণ করতেই হবে। আপনাকে আরও বলে রাখি, স্বর্গত ম্যাকেঞ্জি যাতায়াতে এবং মালপত্র আনা-নেওয়াতে যে অর্থ ব্যয় করেছেন সরকার কখনও সে টাকা দেবে না। কংগ্রেসের মারফতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে আপনি যদি একটা সাহায্যমূলক বিল মঞ্জুর করাতে পারেন তাহলে শেরম্যান-এর সৈন্যরা গো-মাংসের যে পিপেটা উদ্ধার করেছিল তার দাম হয়তো সরকার দিতে পারেন, কিন্তু বাকি যে উনত্রিশটা পিপে রেড ইণ্ডিয়ানরা খেয়েছে তার দাম সরকার কদাচ দেবে না।"

"তাহলে আমার প্রাপ্য হচ্ছে মাত্র একশ' ডলার, আর তাও নিশ্চিত ব্যাপার কিছু নয়! সারা ইউরোপ, এসিয়া, ও আমেরিকা জুড়ে ম্যাকেঞ্জি গো-মাংস নিয়ে ঘুরে মরল; এত দুঃখ-কষ্ট সইল। হাঁটাহাঁটি করল; বিলের টাকা আদায় করতে এতগুলি নির্দোষ মানুষ খুন হল-আর এই তার পরিণতি, আচ্ছা যুবক, শস্য-গো-মাংস বিভাগের প্রথম কম্পট্রোলার আমাকে এ কথাটা জানিয়ে দিলেন না কেন?"

"আপনার দাবীর যাথার্থ্য সম্পর্কে তো তিনি কিছু জানতেন না।"

"তাহলে দ্বিতীয় জন বললেন না কেন? বা তৃতীয় জন? এতগুলো বিভাগের কেউ আমাকে বললেন না কেন?"

"তারা কেউই জানতেন না। আমরা রুটিন-মাফিক কাজ করে থাকি। আপনি রুটিনমত চলেছেন, আর যা জানতে চেয়েছিলেন তা জেনেছেন। এটাই শ্রেষ্ঠ পথ। এটাই একমাত্র পথ। এটা নিয়মমাফিক ও ধীরগতি কাজ বটে, কিন্তু এর ফলাফল নিশ্চিত।"

"হ্যাঁ, নিশ্চিত মৃত্যু। আমাদের জাতির অনেকের ভাগ্যেই তাই ঘটেছে। মনে হচ্ছে, আমারও ডাক এসেছে। যুবক, আপনার চোখের নরম চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি, শান্ত নীল চোখ আর কানের পিছনে ইস্পাতের কলম নিয়ে ওখানে যে উজ্জ্বল মূর্তিটি বসে আছে তাকে আপনি ভালবাসেন; তাকে আপনি বিয়ে করতে চান-কিন্তু আপনি গরীব মানুষ। এই যে, হাতটা বাড়ান-এই নিন গো-মাংস চুক্তি-নামা; চলে যান, ওকে গ্রহণ করুন, সুখী হোন। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।"

যে গো-মাংস চুক্তি নিয়ে এত কথা হয়েছে সে সম্পর্কে যা জানি সব বললাম। যে করণিককে সেটা দান করেছিলাম সেও মারা গেছে। সেই চুক্তি সম্পর্কে, অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও সম্পর্কে এর বেশী কিছুই আমি জানি না। আমি শুধু জানি, কোন লোক যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে তাহলে অনেক পরিশ্রম, হাঙ্গামা ও বিলম্বে হলেও ওয়াশিংটন-এর "গোলকধাঁধা" আপিসের ভিতর দিয়ে সে তার অভিষ্ট বস্তুটি খুঁজে পেতে পারে; অবশ্য "গোলকধাঁধা" আপিসটি যদি একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হত তাহলে প্রথম দিনেই সে তার কার্য উদ্ধার করতে পারত।

১৮৭০

কি ভাবে একখানি কৃষি-পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলাম

How I Edited an Agricultural Paper

বিপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে কৃষি-পত্রিকাখানির অস্থায়ী সম্পাদক-পদ আমি গ্রহণ করি নি। কোন স্থলবাসী মানুষই বিপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে জাহাজের প্রধান নাবিকের পদ নিতে পারে না। কিন্তু তখন আমার যা অবস্থা তাতে মাইনের কথাটাই ছিল বড়। নিয়মিত সম্পাদক তখন ছুটিতে যাচ্ছিল, আর তার প্রস্তাবমতই চাকরিটা নিয়ে আমি তার জায়গায় বসলাম।

পুনরায় কাজ করতে পারায় বেশ মজাই লাগছিল; অদম্য উৎসাহের সঙ্গে সারাটা সপ্তাহ কাজ করলাম। পত্রিকাটি ছাপতে গেল; আমার পরিশ্রম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিনা দেখবার জন্য বেশ কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গেই একটা দিন কাটালাম। সূর্যাস্তের আগে আপিস ছেড়ে যাবার সময় সিঁড়ির নীচে জমায়েত একদল বয়স্কলোক ও ছেলে-ছোকরা একসঙ্গে সরে গিয়ে আমাকে পথ করে দিল। তাদের দু'একজনকে বলতে শুনলাম, "এই তিনি!" স্বভাবতই ঘটনাটা আমার ভাল লাগল। পরদিন সকালেও সিঁড়ির নীচে অনুরূপ একটা দলকে দেখতে পেলাম। তাছাড়া, এখানে-ওখানে ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোককেও দেখতে পেলাম। সকলেই আগ্রহের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি এগিয়ে যেতেই তারা দলে দলে সরে গেল। শুনতে পেলাম একজন বলছে: "চোখটা দেখেছো!" আমার উপর যে সকলেরই দৃষ্টি পড়েছে আমি যেন সেটা দেখতেই পাই নি এমনই ভাব দেখালাম, কিন্তু মনে মনে বেশ খুসি হলাম। ভাবলাম, পিসিকে এর একটা বিবরণ লিখে পাঠাব। অল্প কয়েকটা সিঁড়ি পার হয়ে উপর উঠে দরজার কাছে পৌঁছতেই খুসির গুঞ্জন ও কলকণ্ঠের হাসি কানে এল। দরজা খুলতেই দুটি গেঁয়ো মত লোককে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখেই তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। আমি তো অবাক।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি বুড়ো ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। মস্ত বড় দাড়ি বুকময় ছড়িয়ে পড়েছে, মুখখানি সুন্দর কিন্তু গম্ভীর। আমার আমন্ত্রণে ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করল। মনে হল, একটা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছে। টুপিটা খুলে মেঝেতে রাখল, আর তার ভিতর থেকে বের করল একখানি লাল রেশমি রুমাল ও আমাদের পত্রিকার একটি কপি।

পত্রিকাটি কোলের উপর রেখে রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছতে মুছতে সে বলল, "আপনিই কি নতুন সম্পাদক?"

জানালাম, আমিই।

"এর আগে কখনও কোন কৃষি-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন?"

"না," আমি বললাম। "এই আমার প্রথম উদ্যম।"

"খুবই সম্ভব। কৃষির ব্যাপারে হাতে-কলমে কাজের কোন অভিজ্ঞতা আছে?"

"না, তাও নেই।"

"সহজ বুদ্ধি এই কথাই বলেছিল," চশমাটা চোখে দিয়ে একটু কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বুড়ো ভদ্রলোক কথাগুলি বলল। তারপর পত্রিকাখানিকে সুবিধাজনক আকারে ভাঁজ করে আবার বলল, "এই সহজ বুদ্ধি কিসে হল সেটা আপনাকে পড়ে শোনাতে চাই। এই সম্পাদকীয় রচনাটির কথা বলছি। মন দিয়ে শুনুন, আর ভাবুন আপনিই কথাগুলি লিখেছেন কি না।"

"শালগম কখনও তোলা উচিত নয়, এতে এদের ক্ষতি হয়। কোন ছেলেকে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে গাছটাকে নাড়া দেওয়াই ভাল।"

"এবার বলুন তো এ বিষয়ে আপনার কি ধারণা?-কারণ আমি সত্যিই মনে করি যে আপনিই এটা লিখেছেন।"

"আমার ধারণা? আমি তো মনে করি লেখাটা ভালই হয়েছে। বেশ অর্থপূর্ণ লেখা। কেবলমাত্র এই শহরেই যে আধ-পাকা অবস্থায় তুলে ফেলার জন্য লক্ষ লক্ষ ঝুড়ি শালগম নষ্ট করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ তারা যদি একটি ছেলেকে গাছে তুলে দিয়ে নাড়া দিত-"

"আপনার ঠাকুরমাকে নাড়া দিক! শালগম গাছে ফলে না!"

"ওহো, গাছে ফলে না! ফলে না বুঝি? আরে, কে বলেছে যে গাছে ফলে? কথাটা এখানে আলংকারিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ আলংকারিক। যার কিছুমাত্র জ্ঞানগম্যি আছে সেই বুঝবে যে আমি বলতে চেয়েছি, ছেলেটি লতাটাকে নাড়াবে।"

বুড়ো লোকটি তখন উঠে দাঁড়াল, পত্রিকাটাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ল, সেগুলোকে পা দিয়ে মাড়াল, হাতের ছড়ি দিয়ে কিছু জিনিসপত্র ভাঙল এবং শেষ পর্যন্ত বলল যে একটা গরু যা জানে আমি তাও জানি না। তারপর সে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিল এবং এক কথায় এমন সব কাণ্ডকারখানা করে গেল যাতে আমার মনে হল যে কোন ব্যাপারে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু অসন্তুষ্টির কারণ অনুধাবন করতে না পারায় আমি তাকে কোন রকম সাহায্যই করতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পরেই একটা লম্বা বিশ্রী দেখতে লোক ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকল। লম্বা চুলের গোছা কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে, এক সপ্তাহের খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখের পাহাড়ে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে কোন কিছু শোনবার ভঙ্গীতে মাথা ও শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কোথাও কোন শব্দ নেই। তবু সে শুনছে। কোন শব্দ নেই। তখন দরজায় চাবি ঘুরিয়ে পা টিপে-টিপে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং বেশ কিছুক্ষণ সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতর থেকে আমাদের পত্রিকার একটি ভাঁজ করা সংখ্যা বের করে বলল:

"এই যে, এটা তো আপনারই লেখা। এটা পড়ে শোনান-তাড়াতাড়ি! আমাকে স্বস্তি দিন। আমার কষ্ট হচ্ছে।"

পড়তে লাগলাম। যত পড়ছি ততই যেন লোকটা স্বস্তি ফিরে পাচ্ছে। দেখলাম, তার টান-টান মাংসপেশীগুলো ঢিলে হচ্ছে। মুখের উপর থেকে দুশ্চিন্তা সরে যাচ্ছে, আর নির্জন প্রান্তরের বুকে সদয় জোছনার মত বিশ্রাম ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ছে তার সারা মুখে:

"গুয়ানো একটি সুন্দর পাখি, কিন্তু তাকে পালন করতে হলে যথেষ্ট যত্ন আত্তির দরকার। জুনের আগে অথবা সেপ্টেম্বরের পরে তাকে আমদানি করা চলবে না। শীতের সময় তাকে গরম জায়গায় রাখতে হবে যাতে সে বাচ্চাদের তা দিতে পারে।

"ফসলের জন্য যে একটু বিলম্বিত মরশুম প্রয়োজন সেটা তো পরিষ্কার কথা। সুতরাং কৃষক যদি জুলাইয়ের পরিবর্তে অগস্ট মাসে বীজতলা তৈরি করে ফসল বুনতে শুরু করে তাহলেই ভাল হয়।

"এবার লাউ-কুমড়োর কথা। এই ফলটি নিউ ইংলণ্ডের মফস্বল অঞ্চলের অধিবাসীদের খুব প্রিয়। ফলের কেক তৈরি করতে তারা বনকুল অপেক্ষা এই ফলটাই বেশী পছন্দ করে। আর সহজে ভালভাবে পেট ভরে বলে গরুর খাদ্য হিসাবেও রাস্পবেরি অপেক্ষা এটাকেই বেশী পছন্দ করে। উত্তরের মাটিতে ফলটা জন্মেও ভাল। কিন্তু অন্য গাছপালার সঙ্গে বাড়ির সামনের উঠোনে লাউ গাছ লাগানোর প্রথা এখন দ্রুত উঠে যাচ্ছে, কারণ এখন সকলেই স্বীকার করে যে ছায়া-তরু হিসাবে লাউ কোন কাজের নয়।

"এখন, যেহেতু গরম আবহাওয়া এগিয়ে আসছে এবং রাজহংসীরা ডিম পাড়তে শুরু করেছে-"

উত্তেজিত শ্রোতাটি গরম আবহাওয়া এগিয়ে আসছে এবং রাজহংসীরা ডিম পাড়তে শুরু করেছে-"

উত্তেজিত শ্রোতাটি আমার সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য লাফ দিয়ে কাছে এসে বলল: "বাস-বাস-এতেই হবে। আমি জানি এখন আমি ভাল হয়ে গেছি। কারণ আপনিও আমার মতই প্রতিটি অক্ষর ধরে ধরে পড়েছেন। কিন্তু হে অপরিচিত, আজ সকালে প্রথম এটা পড়েই আমি নিজেকে বললাম, আমার বন্ধুরা যতই আমার উপর নজর রাখুক এতকাল কথাটা আমি বিশ্বাস করি নি, কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি যে আমি উন্মাদ; আর সেই জন্যই আমি এমন হট্টগোল শুরু করেছি যেটা দু' মাইল দূর থেকে আপনি হয়তো শুনতে পেয়েছেন এবং একজন কাউকে খুন করতে বেরিয়েছি-কারণ কি জানেন, আমি জানি যে আগে হোক আর পরে হোক সেটা ঘটবেই, কাজেই আমার শুরু করতে আর দোষ কি। নিশ্চিত হবার জন্য এই পত্রিকার একটি অনুচ্ছেদ আমি আবার পড়ি আর তার পরেই আমার ঘরটা পুড়িয়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছি। কয়েকজনকে খোঁড়া করেছি; আর একজন ভয়ে গাছে চড়ে বসেছে; ইচ্ছা করলেই সেখানে তাকে ধরতে পারি। কিন্তু এখান দিয়ে যেতে যেতে মনে হল সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্য এখানেই ঢুকে পড়া যাক। এবার আমি নিশ্চিত, আর তাই আপনাকে বলছি, সে লোকটার ভাগ্য ভাল যে সে গাছে চড়ে বসেছে। ফিরবার পথে তাকে আমি নির্ঘাৎ খুন করতাম। বিদায়

মশাই, বিদায়; আমার বুক থেকে মস্ত বড় বোঝা আপনি নামিয়ে দিয়েছেন। আপনার একটি কৃষি-সংক্রান্ত প্রবন্ধের চাপ যখন আমার বুদ্ধি সইতে পেরেছে তখন আর কিছুই তাকে ঘায়েল করতে পারবে না। বিদায় মশাই।"

এই যে লোকটি মানুষকে খোঁড়া করে এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে খোস মেজাজে আছে তার কথা ভেবে আমার কিছুটা অস্বস্তি বোধ হল, কারণ এ কথা না মনে করে আমি পারছি না যে তার এই সব কাজের মধ্যে অত্যন্ত দূরতম হলেও আমার কিছুটা হাত রয়েছে। কিন্তু এ সব চিন্তা শীঘ্রই মন থেকে দূর হয়ে গেল, কারণ তখনই নিয়মিত সম্পাদক মশাই ঘরে ঢুকল।

সম্পাদককে খুবই বিষণ্ণ, বিচলিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

সেই বৃদ্ধ ও দুটি চাষী যুবক যে ধ্বংসকাণ্ড করে গেছে সে সব ভাল করে দেখে নিয়ে সে বলল: "কাজটা খারাপ হয়েছে-খুবই খারাপ হয়েছে। একটা আঠার বোতল ভেঙেছে, ভেঙেছে জানালার ছ'খানা কাঁচ, একটা পিকদানি ও দুটো মোমবাতি-দান। কিন্তু সেটা খুব খারাপ কিছু নয়। পত্রিকাটির সুনাম নষ্ট হয়েছে- স্থায়ীভাবে। সেটাই ভয়ের কথা। এ কথা ঠিক যে আগে কখনও পত্রিকাটির এত চাহিদা ছিল না; এত বেশী সংখ্যায় কখনও বিক্রিও হয় নি, বা জনপ্রিয়তার এত উচ্চেও কখনও ওঠে নি;-কিন্তু বিখ্যাত হবার জন্য কেউ কি পাগল হতে চায়? চায় মনের সুস্থতার বিনিময়ে উন্নতি করতে? বন্ধু আমি সৎ লোক বলেই বলছি, বাইরের রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, অনেকে বেড়ার উপর চড়ে বসেছে; তারা মনে করে যে আপনি পাগল, তাই তারা আপনাকে একবার দেখতে চাইছে। আর আপনার সম্পাদকীয় পড়বার পরে এ কথা তারা মনে করতেই পারে। সে সব লেখা সাংবাদিকতার এক চরম লজ্জা। এ ধরনের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে আপনি পারেন এ ধারণা আপনার মাথায় এল কেমন করে? কৃষির প্রাথমিক কথাগুলোও তো আপনি জানেন না। লাঙলের শিরালা ও বিদেমইকে আপনি একই বস্তু মনে করেন; বলেন গরুদের খোলস ছাড়বার ঋতুর কথা; ভাল খেলা করতে পারে ও ইঁদুর ধরতে পারে বলে আপনি গন্ধ-গোকুলকে গৃহপালিত জীবে পরিণত করবার পরামর্শ দেন! গান-বাজনা শোনালে ঝিনুকরা চুপচাপ শুয়ে থাকবে-আপনার এ মন্তব্যও অবান্তর, সম্পূর্ণ অবান্তর। ঝিনুকরা কোন কিছুতেই বিরক্ত হয় না। তারা সব সময়ই চুপচাপ থাকে। গান-বাজনা নিয়ে তারা মাথাই ঘামায় না। হায় বন্ধু অজ্ঞানতা অর্জনকেই যদি আপনার জীবনের পাঠ্যবিষয় করতেন তাহলেও আজকের চাইতে অধিকতর সম্মানের সঙ্গে আপনি স্নাতক হতে পারতেন না। এ রকমটা আমি কখনও দেখি নি। সুপুরির ব্যবসা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই মর্মে আপনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে এই পত্রিকার মহা সর্বনাশ হয়েছে। আমি চাই, আপনি চাকরি ছেড়ে চলে যান। ছুটিতে আমার দরকার নেই-ছুটি পেলেও আমি তা ভোগ করতে পারতাম না। আপনাকে আমার আসনে রেখে তো কোন মতেই না। আপনি কখন কি সুপারিশ করে বসেন তাই নিয়ে সর্বক্ষণ আমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। 'জমিতে বাগান করা' শিরোনাম দিয়ে ঝিনুক-চাষের আলোচনা করেছেন, একথা ভাবলেই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আমি চাই আপনি চলে যান। কোন কিছুতেই আমি আর একটি দিনের জন্যও ছুটি নেব না। উঃ! আপনি কেন বলেন নি যে কৃষির আপনি কিছুই জানেন না?

"আপনাকে বলব কি? আপনি তো খড়ের ডাঁটা, বাঁধা কপি, ফুল কপির বাচ্চা! এ ধরনের অদ্ভুত কথা এই আমি প্রথম শুনলাম। আপনাকে বলছি, আজ চোদ্দ বছর ধরে আমি সম্পাদকীয় কাজকর্ম করে আসছি; আর আজই আমি প্রথম এ রকম একটা বাজে মন্তব্য শুনলাম যে কোন সংবাদপত্রের সম্পাদনা করতে কাউকে কিছু জানতে হয়। আরে শালগম! দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার জন্য যত সব নাটকীয় সমালোচনা কে লেখে?কেন, একদল করিৎকর্মা মুচি আর সৌখিন মুর্দাফরাস-ভাল কৃষিকাজের আমি যতটা কাজনি তারাও তো ভাল অভিনয়ের ঠিক ততটাই জানে। পুস্তক সমালোচনা কারা করে? যে সব লোক কখনও একটা বইও লেখে নি। অর্থনীতি বিষয়ে ভারী ভারী প্রবন্ধকারা লেখে? এ বিষয়ে কিছু না জানবার সুযোগ যাদের সব চাইতে বেশী। রেড ইণ্ডিয়ান অভিযানের সমালোচক কারা? যে সব ভদ্রলোকরা আদিবাসীদের যুদ্ধের হল্লা আর তাঁবুর পার্থক্য বোঝে না, আদিম রণকুঠারধারীদের সঙ্গে যারা কোনদিন এক পা-ও হাঁটে নি, অথবা সন্ধ্যায় সমবেত শিবির-অগ্নি জ্বালাবার জন্য নিজেদের পরিবারের লোকের শরীর থেকে একটা তীরও খুলে নেয় নি। মদ্যপানবিরোধী আবেদন লেখে কারা? ভরা পান-পাত্র নিয়ে হৈ-চৈ করে কারা? কবরে যাবার আগে একটি দিনও যারা সুস্থভাবে নিঃশ্বাস টানে না তারাই। কৃষি-পত্রিকা কে সম্পাদনা করে-বলুন তো ওলমশাই? সাধারণত যে সব মানুষ কবিতা লিখতে পারে না, হল্‌দে মলাটের উপন্যাস লিখতে পারে না, শহর-সম্পাদকের কাজ করতে পারে না, এবং সাময়িকভাবে দাতব্যশালায় যাবার হাত থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করে। আপনি আমাকে বোঝাতে চান সংবাদপত্রের কাজ! আরে মশাই, আমি তার আগাপাশতলা সব জানি। আমি বলছি, একটা লোক যত কম জানবে তত বেশী হৈ-চৈ ফেলে দেবে এবং তত বেশী মাইনে আদায় করে নেবে। ঈশ্বর জানেন, আমি যদি শিক্ষিত লোক না হয়ে মূর্খ হতাম, বিনীত না হয়ে বেহায়া হতাম, তাহলেই এই

উদাসীন, স্বার্থপর জগতে নাম করতে পারতাম। এবার আমি বিদায় হচ্ছি। আপনি আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তারপরে আমার আর চলে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কর্তব্য আমি করেছি, যতটা সম্ভব আমার চুক্তিও পূরণ করেছি। আমি বলেছিলাম, আপনার পত্রিকাকে সব শ্রেণীর মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলব-আর তার করেছি। বলেছিলাম আপনার পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা বিশ হাজারে তুলে দেব, আর দু'সপ্তাহ সময় পেলে তাও করে দিতাম। আর যে শ্রেষ্ঠ পাঠক-শ্রেণী আপনাকে দিয়ে গেলাম এমনটি আজ পর্যন্ত কোন কৃষি-পত্রিকার ভাগ্যে জোটে নি-তার মধ্যে একজনও চাষী নেই, বা এমন কোন লোক নেই যে প্রাণের দায়ে তরমুজ-গাছ ও পীচ-লতার পার্থক্য বলতে পারে। আরে পিঠের গাছ, এই সম্পর্কচ্ছেদের ফেল আপনারই ক্ষতি হল, আমার নয়। বিদায়।"

তারপরই সেখান থেকে চলে এলাম।

১৮৭০

একটি মধ্যযুগীয় রোমান্স

A Medieval Romance

১-রহস্য প্রকাশ হল

অনেক রাত। ক্লুগেনস্টিন-এর অতি প্রাচীন সামন্তযুগীয় দুর্গে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করছে। ১২২২ সাল শেষ হয়ে আসছে। অনেক উপরে দুর্গের সব চাইতে উঁচু চূড়ায় একটি মাত্র আলো জ্বলছে। সেখানে একটি গোপন সভা বসেছে। ক্লুগেনস্টিন-এর বৃদ্ধ গম্ভীর মালিক রাজকীয় আসনে বসে মধ্যস্থতা করছে। এক সময় নরম গলায় সে বলল: "মা আমার।"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত যোদ্ধার বর্মে-চর্মে সজ্জিত উপস্থিত যুবকটি বলল: "বল বাবা!"

"কন্যা, যে রহস্য সমস্ত যৌবন-কালটা তোমাকে ঢেকে রেখেছে এবার যে তাকে উন্মোচনের সময় হয়েছে। এ রহস্য কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল সে কথাই খুলে বলছি। আমার দাদা উল্‌রিশ হল ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ-এর ডিউক। আমাদের বাবা মৃত্যুশয্যায় নির্দেশ দেন যে উল্‌রিশ-এর যদি কোন পুত্র-সন্তান না জন্মে তাহলে আমার বংশই তার উত্তরাধিকারী হবে, অবশ্য যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মে। তিনি আরও বলেন, কোন ভাইয়েরই যদি পুত্র-সন্তান না হয়, শুধু মেয়েই হয়, তাহলে নিষ্কলংক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে উল্‌রিশ-এর মেয়েই উত্তরাধিকার লাভ করবে; তা যদি না হয় তাহলে সে অধিকার পাবে আমার মেয়ে, অবশ্য যদি তার সুনাম নিষ্কলুষ থাকে। তাই এখানে বসে আমি ও আমার বৃদ্ধা স্ত্রী একটি পুত্র-সন্তানের বর লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগলাম, কিন্তু সব প্রার্থনাই বৃথা হল। জন্মালে তুমি। আমি হতাশ হলাম। এত বড় জমিদারি হাতছাড়া হতে বসল-উজ্জ্বল স্বপ্ন বুঝি দূরে মিলিয়ে যায়! অথচ কত আশাই না করেছিলাম! উল্‌রিশ-এর বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছর কেটে গেলেও তাদের কোন সন্তানই হল না।

মনে মনে বললাম, 'ধৈর্য ধর, এখনও সব আশা যায় নি।' একটা মতলব মাথায় এল। তুমি জন্মেছিলে মাঝরাতে। তুমি যে মেয়ে একথা জানল শুধু ডাক্তার, নার্স ও ছ'জন দাসী। এক ঘণ্টা পার না হতেই তাদের প্রত্যেককে ফাঁসিতে ঝোলালাম। পরদিন সকালে ক্লুগেনস্টিন বংশে একটি পুত্র-সন্তান জন্মেছে-জন্মেছে মহান ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ-এর উত্তরাধিকারী, এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা জমিদারি আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল। সে রহস্য আজও গোপন আছে। শিশুকাল থেকে তোমার মায়ের নিজের বোন তোমাকে লালন-পালন করেছে; তাই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কোন ভয়ই আমাদের ছিল না।

"তোমার যখন দশ বছর বয়স তখন উল্‌রিশ-এর একটি মেয়ে হল। আমরা দুঃখ পেলাম, তবু আশা করতে লাগলাম যে হাম, বা ডাক্তার, বা শৈশবে নানা রকম স্বাভাবিক শত্রুর কাছ থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে, কিন্তু সব ব্যাপারেই নিরাশ হলাম। সে বেঁচে রইল, বড় হতে লাগল-স্বর্গের অভিশাপ নামুক তার মাথায়! কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা নিরাপদ। আরে, হা! হা! হা! আমাদের একটি ছেলে রয়েছে না? আর আমাদের সেই ছেলেই কি ভবিষ্যৎ ডিউক নয়? আমাদের বড় আদরের কন্‌রাড-তাই নয় কি?-কারণ আটাশ বছরের স্ত্রীলোক হলেও আজ পর্যন্ত ও নাম ছাড়া আর কোন নামই তোমার হয় নি!

"এদিকে বয়সের হাত পড়েছে আমার দাদার দেহে, দিন দিন সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। জমিদারির কাজকর্ম চালানো তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে, তাই তার ইচ্ছা তুমি তার কাছে চলে যাও এবং নামে ডিউক না হলেও কার্যত ডিউক হও। তোমার অনুচররা তৈরি-আজ রাতেই যাত্রা কর।

"এবার মন দিয়ে শোন। আমি যা বলি তার প্রতিটি কথা মনে রেখো। জার্মেনি যত প্রাচীন তত প্রাচীন একটি বিধান আছে যে, জনসাধারণের সামনে জমিদারি তক্তে অভিষিক্ত হবার আগে কোন নারী যদি যদি মুহূর্তের জন্যও সেই মহান আসনে বসে তাহলেই-তার মৃত্যু হবে! সুতরাং ভাল করে শুনে রাখ। সব সময় বিনয়ের অভিনয় করবে। সিংহাসনের পায়ের কাছে অবস্থিত প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসে বিচার-কার্য চালাবে। যতদিন তোমার অভিষেক না হয়, যতদিন নিরাপদ না হও, ততদিন এই ভাবে চলবে। তোমার নারীত্ব প্রকাশ পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু বিশ্বাসঘাতকতায় ভরা এই পার্থিব জীবনে নিরাপদে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

"হায় পিতা! এর জন্যই কি আমার জীবন মিথ্যায় ঢাকা? আমার নির্দোষ বোনটিকে যাতে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারি তার জন্যই কি এই ব্যবস্থা? আমাকে রেহাই দাও বাবা, তোমার সন্তানকে রেহাই দাও!"

"প্রগল্‌ভা বালিকা! বুদ্ধি খরচ করে যে তোমার জন্য এত বড় সৌভাগ্যের ব্যবস্থা করছি, এই কি তার পুরস্কার? আমার পিতৃপুরুষের অস্থির দিব্যি, তোমার এই প্যান্‌পেনে মনোভাব আমার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। এই মুহূর্তে ডিউকের কাছে চলে যাও; সাবধান, আমার উদ্দেশ্য যেন ভেস্তে দিও না।"

সংলাপ এই পর্যন্তই থাক। আমরা তো বুঝতে পারছি যে, ভাল মেয়েটির প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয় ও চোখের জলে কোন ফলই হল না। কোন কিছুই ক্লুগেনস্টিন-এর কঠোর বৃদ্ধ মালিককে বিচলিত করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুর্গের ফটক পার হল; সশস্ত্র জায়গীরদারের সমারোহে ও একদল সাহসী ভৃত্য পরিবৃত হয়ে রাতের অন্ধকারে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

মেয়ে চলে যাবার পরে বৃদ্ধ জমিদার অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল; তারপর তার বিষণ্ণ স্ত্রীকে বলল: "বৌ, আমাদের ব্যবস্থা তো ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে। তিন মাস হয়ে গেল ধূর্ত সুদর্শন কাউণ্ট ডেটজিনকে শয়তানী মতলব দিয়ে পাঠিয়েছি দাদার মেয়ে কন্সটান্স-এর কাছে। সে যদি বিফল হয় তাহলে আমরা পুরোপুরি নিরাপদ নই, কিন্তু সে যদি সফল হয় তাহলে ভাগ্য যত বিরোধিতাই করুক কোন শক্তিই আমাদের মেয়ের ডাচেস হবার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না!"

"আমার মন বড় কু-ডাক ডাকছে: তবু সব যেন ভাল হয়!"

"চুপ কর গো মেয়ে! প্যাঁচাকে ডাকতে দাও। এবার শুয়ে পড়, আর ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ ও রাজকীয় সমারোহের স্বপ্ন দেখতে থাক।"

২-উৎসব ও অশ্রুজল

উপরের অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার দু'দিন পরে ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ রাজ্যের উজ্জ্বল রাজধানী সামরিক লোকজনের চলাফেরায় আর হাজার হাজার রাজভক্ত প্রজার আনন্দের হৈ-হুল্লায় মুখর হয়ে উঠেছে, কারণ জমিদারী তরুণ উত্তরাধিকারী কনরাড এসে পৌঁচেছে। বৃদ্ধ ডিউকের মনেও সুখে ভরে উঠেছে, কারণ কনরাড-এর সুদর্শন চেহারা ও ভদ্র ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভালবাসাকে জয় করে নিয়েছে। প্রাসাদের বড় বড় হলগুলি সম্ভ্রান্ত লোকজনে ভরে গেছে; সকলেই কনরাডকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। চারদিকে সব কিছুই এত উজ্জ্বল ও আনন্দমুখর যে তার মনের সব ভয় ও দুঃখ দূরে গিয়ে সন্তোষ ও সান্ত্বনায় ভরে উঠেছে।

কিন্তু প্রাসাদের একটি দূরতম কোণে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা রয়েছে। ডিউকের একমাত্র সন্তান লেডি কন্সটান্স জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটি লাল, ফোলা-ফোলা, জলে ভরা। সে একেবারে একা। আবার নতুন করে কাঁদতে শুরু করে সে বলে উঠল:

"শয়তান ডেটজিন চলে গেছে-জমিদারি ছেড়ে পালিয়েছে! প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু হায়! সেটাই সত্যি। তাকে আমি এত ভালবেসেছিলাম। যদিও জানতাম আমার বাবা ডিউক কখনও তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না, তবু তাকে ভালবেসেছিলাম ভালবেসেছিলাম-কিন্তু এখন কত ঘৃণা করি! সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করি! হায়, আমার কি হবে? আমার যে সব শেষ, শেষ, শেষ! আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব!"

৩-গল্পাংশ জটিলতর হল

কয়েক মাস পার হয়ে গেল। তরুণ কনরাড-এর শাসন ব্যবস্থার প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। তার বিচারের বুদ্ধিমত্তা, শাস্তির করুণাময়তা, আর এই গুরু দায়িত্ব পালনে সবিনয় আচরণ-সকলেরই ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করল। বৃদ্ধ জমিদার অচিরেই সবকিছু তার হাতে ছেড়ে দিল, আর তার উত্তরাধিকারী যখন প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসে রাজকীয় নির্দেশাবলী ঘোষণা করত, তখন দূরে বসে সগর্ব সন্তোষের সঙ্গে সে শুনত। পরিস্কার মনে হত যে, এত ভালবাসা, প্রশংসা ও সম্মান পেয়ে কনরাড ও সুখী না হয়ে পারে না। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে মোটেই সুখী নয়। কারণ সে দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পেরেছে যে রাজকুমারী কন্সটান্স তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। সারা বিশ্বের ভালবাসা তার কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এ ভালবাসা যে বিপদ-সংকুল। সে আরও বুঝতে পেরেছে যে, ডিউকও তার মেয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে খুসি হয়েছে, এবং এর মধ্যেই বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। রাজকুমারীর মুখে যে গভীর দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল প্রতিদিনই একটু একটু করে তা যেন সব সরে যাচ্ছে। প্রতিটি দিন আশা ও উৎসাহের আলো তার চোখে

ঝলমলিয়ে উঠছে। এমন কি তার বিষাদদীর্ণ মুখে যেন একটু একটু করে যাযাবর হাসি দেখা দিচ্ছে।

কনরাড ভীত হয়ে পড়ল। এখানে সে যখন নতুন এসেছিল, সকলের কাছে অপরিচিত ছিল-যখন বিষণ্ণ অন্তরে সেই সমবেদনার জন্য সে তৃষিত হয়ে উঠেছিল। যা একমাত্র নারীই দিতে বা অনুভব করতে পারে, তখন নিজেরই মত আর একটি মেয়ের সঙ্গ লাভের বাসনার কাছে সে যে আত্মসমর্পণ করেছিল, সে জন্য এখন সে নিজেকেই তীব্রভাবে অভিশাপ দিতে লাগল। এখন সে বোনকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু তার ফল হল আরও খারাপ; যত সে তাকে এড়িয়ে চলে ততই মেয়েটি তার পথের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে এটা তার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে সে বিস্ময় বোধ করতে লাগল। মেয়েটি তাকে তাড়া করে ফিরছে; সব সময়, সব জায়গায় সে তার পিছনে লেগে আছে; রাত্রে ও দিনে একই অবস্থা। মেয়েটিকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন মনে হল। নিশ্চয় কোথাও একটা রহস্য আছে।

এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। জগৎ-সংসার এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। ডিউককেও বিচলিত মনে হল। কনরাড যেন একটি ভৌতিক উপস্থিতি হয়ে উঠল। একদিন সে চিত্র-কক্ষ সংলগ্ন একটা ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে এমন সময় কন্সটান্স তার সামনে এসে দাঁড়াল; দুটি হাত ধরে সোচ্চারে বলে উঠল:

"ওঃ, তুমি আমাকে এড়িয়ে চল কেন? আমার সম্পর্কে তোমার যে ভাল ধারণা ছিল সেটা হারাবার মত কি আমি করেছি-কি বলেছি? কনরাড আমাকে ঘৃণা করো না, একটি ব্যথিত হৃদয়কে করুণা কর। যে কথা এতদিন না-বলা ছিল আর আমি তা চেপে রাখতে পারছি না, কারণ তাহলে আমি মরে যাব-আমি তোমাকে ভালবাসি কনরাড! যদি আমাকে ঘৃণা করতে চাও তো কর, তবু এ কথা আমি বলবই।"

কনরাড নির্বাক! কন্সটান্স এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল; তারপরই তার নীরবতাকে ভুল বোঝার ফলে একটা উন্মাদ খুসি তার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল; দুই হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল: "দয়া কর! দয়া কর! তুমি আমাকে ভালবাসতে পার-ভালবাসবেই! ওগো আমার আপন জন, আমার প্রভু কনরাড, বল তুমি আমাকে ভালবাসবে!"

কনরাড আর্তনাদ করে উঠল। তার মুখের উপর বিষাদের ছায়া নেমে এল। আস্পেন-পাতার মত সে কাঁপতে লাগল। বেপরোয়াভাবে হাতভাগিনী মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল: "তুমি কি চাইছ তা নিজেই জান না! ওটা অসম্ভব, চিরদিনের মত অসম্ভব!" তারপরই সে একজন অপরাধীর মত পালিয়ে গেল; রাজকুমারী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক মিনিট পরে মেয়েটি সেখানেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর কনরাডও কাঁদতে লাগল তার নিজের ঘরে। দু'জনেই হতাশ। দু'জনেই দেখল, তাদের সামনে সর্বনাশের রক্তচক্ষু।

ধীরে ধীরে কন্সটান্স দাঁড়াল, আর যেতে যেতে বলল: "যে মুহূর্তে ভেবেছিলাম তার নিষ্ঠুর হৃদয় বুঝি গলছে, সেই ক্ষণেই সে আমার ভালবাসাকে ঘৃণা করল! আমিও তাকে ঘৃণা করি! সে আমাকে পায়ে ঠেলেছে-এই লোকটা-কুকুরের মত সে আমাকে পায়ে ঠেলেছে!"

৪-ভয়ংকর সত্য প্রকাশ পেল

সময় কাটতে লাগল। ভাল মানুষ ডিউকের মেয়ের মুখের উপর আবার নেমে এল একটা স্থায়ী বিষণ্ণতা। কনরাড ও কন্সটান্সকে এখন আর এক সঙ্গে দেখা যায় না। তা দেখে ডিউক বড় দুঃখ পায়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই কনরাড-এর গালে আবার লালের ছোপ ফিরে এল, তার চোখে দেখা দিল পুরনো দিনের সজীবতা, এবং স্থির পরিপক্ক প্রজ্ঞার সঙ্গে সে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে সারা প্রাসাদে চুপি চুপি একটা অদ্ভুত গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। সে গুঞ্জন উচ্চতর হল, আরও ছড়িয়ে পড়ল। সারা শহরে কানাঘুসা চলতে লাগল। ক্রমে সেটা ছড়িয়ে পড়ল সারা জমিদারিতে। সে গুঞ্জনটা এই:

"লেডি কন্সটান্স-এর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।"

ক্লুগেন্স্টিন-এর মালিক সে কথা শুনে তার পালকসজ্জিত শিরস্ত্রাণটা তিনবার মাথাক চারদিকে ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

"ডিউক কনরাড দীর্ঘজীবি হোক!-কারণ আজ থেকে তার মুকুট পাকা হয়ে গেল। ডেটজিন তার কাজ ভালভাবেই সমাধা করেছে; শয়তানটাকে ভালভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।"

খবরটাকে সে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে দিল; সারা জমিদারির সব মানুষ আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে নাচল, গাইল, আলো জ্বালাল, এতবড় ঘটনাটাকে নিয়ে উৎসব করল; আর সে সব খরচ বহন করল বড়ো ক্লুগেন্স্টিন।

৫-চরম পরিণতি

বিচারের দিন এল। ব্র্যাণ্ডেবুর্গ-এ সব বড় বড় লর্ড ও ব্যারনার ডিউক-প্রাসাদের বিচার-কক্ষে সমবেত হল। এমন কোন জায়গা রইল না যেখানে আর একজন দর্শকও দাঁড়াতে বা বসতে পারে। লাল-সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে কনরাড বসেছে প্রধান মন্ত্রীর আসনে; তার দুই পাশে বসেছে রাজ্যের সব বড় বড় বিচারকরা। বৃদ্ধ ডিউক কঠোর নির্দেশ দিয়েছে যে তার মেয়ের বিচার যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়। তারপরই ভগ্নহৃদয়ে সে বিছানা নিয়েছে। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। নিজের বোনের বিচারের দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহিত দেবার জন্য বেচারি কনরাড অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

সেই বিরাট জনসমাবেশ সব চাইতে দুঃখী হৃদয়টি বুঝি লুকিয়ে ছিল কনাড-এর বুকের মধ্যে।

আর সব চাইতে সুখী হৃদয় বোধ হয় তার বাবার, কারণ মেয়ের "কনরাড"-এর অজ্ঞাতেই বৃদ্ধ ব্যারণ ক্লুগেনস্টিন সেখানে হাজির হয়েছিল এবং স্বীয় বংশের এই প্রভূত বিত্তলাভে উৎসাহিত ঘোষণা পাঠ করল; অন্য সব প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ হল; তখন মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলল: "বন্দী, উঠে দাঁড়ান!"

ভাগ্যহীন রাজকুমারী উঠে দাঁড়াল; বিশাল জনতার সম্মুখে সে তখন অনবগুণ্ঠিতা। প্রধান বিচারপতি বলতে লাগল:

"মাননীয়া মহোদয়া, রাজ্যের প্রধান বিচারকমণ্ডলীর সম্মুখে এই অভিযোগ করা হয়েছে এবং সে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে যে পবিত্র বিবাহবন্ধন ব্যতিরেকেই আপনি একটি সন্তান প্রসব করেছেন, আর আমাদের প্রাচীন বিধান অনুসারে এ অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড; অবশ্য তার একটিমাত্র বিশেষ শর্ত এই যে মহামান্য অস্থায়ী ডিউক লর্ড কনরাড এবার এই গুরুদণ্ডের আদেশ প্রচার করবেন; সুতরাং মন দিয়ে শুনুন।"

কনরাড অনিচ্ছুক হাতে রাজদণ্ড তুলে নিল। আর সেই মুহূর্তে রাজবেশের অন্তরালবর্তী তার নারী-হৃদয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই বন্দিনীর প্রতি করুণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, দুই চোখে নামল অশ্রুধারা। দণ্ডিত এই বন্দিনীর প্রতি করুণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, দুই চোখে নামল অশ্রুধারা। ঘোষণার জন্য সে মুখ খুলল, আর প্রধান বিচারপতি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল:

"ওখান থেকে নয় মহামান্য, ওখান থেকে নয়। ডিউকের সিংহাসনে উপবিষ্ট না হয়ে ডিউক-বংশীয় কারণ প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করা আইনসম্মত নয়!"

বেচারি কনরাড-এর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। তার বাবার লৌহকঠিন দেহটাও কাঁপতে লাগল। কনরাড-এর তো অভিষেক হয় নি-এ অবস্থায় কি সে সিংহাসনকে কলংকিত করতে সাহসী হবে? সে ইতস্তত করতে লাগল; ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এ কাজ তো তাকে করতেই হবে। সকলের সচকিত দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। বেশীক্ষণ ইতস্তত করলে সে দৃষ্টি সন্দেহে কুটীল হয়ে উঠবে। সে সিংহাসনে আরোহণ করল। পুনরায় রাজদণ্ডটি তুলে সে বলল:

"বন্দী, ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ-এর ডিউক সর্বক্ষমতার অধীশ্বর লর্ড উল্‌রিশ-এ নামে আমার উপর ন্যস্ত গুরুকর্তব্য আমি পালন করছি। আমার সব কথা মন দিয়ে শোন। এ দেশের প্রাচীন বিধান অনুসারে, তুমি যদি তোমার এই অপরাধের অংশীদারকে এখানে উপস্থিত না কর এবং তাকে জল্লাদের হাতে তুলে না দাও তাহলে তোমার অবশ্য মৃত্যু হবে। এই সুযোগ গ্রহণ কর-সময় থাকতে এখনও নিজেকে বাঁচাও। তোমার সন্তানের পিতার নাম বল!"

দরবার-কক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল-সে নৈঃশব্দ্য এত গভীর যে লোকে বুঝি বা নিজ নিজ হৃৎপিণ্ডের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল।

তখন রাজকুমারী ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল; দুই চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা নিয়ে সোজা কনরাড-এর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল:

"আপনি সেই লোক!"

নিজের অসহায় অবস্থার ভয়ঙ্কর চিন্তায় কনরাড-এর বুকের ভিতরটা মৃত্যু-শীতলতায় শির্‌শির্ করতে উঠল। পৃথিবীর কোন্ শক্তি এখন তাকে বাঁচাবে! এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করতে হলে তাকে প্রকাশ করে বলতে হবে যে সে নারী, আর যে কোন অভিষেকহীন নারী ডিউকের আসনে বসলেও তার মৃত্যু অনিবার্য! একই সঙ্গে সে ও তার কঠোর-হৃদয় বাবাম মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এই রোমহর্ষক ঘটনাবহুল কাহিনীর বাকি অংশটা এখানে বা অন্য কোন গ্রন্থেস বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কখনও পাওয়া যাবে না।

আসল কথা হল, আমার নায়ক (অথবা নায়িকা)-কে এমন একটা গাড্ডায় ঠেলে দিয়েছি যে তাকে আবার কি করে সেখান থেকে বের করে আনব তার হদিস আমি নিজেই জানি না; সুতরাং এ সব ব্যাপারে নিজের হাত ধুয়ে ফেলে নায়ক (অথবা নায়িকা)-কে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম। যদি পারে সেখান থেকে বেরিয়ে আসুক,-নয়তো সেখানেই থাকুক। ভেবেছিলাম, এই সামান্য অসুবিধাকে সহজেই দূর করে ফেলতে পারব, কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে উঠেছে।

১৮৭০

আমার ঘড়ি

My Watch

(একটি শিক্ষামূলক ছোট্ট কাহিনী)

আমার সুন্দর নতুন ঘড়িটা আঠারো মাস ধরে চলছে; এর মধ্যে সময়ের কোন হেরফের হয় নি, কোন যন্ত্রাংশ ভাঙে নি, বা থেমেও যায় নি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে সময় রক্ষার ব্যাপারে ঘড়িটি অভ্রান্ত; এ গঠন ও দেহযন্ত্র অক্ষয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন রাতে ঘড়িটা হাত থেকে পড়ে গেল। আমি দুঃখ পেলাম; মনে হল, এটা যেন কোন আসন্ন বিপদের অগ্রদূত ও পূর্বাভাষ। যা হোক, মনের সে ভাব কাটিয়ে আন্দাজ মতে ঘড়িটা চালিয়ে দিলাম এবং কু-চিন্তা ও বিপদের আভাষ মন থেকে দূর করে দিলাম। পরদিন একজন বড় ঘড়িওয়ালার দোকানে গেলাম ঘড়িতে সঠিক সময় দেবার জন্য। দোকানের বড়-কর্তা ঘড়িটা আমার হাত থেকে নিয়ে সময় ঠিক করতে লাগল। তারপর বলল, ঘড়িটা চার মিনিট স্লো যাচ্ছে-রেগুলেটারটা একটু তুলে দেওয়া দরকার।"

আমি তাকে থামাতে চেষ্টা করলাম-বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ঘড়িটা সঠিক সময় দিচ্ছিল। কিন্তু না; এই মাথা-মোটা লোকটা তখন শুধু একটা কথাই বুঝেছে যে ঘড়িটা চার মিনিট স্লো যাচ্ছে আর রেগুলেটারটাকে একটু তুলে দিতে হবে। উদ্বিগ্ন চিত্তে আমি অনেক আপত্তি করলাম, ঘড়িটাতে হাত না দিতে বললাম, কিন্তু সেই লজ্জাজনক কাজটাই সে শান্ত চিত্তে নিষ্ঠুরভাবে করে গেল। আমার ঘড়িটা এবার আগে বাড়তে শুরু করল। প্রতিদিনই ফাস্ট হয়ে চলল। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘড়িটার যেন প্রচণ্ড জ্বর হল, তার নাড়িটা একশো পঞ্চাশে উঠে গেল। দু'মাস পরে দেখা গেল, সে শহরের অন্য সব ঘড়িকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে; পঞ্জিকার তারিখ থেকে তেরো দিনের বেশী এগিয়ে গেল। অক্টোবরের পাতা থাকতে থাকতেই ঘড়িটা নভেম্বরের বরফ-ঝরা দিনে পা দিল। বাড়ি ভাড়া ও অন্য থাকতে থাকতেই ঘড়িটা নভেম্বরের বরফ-ঝরা দিনে পা দিল। বাড়ি ভাড়া ও অন্য সব দেয় বিল এমন ভয়ঙ্করভাবে সে এগিয়ে দিতে লাগল যে আমি আর পেরে উঠলাম না। সময় ঠিক করবার জন্য ঘড়িটাকে নিয়ে গেলাম একজন ঘড়ি-ওয়ালার কাছে। সে জানতে চাইল ঘড়িটা কখনও মেরামত করিয়েছি কি না। আমি বললাম, না, মেরামতের কখনও দরকার হয় নি। অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে ঘড়িটাকে খুলে ফেলল, নিজের চোখে একটা ছোট গোল বাক্স বসাল এবং যন্ত্রটাকে ভালভাবে দেখতে লাগল। সে বলল, ঘড়িটাকে পরিস্কার করতে হবে, তেল দিতে হবে এবং সময়ও ঠিক করতে হবে-এক সপ্তাহ পরে আসবেন। পরিস্কার করে, তেল দিয়ে, সময় ঠিক করিয়ে নেবার পরে আমার ঘড়িটা এত বেশী স্লো হয়ে যেতে লাগল যে তার টিক্ টিক্ শব্দ বড় ঘণ্টা বাজার তালে তালে চলতে লাগল। ফলে আমি পৌঁছবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিতে লাগল, কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে সময় মত উপস্থিত হতে পারতাম না, খাবার সময় ঠিকমত হাজির হতে পারতাম না; যেখানে চার দিন হবার কথা সেখানে আমার ঘড়িতে হত তিন দিন। ক্রমে ক্রমে আমি পিছিয়ে পরতে লাগলাম-প্রথমে গতকালে, তারপর তার আগের দিনের, তারপর গত সপ্তাহে; একসময়ে আমার মনে হল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একাকী আমি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর পৃথিবীটা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। আমার মনে হলব সংগ্রহশালার মমির সঙ্গে কোথায় যেন আমার একটা গোপন মিল আছে। আবার একজন ঘড়িওয়ালার কাছে গেলাম। আমার সামনেই ঘড়িটাকে পুরো খুলে ফেলে সে বলল ব্যারালটা একটু "ফেঁপে" উঠেছে, তিন দিনের মধ্যেই সে ঠিক করে দিতে পারবে। তারপর থেকে ঘড়িটা মোটামুটি চলতে লাগল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। দিনের প্রথম অর্ধেকটা সময় ঘড়িটা এমন দুষ্ট ছেলের মতই ছুটতে লাগল; এমনভাবে খট্‌খট্‌, ঝর্‌ঝর্‌, হ্যাচ্‌হ্যাচ্‌, হিচ্‌হিচ্‌, শব্দ করতে লাগল যে নিজের সব ভাবনা চিন্তাই মাথায় উঠল; আর সেই সময় সে এত দ্রুত ছুটত যে এ অঞ্চলের আর কোন ঘড়ি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। কিন্তু দিনের বাকিটা সময় ঘড়িটা আবার এমন স্লো হতে আরম্ভ করত যার ফলে যে সব ঘড়িকে সে পিছনে ফেলে এসেছিল সেগুলি আবার তাকে ধরে ফেলত। কাজেই শেষ পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার পরে সে যথাসময়ে ঠিক জায়গায় এসেই দাঁড়াত। ঘড়িটা একটা মোটামুটি সময় রেখে চলত; কাজেই কেউ বলতে পারত না যে সে তার কর্তব্য বেশী বা কম কিছু করেছে। কিন্তু মোটামুটি সময় রাখা তো একটা ঘড়ির পক্ষে কোন সদ গুণ নয়, কাজেই আমি সেটাকে আর একজন ঘড়ি-ওয়ালার কাছে নিয়ে গেলাম। সে বলল, কিং-বোল্টটা ভেঙে গেছে। আমি বললাম, তার চাইতে গুরুতর কিছু যে ঘটে নি সে জন্য আমি খুশি। সত্যিকথা বলতে কি, কিং-বোল্ট, যে কি বস্তু সে ধারণাই আমার ছিল না, কিন্তু একজন অপরিচিত লোকের কাছে আমি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম না। সে কিং-বোল্টটা মেরামত করে দিল কিন্তু তাতে ঘড়িটায় একদিকে যতটুকু লাভ হল, অন্যদিকে ততটুকু ক্ষতি হল। ঘড়িটা কিছুক্ষণ চলত, আবার কিছুক্ষণ বন্ধথাকত। তারপর আবার চলত, আবার বন্ধহত, এবং এইভাবেই তার মর্জি মত চলতে লাগল। আরও একটা ব্যাপার, ঘড়িটা যখনই চলত তখনই বন্দুকের কুঁদোর মত পিছনে একটা ধাক্কা দিত। কয়েকদিন বুকের উপর একটা প্যাড বেঁধে নিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘড়িটাকে আর একজন ঘড়ি-ওয়ালার

কাছে নিয়ে গেলাম। সে ঘড়িটাকে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলল এবং চোখে একটা কাঁচ লাগিয়ে সেগুলোকে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। তারপর সে বলল, মনে হচ্ছে যেন হেয়ার স্প্রিং-এ কিছু গোলমাল হয়েছে। হেয়ার স্প্রিং-টা ঠিক করে সে ঘড়িটাকে নতুন করে দম দিয়ে দিল। এবার ঘড়িটা ভালই চলল, তবে দশটা বাজবার দশ মিনিট আগে কাঁটা দুটো সবসময়ই কাঁচির মত একসঙ্গে জুড়ে যেত এবং তখন থেকে দুটো কাঁটা একসঙ্গে এগিয়ে চলত। কাজেই পৃথিবীর প্রাচীনতম লোকও এই ঘড়ি দেখে সময়ের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারত না। আবার ঘড়িটাকে নিয়ে গেলাম মেরামতের জন্য। এ লোলকটি বলল, ক্রিস্টালটা বেঁকে গেছে, আর মেইন স্প্রিং-টাও সোজা নেই; এ ছাড়া আরও কিছু কিছু মেরামত দরকার। সে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিল, আর আমার ঘড়িটাও ভালভাবেই চলতে শুরু করল। তবে একটা অসুবিধা দেখা দিল। প্রায় আট ঘণ্টা ঠিকভাবে চলবার পরে ভিতরের সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যেত এবং মৌমাছির মত শব্দ করত; তাছাড়া কাঁটা দুটো এত জোরে অবিরাম ঘুরতে থাকত যে তার কোন হিসাব পাওয়া যেত না-মনে হত ঘড়িটার মুখের উপর একটা মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। মাত্র ছয় বা সাত মিনিটের মধ্যে ঘড়িটা চব্বিশ ঘণ্টা পরিক্রমা শেষ করত আর তারপরেই সশব্দে বন্ধ হয়ে যেত। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আর একজন ঘড়ি-ওয়ালার কাছে গেলাম। সেও ঘড়িটাকে টুকরো টুকরো করে খুলে পেলল। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠছে; তাই স্থির করলাম তাকে বেশ কড়া করে জেরা করব। ঘড়িটা কিনতে আমার লেগেছিল দু'শ' ডলার আর যতদূর মনে হয় তার মেরামতের জন্য খরচ করেছি দু-তিন হাজার। বসে বসে লোকটাকে দেখতে হঠাৎ মনে হল এই ঘড়ি-ওয়ালাটি আমার অনেকদিন আগের একজন পরিচিত লোক-তখন সে ছিল একজন স্টিম্-বোট ইঞ্জিনিয়ার; আর তাও ভাল ইঞ্জিনিয়ার নয়। অন্য ঘড়ি-ওয়ালাদের মত সেও সবকিছু সযত্নে পরীক্ষা করল এবং একই রকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার রায়টি ঘোষণা করল।

সে বলল, "ঘড়িটাতে বড় বেশী বাষ্প জমছে-সেফটি-ভাল্বের উপরে মাঙ্কি-রেঞ্চটা ঝোলাতে চাও কি?"

সেখানেই মাথায় আঘাত করে তাকে মেরে ফেললাম; নিজের খরচে তাকে কবর দিলাম।

আমার খুড়ো উইলিয়ম (হায়! আজ সে মৃত) বলত, একটা ঘোড়া যতদিন পালিয়ে না যায় ততদিনই সেটা ভাল ঘোড়া, আর একটা ঘড়ি যতদিন মেরামত-ওয়ালাদের হাতে না পুড়ে ততদিনই সেটা ভাল ঘড়ি। আর খুড়ো প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, যে সব কাঁসারি, বাসনওয়ালা, মুচি, ইঞ্জিনিয়ার ও কামার জীবনে কিছু করতে পারে নি তারা সব যায় কোথায়; কিন্তু কেউ তাকে সে কথা বলতে পারে নি।

১৮৭০

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

Political Economy

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সব সুপরিচালিত সরকারেই ভিত্তিস্বরূপ। সর্ব যুগের যারা জ্ঞানীজন তারা এই বিষয়টির উপরে-

[এইখানে আমার লেখা বাধাপ্রাপ্ত হল; খবর এল, একটি অপরিচিত লোক নীচে দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নীচে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম, তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলাম; তবে সারাক্ষণই আমি সচেষ্ট ছিলাম যাতে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির যে চিন্তা-ভাবনাগুলি আমার মাথার মধ্যে কিল্‌বিল্‌ করছিল সেগুলি হাতছাড়া হয়ে না যায়, বা জট পাকিয়ে না যায়। এদিকে মনে মনে আমি চাইছিলাম যেন অপরিচিত লোকটি খড়-বোঝাই একটা নৌকোয় চাপা পড়ে খালের জলে ডুবে মরে। ফলে আমি তখন উত্তেজনায় অধীর, আর লোকটি ধীর, স্থির, ঠাণ্ডা। সে বলল, আমাকে বিরক্ত করার জন্য সে দুঃখিত, কিন্তু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে সে লক্ষ্য করেছে যে আমার কয়েকটি বজ্রবারণ ধাতুদণ্ড প্রয়োজন। বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ,-বলে যান-তারপর কি?" সে বলল, না, তারপরে তেমন কিছু নয়, তবে আমার বাড়িতে সে কয়েকটি বজ্রবারণ-দণ্ড বসিয়ে দিতে চায়। ঘর-গৃহস্থালীর কাজে আমি নতুন; সারাটা জীবন হোটেল-বোডিংয়েই কাটিয়েছি। এ ধরনের অন্য যে কোন লোকের মতই (অপরিচিত লোকজনের কাছে) আমিও নিজেকে ঘর-গৃহস্থালীর কাজে বেশ একজন পাকা লোক বলেই চালাতে চেষ্টা করে থাকি। সুতরাং আমি আচমকাই বলে ফেললাম যে, কিছুদিন যাবৎই ছটা বা আটটা বজ্রবারণ-দণ্ড বসাবার কথা আমিও ভাবছিলাম, কিন্তু-। নবাগত লোকটি চমকে উঠে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমি তবু অবিচলিত। ভাবলাম, হঠাৎ যদি কোন ভুল করেও থাকি, লোকটি যেন আমার মুখ দেখে সেটা বুঝতে না পারে। সে বলল, শহরের অন্য যে কোন লোকের কাজ করবার আগেই সে আমার কাজটা করে দেবে। আমি বললাম, "ভাল কথা", আর তারপরেই আবার লেখা নিয়ে পড়লাম। এখন লোকটি আবার আমাকে খবর পাঠিয়ে জানতে চাইল, আমার ঠিক ক'টা "পয়েণ্ট" দরকার, বাড়ির কোন্‌ কোন্‌ অংশে সেগুলি বসাব এবং কি ধরনের দণ্ড আমার পছন্দ। গৃহস্থালীর কাজকর্মে অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে এগুলো খুবই মুস্কিলের ব্যাপার; কিন্তু আমি বেশ ভালভাবেই কাজ চালিয়ে গেলাম, আর এ সব ব্যাপারে আমি যে একেবারেই আনকোরা সে সন্দেহ সম্ভবত তারও হল না। তাকে বলে দিলাম, আটটা "পয়েণ্ট" বসাতে হবে, সবগুলিই ছাদের উপর বসাতে হবে, এবং সব চাইতে ভাল দণ্ডই ব্যবহার করতে হবে। সে বলল, "সাধারণ" মাল ফুটপ্রতি ২০ সেণ্ট দামে, "তামায় মোড়া" মাল ২৫ সেণ্ট দামে, আর "দস্তায় মোড়া বাঁকানো" মাল যা যে কোন সময় বিদ্যুৎ পরিবহন বন্ধ করতে সক্ষম সেটা ৩০ সেণ্ট দামে সরবরাহ করতে সে পারবে। আমি বললাম, "বাঁকানো" মালই আমার পছন্দ। তখন সে বলল, আড়াই শ' ফুট তুলেই সে কাজ চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু কাজটাকে ঠিক ঠিক মত করতে হলে, এ শহরের সেরা কাজ হিসাবে করতে হলে, ভাল-মন্দ সব লোকের নজর কাড়তে হলে, এবং জন্মাবধি কেউ কখনও বজ্রবারণ দণ্ডের এ হেন সুসমঞ্জস ও সুদৃশ্য ব্যবস্থাপনা দেখে নি এ কথা বলতে সব লোককে বাধ্য করতে হলে, অন্তত পক্ষে চার শ' ফুট ছাড়া সে কাজটা শেষ করতে পারবে না। অবশ্য কোন রকম জোর-জবরদস্তি করতে সে চায় না; সে শুধু একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়। আমি বললাম, চার শ' ফুটের কাজেই হাত দেওয়া হোক, তার পছন্দমতই সবকিছু করা হোক; আর আমাকে আমার কাজে ফিরে যেতে দেওয়া হোক। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির চিন্তা-ভাবনাগুলোকে পুনরায় ঠিকভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করলাম]

-তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রয়োগ করেছেন। জরোষ্ট্রার থেকে হোরেস গ্রীল পর্যন্ত সর্ব কালের, সকল সভ্যতার ও সকল জাতির ব্যবসায়িক আইন, আন্তর্জাতিকতা, সৌভ্রাত্র ও প্রাণীগত পথচ্যুতি সংগ্রাম করেছে-

[এইখানে আবার বাধা পড়ল; নীচে গিয়ে বজ্রবারণ দণ্ডের লোকটির সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে। উত্তপ্ত, উচ্ছ্বসিত চিন্তা-ভাবনাগুলিকে নিয়ে তার সামনে হাজির হলাম-সে আগের মতই শান্ত, মধুর আর আমি উত্তপ্ত, উন্মত্ত। রোড্‌স্‌-এর বিরাট কায় পিতল-মূর্তির মত চিন্তামগ্নভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে; তার একটি পা আমার গোলাপ-চারার উপরে, অন্য পা প্যান্সি ফুলের ঝাড়ে; দুই হাতে উরুর উপরে রাখা; মাথার টুপির কোণটা সামনের দিকে বাঁকানো; একটি চোখ বুজে অন্য চোখটি খুলে সে সপ্রশংসা দৃষ্টিতে আমার বড় চিমনিটার দিকে তাকিয়েছিল। সে বলল, "এরকম একটা পরিস্থিতি দেখতে বেঁচেও সুখ। একটিমাত্র চিমনির গায়ে আটটি বজ্রবারণ দণ্ডের অবস্থানের এমন অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য কখনও দেখেছেন কিনা সেটা আপনিই বলুন।"

আমি বললাম, এর চাইতে বড় কিছু দেখেছি বলে তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সে বলল, তার মতে প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে এর চাইতে মহত্তর দৃশ্য একমাত্র নায়াগারা জলপ্রপাত ছাড়া আর কোথাও নেই এ পৃথিবীতে। তার একান্ত বিশ্বাস, আমার বাড়িটিকে

পরিপূর্ণ নয়নসুখকর করে তুলতে এখন একমাত্র প্রয়োজন অন্য চিমনিগুলোতে একটু হাত লাগানো; আর "তাহলেই 'কু-দেতাত'-এর ফলে স্বভাবতই যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটা শান্ত সহজ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে।" আমি জানতে চাইলাম, সে কোন বইয়ের ভাষায় কথা বলছে কি না, আর আমি সেগুলো দরকার মত অন্যত্র ব্যবহার করতে পারি কি না? স্মিত হাসির সঙ্গে সে বলল, তার এই সংলাপ পুঁথি থেকে শেখা নয়, এবং বিদ্যুতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় না থাকলে এই সংলাপ-শৈলী আয়ত্ত করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সে তখন একটা মোটামুটি খরচের আন্দাজ জানিয়ে বলল, আমার ছাদের এখানে-ওখানে আরও আটটা দণ্ড বসালেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আর সে জন্য আরও পাঁচ শ' ফুট মাল লাগবে। সে আরও জানাল, আগে যে হিসাব সে দিয়েছিল তার চাইতে কিছু বেশী মাল লেগে গেছে-মোটামুটি একশ' ফুটের মত। বললাম, আমার ভয়ংকর কাজের তাড়া রয়েছে; কাজেই এ কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হলেই আমি আমার কাজ নিয়ে বসতে পারি। সে বলল, "ঐ আটটা দণ্ড বসিয়ে দিয়ে আমিও কাজটা এগিয়ে নিতে পারতাম,-অন্য লোক হলে তাই করত। কিন্তু না; আমি নিজের মনে বললাম, এই লোকটি আমার অপরিচিত, কাজেই তার কোন ক্ষতি হবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়; এই বাড়িটিতে প্রয়োজনীয় বজ্রবারণ দণ্ড নেই। আর সে কথা তাকে আমার বলা উচিত। হে অপরিচিত, আমার কর্তব্য শেষ; স্বর্গের বিদ্রোহী দূত যদি আপনার বাড়িকে আঘাত করে-" আমি বলে উঠলাম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে; আরও আটটি দণ্ড ও পাঁচ শ' ফুট বাঁকানো মাল ব্যবহার করুন-যেমন ইচ্ছা তাই করুম; শুধু আপনার দুঃখকে প্রশমিত করুন, আর অনুভূতিগুলোকে নাগাল পেতে পারেন। এবার তো পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেল, অতএব আমি আমার কাজে চললাম।

[মনে হচ্ছে, বাধা পাবার আগে আমার চিন্তার সূত্রগুলো যেখানে ছিল সেখানে পৌঁছবার চেষ্টায় আমি পুরো একটি ঘণ্টা এখানে বসে আছি। আমার বিশ্বাস, সে কাজে সফল হয়েছি, আর তাই পুনরায় অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে পারি।]

-এই মহান বিষয়বস্তুটির সঙ্গে, আর তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা সকলরেই এটাকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মেনে নিয়েছে, তার প্রতি পদক্ষেপেই দেখতে পেয়েছে তার নব নব হাস্যময় রূপ। মহান কন্‌ফিউসিয়াস বলেছেন, একজন পুলিশের বড় কর্তা হওয়ার চাইতে তিনি একজন প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্‌ই হতে চান। সিসেরো প্রায়ই বলতেন, মানুষের মন যত বড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম তার মধ্যে সব চাইতে মহৎ কাজ হল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি। এমন কি আমাদের নিজস্ব লোক গ্রীলও অস্পষ্টভাবে হলেও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে "রাষ্ট্রীয়-

[এইখানে বজ্রবারণ দণ্ডের লোকটি আবার আমাকে ডেকে পাঠাল, আর আমিও প্রায় ধৈর্য-হারা মন নিয়ে নীচে নেমে গেলাম। সে বলল, আমার কাজে বিঘ্ন ঘটানো অপেক্ষা তার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু তাকে যখন একটা কাজ করতে দেওয়া হয়েছে এবং সে কাজটি পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে যথেষ্ট শিল্পসম্মতভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হয়েছে, এবং কাজটি শেষ হবার পরে শান্ত দেহে যখন বিশ্রাম তার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তদনুযায়ী সে বিশ্রাম নিতেও যাচ্ছিল, তখন মুহূর্তের দৃষ্টিপাতের ফলে সে দেখতে পেল যে পুরো পরিকল্পনাটাতেই কিছু গোলমাল হয়ে গেছে এবং এখন যদি বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড় আসে তাহলে এই যে বাড়িটির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত তাকে বাঁচাবার জন্য আটটি বজ্রবারণ দণ্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। শুনে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, "আত্মরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা করা হোক! দেড় শ' ফুট উঁচু করুন! রান্নাঘরের মাথায় কয়েকটি দণ্ড বসান। গোলাবাড়ির উপর বসান এক ডজন! গরুটার উপর বসান দুটো-বাঁধুনির উপর একটা!-অভিশপ্ত বাড়িটার সর্বত্র দণ্ডে-দণ্ডে ছেয়ে ফেলুন! শুরু করে দিন! হাতের কাছে যা মাল পাবেন কাজে লাগান; তারপর বজ্রবারণ দণ্ড ফুরিয়ে গেলে হেন-দণ্ড, তেন-দণ্ড, সিঁড়ির দণ্ড, পিষ্টন-দণ্ড-এক কথায় আপনার কৃত্রিম দৃশ্যরচনার ক্ষুধা মেটাবার জন্য যা কিছু দরকার, এবং আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শান্ত করবার জন্য ও ছিন্নভিন্ন আত্মাকে নিরাময় করবার জন্য যা কিছু দরকার-সব করুন।" একটু মিষ্টি হাসি ছাড়া সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে সে শুধু জানাল, নিজেকে সে আর জ্বালাতন করতে ইচ্ছুক নয়। আহা, এ সবই তিন ঘণ্টা আগেকার কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মত একটা মহান বিষয় নিয়ে লিখবার মত মানসিক প্রশান্তি কি একনও আমার আছে? কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখবার বাসনাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না, কারণ পৃথিবীর সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এই বিষয়টিই আমার হৃদয়ের একান্ত আপন এবং আমার মস্তিষ্কের একান্ত প্রিয়।]

-'অর্থনীতি মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান।" বিকলমস্তিষ্ক অথচ প্রতিভাদীপ্ত বায়রন ভেনিস-এ নির্বাসনে থাকার সময় বলেছিলেন, তাকে যদি ফিরে গিয়ে আবার তার উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতে দেওয়া হয়, তাহলে যতটুকু অবসর তার হাতে থাকবে সেটুকু সময় বড় বড় কথায় কাব্য রচনা না করে তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে কাটাবেন। ওয়াশিংটনও এই সুন্দর বিজ্ঞাপনকে ভালবাসতেন। বেকার, বেকউইথ, জাডসন, স্মিথ প্রভৃতির নামও এর সঙ্গে অমর অক্ষরে বিজড়িত আছে। এমনকি মহাকবি হোমারও

'ইলিয়াড'-এর নবম খণ্ডে বলেছেন:

Fiat justitia, ruat coelum,
Post mortem unum, ante bellum,
Hic jacet hoc, ex-arte res,
Politicum e-economico est.

প্রাচীন কবির এই সব ধ্যান-ধারণার বিশালতা ভাষার মাধুর্য ও কল্পনার মহত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই অনুচ্ছেদটিকে যে খ্যাতি দান করেছে তা বুঝি আর কোথাও-

["না, আপনার সঙ্গে আর একটি কথাও নয়। আপনার কত পাওনা সেটা বলুন, আর এই বাড়িতে যতক্ষণ আছেন অতল নৈঃশব্দের মধ্যে চিরতরে ডুবে যান। ন'শ' ডলার? এই সব তো? আমেরিকার যে কোন ভাল ব্যাংক থেকে এই চেকে আপনি টাকাটা তুলতে পারবেন। রাস্তায় এই অগণিত জনতা জড় হয়েছে কেন? সে কি?-সবাই বজ্রবারণ দণ্ডগুলির দিকেই যে তাকিয়ে আছে! কী আশ্চর্য, ওা কি আগে কখনও বজ্রবারণ দণ্ড দেখে নি? আপনি কি বলছেন? একটা বাড়ির মাথায় এতগুলো কখনও দেখেনি? আমি নীচে নেমে যাচ্ছি; জনগণের অজ্ঞতার এই প্রচণ্ড প্রকাশকে নিজের চোখে ভাল করে দেখে আসি।"

তিন দিন পরে। আমরা সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমাদের দণ্ড-কণ্টকিত বাড়িটাই ছিল সারা শহরের আলোচনা ও বিস্ময়ের বস্তু। থিয়েটারে ভিড় ছিল না। কারণ তাদের সব চাইতে ভাল দৃশ্য-সজ্জাও আমাদের বজ্রবারণ দণ্ডগুলোর তুলনায় অতীব সাদামাঠা। আমাদের রাস্তাটা দিন রাত ছিল দর্শকে ঠাসা; তাদের মধ্যে অনেকে এসেছিল গ্রামাঞ্চল থেকে। দ্বিতীয় দিনে মিলল প্রার্থিত শান্তি। একটা বাজ-ডাকা ঝড় উঠল, আর ইতিহাসবিদ জোসেফাস-এর ভাষায় বলা যায়, বিদ্যুৎ এসে "হানা" দিল আমার বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে যেন গ্যালারি ফাঁকা হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বাড়ির আধা মাইলের মধ্যে কোন দর্শককে দেখা গেল না; কিন্তু ততখানি দূরত্ব পর্যন্ত সবগুলো উঁচু বাড়ির জানালা, ছাদ সব লোকে লোকারণ্য। আর তা তো হতেই পারে; কারণ একটা যুগব্যাপী যত কক্ষ্যচ্যুত নক্ষত্র আর চৌঠা জুলাই-এর যত সব বাজি যদি এক সঙ্গে হয়ে একটিমাত্র উজ্জ্বল আলোকছটায় একটি অসহায় ছাদের উপর বৃষ্টিধারার মত ঝরে পড়ে তাহলেও তো এই ঝড়ো পরিমণ্ডলে আতসবাজির যে জমকালো প্রদর্শনী আমার বাড়িটাকে সকলের পক্ষে একান্ত দর্শনীয় করে তুলেছে তার সমকক্ষ হতে পারবে না। প্রকৃত অবস্থার পর্যালোচনায় দেখা গেল, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমার বাড়িটা সাত শ' চৌষট্টি বার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে, এবং প্রতিবারেই একটি বিশেষ দণ্ডের উপর পড়ে বাঁকানো দণ্ডের মারফতে তীরবেগে মাটি পর্যন্ত চলে গেছে। আর সেই মুহূর্মুহু বজ্রপাতের মধ্যে ছাদের একটি মাত্র স্লেট পাথর ভেঙেছে, কারণ ঐ একবারই আশেপাশের দণ্ডগুলি সাধ্যমত বিদ্যুৎশক্তি টেনে নিয়েছিল।বাপরে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ রকমটি কেউ কখনও দেখে নি। সারা দিনমানে আমার পরিবারের যে কেউ জানালা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়েছে তারই চুল সবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাথাটিকে একটি মসৃণ বিলিয়ার্ড-বলে রূপান্তরিত করেছে; আর পাঠক মহোদয়গণ বিশ্বাস করুন, আমরা কেউই বাইরে বেরিয়ে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভয়ংকর আক্রমণের অবসান হল, কারণ আমার তৃষ্ণার্ত দণ্ডগুলির ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আকাশের মেঘে আর কোন বিদ্যুৎ অবশিষ্ট রইল না। তখন আমি বেরিয়ে এলাম, কিছু সাহসী লোকজন যোগাড় করলাম, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ির মাথায় মাত্র তিনটি দণ্ড, রান্নাঘরের মাথায় একটি দণ্ড ও গোলাবাড়ির মাথায় একটি দণ্ড ছাড়া এই ভয়ংকর সমরাস্ত্র সম্ভারের আর সব কিছুই পরিষ্কার করা না হল ততক্ষণ আমরা কিছু মুখে দিই নি, বা আমাদের চোখে এক পলক ঘুম আসে নি। চেয়ে দেখুন, সেই দণ্ডগুলি আরও পর্যন্ত সেখানেই রয়েছে। আর একমাত্র তখনই, তার আগে নয়, লোকজন সব আবার আমাদের রাস্তাটা ব্যবহার করতে শুরু করল। এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলি, সেই ভয়ংকর সময়টাতে আমি কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপর আমার প্রবন্ধটি লেখা চালিয়ে যেতে পারি নি। এমন কি সে লেখা নতুন করে শুরু করবার মত স্নায়ু ও মস্তিষ্কের অবস্থা আমি এখনও ফিরে পাই নি।

যার প্রয়োজন তারই উদ্দেশে: তিন হাজার দু' শ' এগারো ফুট সেরা গুণান্বিত দস্তায় মোড়া বাঁকানো বজ্রবারণ দণ্ড এবং ষোল শ' একত্রিশটি রূপোয় মাথা-মোড়া "পয়েণ্ট"-এর যদি কারও দরকার থাকে তো প্রকাশকের ঠিকানায় যোগাযোগ করে দর-দামের বিষয় জানতে পারেন; মালগুলি সবই মোটামুটি মেরামতযোগ্য অবস্থায় আছে এবং ব্যবহারে জীর্ণ হলেও যে কোন সাধারণ মালের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা রাখে।

১৮৭০

বিজ্ঞান বনাম ভাগ্য

Science Vs. Luck

সে সময় (মাননীয় মি. কে-বলেন) যাকে বলা হয় "ভাগ্যের খেলা" তার বিরুদ্ধে কেন্টাকি-র আইন ছিল খুব কড়া। বাজি রেখে "সেভেন-আপ" অথবা "ওল্ড স্লেজ" খেলার সময় প্রায় ডজন খানেক ছেলেকে হাতেনাতে ধরা হয়; গ্র্যাণ্ড জুরি তাদের বিরুদ্ধে একখানি সত্যিকারের বিলও পায়। মামলা যখন আদালতে উঠল তখন তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য জিম স্টার্গিসকে নিয়োগ করা হল। কেসটা নিয়ে সে যত বেশী পড়াশুনা করল, সাক্ষ্যপ্রমাণাদি নিয়ে যত বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করল, ততই সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে এ-মামলায় শেষ পর্যন্ত তার হার হবেই-এই দুঃখজনক ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলবে না। ছেলেগুলো যে জুয়ো খেলায় বাজি ধরেছিল সেটা ঠিক। স্টার্গিস-এর স্বপক্ষে জন-সমর্থনও গড়ে উঠেছিল। তারা বলতে লাগল, এত বড় একটা বড় মামলায় তার সফল ওকালতির জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে এটা খুবই দুঃখের কথা, কারণ এ মামলা তার বিরুদ্ধে যাবেই।

কিন্তু কয়েকটি বিনিদ্র রাত কাটাবার পরে একটা চিন্তা স্টার্গিস-এর মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। আনন্দে সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। তার মনে হল, বাঁচবার পথ সে খুঁজে পেয়েছে। পরদিন সে মক্কেল ও কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফিস-ফাস করল, এবং মামলা যখন আদালতে উঠল তখন "সেভেন আপ" ও বাজি ধরার কথা স্বীকার করল, এবং মক্কেলের পক্ষ সমর্থনে নির্লজ্জ ধৃষ্টতার সঙ্গে জানাল যে "ওল্ড স্লেজ" কোন রকম জুয়া খেলাই নয়! বিদগ্ধ শ্রোতাদের সকলের খুবই হাসিতে বিগলিত হয়ে উঠল। সকলের সঙ্গে বিচারকও হাসল। কিন্তু স্টার্গিস-এর মুখে আন্তরিক কঠোরতা। বিরোধী পক্ষের কৌঁসুলি ঠাট্টার দ্বারা তাকে কাৎ করতে চাইল, কিন্তু পারল না। ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল। বিচারক কিছুটা ধৈর্য হারিয়ে বলল, ঠাট্টা-পরিহাসটা একটু বেশীদূর গড়িয়েছে। জিম স্টার্গিস জানাল, এ ব্যাপারে সে তো ঠাট্টা-তামাসার কিছু দেখতে পাচ্ছে না-কিছু লোক এটাকে জুয়া খেলা বললেও এটা যে সত্যি জুয়া খেলা সেটা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য তার মক্কেলদের শাস্তি দেওয়া চলতে পারে না। বিচারক ও কৌঁসুলি বলল, সেটা তো খুব সোজা কাজ। সঙ্গে সঙ্গে জব, পিটার্স, বার্ক, জনসন নামক ডিয়েকনদের এবং উইর্ট ও মিগ্‌লস্ নামক ডোমিনিদের সাক্ষী দিতে ডাকা হল। তারা সকলে একবাক্যে স্টার্গিস-এর আইনের প্যাঁচকে নস্যাৎ করে দিয়ে ঘোষণা করল যে "ওল্ড স্লেজ" একটি জুয়ার খেলা।

বিচারক বলল, "এবার আপনি এটাকে কি বলবেন?"

স্টার্গিস বলল, "এবার আপনি এটাকে কি বলবেন?"

স্টার্গিস পাল্টা জবাব দিল, "আমি এটাকে বলব বিজ্ঞানের খেলা! আর সেটা আমি প্রমাণও করে দেব!"

শুরু হল তার খেলা।

সে একগাদা সাক্ষী এনে হাজির করল; গাদা গাদা প্রমাণ-পত্র দাখিল করল; সে দেখাতে চাইল যে "ওল্ড স্লেজ" মোটেই ভাগ্যের খেলা নয়। সেটা বিজ্ঞানের খেলা।

জগতের সব চাইতে সরল মামলা না হয়ে ব্যাপারটা হয়ে উঠল অত্যন্ত জটিল। বিচারক একটুখানি মাথা চুলকে বলল, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়, কারণ এক পক্ষের সমর্থনে আদালতের সামনে যত সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা যায়, ঠিক ততটাই হাজির করা যায় বিপক্ষের সমর্থনে। কিন্তু তার ইচ্ছা যেন উভয় পক্ষের প্রতিই সুবিচার করা হয়; কাজেই এ সমস্যার সমাধানের কোন প্রস্তাব যদি মিঃ স্টার্গিস-এর থাকে তাহলে সেই ভাবেই কাজ করা যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে স্টার্গিস উঠে দাঁড়াল।

"ভাগ্য বনাম বিজ্ঞান-প্রত্যেক পক্ষে ছ'জন করে জুরি নিয়োগ করুন। তাদের হাতে মোমবাতি ও একজোড়া করে তাস দিন। তাদের জুরিদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ফলাফল অনুসারে চলুন!"

এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। চার ডিয়েকন ও দুই ডোমিনিকে "জুয়া"র পক্ষে জুরি হিসাবে শপথ গ্রহণ করানো হল, আর ছ' জন বৃদ্ধ "সেভেন-আপ" খেলুড়েকে মনোনীত করা হল "বিজ্ঞানের" পক্ষ সমর্থন করতে। তারা সকলেই জুরিদের ঘরে চলে গেল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ডিয়েকন পিটার্স জনৈক বন্ধুর কাছ থেকে দুই ডলার ধার পাঠাতে আদালতে খবর দিল। [চাঞ্চল্য] আরও ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ডোমিনি মিগ্‌ল্‌স্ জনৈক বন্ধুর কাছ থেকে "বাজি"র টাকা ধার করে পাঠাতে আদালতে খবর দিল। [চাঞ্চল্য] আরও তিন বা চার ঘণ্টার মধ্যেই বাকি ডোমিনি ও ডিয়েকনরা ছোটখাট ধারের জন্য আদালতে খবর পাঠাল। ঘর-ভরা দর্শকের দল কিন্তু তখনও অপেক্ষা করেই আছে, "বুল্‌স্ কর্ণার্স"-এ এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা; প্রতিটি পরিবারের পিতা এ ঘটনার প্রতি অনিবার্যভাবেই আগ্রহী।

বাকি গল্পটা সংক্ষেপেই বলা যায়। দিনের আলো ফুটতেই জুরিরা আদালতে ঢুকল এবং তাদের মুখপাত্র হিসাবে ডিয়েকন পড়তে লাগল-

রায়

আমরা কেণ্টাকি কমনওয়েল্‌থ বনাম জন হুইলার গং-এর জুরিগণ মামলার সমস্ত দিক ভালভাবে বিবেচনা করিয়া এবং বিভিন্ন বক্তব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছি যে, "ওল্ড স্লেজ" অথবা "সেভেন-আপ" নামে পরিচিত খেলাটি প্রধানত বিজ্ঞানেরই খেলা, ভাগ্যের খেলা নয়। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ এখানে বলা যাইতেছে, বার বার বলা যাইতেছে, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই বলা যাইতেছে যে, সারা রাতের মধ্যে "জুয়া"র সমর্থকগণ একটি খেলাও জিতিতে পারেন নাই বা একটি গোলামও দেখাইতে পারেন নাই, অথচ বিরোধী পক্ষ সে কাজটি বারে বারেই সমাধান করিয়াছেন; অধিকন্তু, আমাদের রায়ের সমর্থনে এই অর্থপূর্ণ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে "জুয়া"র পক্ষের লোকেরা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, আর "বিজ্ঞান"-এর পক্ষের লোকেরা সে অর্থ হজম করিয়াছেন। এই জুরির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, "সেভেন-আপ"-কে "ভাগ্যের" খেলা বলিয়া অভিহিত করা অত্যন্ত ক্ষতিকর, এবং যে সমাজ এই খেলায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের উপর দুঃখ-দুর্দশা ও আর্থিক ক্ষতি চাপাইয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

"এই ভাবেই কেণ্টাকির বিধান-গ্রন্থে 'সেভেন-আপ'কে ভাগ্যের খেলা না বলে বিজ্ঞানের খেলা বলে বিশেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সে খেলা আইনত দণ্ডনীয় নয়," বলল মিঃ কে-। "এই রায়ের কথা উক্ত গ্রন্থেই লেখা আছে এবং আজও তা সমান প্রযোজ্য।"

১৮৭০

ভাল ছোট ছেলেটির কাহিনী

The Story of the good Little Boy

এক সময়ে একটি ভাল ছেলে ছিল। তার নাম জ্যাকব ব্লিভেন্স। বাবা-মা যতই বাজে ও যুক্তিহীন কথাই বলুক না কেন সে সব সময় তাদের কথা মত চলত; সর্বদা লেখাপড়া করত; সাবাথ-স্কুলে যেতে কখনও দেরী করত না। যদিও সে ভালভাবেই বুঝত যে হকি খেলাটা তার পক্ষ ভাল, তবু সে হকি খেলত না। যত সুবিধাই পাওয়া যাক না কেন, সে কখনও মিথ্যা বলত না। সে শুধু বলত, মিথ্যা বলা খারাপ, আর তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর সে এত বেশী সৎ ছিল যে তাকে দেখে সকলেই হাসাহাসি করত। জ্যাকবের চাল-চলনগুলোই ছিল সব চাইতে অদ্ভুত। রবিবারে সে গুলি খেলত না, পাখির বাসা লুঠ করত না, বাঁদরগুলোকে বিরক্ত করত না; কোন রকম ভাল আমোগ-প্রমোদের প্রতিই তার টান ছিল না। অন্য ছেলেরা যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করত, কিন্তু কোন ফল হত না। আগেই বলেছি, তাদের মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে ছেলেটি "পীড়িত", আর সেই জন্যই তারা তাকে ঘিরে রাখত; তার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে দিকে নজর রাখত।

এই ছোট ভাল ছেলেটি স্কুলের সব বই পড়ত; তাতেই সে সব চাইতে বেশী আনন্দ পেত। তার জীবনের গোপন কথাই ছিল-সেই সব বইতে। স্কুলের বইতে যে সব ভাল ছোট ছেলেদের কথা লেখা থাকে সেগুলি সে বিশ্বাস করত; তাদের উপরেই সে সব সময় ভরসা করত। তার বড়ই ইচ্ছা করত, তাদের কেউ যদি জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াত; কিন্তু কেউ আসত না। হয় তো তার সময়ের আগেই তারা সবাই মরে গেছে। যখনই কোন ভাল ছেলের গল্প সে পড়ত তখনই আগেই শেষের পাতাটা উল্টে সে দেখে নিত ছেলেটির কি হল, সে চাইত তার দিকে চোখ রেখে সে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে যাবে; কিন্তু কিছুই হত না; সেই ভাল ছোট ছেলেটি সব সময়ই শেষ অধ্যায়ে গিয়ে মারা যায়; সেখানে থাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা ছবি; তার আত্মীয়-স্বজনরা ও স্কুলের ছেলেরা কবরটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে; তাদের পরনে খাটো পাঁৎলুন ও ঢাউস বনেট; সকলেই হাতে বড় বড় রুমাল নিয়ে কাঁদে।

জ্যাকবের মনে বড় সাধ, তাকে যদি কোন স্কুলের বইতে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তার ইচ্ছা, তাকে বইতে রাখা হবে, ছবি এঁকে দেখানো হবে কিছুতেই সে মায়ের কাছে মিথ্যা বলবে না। আর তাই নিয়ে অতি আনন্দে মায়ের সে কী কান্না! আরও ছবি থাকবে-ছ'টি ছেলেমেয়েসহ একটি ভিখারিণীকে সে দরজায় দাঁড়িয়ে একটি পেনি ভিক্ষা দিচ্ছে, আর বলে দিচ্ছে সে যেন পেনিটা তার ইচ্ছামতই খরচ করে, তবে সে যেন অমিতব্যায়ী না হয়, কারণ অমিব্যায়িতা পাপ। ছবিতে আরও দেখানো হবে-যে খারাপ ছেলেটি সে স্কুল থেকে আসবার সময় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার মাথায় বাড়ি মেরে 'হি! হি!' করে তাড়া করবে, পরম উদারতা বশত সে তাকেও কিছু বলবে না। ছোট জ্যাক ব্লিভেন্স-এর এই ছিল মনের সাধ। স্কুলের বইতে যেন সে স্থান পায়। অবশ্য যখন সে ভাবত যে ঐ ছোট ভাল ছেলেটি সব সময়ই মরে যায় তখন তার কিছুটা খারাপ লাগত। সে বেঁচে থাকতে ভালবাসে, তাই স্কুলের পাঠ্য বইয়ের ভাল ছেলে হবার এই একটা বেজায় বড় অসুবিধা। সে জানত, ভাল ছেলে হওয়াটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সে জানত, পাঠ্য বইয়ের ছেলেগুলোর মত অতটা অলৌকিক ধরনের ভাল হওয়াটা যক্ষ্মা রোগের চাইতেও মারাত্মক। সে জানত, এ ধরনের ছেলেরা বেশী দিন বাঁচে না; এমন কি তাকে যদি কোন বইতে ঢোকানোও হয়, সে হয় তো মরবার আগে বইটা দেখেই যেতে পারবে না; আর যদি তার মরবার আগের বইটা বের করা হয় তাহলেও বইটার পিছনে তার অন্ত্যেষ্টির ছবি না থাকায় বইটা মোটেই জনপ্রিয় হবে না। তাছাড়া, মরবার সময় সে যদি সবাইকে ভাল ভাল উপদেশ শুনিয়ে দিতে না পারে তাহলেও তো ব্যাপারটা ঠিক স্কুল পাঠ্য বইয়ের মত হবে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত সে মনস্থির করে ফেলে-সে বেঁচে থাকবে, যতদিন সম্ভব ঝুলে থাকবে, আরে সময় যেদিন আসবে তার জন্য মৃত্যুকালীন বক্তৃতাটা আগে থেকেই তৈরি করে রাখবে।

কিন্তু যে কারণেই হোক এই ছোট ভাল ছেলেটির পক্ষে সব কিছু ঠিক ঠিক মত ঘটল না; বইয়ের ভাল ছোট ছেলেটির বেলায় যা যা ঘটে থাকে, তার বেলায় সে রকমটা ঘটল না। তারা সব সময়ই ভাল থাকে, আর খারাপ ছেলেদের পা ভাঙে; কিন্তু তার বেলায় কোথায় যেন একটা স্ক্রু ঢিলে থাকায় ব্যাপারটা ঘটে গেল অন্য রকম। জিম ব্লেককে আপেল চুরি করতে দেখে সে গাছতলায় গিয়ে তাকে বইয়ের সেই খারাপ ছেলেটির গল্প পড়ে শোনাতে লাগল যে প্রতিবেশীর গাছ থেকে আপেল চুরি করতে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিল; কিন্তু এ ক্ষেত্রে জিম গাছ থেকে পড়ল ঠিকই, কিন্তু পড়ল ঠিক তারই ঘাড়ে, আর ভাঙল তারই হাত, জিমের আঘাতই লাগল না। জ্যাকব ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বইতে তো এ রকমটা লেখা নেই।

আর একদিন কতকগুলি খারাপ ছেলে একটি অন্ধলোককে কাদার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে তার আশীর্বাদ পাবার আশায় জ্যাকব

তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল; কিন্তু অন্ধ লোকটি তাকে আশীর্বাদ তো করলই না, উল্টে হাতের লাঠি উঁচিয়ে তার মাথায় মেরে শাসিয়ে বলল, এভাবে তাকে সাহায্য করবার ভান করতে এলে সে আবারও মাথায় লাঠির ঘা বসাবে। বইতে তো এরকম কথা লেখা নেই। জ্যাকব বইয়ের পাতা উল্টে অনেক খুঁজল।

আরও একটা কাজ করবার খুব ইচ্ছা জ্যাকবের। যে খোঁড়া কুকুরটার কোথাও কোন আশ্রয় নেই, যেটা খুবই ক্ষুধার্ত ও নির্যাতিত, সেটাকে বাড়িতে এনে আদর করে পুষবে আর কুকুরটার অক্ষয় কৃতজ্ঞতা লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত সে রকম একটা কুকুর পেয়ে সে খুব খুশি হল। সেটাকে বাড়ি নিয়ে এল, পেট ভরে খাওয়াল, আর তারপরে যেই না তাকে আদর করতে গেল অমনই সেটা তেড়ে এসে তার সব জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে একটা অঘটন কাণ্ড সৃষ্টি করে বসল। সে ভাল ভাল বই খুঁজে দেখল, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বইতে যে জাতের কুকুরের কথা লেখা আছে এটা তো সেই জাতের কুকুর, কিন্তু এর আচরণটা উল্টো। ছেলেটি যা কিছু করে তাতেই বিপদে পড়ে। পাঠ্যবইয়ের ছেলেরা যে সব কাজ করে পুরস্কার পায় সেই সব কাজ করেই এ ছেলেটির ক্ষতির অন্ত থাকে না।

একদিন স্কুলের যাবার পথে সে দেখতে পেল কতকগুলি খারাপ ছেলে পাল-তোলা নৌকো নিয়ে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছে। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, কারণ বই পড়ে সে জেনেছে, যে সব ছেলে রবিবারে নৌকো নিয়ে বেড়াতে যায় তারা নির্ঘাত ডুবে মেরে। সুতরাং তাদের সতর্ক করে দেবার জন্য সে দৌড়ে গিয়ে একটা ভেলায় চাপল, কিন্তু একটা কাঠ উল্টে যেতেই সেও ছিটকে জলে পড়ে গেল। অনতিবিলম্বেই একটি লোক তাকে উদ্ধার করল, ডাক্তার তার পেট থেকে পাম্প করে জল বের করে দিল; কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে সে ন' সপ্তাহ বিছানায় পড়ে রইল। কিন্তু সব চাইতে দুর্বোধ্য ব্যাপার হল, নৌকোর খারাপ ছেলেগুলো সারাদিন স্ফূর্তি করে কাটাল এবং একান্ত বিস্ময়করভাবে বহালতবিয়তে জীবন্ত বাড়ি ফিরে এল। জ্যাকব ব্লিভেন্স বলল, এরকমটা সে কোন বইতে পড়ে নি। সে একেবারে বোবা বনে গেল।

ভাল হয়ে উঠে সে কিছুটা দমে গেল, কিন্তু কিছুতেই চেষ্টা ছাড়ল না। সে বুঝতে পেরেছে, এতদিনে যতটুকু অভিজ্ঞতা তার হয়েছে সেটা কোন বইতে স্থান পাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু ভাল ছোট ছেলের জীবনের শেষ মেয়াদ পর্যন্ত তো সে এখনও পৌঁছে নি, কাজেই সে যদি ধৈর্য ধরে চালিয়ে যেতে পারে তাহলে একদিন না একদিন সে যে কেল্লা ফতে করতে পারবে সে আশা তার আছে। আর কিছু যদি নাও হয়, মৃত্যকালীন বক্তৃতাটা তো তার হাতের মুঠোতেই রয়েছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাল ভাল বই পড়ে সে জানতে পারল, এবার তার পক্ষে"কেবিন-বয়" হয়ে সমুদ্রে যাবার সময় হয়েছে। জাহাজের এক কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করে সে তার আবেদনপত্র পেশ করল; কাপ্তেন যখন প্রশংশাপত্র দেখতে চাইল তখন একটা পুস্তিকা বের করে সগর্বে তার লেখাগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল-"জ্যাকব ব্লিভেন্সকে, স্নেহময় শিক্ষক।" কাপ্তেন ছিল কড়া ধাতের গোলা লোক। সে খেঁকিয়ে উঠল, "গোলি মার ও সবে! এতে তো প্রমাণ হয় না তুমি থালা-বাসন ধুতে পার কি না, বা ময়লা জলের বাল্‌তি টানতে পার কি না। তোমাকে দিয়ে চলবে না।" সারা জীবনে জ্যাকব কখনও এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে নি। পুস্তিকায় একজন শিক্ষকের প্রশংসা-পত্র জাহাজের কাপ্তেনের মন গলাতে পারে না, তার বরাতে সম্মানের কাজ জোটে না, সে লাভের মুখ দেখে না-এ রকমটা কখনও হয় না-আজ পর্যন্ত যত বই সে পড়েছে কোথাও এ রকমটা ঘটতে দেখে নি। নিজের চোখ কানকেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

ছেলেটির সময় খুবই খারাপ চলছে। তার বড় বড় বইতে যা লেখা আছে সেভাবে কোন কিছুই চলবে না। অবশেষে একদিন ছোট খারাপ ছেলেদের খোঁজ করতে গিয়ে সে দেখল, পুরনো লোহার কারখানার কাছে একদল খারাপ ছেলে চোদ্দ-পনেরোটা কুকুরকে নিয়ে বেশ মজা করছে; কুকুরগুলোকে সার দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে তাদের লেজের সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসেরিন-এর খালি টিন বেঁধে দেবার উদ্যোগ করছে। জ্যাকব-এর হৃদয় বিগলিত হল। একটা টিনের উপর বসে পড়ে (কর্তব্য করতে গিয়ে গায়ে চটচটে আঠা লাগবে বলে ভয় করলে চলে না) সে একেবারে সামনের কুকুরটার কলার চেপে ধরল এবং তিরস্কারের দৃষ্টিতে দুষ্টু টম জোনস-এর দিকে তাকাল। কিন্তু ঠিক সেই সময় অল্ডারম্যান ম্যাকওয়েল্টার রেগে টং হয়ে সেখানে হাজির হল। খারাপ ছেলেগুলো সব দৌড়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু জ্যাক ব্লিভেন্স নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং স্কুল-পাঠ্য বইতে যেভাবে "ওঃ স্যার!" বলে বক্তৃতা শুরু হয়ে থাকে ঠিক সেইভাবে একটি গম্ভীর ছোটখাটো বক্তৃতা শুরু করে দিল। অল্ডারম্যান কিন্তু বক্তৃতা শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না। জ্যাক ব্লিভেন্স-এর কান ধরে চারদিকে ঘুরিয়ে তার পাছায় কসাল এক থাপ্পড়, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাল ছোট ছেলেটি গুলির মত ছাদ ফুঁড়ে সূর্যের দিকে উড়ে চলল; সেই পনরোটা কুকুর ঘুড়ির লেজের মত তার পেছনে ঝুলতে লাগল। পৃথিবীর বুকে সেই অল্ডারম্যান বা সেই পুরনো লোহার কারখানার চিহ্নমাত্রও আর চোখে পড়ল না। আর জ্যাকব ব্লিভেন্স? এই ঝামেলায় পড়ে তার

শেষ মৃত্যুকালীন বক্তৃতাটি আর দেওয়া হল না; অবশ্য সে যদি সেই বক্তৃতাটি পাখিদের শু নিয়ে থাকে সে আলাদা কথা। যদিও তার শরীরের একাটা বড় অংশ পার্শ্ববর্তী কোন জেলার একটি গাছের মাথায় পড়েছিল, তবু তার বাকি অংশটা ভাগ হয়ে পড়েছিল চারটি শহরে, এবং তার ফলে সে জীবিত আছে কি মারা গেছে এবং এ ঘটনা কি ভাবে ঘটেছে তা নিয়ে তাদের পাঁচটি তদন্ত কমিশন বসাতে হয়েছিল। এভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়া একটি ছেলেকে আপনারা কখনও দেখেন নি।*

যে ভাল ছোট ছেলেটি পাঠ্যবইয়ের মত করে বেঁচে থাকতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল এইভাবে সে মারা গেল। একমাত্র সে ছাড়া এ কাজ আর যে করেছে সেই জীবনে উন্নতি করেছে। তার ব্যাপারটা সত্যি উল্লেখযোগ্য। হয় তো কোন দিনই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

১৮৭০

**একখানি উরন্ত খবরের কাগজের পাতা থেকে এই গ্লিসেরিন-দুর্ঘটনাটি গৃহীত হয়েছে; জানা থাকলে লেখকের নামটি আমি বলে দিতাম।-মার্ক টোয়েন*

ঘুঙ্ড়ি কাশির ব্যাপারে ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ পরিবারের অভিজ্ঞতা

Experience of the Mcwilliamses With Membranous Croup

ঘটনাক্রমে কোন যাত্রাপথে নিউইয়র্ক-এর জনৈক সহৃদয় ভদ্রলোকের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়েছিল; কাহিনীটি তার মুখেই শোনা।

দেখুন, সেই ভয়ংকর দুরারোগ্য ঝিল্লির প্রদানজনিত ঘুঙ্ড়ি কাশি কি ভাবে গোটা শহরটাকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল এবং সব মায়েদের আতংকে উন্মাদপ্রায় করে তুলেছিল সে কথা বলবার আগে আমি গোড়ার কথায়ই ফিরে যাচ্ছি। ছোট্ট পেনিলোপ-এর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্‌কে বললামঃ

"প্রিয়তম, আমি হলে কিন্তু মেয়েটিকে ঐ দেবদারুর কাঠি চুষতে দিতাম না।"

"ধন আমার, এতে ক্ষতি কি হচ্ছে?" মুখে এ কথা বললেও কার্যত সে চুষিকাঠিটা নিয়ে নিতে রাজী হল-অতি বড় যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবকেও মেয়েরা কখনও বিনা তর্কে মেনে নিতে পারে না; মানে, বিবাহিতা মেয়েরা।

আমি জবাব দিলাম, "ভালবাসার ধন, একথা তো সকলেই জানে যে শিশুদের পক্ষে দেবদারুই হচ্ছে সব চাইতে পুষ্টিহীন কাঠ।"

আমার স্ত্রীর হাতটা থেমে গেল, কাঠিটা আর নেওয়া হল না। নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে বললঃ

"হবি, এর চাইতেও বেশী কিছু তুমি তো জান। আর সে কথা তোমার অজানাও নয়। সব ডাক্তাররাই বলেন যে, দেবদারু কাঠে যে তার্পিন থাকে সেটা দুর্বল শিরদাঁড়া ও মূত্রাশয়ের পক্ষে উপকারী।"

"ওহো-আমার তাহলে ভুল ধারনা ছিল। আমি জানতাম না যে আমাদের মেয়েটির মূত্রাশয় ও শিরদাঁড়ার রোগ আছে, আর বিখ্যাত ডাক্তারবাবুটি বলেছেন যে-"

"কে বলল যে মেয়ের শিরদাঁড়া ও মূত্রাশয় খারাপ হয়েছে?"

"সে কি গো, তুমিই তো বললে।"

"কী আশ্চর্য! এরকম কোন কথাই আমি বলি নি।"

"সে কি প্রিয়, দু' মিনিটও হয় নি এই তো তুমি বললে-"

"রেখে দাও আমি কি বলেছি! কি বলেছি না বলেছি তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। মেয়েটি যদি ইচ্ছা করে একটু পাইন-কাঠি চুষে থাকে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর সেটা তুমি ভাল করেই জান। এটাও চুষবেই! এই নাও তো মামণি!"

"আর কোন কথা নয় প্রিয়। তোমার যুক্তির জোর আমি বুঝতে পেরেছি। আজই গিয়ে দুই-তিন বাণ্ডিল ভাল পাইন-কাঠির ওর্ডার দিয়ে আসব। আমার মেয়ে চাইবে আর আমি-"

"দয়া করে তোমার আপিসে যাও তো, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। কেউ কিছু বললেই হল, অমনি তুমি তর্কের পর তর্ক জুড়ে দাও আর শেষ পর্যন্ত কি যে বল তা নিজেই বুঝতে পার না। হ্যাঁ, তাই তুমি কর!"

"ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই করব। কিন্তু তোমার শেষ কথাটির মধ্যে যে কোন যুক্তিই নেই-"

যা হোক, আমার কথা শেষ হবার আগেই সে মেয়েকে নিয়ে সগৌরবে নিষ্ক্রান্ত হল। আর রাতে খাবার সময় সে যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন তার মুখ কাগজের মত সাদা:

"ওঃ মার্টিমার, আবার একজন! ছোট জর্জি গর্ডনকেও ধরেছে।"

"ঘুঙ্‌ড়ি কাশি?"

"ঘুঙ্‌ড়ি কাশি।"

"আশা আছে তো?"

"কোন আশা নেই। ওঃ, আমাদের কি হবে!"

একটু পরে শুভরাত্রি জানাতো ও মায়ের পায়ের কাছে বসে যথারীতি প্রার্থনা জানাতে পেনিলোপকে নিয়ে নার্স ঘরে ঢুকল। "এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ব," বলতে বলতেই সে একটু কাশল! আমার স্ত্রী মৃত্যু-তাড়িতের মত চমকে সরে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মস্থ হয়ে যথাবিহিত কাজে মনোনিবেশ করল।

তখনই হুকুম করল, শিশুটির বিছানা যেন আমাদের শোবার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; আর সে হুকুম তামিল হল কি না দেখবার জন্য তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অবশ্য আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। অতি দ্রুত সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। আমার স্ত্রীর সাজ-ঘরে নার্সের জন্য একটা খাটিয়া পাতা হল। কিন্তু তখনই মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ বলে উঠল, আমরা যে অন্য ছেলের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে এলাম; রাতের বেলায় তার মধ্যেও যদি রোগের লক্ষণ দেখা দেয় তখন কি হবে-বেচারি আবার ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেল।

তখন আমরা সেই ছোট বিছানা ও নার্সকে আমার ছেলেমেয়েদের ঘরেই ফেরৎ পাঠালাম এবং আমাদের বিছানাটা পাতলাম পাশের একটা ঘরে।

ইতিমধ্যে মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ আবার বলল, ধর পেনিলোপ-এর রোগ যদি ছেলেকে ধরে? একথা ভাবতেই তার মনে আবার ভয় ধরে গেল এবং আমরা সকলে মিলে ছোট বিছানাটা নার্সারিতে নিয়ে যাবার পথেই সে নিজে এসে সেটাতে হাত লাগাল এবং তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

আমি নীচে নেমে গেলাম; সেখানেও নার্সের থাকবার মত কোন জায়গা ছিল না। তাছাড়া, মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ বলল, নার্সের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই মালপত্র নিয়ে আমরা আবার নিজেদের শোবার ঘরে ফিরে গেলাম, এবং ঝঞ্ঝাতাড়িত পাখিদের নীড়ে ফেরার মত পরম সুখ লাভ করলাম।

সব কিছু নিজের চোখে দেখবার জন্য মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ পুনরায় নার্সারিতে গেল। একমুহূর্ত পরেই সভয়ে ফিরে এসে বলল, "ছোট বাচ্চাটা এত ঘুমুচ্ছে কেন?"

আমি বললাম "আরে বাবা বাচ্চারা তো সব সময় পাথরের মূর্তির মতই ঘুমিয়ে থাকে।"

"জানি, জানি; কিন্তু এ ঘুমের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মনে হচ্ছে-মনে হচ্ছে সে নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস টানছে। উঃ, এ যে সাংঘাতিক"

"কিন্তু সে তো সব সময়ই নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস টানে।"

"আঃ, সেকথা আমি জানি। কিন্তু এখন যেন ব্যাপারটা খুবই ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে। তার নার্সটি ও অল্পবয়সী আর অনভিজ্ঞ। মারিয়া তার কাছে থাকুক, যাতে কোন কিছু ঘটলে সে দেখতে পারে।"

"সেটা খুব ভাল কথা, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করবে কে?"

"আমার যেটুকু সাহায্য দরকার সে তো তুমিই করতে পারবে। যাই হোক, এরকম অবস্থায় সব কিছুই আমি নিজের হাতে করতে চাই,

কারও সাহায্য চাই না।"

আমি বললাম, আমাদের ছোট রোগীটির পাশে জেগে বসে থেকে সে ক্লান্ত রাত কাটিয়ে দেবে আর আমি বিছানায় শুয়ে ঘুম দেব, সেটা যে আমার পক্ষে খুবই নীচ তার পরিচয় হবে। কিন্তু সে জোর করে আমাকে দিয়ে তাই করাল। কাজেই বুড়ি মারিয়া চলে গেল এবং নার্সারিতে তার নিজের জায়গায়ই বহাল রইল।

পেনিলোপ ঘুমের মধ্যে দু'বার কাশল।

"আঃ, ডাক্তার এখনও আসছে না কেন! মার্টিমার, এ ঘরটা বড় গরম। সত্যি বড় বেশী গরম। রেগুলেটারটা অফ করে দাও-শিগগির!"

রেগুলেটারটা ঠেলে দিলাম; সঙ্গে সঙ্গে থার্মোমিটারটা দেখে নিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, একটি অসুস্থ শিশুর পক্ষে ৭০ ডিগ্রি কি বড় বেশী গরম।

কোচয়ান খবর নিয়ে ফিরে এল, আমাদের ডাক্তারটি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ মৃত্যু-শীতল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মৃত্যু-কঠিন গলায় বলল:

"এর মধ্যে নিয়মিত ইঙ্গিত রয়েছে। এটা পূর্বনির্দিষ্ট। এর আগে তো তিনি কখনও অসুস্থ হন নি। কখনও না। আমাদের যে ভাবে থাকা উচিত সে ভাবে আমরা থাকি কি মার্টিমার। এ কথা বার বার তোমাকে আমি বলেছি। এখন তার ফল ভোগ কর। আমাদের বাচ্চা কোনদিন ভাল হয়ে উঠবে না। নিজেকে যদি ক্ষমা করতে পার তো কর, আমি কখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

তাকে আঘাত করবার ইচ্ছা আমার ছিল না; কোন রকম না ভেবেচিন্তেই বললাম, আমরা যে এ রকম সমাজবহির্ভূত জীবন যাপন করছি তা আমি জানতাম না।

"মার্টিমার! বাচ্চাদেরও তুমি এর মধ্যে জড়াতে চাও!"

সে কাঁদতে শুরু করে দিল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল:

"ডাক্তার নিশ্চয় ওষুধ পাঠিয়েছেন!"

আমি বললাম, "নিশ্চয়। তুমি কখন বলবার সুযোগ দেবে তার জন্যই তো অপেক্ষা করে আছি।"

"ওগুলো আমাকে দাও। তুমি কি জান না যে এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কিন্তু তিনি যখন জানেন যে এ রোগ দুরারোগ্য, তখন ওষুধ পাঠাবার দরকারটা কি ছিল?"

আমি বললাম, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

"আশা! মার্টিমার, যে সন্তান এখনও জন্মে নি তার মতই তুমি যা বলছ তার কিছুই তুমি জান না। তা যদি জানতে-এই তো সেবন-বিধিতে লেখা রয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় এক চা-চামচ ওষুধ খাওয়াতে হবে। ঘণ্টায় একবার!-যেন বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য আমাদের হাতে একটা গোটা বছর পড়ে আছে! মার্টিমার, দয়া করে তাড়াতাড়ি কর! বেচারি মরতে বসেছে, ওর মুখে এক বড় চামচ ওষুধ দাও। তাড়াতাড়ি কর!"

"সে কি প্রিয়ে, বড় চামচ ওষুধ দিলে-"

"আঃ, আমাকে পাগল করে দিও না!......এই যে, এই যে আমার আদরের সোনা শুয়েছে; ওষুধটা বাজে, তেতো, কিন্তু মায়ের নয়নের মণি নেলির জন্য ওষুধটা ভাল-ওটা খেলে ও সেরে উঠবে। এই যে, এই যে সোনা, মায়ের বুকে ছোট্ট মাথাটা রেখে শুয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়। ওঃ, আমি তো জানি, সকাল পর্যন্ত ও বেঁচে থাকবে না! মার্টিমার, প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বড় চামচের এক চামচ দিলে-ওঃ,

বাছার আমার বেলাডোনা দরকার; আমি জানি দরকার-আর একোনাইট ও। সব নিয়ে এস মার্টিমার। আহা, আমার মত চলতে দাও আমাকে। এ সব ব্যাপারে তুমি কিছু বোঝ না।"

এবার আমরা শুতে গেলাম। ছোট বিছানাটা রাখা হল আমার স্ত্রীর বালিশের লাগোয়া। এই সব গোলমালে আমার বড়ই ধকল গেছে, দুই মিনিটের মধ্যেই আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম। মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ আমাকে জানিয়ে দিল: "প্রিয়তম, রেগুলেটরটা কি অন করা আছে?"

"না।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। দয়া করে এখনই ওটা অন করে দাও। ঘরটা বড় ঠাণ্ডা।"

অন করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার আমার ঘুম ভাঙানো হল:

"প্রিয়তম, ছোট বিছানাটাকে তোমার খাটের দিকে টেনে নিতে তোমার আপত্তি আছে কি? এখানে ওটা রেগুলেটারের বড়ই কাছাকাছি রয়েছে।"

বিছানাটাকে টানতে গিয়ে ধাক্কা লেগে বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে গেল। আমার স্ত্রী তাকে শান্ত করতে করতেই আমি আবার ঘুমে ঢুলে পড়লাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তন্দ্রার আবছা কুয়াশার ভিতর দিয়ে এই কথাগুলি যেন অনেক দূর থেকে কানে এসে লাগল:

"মার্টিমার, ভাল হাঁসের চর্বি যদি পাওয়া যেত-একবার ঘণ্টাটা বাজাবে?"

ঘুমের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে গেলাম, একটা বিড়ালকে মাড়িয়ে দিলাম, প্রতিবাদে সেটা ফ্যাঁচ করে উঠল, আমিও তাকে একটা আচ্ছা লাথি কসাতাম, কিন্তু সেটা পড়ল গিয়ে একটা চেয়ারের উপর।

"আহা মার্টিমার, গ্যাসটা জ্বালাতে গেলে কেন? বাচ্চাটা জেগে উঠবে যে?"

"আমার কতটা আঘাত লেগেছে সেটা দেখতে চাই ক্যারোলিন।"

"ভাল কথা, চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে দেখ-ওটার বারোটা বেজে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেচারি বিড়ালটা, ধর তুমি যদি-"

"না, এই বিড়াল সম্পর্কে কোন কিছুই ধরে নিতে আমি রাজী নই। মারিয়াকে যদি এখানে থাকতে দেওয়া হত তাহলে এ সব কিছুই ঘটত না; এ সবই তো তার কাজ, আমার নয়।"

"দেখ মার্টিমার, আমি মনে করি, এ ধরনের কথা বলতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। এমন একটা ভয়ঙ্কর সময় যাচ্ছে, আমাদের বাচ্চাটার এই হাল, আর আমার কথা মত দু'একটা টুকিটাকি কাজও তুমি করতে পারবে না এটা খুবই দুঃখের কথা।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যা করতে বলবে তাই করব। কিন্তু এখন ঘণ্টা বাজিয়ে আমি কাউকে পাব না। সবাই শুতে গেছে। হাঁসের চর্বি কোথায় আছে?"

"নার্সারিতে ম্যান্টেলপিসের উপরে। পাটা বাড়িয়ে যদি মারিয়াকে বল-"

হাঁসের চর্বি এনে দিয়ে আবার ঘুমোতে গেলাম। আবার ডাক এল:

"মার্টিমার, তোমাকে বিরক্ত করতে আমি ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে এটা লাগাতে পারছি না। আগুনটা জ্বেলে দেবে কি? সবই ঠিক আছে, শুধু একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে দিলেই হল।"

শরীরটাকে টানতে টানতে এগিয়ে গিয়ে আগুন জ্বেলে দিলাম এবং বিরক্ত হয়ে সেখানেই বসে পড়লাম।

"মার্টিমার, ওখানে বসে থেকে আর মরণ ডেকে এন না। বিছানায় এস।"

পা বাড়াতেই সে বলল:

"কিন্তু এক মিনিট সবুর কর। বাচ্চাটাকে আরও ওষুধ দাও।"

দিলাম। এ ওষুধটা খেলেই বাচ্চারা কিছুটা ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আর সেই সুযোগে সে জেগে উঠলেই বাচ্চাটার জামা খুলে আমার স্ত্রী তার সারা গায়ে হাঁসের তেল লাগাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম এবং যথারীতি আবার উঠতে হল।

"মার্টিমার, বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি। এ রোগের পক্ষে ঠাণ্ডা বাতাস বড়ই খারাপ। দয়া করে ছোট বিছানাটা আগুনের কাছে সরিয়ে দাও।"

তাই দিলাম; আর সে কাজ করতে গিয়ে পাথরটায় ঠোক্কর খেয়ে সেটাকে আগুনের মধ্যে ছুড়ে দিলাম। মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সেটাকে উদ্ধার করল; কিছু কথা-কাটাকাটিও হল। আবার যৎসামান্য একটু ঘুমিয়েই উঠতে হল; এবার বানাতে হল একটা মস্‌নের পুল্‌টিস। বাচ্চাটার বুকের উপর সেটা লাগিয়ে দেওয়া হল, তাতে যদি রোগ সারে।

কাঠের আগুন স্থায়ী বস্তু নয়। প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর উঠে আমাকে নতুন করে আগুন জ্বালাতে হল, আর তার ফলে মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্-এর পক্ষে ওষুধ খাওয়াবার সময়ের ব্যাবধানটা দশ মিনিট করে কমে গেল, আর তাতেই সে মহা খুশি। আমিও মাঝে মাঝেই মস্‌নের বীজের পুল্‌টিসটা পাল্টে দিলাম, এবং বাচ্চাটার শরীরের যেখানে যেখানে ফাঁকা রয়েছে সেখানেই সরষের পুল্‌টিস বা অন্য ধরনের বেলেস্তারা লাগাতে লাগালাম। যা হোক, সকালের দিকে কাঠ ফুরিয়ে গেল এবং আমার স্ত্রী নীচ থেকে আরও কাঠ নিয়ে আসতে বলল।

আমি বললাম, "দেখ গো, ওটা বড় খাটুনির কাজ; তাছাড়া বাড়তি জামা-কাপড়ে বাচ্চাটা তো বেশ গরমই আছে। এখন বরং আর এক পরতা পুল্‌টিস লাগালে-"

আমার কথা শেষ হল না। বাধা পেলাম। কিছুক্ষণ নীচ থেকে কাঠ বয়ে আনলাম, আর তারপরই এমনভাবে নাক ডাকতে শুরু করলাম যেন আমার সব শক্তি-সামর্থ্য গলে জল হয়ে গেছে, মনও ঝিমিয়ে পড়েছে। দিনের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতেই কে যেন আমার ঘার চেপে ধরতেই হঠাৎ আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার স্ত্রী হাঁপাচ্ছে। তারপর কথা বলবার মত অবস্থা হতেই সে বলে উঠল:

"সব শেষ হয়ে গেছে! সব শেষ! বাচ্চাটা ঘামছে! আমরা কি করব?"

"উঃ, তুমি আমাকে কি ভয় পাইয়ে দিয়েছ! কি যে করব কিছুই তো বুঝতে পারছি না। হয় তো জামাগুলো ছাড়িয়ে আবার একটু ঠাণ্ডা বাতাসে নিয়ে গেলে-"

"উঃ, কী নির্বোধ! একমুহূর্ত সময় নষ্ট করো না। ডাক্তারের কাছে যাও। নিজে যাও। তাকে বল, জীবিত বা মৃত তাকে আসতেই হবে।"

বেচারি অসুস্থ লোকটিকে বিছানা থেকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম। বাচ্চাটাকে ভাল করে দেখে সে বলল, মরবার কোন লক্ষণ নেই। আমার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করবার নয়, কিন্তু আমার স্ত্রী এতই পাগলা হয়ে উঠল যেন তাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করা হয়েছে। তখন ডাক্তার জানাল যে, গলায় সামান্য প্রদাহ বা অন্য কোন তুচ্ছ কারণেই কাশিটা হয়েছে। এ কথা শুনে আমার মনে হল, আমার স্ত্রী এখনই তাকে দরজাটা দেখিয়ে দেবে। এবার ডাক্তার বলল যে বাচ্চাটা আর একটু বেশী করে কাশলেই গোলমালটা কেটে যাবে; সুতরাং সে তাকে এমন একটা ওষুধ দিল যাতে সে ক্রমাগত কাশতে লাগল। আর তার ফলেই একটা ছোট কাঠের টুকরো বা ঐ রকম একটা কিছু বেরিয়ে এল।

ডাক্তার বলল, "বাচ্চাটির ঝিল্লির প্রদাহজনিত ঘুঙ্রি কাশি মোটেই হয় নি। সে পাইনের কাঠি বা ঐ রকম একটা কিছু চুষছিল এবং তারই একটা টুকরো গলায় আটকে গিয়েছিল। এতে তার কোণ ক্ষতি করবে না।"

আমি বললাম, "তা করবে না আমি জানি। আসলে ওতে যে তার্পিন থাকে সেটা বাচ্চাদের কোন কোন অসুখের খুবই উপকারী। সে কথা আমার স্ত্রীই আপনাকে বলবে।"

আমার স্ত্রী কিন্তু কিছুই বলল না। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল। সেই থেকে আমাদের জীবনের এই একটি অধ্যায়ের কথা আমরা কখনও উল্লেখ করি না। সুতরাং গভীর অচঞ্চল প্রশান্তির ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে।

ম্যাক্উইলিয়াম্স্-এর মত এমন অভিজ্ঞতা খুব অল্প বিবাহিত লোকেরই হয়েছে; সুতরাং এই বইয়ের লেখক মনে করে যে এর অভিনবত্ব পাঠকের মনকে ক্ষণকালের জন্যও আকৃষ্ট করবে।

১৮৭৫

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু বিদগ্ধ উপকথা

Some Learned Fables for Good Old Boys and Girls

তিন পর্বে সম্পূর্ণ

প্রথম পর্ব-বনের জীবজন্তুরা কেমন করে একটা বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল পাঠাল

এক সময়ে বনের জীবজন্তুরা একটা মহা সম্মেলন ডেকে তাদের ভিতরকার সবচাইতে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিশন নিয়োগ করল। বনজঙ্গল পেরিয়ে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত জগতে পাড়ি দিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করা এবং তাদের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে যে সব বিষয় শেখানো হয়ে থাকে তার সত্যতা যাচাই করাই হবে কমিশনের কাজ। এত বিরাট একটা উদ্যোগে জাতি এর আগে কখনও আত্মনিয়োগ করে নি। এ কথা সত্য যে, জংলের দক্ষিণ কোন বরাবর জলাভূমির ভিতর দিয়ে একটা উত্তর-পশ্চিমমুখী পথের সন্ধানে এক সময় কিছু বাছা বাছা লোক সঙ্গে দিয়ে সরকার ডক্টর কোলা ব্যাঙকে পাঠিয়েছিল, এবং সেই থেকে ডক্টর কোলা ব্যাঙের সন্ধানে অনেকগুলি অভিযাত্রী দলকেও পাঠিয়েছে; কিন্তু তার কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি; সুতরাং শেষ পর্যন্ত সরকার তার মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে বিজ্ঞানের সেবায় ছেলের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার মাকে নানা গৌরবে ভূষিত করেছে। আর একবার সরকার স্যার কাঠ-ফড়িং-কে পাঠিয়েছিল যে নদীর জল এসে জলাভূমিতে পড়েছে তারই উৎস সন্ধানে; আর তারপরে স্যার কাঠ-ফড়িং-এর খোঁজে অনেকগুলি অভিযাত্রী দলও পাঠিয়েছিল; শেষ পর্যন্ত তাদের সে কাজে তারা সফলও হয়েছিল-তার মৃতদেহটি তারা খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু মরবার আগে উৎসের সন্ধান সে পেয়েছিল কি না সেটা জানিয়ে যায় নি। সুতরাং সরকার যথোচিত মর্যাদায় তার সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল, আর সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান অভিযানের তুলনায় সেগুলো ছিল অতি তুচ্ছ; কারণ এই অভিযাত্রী দলে আছে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাই; তাছাড়া আগেই তো বলেছি-এই মহান অরণ্যের ওপারে যে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত অঞ্চল আছে সেইখানে তাদের যেতে হবে। এই সদস্যদের নিয়ে কত ভোজসভা, কত স্তবস্তুতি, কত আলোচনা। তাদের মধ্যে যে কেউ যেখানেই দর্শন দিক, সেখানেই জনতার ভিড়, সেখানেই শত উৎসুক চোখের দৃষ্টি।

শেষ পর্যন্ত তারা যাত্রা করল। সে একটা দেখবার মত দৃশ্য। দীর্ঘ শোভাযাত্রা-বিদ্বজ্জন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে বোঝাই শুকনো দেশের কচ্ছপের দল, সংকেত পাঠাবার কাজের জন্য জোনাকির দল, খাবার-দাবার, সংবাদ আদান-প্রদান ও গর্ত খোঁড়ার জন্য পিঁপড়ে ও গুবরে-পোকা, জরিপের শিকল বয়ে নেওয়া ও অন্য নানাবিধ যন্ত্রবিদের কাজের জন্য মাকড়শার দল, এমনই আরও কত কিছু; কচ্ছপদের পরে জলপথের যান-বাহন হিসাবে আছে শক্ত ও চওড়া পিঠ বিরাট দেহ সব কাদা-কাছিমের লম্বা সারি; প্রতিটি কচ্ছপ ও কাছিমের সঙ্গে একটা করে চমৎকার উজ্জ্বল পতাকা; মিছিলের একেবারে মাথায় সামরিক বাদ্য বাজিয়ে চলেছে ভ্রমর, মশা, ফরিং ও ঝিঁঝি পোকার দল; আর সেই গোটা মিছিলটা চলেছে ক্রিমি-কীট বাহিনীর বারোটা বাছা বাছা সেনাদলের আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে।

তিন সপ্তাহ চলার পরে অভিযাত্রী দলটি বন থেকে বেরিয়ে বিরাট অজ্ঞাত জগতের মুখোমুখি হল। একটি আকর্ষণীয় দৃশ্য তাদের দৃষ্টিকে স্বাগত জানাল। তাদের সম্মুখে একটা বিরাট সমতল প্রান্তর প্রসারিত; তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী; আর তাকেও ছাড়িয়ে আকাশের প্রেক্ষাপটে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘ সুউচ্চ প্রাচীর-সেটা যে কি তা তারা জানে না। গুবরে-পোকা বলল, তার বিশ্বাস মাটিটাই ঠেলে উঁচুতে উঠে গেছে, কারণ সেখানেও সে গাছপালা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু অধ্যাপক শম্বুক ও অন্যরা বলল:

"স্যার, আপনাকে ভাড়া করে আনা হয়েছে খোঁড়াখুঁড়ি করবার জন্য- বাস, ঐ পর্যন্তই। আমাদের প্রয়োজন আপনার মাংসপেশীর-মস্তিষ্কের নয়। বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাপারে আপনার মতামতের দরকার হলে আমরাই আপনাকে জানাব। অন্য শ্রমিকেরা যখন শিবির স্থাপনে কর্মরত তখন আপনার এই শান্ত ভাব অসহ্য-অকারণেই আপনি এখানে লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে এসেছেন। চলে যান, মালপত্র টানতে সাহায্য করুন গে।"

গুবরে-পোকা কোন রকম বিচলিত বা বিমর্ষ না হয়ে পা চালিয়ে দিল; মনে মনে বলল, "এটা যদি মাটির স্তূপ না হয় তাহলে আমার

যেন পাপীর মৃত্যু হয়।"

অধ্যাপক কোলা ব্যাঙ (স্বর্গত আবিষ্কারকের ভাই-পো) বলল, তার বিশ্বাস এই পাহাড় পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। সে বলতে লাগল:

"আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক জ্ঞান-ভাণ্ডার রেখে গেছেন, কিন্তু তারা তো দূর দেশে যান নি, তাই এটাকে আমরা একটি মহৎ নতুন আবিষ্কার বলে গণ্য করতে পারি। আমাদের প্রচেষ্টা যদি এই একটিমাত্র অপদানেই শুরু ও শেষ হয় তাহলেও আমাদের খ্যাতি সুনিশ্চিত। আমি শুধু ভাবছি, এই প্রাচীর কি দিয়ে তৈরি? ছত্রাক কি? প্রাচীর নির্মাণের পক্ষে ছত্রাক অবশ্যই একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।"

অধ্যাপক শম্বুক ফিল্ড-গ্লাসটাকে ঠিক মত চোখে লাগিয়ে দেয়ালটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে বলল: "এটা যে তরল পদার্থ নয় তা থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাপতাড়িত উর্দ্ধমুখী জলকণা উত্তপ্ত হওয়ার ফলে যে ঘণীভূত বাষ্প সৃষ্টি হয় তার দ্বারাই এই প্রাচীর গঠিত হয়েছে। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই এটা প্রমাণ করা যায়, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। এটা একান্তই স্পষ্ট।"

সুতরাং ফিল্ড-গ্লাসটা বন্ধ করে সে তার খোলসের মধ্যে ঢুকে পৃথিবীর শেষ সীমান্ত ও তার স্বরূপ আবিষ্কার বিষয়ক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে বসল।

অধ্যাপক কোণ্-কীট অধ্যাপক মেঠো ইঁদুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী গভীর মনীষা! এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে কোন কিছুই রহস্যাবৃত থাকতে পারে না!"

ক্রমে রাত নেমে এল। শাস্ত্রী ঝিঁঝিঁ পোকারা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জায়গা নিল। জোনাকিদের আলো জ্বালানো হল। সারা শিবির নৈঃশব্দ ও নিদ্রায় ডুবে গেল। সকালে প্রাতরাশের পরে অভিযাত্রী দল আবার এগিয়ে চলল। দুপুর নাগাদ তারা একটা বড় রাস্তায় পড়ল। সেখানে দুটো সীমাহীন সমান্তরাল দণ্ড ছিল। তাদের উচ্চতা সব চাইতে উঁচু কোলা ব্যাঙের সমান। বিজ্ঞানীরা সে দুটোর উপর চড়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখল। সে দুটোর উপর চড়ে তারা অনেক দূর পর্যন্ত গেল, কিন্তু না পেল কোথাও ছেদ, না পেল তাদের অন্ত। তারা কিছুই বুঝতে পারল না। বিজ্ঞানের কোন তথ্য-পুস্তকে এ ধরনের জিনিসের উল্লেখ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যুগের প্রধান ভূগোলবিদ টাক-মাথা মাননীয় মেঠো কাছিম বলল:

"বন্ধুগণ, এখানেও আমরা একটা নতুন আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমাদের বিজ্ঞতম পূর্বপুরুষগণ যাকে মনে করত নিছক কল্পনা তারাই ইন্দ্রয়গ্রাহ্য অক্ষয় বাস্তবরূপ আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করেছি। বন্ধুগণ, মস্তক অবনত করুন, কারণ এক মহান সত্ত্বার সামনে আমরা দাঁড়িয়েছি। এগুলো সমান্তরাল লঘিমা!"

এই নব-আবিষ্কারের গুরুত্ব এতদূর মহত্বপূর্ণ, এতদূর ভয়ংকর যে প্রতিটি অন্তর, প্রতিটি শির অবনত হল। অনেকের চোখে নামল জলধারা।

তাঁবু ফেলা হল। সারাটা দিন কেটে গেল এই মহাবিস্ময়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখতে ও সৌরজাগতিক পরিসংখ্যানকে তদনুযায়ী সংশোধন করতে। মধ্যরাত্রিতে শোনা গেল একটা দানবীয় আর্তনাদ, একটা খটাখট, খস্‌খস্ আওয়াজ; পরমুহূর্তেই একটা প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর চোখ জ্বলে উঠল, একটা দীর্ঘ লেজ তার সঙ্গে যুক্ত; জয়সূচক চীৎকার করতে করতে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিবিরের শ্রমিকরাও ভয়ে কাঁপতে লাগল। এক সঙ্গে পড়ি-মরি করে ছুটে বের হল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সে রকম কিছুই করল না। তারা সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। তারা শান্তভাবে আলোচনা শুরু করে দিল। প্রবীণ ভূগোলবিদের মতামত জানতে চাওয়া হল। সে খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। আবার যখন বেরিয়ে এল তখন তার ভক্তিনম্র মুখ দেখেই সকলে বুঝতে পারল যে সে আলোর সন্ধান পেয়েছে। সে বলল: "এই বিরাট বস্তুটিকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি বলে সকলেই ধন্যবাদ জানাও। এটাই মহাবিষুব সংক্রান্তি!"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সকলে হৈ-হৈ করে উঠল।

কোণ্-কীট অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে দেহটাকে প্রসারিত করে বলল, "কিন্তু এখন তো ভরা গ্রীষ্মকাল।"

কাছিম বলল, "ঠিক কথা; আমরা তো নিজেদের দেশ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি; দুটি স্থানের দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঋতুরও পরিবর্তন ঘটে।"

"ঠিক, খুব ঠিক। কিন্তু এখন তো রাত। রাত্রিতে সূর্য আসবে কেমন করে?"

নিঃসন্দেহে এই দূরবর্তী অঞ্চলে সূর্য রাতের বেলাতেই দেখা দিয়ে থাকে।"

"হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এটা খাঁটি কথা। কিন্তু এখন তো রাত, তাহলে আমরা সূর্যকে দেখতে পেলাম কেমন করে?"

"সেটাই এক পরম রহস্য। সেটা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে এই সব দূরবর্তী অঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা এমনই যে দিনের আলোর কণাগুলি সৌর-চক্রের সঙ্গে লেগে থাকে, আর সেগুলোর সাহায্যেই আমরা অন্ধকারেও সূর্যকে দেখতে পাই।"

এটাকে সন্তোষজনক বিবেচনা করে তদনুসারে সব কথা লিপিবদ্ধ করা হল।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ আবার শোনা গেল। রাত্রির বুক ভেদ করে আবার এল সেই বজ্র-গর্জন। আবারও সেই প্রকাণ্ড অগ্নিময় চোখ ঝল্সে উঠেই অনেক দূরে হারিয়ে গেল।

শিবিরের মজুররা আতংকে জীবনের আশাই ছেড়ে দিল। পণ্ডিতজনরাও খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। এ রহস্যের তো কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ভাবল আর আলোচনা করল; আলোচনা করল আর ভাবল। শেষ পর্যন্ত মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ শ্রীমন্মহাপ্রভু দীর্ঘপদ ঠাকুর্দা ধ্যান ভঙ্গ করে হাত-পা ভেঙে বসে বলে উঠল: "ভাই সব, আগে তোমাদের মতামত বল, তারপর শোনাব আমার মনের কথা-কারণ আমি মনে করি যে এ সমস্যার সমাধান করতে আমি পেরেছি।"

শুট্কো-দেহ অধ্যাপক গেছো-উকুন বলল, "তাই হবে মহাপ্রভু, কারণ প্রভুর শ্রীমুখ থেকে আমরা অবশ্যই জ্ঞানগর্ভ বাণীই শুনতে পাব। হয়তো জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারে নাক গলানো আমা উচিত নয়, তবু একান্ত সবিনয়ে আমি নিবেদন করতে চাই যে, যেহেতু এই শেষ আশ্চর্য ভৌতিক মূর্তিটি প্রথম মূর্তিটির ঠিক বিপরীৎ দিকে চলে গেল এবং যেহেতু প্রথমটিকে আপনারা মহাবিষুব সংক্রান্তি বলে মেনে নিয়েছেন, তখন কি এটাই সম্ভব নয়, অথবা নিশ্চিত নয় যে এই শেষেরটি হচ্ছে শরৎকালীন বিষুব-"

"ও-ও-ও! ও-ও-ও! শুয়ে পড় গে হে! শুয়ে পড় গে!" চারদিক থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বান ডেকে গেল। বেচারি মেঠো-উকুন লজ্জায় মুখ কালো করে সরে পড়ল।

অনেক আলোচনার পর কমিশন একবাক্যে প্রভু দীর্ঘপদ-কে তার বাণী শোনাতে বলল। প্রভু বলতে লাগল:

"সহকর্মী বিজ্ঞানীবৃন্দ, আমার বিশ্বাস আজ আমরা যা দেখেছি সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র আর একটিবার সে জিনিস পূর্ণভাবে ঘটেছে। যে যাই মনে করুক, এই ঘটনা অকল্পনীয় গুরুত্ব ও আগ্রহের অধিকারী; তাছাড়া এটা আমাদের কাছে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এর স্বরূপ সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি আজ পর্যন্ত আর কোন পণ্ডিত লোক তা জানতে পারে নি, বা কল্পনাও করতে পারে নি। পণ্ডিতবন্ধুগণ, এইমাত্র আমরা যে মহারহস্য প্রত্যক্ষ করলাম সেটি শুক্রগ্রহের পরিক্রমা ছাড়া আর কিছুই নয়!"

বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে প্রতিটি পণ্ডিত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর শুরু হল অশ্রুপাত, কর-মর্দন, উন্মত্ত আলিঙ্গন ও বল্গাহীন নানাবিধ উচ্ছ্বাস। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উচ্ছ্বাস কমে গিয়ে যখন সুবিবেচনা ফিরে এল, তখন বহুগুণে গুণান্বিত প্রধান পরিদর্শক গিরগিটি মন্তব্য করল:

"কিন্তু তা কি করে হয়? শুক্র তো সূর্যকে পরিক্রমা করে, পৃথিবীকে নয়।"

তীর লক্ষ্যভেদ করল। উপস্থিত সকল পণ্ডিতের বুকই দুঃখে উদ্বেল হয়ে উঠল, কারণ এ সমালোচনা যে অখণ্ডনীয় তা কেউ অস্বীকার করতে পারল না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কানের পিছনে দুই বাহু নিয়ে শান্ত গলায় বলল:

"আমার বন্ধুটি এই মহা-আবিষ্কারের একেবারে মজ্জাকে স্পর্শ করেছেন। হ্যাঁ-আমাদের আগে পর্যন্ত সকলেই মনে করে এসেছে যে সূর্যের উপর দিয়েই শুক্রের পরিক্রমণ হয়ে থাকে; এটাই তারা ভেবেছে, সমর্থন করেছে, বিশ্বাস করেছে; সরলপ্রাণ মানুষ তারা, তাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা যতদূর জেনেছিল ঠিকই জেনেছিল; কিন্তু শুক্রের পরিক্রমণ যে পৃথিবীর উপর দিয়েই হয়ে থাকে সেটা প্রমাণ করবার অমূল্য সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি আমরা, কারণ আমরাই তা প্রত্যক্ষ করেছি!

এই রাজকীয় মণীষার প্রশংসায় সমবেত গুণীজন নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। বিদ্যুতের আলোয় যেমন রাতের আধার দূরে যায়, তেমনই তাদের মন থেকে সব সন্দেহ মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

এমন সময় শ্রীছারপোকা মশায় সকলের অলক্ষ্যে সেখানে হাজির হল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে পরিদর্শক গিরগিটির কাঁধে ডান বাহুটা রাখতেই-কাঁধটা সক্রোধে সরে গেল আর শ্রীছারপোকা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। এইভাবে এর-ওর-তার ঘাড়ে ভর দিয়ে বার কয়েক ধরাশায়ী হবার পরে অধ্যাপক কোলা ব্যাঙ গর্জে বলে উঠল:

"ও সব কায়দা থাক শ্রীছারপোকা। ওখানে থেকেই তোমার যা বলার আছে বলে চটপট সরে পড়। তাড়াতাড়ি-বল কি খবর এনেছ? আর একটু এগিয়ে এস; উঃ! তোমার গায়ে যে আস্তাবলের গন্ধ বলে ফেল-বলে ফেল।"

"দেখুন পূজ্যপাদ (ইক্!) হঠাৎ একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে। ভাল কথা, প্রথম একটা (ইক!) কি যেন এখানে ঘটল?"

"মহাবিষুব সংক্রান্তি।"

"ঠিক। আমি ভদ্রলোককে দেখি নি (ইক্!) তারপর আর একটা (ইক!) কি ঘটল?"

"শুক্রের পরিক্রমণ।"

"ঠিক। সেই সময় একটা (ইক!) জিনিস এখানে পড়েছে।"

"বটে! কী ভাগ্য! সুসংবাদ! শিগগির দেখাও-সেটা কি?"

"দেখবেন তো বাইরে চলুন।"

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর কোন রকম ভোটাভুটি হল না। তারপর এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ হল:

"কমিশন একযোগে জিনিসটা দেখতে পেল। একটা কঠিন, মসৃণ, প্রকাণ্ড বস্তু। উপরকার গোলাকার দিকে আড়াআড়িভাবে কাটা বাঁধাকপির ডাঁটার মত একটা ছোট অংশ। বাড়তি অংশটা নিরেট নয়-একটা লম্বা গোলাকার চোঙ কাঠের মত এমন একটা নরম জিনিস দিয়ে ঠাসা যা আমাদের অঞ্চলের লোকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত-অর্থাৎ চোঙটা ঐ ভাবে ঠাসা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা উপস্থিত হবার আগেই আমাদের অগ্রবর্তী খোঁড়াখুঁড়ি-বাহিনীর প্রধান নরওয়ে-ইঁদুর মশায় অনবধানতাবশত সেই কাঠের মত নরম জিনিসটাকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। উজ্জ্বল মহাশূন্য থেকে আমাদের সামনে রহস্যজনকভাবে ভূপাতিত সেই প্রকাণ্ড ফাঁপা বস্তুটি অনেক দিন ধরে জমে থাকা বৃষ্টির জলের মত বাদামী রঙের দুর্গন্ধযুক্ত কোন জলীয় পদার্থে ভর্তি। আমাদের চোখের সামনে তখন সে কী দৃশ্য! নরওয়ে-ইঁদুর মশায় সেটার মাথায় চড়ে তার লেজটা চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দিচ্ছেন আর তার ভিতর থেকে সেই জলীয় পদার্থ ফোঁটায় ফোঁটায় উপচে গড়িয়ে সমবেত যত কুলি-মজুর ও লোকজন সেটা চুষে চুষে খেতে লাগল। স্পষ্টতই এই জলীয় পদার্থের কিছু বিস্ময়কর শক্তি ছিল, কারণ যারাই সেটা খেল তারাই সঙ্গে সঙ্গে মহাউল্লাসে আনন্দে মেতে উঠল; গুরুজন ও কর্তৃপক্ষের কোন রকম তোয়াক্কা না করে টলতে টলতে মুখে ইতর শ্রেণীর গান গাইতে গাইতে নাচতে লাগল, পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগল, লড়াই করতে লাগল। আমাদের চারপাশে সকলেই সেই হুল্লোড়ে মেতে উঠল-জনতা সব রকমেই হাতের বাইরে চলে গেল, কারণ সিপাই-শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে গোটা সেনাবাহিনীই সেই পানীয়ের গুণে বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ল। এই বেপরোয়া জীবরা ক্রমে আমাদের উপরেও চড়াও হল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অন্য সকলের থেকে আমাদের আলাদা করে চিনে নেবার আর কোন উপায়ই রইল না-অধঃপতন এতই পরিপূর্ণ ও সার্বিক হয়ে দেখা দিল। দেখতে দেখতে এই পান-মহোৎসবের ফলে গোটা শিবিরটাই

একটা সকরুণ দৃশ্যে পরিণত হল-সেখানে দূরে গেল উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, কে কাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল তার কোন ঠিক-ঠিকানা রইল না। সেই মহাসন্ধিক্ষণে যে অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলাম তাতে আমাদের চোখ ঝাপ্সা হয়ে এল, মন হল দূষিত। দেখলাম, অসহ্য দুর্গন্ধময় ঝাড়ুদার শ্রীছারপোকা আর বিখ্যাত শ্রীমন্মহাপ্রভু দীর্ঘপদ ঠাকুর্দা একে-অন্যকে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে গভীর নিদ্রায় ডুবে আছেন। এ হেন দৃশ্য কোন কালে কেউ দেখে নি এবং আমরা যারা এই ঘৃণ্য অপবিত্র দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি তারা ছাড়া আর কেউ ভবিষ্যতেও এ হেন দৃশ্যকে বিশ্বাস করবার কথা কল্পনাও করতে পারবে না। এইভাবে ঈশ্বরের লীলা বড়ই দুর্জ্ঞেয়-তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

"আজ সকালের নির্দেশে প্রধান যন্ত্রবিদ হের মাকড়শা উপযুক্ত কৌশলের সাহায্যে সেই মস্তবড় পাত্রটিকে উল্টে দিলেন এবং তার ভিতরকার সেই বিপজ্জনক পদার্থ সবেগে শুষ্ক মাটির উপর বয়ে যেতেই মাটি তাকে শুষে নিল; ফলে আর কোন বিপদই রইল না; শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এবং রাজাকে দেখিয়ে জাতীয় সংগ্রহশালার আশ্চর্য বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সংগ্রহ করে রাখার উদ্দেশ্যে সামান্য কয়েকটি ফোঁটা আমরা নিজেদের কাছে রেখে দিলাম। এই তরল পদার্থটি যে কি তা নির্ণীত হয়েছে। এটা যে বিদ্যুৎ নামক হিংস্র ও ধ্বংসকারী তরল সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। উড়ন্ত গ্রহের দুর্বার শক্তি তাকে তার মেঘের আবাস থেকে পাত্রসমেত ছিনিয়ে এনে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। এইভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি আবিষ্কার করা হল : এই বিদ্যুৎ স্বয়ং অত্যন্ত শান্ত, স্থির; কিন্তু বজ্রের আক্রমণাত্মক সংযোগের স্থিতাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সেই বিদ্যুৎ ভয়ংকর অগ্নিদাহে জ্বলে ওঠে, ফলে দেখা দেয় অগ্নুৎপাত ও বিস্ফোরণ, আর পৃথিবীর দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে সমূহ বিপদ ও জনহীনতা।"

আরও একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে সেই ধকল কাটিয়ে অভিযাত্রীদল আবার পথে নামল। কয়েকদিন পরে একটি সুন্দর প্রান্তরে তারা তাঁবু ফেলল; পণ্ডিতজনরা আবিষ্কারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। পুরস্কার মিলল হাতে-নাতে। অধ্যাপক কোলা ব্যাঙ একটি আশ্চর্য গাছ দেখতে পেয়ে সহকর্মীদের ডাকল। গভীর আগ্রহে তারা গাছটাকে পরীক্ষা করল। গাছটা সোজা খাড়া হয়ে উঠে গেছে; গায়ে বাকল নেই, ডালপালা নেই, পাতা নেই। মহাপ্রভু দীর্ঘপদ ত্রিকোণমিতির সাহায্যে গাছটার লঘিমা স্থির করল; হের মাকড়শা গাছটার নীচের ব্যাস মেপে নিয়ে নানাবিধ গণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে একেবারে শীর্ষের ব্যাস-এর পরিমাপও করে ফেলল। এটাকে একটা অসাধারণ আবিষ্কার বলে গণ্য করা হল; আর যেহেতু এ ধরনের গাছ এতদিন ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাই অধ্যাপক গেছো-উকুন এটার নামকরণ করল অধ্যাপক কোলা ব্যাঙের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে নিজেদের নামকে যুক্ত করে নামকে চিরস্মরণীয় ও সম্মানার্হ করে রাখার এই রীতি আবিষ্কারকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

এদিকে অধ্যাপক মেঠো ইঁদুর গাছটার গায়ে কান লাগিয়ে একটা উদাও সুরেলা শব্দ শুনতে পেল। একে একে প্রত্যেকটি পণ্ডিতই এই বিস্ময়কর জিনিসটি পরীক্ষা করে দেখে প্রচুর আনন্দ লাভ করল। তখন অধ্যাপক গেছো উকুনকে অনুরোধ করা হল, গাছটির এই সুর-সাধনার গুণটিও যাতে প্রকাশ পায় সেই ভাবে নামটিকে আরও একটু বড় করে রাখা হোক-আর সে অনুরোধ মেনে নিয়ে সে নামের সঙ্গে যোগ করল "প্রার্থনাগীতিকার"।

ইত্যবসরে অধ্যাপক শাম্বুক দূরবীণের সাহায্যে কিছু পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পেল, দক্ষিণে ও উত্তরে যতদূর তার দূরবীণের দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত বেশ কিছু দূরে দূরে এই ধরনের অনেক গাছ সারিবদ্ধভাবে চলে গেছে। ইতিমধ্যে সে আরও আবিষ্কার করেছে যে একেবারে মাথার দিকে পর পর সাজানো চোদ্দটি বড় দড়ি দিয়ে এই গাছগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, আর যতদূর দেখা যায় দড়িগুলো একটানা চলে গেছে। প্রধান যন্ত্রবিদ মাকড়শা অবাক হয়ে সেই দড়ির সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে দ্রুত ছুটে গেল এবং শীঘ্রই ফিরে এসে জানাল যে, এই দড়িগুলো তারই বংশের কোন দৈত্যাকার জীবের দ্বারা বোনা জাল মাত্র, কারণ সে দেখতে পেয়েছে এই জালের মাঝে মাঝেই কিছু মৃত শিকার ঝুলে রয়েছে। ঠিক যেমনটি থাকে মাকড়শার জালের মধ্যে। তখন আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে একটি দড়ি বেয়ে এগিয়ে যেতে যেতেই তার পায়ের পাতায় হঠাৎ একটা তীব্র ছ্যাঁকা লাগল, মনে হল যেন তার শরীরটাই অবশ হয়ে যাবে; তাই সে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে নিজের বোনা একটা সুতো বেয়ে মাটিতে নেমে এল, এবং সকলকে সতর্ক করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ শিবিরে ফিরে যেতে লাগল; বলা তো যায় না, সেই দৈত্যটা যে কোন সময় এসে তার মতই অন্য সব পণ্ডিতদের উপরেও হাম্লা করতে পারে। সুতরাং তারা সবেগে পা চালিয়ে দিল এবং যেতে যেতেই সেই বিরাট মাকড়শার জালটা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল। সেদিন রাতেই দলের জীববিজ্ঞানী পণ্ডিতটি সেই দৈত্যাকার মাকড়শার একটা সুন্দর মডেল তৈরি করে ফেলল। মূর্তিটির আছে লেজ, দাঁত, চোদ্দটা পা ও একটি শুঁড়; নির্বিচারে সে ঘাস, গরু-মোষ, পাথরের নুড়ি ও ধুলো-বালি খায়। এই জন্তুটি জীব-বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। সকলেই আশা প্রকাশ করল যে একটা মরা জীব হয় তো পাওয়া

যেতেও পারে। অধ্যাপক গেছো-উকুন বলল, সে ও তার সহকর্মী পণ্ডিতরা চুপচাপ লুকিয়ে থাকলে হয় তো একটা জীবন্ত প্রাণীকেও ধরে ফেলতে পারে। এ প্রস্তাব সকলেই সমস্বরে সমর্থন করল। যেহেতু ঈশ্বরের পরে এই জীব-বিজ্ঞানীই দৈত্যাকার মাকড়শাটার সৃষ্টিকর্তা সেই হেতু তার নামেই জীবটির নামকরণ করে সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হল।

অদম্য কৌতূহল ও চিরদিনের অভ্যাস বশে শ্রীছারপোকাটি এই সময় মুখ বাড়িয়ে তো-তো করে বলে উঠল, "এরা বোধ হয় অনেক দূর এগিয়েছেন।"

দ্বিতীয় পর্ব-বনের জীবজন্তুরা কেমন করে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ করল

এক সপ্তাহ পরে অভিযাত্রীদল যেখানে শিবির ফেলল সেখানে অনেক বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল। নদীর তীর বরাবর বিরাট সব পাথরের গুহা কোথাও এককভাবে, কোথাও বা সারিবদ্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চওড়া রাস্তার একপাশে সারিবদ্ধ গাছ লাগানো হয়েছে। আর সেই পথের দু' ধারেই গুহার লম্বা সারি। প্রতিটি গুহার মাথাই দু'দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পাতলা, চকচকে, স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে ঢাকা বড় বড় চৌকো গর্তের সারি প্রত্যেকটি গুহার সামনের দিকে শোভা পাচ্ছে। ভিতরে গুহার ভিতরে গুহা; যে কেউ ইচ্ছা করলে ঘোরানো পথ ধরে উঠে এই সব ছোট ছোট ঘরগুলো দেখতে পারে। প্রতিটি ঘরে অনেক বড় বড় বিকৃতদেহ বস্তু পড়ে আছে; একসময় এ সবই ছিল জীবন্ত প্রাণী, কিন্তু এখন তাদের পাতলা বাদামী চামড়া কুঁচকে ঢিলে হয়ে গেছে; হাত দিলেই খট্‌খট্ শব্দ হয়। চারদিকে অনেক মাকড়শা; চতুর্দিকে প্রসারিত তাদের জাল সেই সব মৃতদেহকে জড়িয়ে যেন একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। এই সব মাকড়শার কাছ থেকে তথ্যাদি পাবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু কোন ফল হল না। অভিযাত্রী দলের মাকড়শা আর এই মাকড়শাদের জাত আলাদা; তাদের ভাষা এদের কাছে অর্থহীন সুরেলা কথার কচকচি বলেই মনে হল; তারা সব শান্ত, শিষ্ট, অজ্ঞ, এবং অজ্ঞাত বহু ঈশ্বরের মূর্তিপূজকের দল। তাদের সত্য ধর্ম শেখাবার জন্য অভিযাত্রী দলের পক্ষ থেকে একটি ধর্ম-প্রচারক দলকে পাঠানো হল। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অন্ধকারের জীবদের মধ্যে তারা মূল্যবান কাজ করে ফেলল, আর সেই জন্য কাজটা চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্য প্রচারকদের একটা স্থায়ী উপনিবেশ সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হল।

কিন্তু সে সব কথা থাক। গুহার বাইরের অংশগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে এবং অনেক ভাবনা-চিন্তা ও মত বিনিময় করে বিজ্ঞানীরা এই অদ্ভুত গঠনরীতি সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হল। তারা বলল, এগুলি সবই প্রধানত প্রাচীন লাল বেলেপাথরের যুগের জিনিস। কিন্তু বর্তমান আবিষ্কারের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে স্বীকৃত ভূবিজ্ঞানের সব মতামতই প্রবলভাবে খণ্ডিত হয়েছে। এই সব গুহা নানা স্তরে ক্রমাগত আকাশের দিকে মাথা তুলেছে; প্রাচীন লাল বেলেপাথরের প্রতিও দুটি স্তরের মধ্যে রয়েছে একটি করে বিকৃত চুনাপাথরের পাতলা স্তর; কাজেই প্রাচীন লাল বেলেপাথরের যুগ শুধু একটি নয়, সে রকম যুগ ছিল ন্যূনপক্ষে একশ' পঁচাত্তরটি বন্যা বয়ে গেছে এবং সমসংখ্যক চুনাপাথরের স্তর তার উপরে জমেছে। এই উভয়বিধ ঘটনা থেকে অনিবার্য অনুমান হিসাবে এই প্রবল সত্যকেই মেনে নিতে হয় যে এই পৃথিবী মাত্র দুই শত সহস্র বছরের পুরনো নয়, এর বয়স আরও লক্ষ লক্ষ বছর বেশী!

গ্রীষ্ম চলে গেল। শীত এল। অনেক গুহার ভিতরে ও বাইরে এমন কিছু দেখা গেল যাকে শিলালিপি বলে মনে হ'ল। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সে কথা বলল, আবার কিছু বিজ্ঞানী সেটা অস্বীকার করল। প্রধান ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক গেছো-উকুন বলল, যে লিপিতে এগুলো লেখা হয়েছে তা পণ্ডিতদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আর সে ভাষাও তাদের কাছে সমান অজ্ঞাত। শিল্পী ও নকশাকারকদের সে আগেই সবগুলি শিলালিপির হুবহু প্রতিলিপি তৈরির হুকুম দিয়েছে এবং এই অজ্ঞাত ভাষাটির মূল সূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে সে নিজে। শিলালিপির অনেকগুলি প্রতিলিপিকে পাশাপাশি রেখে সামগ্রিকভাবে ও বিস্তারিতভাবে সেগুলিকে পরীক্ষা করেছে। প্রথমেই বলা যায়, নিম্নোক্ত প্রতিলিপিগুলিকে সে একসঙ্গে রেখেছে:

দি আমেরিকান হোটেলসব — সময় খাবার
দি শেড্‌স্ — ধূমপান নিষেধ
নৌকো ভাড়া সস্তা — সম্মিলিত প্রার্থনা সভা,বিকেল ৪টা
বিলিয়ার্ডস্ — ওয়াটারসাইড পত্রিকা
১নং নাপিতের দোকান — টেলিগ্রাফ আফিস
ঘাস থেকে দূরে থাকুন — ব্র্যান্ ড্রেথ্‌'স পিল খেয়ে দেখুন

সেচের মরশুমে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়

সস্তায় বিক্রি — সস্তায় বিক্রি
সস্তায় বিক্রি — সস্তায় বিক্রি

প্রথমে অধ্যাপকের মনে হল যে এটা একটা প্রতীকী ভাষা, প্রতিটি শব্দের জন্য একটি বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে; আরও বিশদ পরীক্ষার ফলে সে নিশ্চিত হয়েছে যে এটা একটা লিখিত ভাষা এবং তার বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; আর শেষ পর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এই ভাষাটি কতকাংশ অক্ষরের সাহায্যে ও কতকাংশ প্রতীকের সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে। নিম্নলিখিত কতকগুলি দৃষ্টান্ত আবিষ্কারের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সে বাধ্য হল:

সে দেখতে পেল, কতকগুলি শিলালিপি অন্যগুলোর তুলনায় বারবার চোখে পড়েছে। যেমন "সস্তায় বিক্রি" "বিলিয়ার্ডস্" "এস. টি.-১৮৬০-এক্স", "কেনো," "এল অন্ ড্রুগ"। স্বভাবতই এগুলি নির্ঘাৎ ধর্মীয় অনুশাসন কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ ধারণা পরিত্যক্ত হল। এক সময়ে অধ্যাপক বেশ কিছু শিলালিপির মোটামুটি সহজবোধ্য অনুবাদ করতে সক্ষম হল। সকলে তা নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও তার কাজে ক্রমাগতই উন্নতি ঘটতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত এই রকম শিলালিপিসহ একটি গুহা আবিষ্কৃত হল :

ওয়াটারসাইড মিউজিয়ম
সব সময় খোলা থাকে-প্রবেশ মূল্য ৫০ সেন্ট
মোমের মূর্তি, প্রাচীন জীবাশ্ম প্রভৃতির
আশ্চর্য সংগ্রহ

অধ্যাপক গেছো-উকুন জানাল, "মিউজিয়ম" শব্দটা "লুম্‌গাথ্ মেলো" বা "কবরস্থান"-এর সম-অর্থবাচক। সেখানে ঢুকে বিজ্ঞানীরা সকলেই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তারা কি দেখতে পেল সেটা বরং তাদের সরকারী প্রতিবেদনের ভাষায়ই বলা যাক:

"এক সারিতে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি অনড় বড় মূর্তি; দেখামাত্রই মনে হল, আমাদের প্রাচীন নথি-পত্রে দীর্ঘকাল অবলুপ্ত যে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে 'মানুষ' বলে বর্ণনা করা হত এগুলি তাদেরই স্বগোত্র। এই আবিষ্কারটি বিশেষভাবে সন্তোষজনক এই জন্য যে ইদানিংকালে এই সব জীবদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারের সৃষ্টি এবং আমাদের দূরতম পূর্বপুরুষদের কল্পনার জীব বলে মনে করবার একটা হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু এই তো এখানে সত্যি সত্যি রয়েছে সেই 'মানুষ'-শিলীভূত রূপে। আর শিলালিপি থেকেই জানা যায় যে এটাই তাদের 'কবরস্থান'। কাজেই এখন সন্দেহ করা যেতে পারে যে আমরা যে সমস্ত গুহা পরিদর্শন করেছি সেগুলিই ছিল প্রাচীন যুগের ভ্রাম্যমান মানুষদের আশ্রয়স্থল-কারণ এই সব দীর্ঘদেহ জীবাশ্মের প্রত্যেকটির বুকের উপর রয়েছে একটি করে শিলালিপি। একটিতে লেখা 'জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিড', আরেকটিতে লেখা 'কুইন ভিক্টোরিয়া', কোনটায় 'আবে লিংকন', কোনটায় 'জর্জ ওয়াশিংটন' ইত্যাদি।

"আমাদের সামনে যে সব জীবাশ্ম রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানীদের নথিপত্রের বিবরণ মেলে কিনা দেখবার জন্য গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কিছু আনানো হল। অধ্যাপক গেছো-উকুন উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুরু করল:

"আমাদের পূর্বপুরুষদের কালেও 'মানুষ' পৃথিবীতে চলে-ফিরে বেড়াত, এ কথা আমরা ঐতিহ্যগতভাবে জেনেছি। 'মানুষ' নামক এই জীব ছিল আকারে অনেক বড়, ঢিলে চামড়ায় শরীর ঢাকা, সে চামড়ার রং কখনও একই রকম, আবার কখনও নানা রকমের, সে

ইচ্ছামত সেটা বেছে নিতে পারত; তার পিছনের পায়ে ছোট ছোট থাবা ছিল, আর সামনের পায়ের আঙুলগুলি ছিল অদ্ভুত সরু ও লম্বা, এমনকি ব্যাঙের আঙুলের চাইতেও সরু ও লম্বা, আর মাটি খুঁড়ে খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্য তাতে ছিল চওড়া নখ লাগানো। অনেকটা ইঁদুরের মত হলেও তার চাইতে লম্বা লম্বা এক ধরনের পালক ছিল তার মাথায় আর গন্ধশুঁকে খাবার খুঁজে নেবার জন্য ছিল পাখির মত ঠোঁট। সুখ উথলে উঠলে তার চোখ দিয়ে জল ঝরত, আর কষ্ট পেলে বা দুঃখিত হলে এমন নারকীয় চীৎকার সেটাকে প্রকাশ করত যে তা শুনলেইও ভয় করত, মনে হত এর চাইতে শতধা বিদীর্ণ হয়ে এর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াও অনেক ভাল। দুটি 'মানুষ' একত্র হলেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে এই ধরনের শব্দ করত: 'হ-হ-হ-খুব ভাল, খুব ভাল;' তাছাড়া অনুরূপ আরও অনেক রকম শব্দ করত। কখনও কখনও সে একটা লম্বা লাঠির মত বস্তু মুখে পুরে তার ভিতর দিয়ে এমনভাবে আগুন ও ধোঁয়া বের করত যে তার শিকার ভয়েই মরে যেত, আর সেও নখর দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরে নিজের গুহায় নিয়ে গিয়ে হিংস্র শয়তানী উল্লাসের সঙ্গে সেটাকে ভোজন করত।

"এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের এই বিবরণ এই জীবশ্মগুলির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। 'ক্যাপ্টেন কিড' চিহ্নিত নিদর্শনটিকেই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল। তার মাথায় এবং মুখের কতকাংশে ঘোড়ার লেজের মত এক ধরনের লোম আছে। অনেক পরিশ্রম করে তার ঢিলে চামড়াটা খুলে নেওয়া হলে দেখা গেল তার দেহের রঙ চকচকে সাদা, যদিও এখন পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গেছে। বহু যুগ আগে যে খড় যসে খেয়েছিল তা এখনও দেহের মধ্যে আছে-এমন কি পায়ের মধ্যেও আছে, এতটুকু হজম হয় নি।

"এই সব জীবাশ্মের চতুর্দিকে যে সব জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে সাধারণের কাছে তার কোন অর্থ না থাকলেও বিজ্ঞানের চোখে সেগুলি এক পরম প্রকাশ। মৃত যুগের গোপন কথা তারা মেলে ধরেছে। স্মৃতি-কথা থেকে আমরা জেনেছি, মানুষ কোন্ যুগে বাস করত, আর তার অভ্যাসই বা কেমন ছিল। কিন্তু এখানে 'মানুষ'-এর পাশে পাশে আমরা আর যা দেখতে পাচ্ছি তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে সে বাস করত সৃষ্টির একেবারে আদিম যুগে, যখন পৃথিবীর বুকে বেঁচে ছিল অন্য সব নিম্ন শ্রেণীর জীব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই 'নটিলাস'-এর জীবাশ্ম যে আদিম যুগের সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত; এখানে রয়েছে 'মাস্টোডন', 'ইক্থিয়োসরাস', গুহা-ভল্লুক ও বৃহদাকার হরিণের কংকাল। এখানে রয়েছে অনেক লুপ্ত জীব ও ছোট ছোট মানুষ-দের পোড়া হাড়; হাড়গুলি লম্বালম্বিভাবে দু'ভাগ করা; তা থেকেই বোঝা যায় যে 'মানুষ' মজ্জা খেতে খুব ভালবাসত। যেহেতু সেই সব হাড়ের উপর কনো জানোয়ারের দাঁতের চিহ্ন নেই, সেই জন্যই পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে 'মানুষই' এই সব হাড়ের ভিতরকার পদার্থ বের করে নিয়েছে। এখানে আরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে শিল্প-কলার কিছু কিছু ধারণাও 'মানুষ'-এর ছিল, কারণ কিছু কিছু জিনিসের গায়ে এই সব কথাগুলি লেখা রয়েছে-'চকমকি পাথরের টাঙ্গি, ছুরি, তীরের ফলা, প্রাচীন মানুষের হাড়ের অলংকারপত্র।' এর অনেকগুলিই চকমকি পাথর দিয়ে তৈরি আদিম অস্ত্রশস্ত্র; একটা গুপ্তস্থানে পাওয়া গেছে এই ধরনের কিছু নির্মীয়মান অস্ত্রপাতি, আর তাদের পাশেই রয়েছে একটা পাতলা পাতের উপর অনুকরণীয় ভাষায় লেখা এই কাহিনীটি:

'জোন্স, যদি মিউজিয়াম থেকে বরখাস্ত হতে না চাও তাহলে পরবর্তী আদিম অস্ত্রশস্ত্র আরও যত্ন নিয়ে তৈরি করো-শেষের দিকে তুমি যা তৈরি করেছ তা দিয়ে কলেজ থেকে আসা ঘুম-কাতুরে বুড়ো বিজ্ঞানীদেরও ফাঁকি দিতে পার নি। মনে রেখো, হাড়ের অলংকারের উপরে যে সব জানোয়ারের ছবি তুমি খোদাই করেছ তা এতই বাজে হয়েছে যে কোন আদিমতম মানুষকেও তা দিয়ে বোকা বানানো যায় না! -ভর্নাম ম্যানেজার।'

"কবরস্থানের পিছনে রয়েছে ছাইয়ের গাদা; তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় 'মানুষ' পান-ভোজন করত-নইলে এ রকম জায়গায় ছাই থাকবে কেন : আর বোঝা যাচ্ছে যে সে ঈশ্বরে এবং আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করত-নইলে এমন গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান করবে কেন?

"উপসংহার। আমরা বিশ্বাস করি মানুষের একটা লিখিত ভাষা ছিল। আমরা জানি একসময়ে সত্যি মানুষ ছিল, সে কোন কল্পনামাত্র নয়; আরও জানি, সে ছিল গুহা-ভাল্লুক, মাস্টোডন ও অন্যান্য লুপ্ত জীব শ্রেণীর সমসাময়িক সেই সব জীবদের ও নিজেদের বাচ্চাদের তারা রান্না করে খেত; সে আদিম অস্ত্রশস্ত্র বহন করত এবং শিল্প-কলার কিছুই জানত না; সে মনে করত যে তার আত্মা আছে আর কল্পনা করত যে সে আত্মা অমর। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের হাসা উচিত নয়; কারণ হয় তো এমন কোন জীবেরও অস্তিত্ব আছে যাদের কাছে আমরা ও আমাদের সব গর্ব-অহংকার ও পাণ্ডিত্যও হাস্যকর মনে হতে পারে।"

তৃতীয় পর্ব

এদিকে বড় নদীটার তীরের কাছে বিজ্ঞানীরা একটা মস্তবড় সুগঠিত পাথর দেখতে পেল। তাতে লেখা রয়েছে :

"১৮৪৭-এর বসন্তকালে নদীর দুই তীর ছাপিয়ে গোটা শহরটাকে গ্রাস করল। জলের গভীরতা ছিল দুই থেকে ছ' ফুট। ৯০০-এর বেশী গবাদি পশু মারা গেছে এবং অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য মেয়র এই স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর করুন, এ ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে!"

বহু কষ্ট স্বীকার করে অধ্যাপক গেছো-উকুন এই শিলালিপির একটা অনুবাদ করে দেশে পাঠিয়ে দিল এবং সেখানে প্রচণ্ড হৈ-চৈ পড়ে গেল। শিলালিপিতে দু'একটি এমন শব্দ ছিল যাকে ভাষান্তরিত করা যায় না; ফলে অনুবাদের সত্যতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও তাতে অর্থের স্পষ্টতা নষ্ট হয় নি। অনুবাদটি এখানে তুলে দেওয়া হল :

"এক হাজার আট শ' সাতচল্লিশ বছর আগে (অগ্নিস্রোত?) নেমে এসে গোটা শহরকে গ্রাস করে ফেলল। মাত্র ন' শ' জীবন রক্ষা পেল, বাকি সবই ধ্বংস হয়ে গেল। (রাজা?)-র আদেশে এই পাথরটি স্থাপিত হল যাতে...... (অনুবাদ করা গেল না) ....পুনরাবৃত্তি না ঘটে।"

বিলুপ্ত প্রজাতি 'মানুষ' যে রহস্যময় বর্ণমালা রেখে গেছে তার যত অনুবাদ আজ পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম সার্থক ও সন্তোষজন অনুবাদ। এর ফলে অধ্যাপক গেছো-উকুনের খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়ল যে তার স্বদেশের প্রত্যেকটি বিদ্যাপীঠ একযোগে তাকে অত্যন্ত সম্মানজনক ডিগ্রীতে ভূষিত করল। সকলেরই বিশ্বাস হল যে সে যদি সৈনিক হয়ে কোন আদিম সরীসৃপ জাতির ধ্বংসসাধনে তার এই উজ্জ্বল প্রতিভাকে নিয়োগ করত তাহলে রাজা তাকে গৌরবের আসন দিয়ে প্রচুর ধনৈশ্বর্যে ভূষিত করত। আর এর ফলেইও মানববিজ্ঞানী নামক একটি নতুন বিজ্ঞানী দলের সৃষ্টি হল; মানুষ নামক লুপ্ত পক্ষীশ্রেণীর প্রাচীন তথ্যাদির পাঠোদ্ধার করাই হল তাদের বৈশিষ্ট্য। [কারণ এখন এটা স্বীকৃত সত্য যে মানুষ পক্ষী, সরীসৃপ নয়।] কিন্তু অধ্যাপক গেছো-উকুন সকলেরই প্রধান কর্তা হয়ে রইল, কারণ সকলেই মেনে নিল যে আজ পর্যন্ত এতটা নির্ভুল অনুবাদ আর কখনও হয় নি। সকলেই ভুল করেছে-কিন্তু তার ভুল হতেই পারে না। লুপ্ত জাতির আরও অনেক স্মৃতিস্তম্ভ পরবর্তীকালে পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এই 'মেয়রীর পাথর'-এর মত সুখ্যাতি ও সম্মান আর কেউ অর্জন করতে পারে নি-শিলালিপিতে 'মেয়র' শব্দটি ছিল বলেই 'মেয়রীয়' বলা হল, কিন্তু অনুবাদে 'রাজা' শব্দটি ব্যবহার করায় 'মেয়রীয় পাথর' 'রাজকীয় পাথর'-এরই অন্য নাম মাত্র।"

অভিযাত্রীদল আরও একটি বড় আবিষ্কার করে ফেলল। একটা মস্ত বড় গোলাকার সমতল পদার্থ-ব্যাস দশ ব্যাঙ-মাপের সমান, উচ্চতায় পাঁচ অথবা ছয় ব্যাঙ-মাপ। অধ্যাপক শম্বুক নাকে চশমা এঁটে সেটার উপরে চড়ে মাথাটা ভালভাবে পরীক্ষা করে বলল:

"পুংখানুপুংখরূপে সব কিছু দেখে শুনে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে স্তূপ-নির্মাতারা যে সব সৃষ্টি রেখে গেছে এটি তার একটি আশ্চর্য বিরল নিদর্শন। অতএব এখানে খনন-কার্য চালিয়ে নব নব জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করা হোক।"

একটি পিপিলিকা-বাহিনী খনন-কার্য শুরু করে দিল। কিছুই পাওয়া গেল না। সকলের পক্ষেই এটা হতাশার কারণ হত, কিন্তু মাননীয় দীর্ঘপদ মহাশয় ব্যাপারটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল। সে বলল:

"এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে রহস্যময় ও বিস্মৃত স্তূপ-স্থপতিরা সব সময়ই সমাধিস্তম্ভ হিসাবে এই সব স্তূপ নির্মাণ করত না; তা যদি করত তাহলে এই স্থলে, এবং অন্য আরও অনেক স্থলে, স্তূপের নীচে তাদের কংকাল ও তাদের ব্যবহৃত অন্য আদিম যন্ত্রপাতি পাওয়া যেত। এটা কি পরিষ্কার বোঝা গেল?"

"ঠিক ঠিক!" সকলেই বলে উঠল।

"তাহলে এখানেও আমরা একটি মূল্যবান আবিষ্কার করে ফেললাম; এই আবিষ্কারের ফলে একটি জাতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হ্রাস না পেয়ে বরং আরও বিস্তার লাভ করল। কারণ-এই যে প্রথাগত কোন ধ্বংসাবশেষ এখানে নেই তার একটিই অর্থ হতে পারে: 'এই স্তূপ-স্থপতিদের আমরা এতকাল যেরূপ অজ্ঞ, বর্বর সরীসৃপ বলে ভেবে এসেছি তা না হয়ে তারা ছিল সংস্কৃতি ও উচ্চ মণীষার অধিকারী জীব; স্বীয় শ্রেণীর উন্নত ও মহৎ ব্যক্তিদের কার্যাবলীর তারা যে শুধু প্রশংসা করত তাই নয়, সেগুলিকে স্মরণীয় করে রাখতেও জানত! সহকর্মী পণ্ডিতগণ, এই সুউচ্চ স্তূপ একটি সমাধি-স্তম্ভ নয়, এটি একটি স্মৃতি-স্তম্ভ।"

এ কথা শুনে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ল।

নক্সাকারকদের ডেকে বিভিন্ন কোণ থেকে স্মৃতিস্তম্ভটির নক্সা প্রস্তুত করতে বলা হল। বিজ্ঞানীসুলভ উৎসাহের বশে অধ্যাপক গেছো-উকুন একটা শিলালিপির সন্ধানে স্তূপময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সে রকম কোন লিপি গোড়ায় থাকলেও লুণ্ঠনকারীদের হাতে হয় নষ্ট হয়েছে, আর না হয় তো লুঠ হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ শেষ করবার পর স্থির হল যে, চারটি বৃহদাকার কচ্ছপের পিঠে চাপিয়ে এই মূল্যবান স্মৃতিস্তম্ভটিকে স্বদেশে রাজার সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাই করা হল। স্বদেশে পৌঁছলে মহাধুমধামের সঙ্গে সেটাকে অভ্যর্থনা করা হল এবং হাজার হাজার উৎসাহী জনতা সেটাকে তার ভবিষ্যৎ স্থায়ী আবাসের দিকে নিয়ে চলল। 'রাজা' দ্বাদশ কোলা ব্যাঙ স্বয়ং সে অনুষ্ঠানে যোগ দিল এবং সারা পথ সেটার উপর উপবিষ্ট হয়ে রইল।

এই সময় আবহাওয়া ক্রমেই কষ্টকর হয়ে ওঠায় বিজ্ঞানীরা আপাতত তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে বাড়ি ফিরবার আয়োজন করতে লাগল। কিন্তু সেই সব গুহার মধ্যে কাটানো শেষ দিনটিও যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়ে উঠল, কারণ তাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি সংগ্রহশালা বা "কবরস্থান"-এর অনাদৃত কোণে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অসাধারণ একটি জিনিস দেখতে পেল। সেটা অন্য কিছু নয়, একটি যমজ মানুষ-পক্ষী স্বাভাবিক বন্ধনীর দ্বারা বুকে বুক লাগিয়ে একত্রিত করা, আর তার গায়ে অনুবাদের অতীত ভাষায় লেবেল লাগানো-"শ্যামদেশীয় যমজ"। এতৎসংক্রান্ত সরকারী প্রতিবেদনটি এইভাবে শেষ করা হয়েছে:

"এর থেকেই বোঝা যায় যে পুরাকালে এই মহান পক্ষীর দুটি শ্রেণী ছিল, একটি একক, অপরটি যুগল। প্রকৃতিতে সব জিনিসেরই একটা যুক্তি আছে। বিজ্ঞানের চোখে এটা পরিস্কার যে গোড়ায় এই "যমজ মানুষ" বিপজ্জনক এলাকাগুলোতেই বসবাস করত; দু'জনকে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে একত্র জুড়ে দেওয়া হত যাতে একজন ঘুমোলে অপরজন জেগে পাহারা দিতে পারে, আর ঠিক সেই একইভাবে বিপদ দেখা দিলে একজনের জায়গায় দু'জন একসঙ্গে তাকে প্রতিরোধ করতে পারে। দেবতাসদৃশ বিজ্ঞানের রহস্য-উন্মোচনকারী চক্ষুর জয় হোক!"

সেই যমজ মানুষ-পক্ষীর নিকটেই পাওয়া গেল একত্রে বাঁধানো অসংখ্য পাতলা সাদা পাতায় লিখিত একটি প্রাচীন তথ্য-সংগ্রহ। অধ্যাপক গেছো-উকুন সেটার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত মাত্রই নিম্নলিখিত পংক্তিটি উদ্ধার করে কম্পিত কণ্ঠে সেটাকে অনুবাদ করে বিজ্ঞানীদের সম্মুখে মেলে ধরল। ফলে সকলেরই অন্তর আনন্দে ও বিস্ময়ে এক উচ্চস্তরে উন্নীত হল।

"আসলে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে নিম্ন শ্রেণীর জীবরাও একত্রে চিন্তা করে ও কথা বলতে পারে।"

অভিযাত্রীদলের মহান সরকারী প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হল তখন উপরি-উক্ত পংক্তিটি সম্পর্কে এই মন্তব্য পাওয়া গেল:

"তাহলে 'মানুষ'-এর চাইতে নিম্নশ্রেণীর জীবও আছে! এই বিশিষ্ট অনুচ্ছেদটির তো আর কোন অর্থই হয় না। মানুষ নিজে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তারা হয় তো এখনও বেঁচে আছে। তারা তাহলে কারা? কোথায় থাকে? বিজ্ঞানীদের সম্মুখে আবিষ্কার ও গবেষণার এই যে এক উজ্জ্বল ক্ষেত্র উন্মুক্ত হল তার আলোচনায় সকলেই অধীর হয়ে উঠল। আমাদের প্রচেষ্টার উপসংহারে আমরা এই বিনীত প্রার্থনা জানাই যে মাননীয় রাজা মহাশয় অবিলম্বে একটি কমিশন নিয়োগ করে নির্দেশ প্রচার করুন যে যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি এই অজ্ঞাত জীবশ্রেণী সম্পর্কিত অনুসন্ধান সাফল্যমণ্ডিত না হবে ততদিন তারা বিশ্রাম করবেন না অথবা 'খরচাদি সম্পর্কে কার্পণ্য কবরেন না।"

তারপর দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে স্বীয় কর্ম বিশ্বস্তভাবে সম্পাদনান্তে অভিযাত্রী দল গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। কৃতজ্ঞ দেশবাসীও প্রচণ্ডভাবে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। অবশ্য আজেবাজে ছিদ্রান্বেষী লোকেরও অভাব হয় না; সে রকম কিছু লোক তো সব সময়ই থাকে, আর থাকবেও; স্বভাবতই তাদেরই একজন হল অশ্লীল শ্রীছারপোকা। সে বলল, এই ভ্রমণ থেকে সে তো এইটুকুই জেনেছে যে বিজ্ঞান মাত্র এক চামচ কল্পনা থেকেই ঘটনার ঘনঘটাসম্বলিত একটা পর্বত তৈরি করতে পারে; আর ভবিষ্যতে সে শুধু এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে চায় যে ঈশ্বরের পবিত্র রহস্যের মধ্যে নাক না গলিয়ে যার যার মত করে চলবার স্বাধীনতা প্রকৃতি সকলকেই দিয়েছে।

ক্যানভাসারের কাহিনী

The Canvasser's Tale

গরিব, বিষণ্ণ-নয়ন অপরিচিত লোকটি! এই ভাবটিই ফুটে উঠেছিল তার মুখের বিনীত ভাবে, তার ক্লান্ত দৃষ্টিতে ও জীর্ণ ভদ্র পোশাকে। ফলে তার বগলে একটা পোর্টফোলিও থাকা সত্ত্বেও আমার বুকের অসীম শূন্যতায় যেটুকু বদান্যতার বীজ তখনও অবশিষ্ট ছিল তাকেই সে নাড়া দিল। নিজের মনেই বললাম, দেখ, ঈশ্বর তার এই সেবককে আর একটি ক্যানভাসারের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

আসলে এ সব লোক সব সময়ই আগ্রহ সৃষ্টি করে থাকে। এবং ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই লোকটি আমাকে তার কাহিনী বলতে শুরু করল, আর আমিও মনোযোগ ও সহানুভূতি সহকারে তা শুনতে লাগলাম। তার কথাগুলি অনেকটা এই রকম:

আমি যখন একটি নিষ্পাপ ছোট শিশু তখনই আমার বাবা-মা মারা যায়। আমার খুড়ো ইথুরিয়েল আমাকে বুকে তুলে নিয়ে নিজের সন্তানের মত মানুষ করতে লাগলেন। এই বিরাট বিশ্বে তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র আত্মীয়; কিন্তু তিনি ছিলেন ভাল মানুষ, ধনী ও উদারহৃদয়। ভোগ-বিলাসের মধ্যেই তিনি আমাকে মানুষ করতে লাগলেন। টাকা দিলে যা পাওয়া যায় এমন কোন জিনিসের অভাব আমার ছিল না।

যথাসময়ে আমি গ্র্যাজুয়েট হলাম এবং একজন নায়েব ও একজন খানসামাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে বের হলাম। চার বছর ধরে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের সৌন্দর্যের বাগানে নিশ্চিন্ত পাখা মেলে উড়ে বেড়ালাম। আমার ভাষা চিরদিনই কাব্যের সুরে বাঁধা; তাই আশা করি এ ধরনের ভাষা ব্যবহারের অনুমতি আপনি আমাকে দেবেন; তাছাড়া, আপনার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনিই ঐ ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, আর সেই জন্যই সাহস করে আপনার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলেছি; সেই সব দূর দেশে যে সুধাময় আহার্য আমি গ্রহণ করেছি তাতে আত্মা, মন ও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানকার ধনী লোকদের মধ্যে শোভন ও মূল্যবান বিরল দ্রব্যাদি সংগ্রহের যে রীতি প্রচলিত ছিল সেটাই আমার জন্মগত সৌন্দর্যপ্রীতিকে সব চাইতে বেশী করে আকর্ষণ করল, আর কুক্ষণে আমার খুড়ো ইথুরিয়েলকে এই মনোরম সংগ্রহ-বৃত্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুললাম।

এই ভদ্রলোকের ছিল ঝিনুকের বিরাট সংগ্রহ; আর একজনের ছিল সমুদ্রের জমাট ফেনা দিয়ে তৈরি পাইপের চমৎকার সংগ্রহ; আর একজনের ছিল এমন সব স্বাক্ষরের সংগ্রহ যার পাঠোদ্ধার করা যায় না; একজনের ছিল প্রাচীন চীনামাটির বাসনের অমূল্য সংগ্রহ; একজনের ছিল মনমাতানো ডাক-টিকিটের সংগ্রহ; এমনই কত-কত রকম সংগ্রহ; আর সে সব কথাই আমি খুড়োকে চিঠি লিখে জানালাম। শীঘ্রই আমার চিঠির ফল ফলতে শুরু করল। আমার খুড়োও একটু একটু করে সংগ্রহের নেশায় মেতে উঠলেন। আপনি হয় তো জানেন, এ সব নেশা কত দ্রুত বাড়ে। দেখথে দেখতে তার নেশাও চরমে উঠল, যদিও আমি তা জানতাম না। মস্ত বড় মাংসের ব্যবসার দিকে আর তাঁর নজর রইল না। ক্রমে সে ব্যবসা থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে অবসর সময়টাকে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের খোঁজে ব্যয় করতে লাগলেন। প্রচুর অর্থের মালিক তিনি, কাজেই অর্থের অভাব হল না। শুরু করলেন গরুর ঘণ্টা দিয়ে। সংগৃহীত ঘণ্টায় পাঁচটা বড চ.ঘর ভর্তি হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত যত রকমের গরুর ঘণ্টা তৈরি হয়েছে সব তিনি সংগ্রহ করলেন-শুধু একটি ছাড়া। অধুনালুপ্ত সেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটি ছিল অপর একজন সংগ্রহকারীর দখলে। সেটার জন্য খুড়ো প্রচুর টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু সে লোক কিছুতেই বিক্রি করবে না। বুঝতেই পারছেন তার অনিবার্য পরিণতি কি দাঁড়াল। একজন সত্যিকারের সংগ্রহকারীর কাছে অসমাপ্ত সংগ্রহের কোনই মূল্য নেই। তখন তার মন ভেঙে যায়, সব কিছু বিক্রি করে দেয়, অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে সে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

আমার খুড়োও তাই করলেন। এবার তিনি ইট সংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। চমৎকার একটি বড় মাপের সংগ্রহও হল। কিন্তু আবার দেখা দিল সেই একই বাধা; আবার তার মন ভেঙে গেল; দুষ্প্রাপ্য ইটখানির মালিক এক অবসরপ্রাপ্ত মদ-চোলাইকারীর কাছে তিনি অতিপ্রিয় সংগ্রহগুলি বেচে দিলেন। তারপর তিনি হাত দিলেন আদিম মানুষের চকমকি পাথরের টাঙ্গি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজে। কিন্তু ক্রমে তিনি জানতে পারলেন, যে সব কারখানায় এই সব জিনিস তৈরি হয় তারা তাকে ছাড়াও অন্য সব সংগ্রহকারীকেও সেগুলি সরবরাহ করছে। তারপর শুরু কলেন আজটেক-শিলালিপি ও খড়ভর্তি তিমি সংগ্রহের কাজ-কিন্তু অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পরে সেখানেও জুটল ব্যর্থতা। তার সংগ্রহ হয়ে এসেছে এমন সময় গ্রীনল্যাণ্ড থেকে এল এমন একটা খড়খড়ি তিমি, আর মধ্য আমেরিকার চান্দারোঙ্গো অঞ্চল থেকে এল এমন একখানি আজটেক-শিলালিপি যাতে আগেকার সব নিদর্শনগুলিকেই তুচ্ছ মনে

হল। খুড়ো তড়িতে ছুটে গেলেন এই দুটি মানিক সংগ্রহ করতে। খড়খড়ি তিমিটি পেলেন, কিন্তু শিলালিপিখানি পেয়ে গেল অপর এক সংগ্রহকারী। আপনি হয়তো জানেন, একখানি আসল চান্দারোঙ্গো এতই মূল্যবান যে কোন সংগ্রহকারী একবার সেটা হাতে পেলে সে বরং তার পরিবারকে বেচে দেবে, তবু সেটাকে হাতছাড়া করবে না। কাজেই আমার খুড়ো সব কিছু বেচে দিল; চোখের সামনে তার আদরের সংগ্রহগুলো চলে গেল, আর ফিরে এল না; মাত্র একটি রাতের মধ্যেই তার মাথার কয়লা-কালো চুল বরফের মত সাদা হয়ে গেল।

এত দিনে তিনি থামলেন; ভাবতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, আবার ব্যর্থ হলে তিনি মারাই যাবেন। স্থির করলেন, এর পরে তিনি এমন একটা জিনিস বেছে নেবেন যা কেউ সংগ্রহ করে না। খুব সাবধানে মনস্থির করে আবার কাজে নামলেন-এবার তিনি সংগ্রহ করবেন প্রতিধ্বনি।

কি বললেন?-আমি প্রশ্ন করলাম।

প্রতিধ্বনি স্যার। তিনি প্রথমে কিনলেন জর্জিয়ার প্রতিধ্বি-সেটা চারবার ধ্বনিত হয়; তারপর কিনলেন মেরল্যাণ্ড-এর ষষ্ঠ-ধ্বনি; তারপর মেইন-এর ত্রয়োদশ-ধ্বনি; তারপর কান্সার-এর নয়-ধ্বনি; আর তার পরেরটি টেনেসি-র দ্বাদশ-ধ্বনি; বলতে গেলে এই শেষেরটা তিনি বেশ সস্তায় পেয়ে গেলেন, কারণ পাহাড়ের যে চূড়ায় শব্দটি প্রতিফলিত হত সেটা ভেঙে পড়ায় সে প্রতিধ্বনিটা মেরামতের বাইরে চলে গিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, কয়েক হাজার ডলার খরচ করে তিনি ওটা মেরামত করে নিতে পারবেন এবং রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে উচ্চতাটাকে আরও বাড়িয়ে প্রতিধ্বনির শক্তিটাকে আরও তিনগুণ বাড়িয়ে নিতেও পারবেন। কিন্তু যে বাস্তুকার কাজটা নিল সে এর আগে কখনও প্রতিধ্বনি সংক্রান্ত কাজ না করায় পুরো জিনিসটাকেই বরবাদ করে ফেলল। সে হাত দেবার আগে এটা শাশুড়ির মত বক-বক করতে পারত, কিন্তু এখন এটা মূক-বধিরদের শিবির ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগবে না। দেখুন, এরপর তিনি বিভিন্ন রাজ্যে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলি সস্তা দামের ছোট ছোট দো-নলা প্রতিধ্বনি এক লটে কিনে নিলেন; এক লটে কেনা হল বলে তিনি শতকরা কুড়ি ভাগ ছাড় পেলেন। তারপর কিনলেন অরিগন-এর প্রতিধ্বনিকারক একটা ভাল গ্যাট্লিং-বন্দুক, আর তাতে খরচ পড়ল প্রচুর। 'গ্রেট পিট একো' নামক যে অরিগন-প্রতিধ্বনিটি খুড়ো কিনলেন সেটা ছিল বাইশ ক্যারেটের, আর সেটার দাম ছিল দু'শ' ষোল হাজার ডলার।

এদিকে আমার দিন কাটছিল গোলাপের পথে পা ফেলে। আমি তখন জনৈক ইংরেজ জমিদারের একমাত্র মনোরমা কন্যার পাণিপ্রার্থী, তার প্রেমে উন্মাদ। তাকে কাছে পেলে আমি যেন সুধা-সমুদ্রে সাঁতার কাটি। আমাকে নিয়ে পরিবারের লোকজনরাও খুসি, কারণ সকলেই জানে যে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের মালিক খুড়োর আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী। অবশ্য তখন আমরা কেউই জানতাম না যে আমার খুড়ো ইতিমধ্যে সংগ্রহকারীদের দলে ভিড়ে গিয়েছেন।

এবার কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই মেঘ ঘনিয়ে এল আমার মাথার উপরে। ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই স্বর্গীয় প্রতিধ্বনি সমগ্র জগতের কাছে যার পরিচয় "মহান কোহিনুর" অথবা "প্রতিধ্বনি-গিরি" নামে। সেটা ছিল পঁয়ষট্টি ক্যারেটের মাল। দিন শান্ত থাকলে আপনি যে কোন শব্দ করুন না কেন পনেরো মিনিট ধরে তার প্রতিধ্বনি আপনার কানে বাজতে থাকবে। কিন্তু কি কাণ্ড দেখুন, ঠিক সেই সময় আরও একটি ঘটনা ঘটল-দেখা দিল আরও একজন প্রতিধ্বনি সংগ্রহকারী। দু'জনই ছুটে গেল সেই অতুলনীয় সম্পদটি কিনতে। সম্পদটি আসলে হল-নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের উপকণ্ঠস্থ দুটি ছোট পাহাড় ও তাদের মধ্যবর্তী একটি অগভীর ছায়া-ঘেরা জলাশয়। দু'জন একই সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হল, কিন্তু কেউ কারও খবর জানত না। প্রতিধ্বনিটা কোন একজনের সম্পত্তি নয়; উইলিয়ামসন বলিভার জার্ভিস হল পূব দিককার পাহাড়ের মালিক, আর হার্বিসন জে. ব্লেড্সো হল পশ্চিম দিককার পাহাড়ের মালিক; মাঝখানের জলাশয়টি হল সীমানা-রেখা। সুতরাং আমার খুড়ো যখন ত্রিশ লক্ষ দু' শ' পঁচাশী ডলার দিয়ে জার্ভিস-এর পাহাড়টা কিনছিলেন, তখন ত্রিশ লক্ষ ডলারের কিছু বেশী দিয়ে অপর পক্ষ কিনছিল ব্লেড্সো-র পাহাড়টা।

এখন, এর স্বাভাবিক পরিণতিটা বুঝতে পারছেন তো? আরে, পৃথিবীর এই মহত্তম প্রতিধ্বনিটির মালিকানা চিরদিনের মত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, কারণ পৃথিবীর এই রাজসিক প্রতিধ্বনিটির মাত্র অর্দ্ধাংশের মালিকানা গেল এক-এক জনের দখলে। এই অংশীদারী মালিকানা নিয়ে দু'জনের একজনও খুসি নয়, অথচ কেউ কাউকে নিজের অংশটা বিক্রিও করবে না। শুরু হল গালাগালি, ঝগড়া ও বুক-জ্বালা। অবশেষে যে তীব্র বিদ্বেষ একমাত্র একজন সংগ্রহকারীই অপর একজন সংগ্রহকারী ভাইয়ের প্রতি পোষণ করতে পারে তারই বশে অপর সংগ্রহকারীটি তার পাহাড়কে কেটে ফেলতে উদ্যত হল।

বুঝতেই তো পারছেন, যে যখন প্রতিধ্বনির মালিক হতে পারল না তখনই সে স্থির করল যাতে আর কেউ সেটা না পায়। সে পাহাড়টাকেই সরিয়ে দেবে; তাহলে তো আমার খুড়োর প্রতিধ্বনিকে ফিরিয়ে দেবার কিছুই থাকবে না। খুড়ো বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু সে লোকটি বলল, "প্রতিধ্বনির এই অংশের মালিক আমি; আমি এটাকে নষ্ট করে দেব; আপনি আপনার দিকটার ব্যবস্থা দেখুন গে।"

আমার খুড়ো লোকটির বিরুদ্ধে একটি স্থিতাবস্থার নির্দেশ আদায় করে নিলেন। অপর লোকটিও আপিল করে উচ্চতর আদালতে মামলা লড়তে লাগল। ক্রমে সে মামলা গড়াল যুক্ত রাষ্ট্রের "সুপ্রিম কোর্ট" পর্যন্ত। দু'জন বিচারক বলল, প্রতিধ্বনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি; এটা দৃষ্টি ও স্পর্শযোগ্য না হলেও ক্রয়যোগ্য, বিক্রয়যোগ্য ও তার ফলে করধার্যযোগ্য; অপর দু'জন বলল, প্রতিধ্বনি স্থাবর সম্পত্তি, কারণ এটা স্পষ্টতই জমির সঙ্গে জড়িত এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরযোগ্য নয়; অপর বিচারকগণ বলল, প্রতিধ্বনি মোটেই কোন সম্পত্তি নয়।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল: প্রতিধ্বনি সম্পত্তিই বটে; পাহাড় দুটিও সম্পত্তি; দু'জনই দুটো পাহাড়ের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মালিকানার অধিকারী, কিন্তু প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে দু'জন সম-ভাড়াটে মাত্র; সুতরাং নিজের পাহাড় কেটে ফেলবার সম্পূর্ণ অধিকার বিবাদীর আছে, কারণ সেই পাহাড়টার একমাত্র মালিক, কিন্তু তার ফলে প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে আমার খুড়োর যদি কোন ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে ত্রিশ লক্ষ ডলার মূল্যের "ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড"-এ সই করতে হবে। সেই রায়ে আমার খুড়োর অংশের প্রতিধ্বনিকে প্রতিফলিত করবার জন্য বিবাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার পাহাড়টাকেই ব্যবহার করা থেকেও খুড়োকে বিরত থাকতে বলা হল; তিনি শুধু তার পাহাড়টাকে ব্যবহার করতে পারবেন; এই পরিস্থিতিতে তার অংশের প্রতিধ্বনি যদি সক্রিয় না হয় সেটা খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু আদালতের হাতে তার কোন প্রতিকার নেই। আদালতের নির্দেশে, খুড়োর সম্মতি ছাড়া বিবাদীকেও তার অংশের প্রতিধ্বনিকে খুড়োর পাহাড়ে প্রতিফলিত করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। তাহলেই বুঝুন, কী অপূর্ব পরিণতিই না হল! কেউ সম্মতিও দেবে না, আর এই বিস্ময়কর মহৎ প্রতিধ্বনিটি অকেজো হয়েই পড়ে থাকবে। সেইদিন থেকেই এই চমৎকার সম্পত্তিটি সিল করে অ-বিক্রয়যোগ্য করে রাখা হয়েছে।

আমার বিয়ের দিনের এক সপ্তাহ আগেকার কথা। আমি তখনও আনন্দ-সাগরে সাঁতার কাটছি; আমাদের বিয়েতে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে ভদ্রজনরা এসে সমবেত হয়েছে; এমন সময় এল আমার খুড়োর মৃত্যুসংবাদ; আর সেই সঙ্গে এল তার উইলের একটা নকল; তাতে আমাকেই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। তিনি চলে গেছেন; হায়, আমার একমাত্র উপকারী প্রিয়জন আর নেই! সেকথা ভাবলে আজও আমার বুকের ভিতরটা উথলে ওঠে। উইলটা জমিদারবাবুর হাতে দিলাম; চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ায় আমি সেটা পড়তে পারলাম না। জমিদারবাবু সেটা পড়ে কঠোর স্বরে বলল; "বাপু হে, একে তুমি সম্পত্তি বল?-কি জানি, তোমাদের মুদ্রাস্ফীতির দেশে হয় তো তাই বলে। তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ একটা বড় মাপের প্রতিধ্বনির সংগ্রহ-অবশ্য আমেরিকা মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনিসমূহকে যদি সংগ্রহ বলা চলে। শুধু তাই নয়, তুমি ঋণে একেবারে আকণ্ঠ ডুবে আছ; সব ক'টি প্রতিধ্বনিই মর্টগেজে বাঁধা। দেখ বাপু, আমি নিষ্ঠুর নই, কিন্তু আমার সন্তানের কল্যাণ তো আমাকে দেখতেই হবে; যদি এমন একটি প্রতিধ্বনিও তোমার থাকত যাকে সৎভাবে তুমি তোমার নিজস্ব বলতে পার; যদি এমন একটি প্রতিধ্বনিও তোমার থাকত যা দায়বদ্ধ নয়; আমার মেয়েকে নিয়ে যার উপর তুমি নির্ভর করতে পারতে এবং সৎভাবে পরিশ্রম করে অনুশীলনের দ্বারা তার উন্নতি বিধান করে একটা জীবিকার সংস্থান করে নিতে পারতে, তাহলে আমি 'না' বলতাম না; কিন্তু একটি ভিখারীর সঙ্গে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না! অতএব আদরের মেয়েটি আমার, ওকে পরিত্যাগ কর; আর তুমি বাপু তোমার মর্টগেজ-কণ্টকিত প্রতিধ্বনি নিয়ে সরে পড়; চিরদিনের মত আমার চোখের সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।"

সুন্দরী সিলেস্টিন চোখের জলে বুক ভিজিয়ে দু'খানি প্রেমময় বাহু বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল; শপথ করে বলল, পৃথিবীতে যদি একটি প্রতিধ্বনিও আমার না থাকে তথাপি স্বেচ্ছায়, সানন্দে সে আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তা হল না। পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া হল। কাঁদতে কাঁদতে বারো মাসের মধ্যেই সে মারা গেল, আর আমি বেঁচে রইলাম একাকি বিষণ্ণচিত্তে জীবনের দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে, আর প্রতিদিন প্রতিটি ঘণ্টা সেই মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতে যার ফলে যে-রাজ্যে দুষ্টরা কষ্ট দিতে পারে না আর ক্লান্ত পথিক পায় বিশ্রাম সেখানে আমরা আবার মিলিত হতে পারব। এবার স্যার, আপনি যদি আমার পোর্ট ফোলিও-র ভিতরকার এই মানচিত্র ও নক্সাগুলি দেখেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই এত স্বল্পদামে আপনাকে একটি প্রতিধ্বনি বিক্রি করতে পারব যা এ ব্যবসায় নিযুক্ত আর কোন লোকই আপনাকে দিতে পারবে না। এই যে এটা দেখছেন, ত্রিশ বছর আগে আমার খুড়ো এটা কিনেছিলেন দশ ডলার দিয়ে, সারা টেক্সাস-এ এটা মধুরতম প্রতিধ্বনি, আর আপনাকে এটা আমি দেব মাত্র-"

"তার আগে আমার কথা শুনুন" আমি বললাম। "দেখুন, আজ সারাটা দিন মুহূর্তের জন্যেও ক্যানভাসারদের হাত থেকে রেহাই মেলে নি। দরকার না থাকলেও একটা সেলাই-যন্ত্র কিনেছি; একটা মানচিত্র কিনেছি যার সবটাই ভুলে ভরা; একটা ঘড়ি কিনেছি যেটা চলে না; একটা পোকা মারার বিষ কিনেছি যেটা পোকাদের বড়ই প্রিয় পানীয়; কত যে অকেজো জিনিস কিনেছি তার শেষ নেই; কিন্তু এ রকম বোকামি আর করব না। আপনি অমনি দিলেও আপনার কোন প্রতিধ্বনি আমি নেব না। আমার বাড়িতেই ও জিনিস রাখব না। যারা আমার কাছে প্রতিধ্বনি বেচতে আসে তাদের আমি ঘৃণা করি। এই বন্দুকটা দেখছেন তো? আপনার জিনিসপত্র নিয়ে এখনই সরে পড়ুন; বৃথা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাবেন না।"

কিন্তু সে শুধু একটি বিষণ্ণ মিষ্টি হাসি হাসল, আর আরও কিছু নক্সা বের করে দেখাতে লাগল। এর ফলাফল তো আপনারা ভালই জানেন, কারণ একবার কোন ক্যানভাসারকে ঘরের দরজা খুলে দিলে আর রক্ষা নেই, আপনাকে পরাজয় মানতেই হবে।

একটি দুঃসহ ঘণ্টা এই লোকটির সঙ্গে কাটাবার পরে আমিও তার সঙ্গে আপোষ করলাম। ভাল অবস্থায় দুটো দো-নলা প্রতিধ্বনি কিনলাম, আর অন্য আরেকটি গছিয়ে দিয়ে সে জানাল যে এটা বিক্রয়যোগ্য নয়, কারণ এটা শুধুই জার্মান ভাষায় কথা বলতে পার। সে বলল, 'এই মেয়ে-পুতুলটি এক সময় চমৎকার বহু ভাষাবিদ্ ছিল, কিন্তু কি করে যেন তার মুখের তালুটা নেমে গেছে।"

১৮৭৬

এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স ও রোজান্না এথেল্টন-এর প্রেম

The Loves of Alonzo Fitz Clarence and Rosannah Ethelton

১

একটা তীব্র শীতের দিনের প্রাক্-মধ্যাহ্নকাল। মেইন রাজ্যের ইস্টপোর্ট শহর সদ্য ঝরা গভীর বরফের নীচে চাপা পড়ে আছে। রাজপথে স্বাভাবিক হট্টগোলও নেই। রাস্তা বরাবর যতদূর তাকানো যায় শুধু মৃত্যু-সাদা শূন্যতা ও তদনুরূপ নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। অবশ্য আমি বলছি না যে নিস্তব্ধতা চোখে দেখা যায়। সেটা বরং শোনা যায়। গলিগুলো সব যেন লম্বা গভীর খানা, দুই ধারে খাড়া বরফের দেয়াল। এখানে ওখানে হয় তো কাঠের বেলচার অস্পষ্ট দূরাগত শব্দ শুনতে পাবেন, আর যদি অতি দ্রুত চোখ মেলে তাকাতে পারেন তাহলে হয় তো এই সব গলির যে কোন একটায় মুহূর্তের জন্য দেখতে পাবেন অনেক দূরে একটি কালো মূর্তি ঝুঁকে পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল এবং পরমুহূর্তেই আবার দেখা দিল; তার ভাবভঙ্গী দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এক বেল্চা-ভর্তি বরফ ছুড়ে ফেলবার জন্যই সে এসেছিল। কিন্তু আপনাকে খুব দ্রুতগতি হতে হবে। কারণ ঐ কালো মূর্তিটি বেশীক্ষণ থাকবে না, বেল্চার মাল খালাস করেই সে বাড়ির দিকে ছুটে যাবে। হ্যাঁ, বাইরের ঠাণ্ডা বিষাক্ত বরফ-ঠেলা-ওয়ালারাই হোক আর যেই হোক কেউই বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারে না।

ইতিমধ্যে আকাশ কালো হয়ে উঠল; উঠে এল বাতাস; প্রচণ্ড ঝাপ্টা মেরে দমকা হাওয়া বইতে লাগল; সেই হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পিছনে সামনে, সর্বত্র ঝরে পড়তে লাগল। তেমনি একটা ঝড়ো হাওয়ার তাড়নায় রাস্তা বরাবর সাদা বরফের স্তূপ কবরের মত জমে উঠল; আবার একমুহূর্ত পরে একটা ঝাপ্টা এসে সেই স্তূপের মাথার উপরকার বরফকে বিন্দু বিন্দু আকারে ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে দিচ্ছে-ঠিক যেন প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে; আবার তৃতীয় একটা ঝাপ্টা এসে সব কিছুকে যেন ধুয়ে মুছে আপনার হাতের মত পরিষ্কার করে রেখে যাবে। যেন একটা তামাসা; একটা খেলা; কিন্তু প্রত্যেকটি ঝাপ্টার ফলেই পাশের গলি-পাথরগুলিতে কিছু না কিছু বরফ জমবেই।

এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স তার উষ্ণ সুসজ্জিত বসবার ঘরে আস্তিনে ও বুকে লাল সাটিন বসানো চমৎকার একটা নীল ড্রেসিং গাউনে শরীর ঢেকে বসে ছিল। প্রাতরাশের ভুক্তাবশেষ সামনে পড়ে আছে; খাবার টেবিলের সুন্দর ও দামী বাসনপত্র ঘরের অন্য সব আসবাবপত্রের শোভা, সৌন্দর্য ও মহার্ঘতার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। অগ্নিকুণ্ডে জ্বলছে আরামদায়ক আগুন।

একটা প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপ্টা এসে জানালগুলোকে কাঁপিয়ে দিল; আর বরফের একটা প্রবল ঢেউ যেন সশব্দে সব কিছুর উপর এসে আছড়ে পড়ল। সুদর্শন অবিবাহিত যুবকটি আপন মনেই বলে উঠল:

"এর অর্থ আজ আর বাইরে যাওয়া নেই। বেশ তো, আমি এতে খুসি। কিন্তু সঙ্গী-সাথীর কি হবে? মা হলে অবশ্য ভালই হয়; সুসান মাসিও ভালই; কিন্তু এরা তো সব সময়ই আছেন। আজকের মত দিনে চাই নতুন আগ্রহ, নতুন মানুষ, তবেই তো বন্দীদশার একঘেয়েমি ক্ষুরধার হয়ে উঠবে। কথাটা তো শুনতে ভালই হল, কিন্তু এর কোন অর্থ হয় না। একঘেয়েমির ধারে কেউ শান দিতে চায় না, চায় বরং উল্টোটা।

ম্যান্টেলপিসের উপরকার সুদৃশ্য ফরাসী ঘড়িটার দিকে সে তাকাল।

"ঘড়িটা আবার বিগড়েছে। এই ঘড়িটা কখনও সঠিক সময় জানে না; যখন বা জানে তখন নিজে মিথ্যা বলে-আসলে ব্যাপারটা একই। আল্‌ফ্রেড!"

কোনো সাড়া এল না।

"আলফ্রেড!.......চাকরটা ভাল, কিন্তু ঐ ঘড়িটার মতই অনিশ্চিত।"

এলোঞ্জো দেয়ালের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম হাত রাখল। একমুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার হাত দিল; আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা

করে বলে উঠল:

"নির্ঘাৎ ব্যাটারি খারাপ হয়েছে। কিন্তু একবার যখন শুরু করেছি, সময়টা জানতেই হবে।" দেয়ালের কথা বলার চোখের কাছে গিয়ে একটা বাঁশী বাজিয়ে ডাকল, "মা"। পর পর আরও দু'বার ডাকল।

"না, এতেও কিছু হল না। মায়ের ব্যাটারিও খারাপ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি, নীচের কাউকে জাগাবো যাবে না।"

রোজউড-এর টেবিলেটায় বসে বাঁ দিককার কোণের উপর থুত্‌নিটা রেখে যেন মেঝেকেই বলল: "মাসি সুসান!"

একটি মধুর নীচু গলায় জবাব এল, "কে? এলোঞ্জো?"

"হ্যাঁ। আমি এত আলস্য ও আরাম বোধ করছি যে নীচে নামতে পারছি না; কিন্তু বড়ই ফ্যাঁসাদে পড়েছি।"

"আরে, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর; তোমাকে বলতে পারি।"

"আঃ, আমাকে উৎকণ্ঠায় রেখ না। বল কি ব্যাপার?"

"আমি জানতে চাই, এখন সময় কত?"

"কী বিচ্ছু ছেলেরে বাবা! আমাকে কি দুশ্চিন্তায়ই ফেলেছিল। এই কি সব?"

"হ্যাঁ-বিশ্বাস কর। শান্ত হও। আমাকে সময়টা বলে দাও আর আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।"

"ঠিক ন'টা বেজে পাঁচ মিনিট। না, কোন দক্ষিণা দিতে হবে না-তোমার শুভেচ্ছা তুলে রাখ।"

"ধন্যবাদ।"

উঠে দাঁড়িয়ে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "ঠিক ন'টা বেজে পাঁচ মিনিট।" ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, তুমি দেখছি আগের চাইতে ভাল কাজ করছ। মাত্র চৌত্রিশ মিনিটের হেরফের। ভেবে দেখছি....ভেবে দেখছি....তেত্রিশ আর একুশ মিলে চুয়ান্ন; চুয়ান্নর চারগুণ দু'শ' ছত্রিশ। এক বাদ দিলে থাকে দু'শ' পঁয়ত্রিশ। ঠিক আছে।"

ঘড়ির কাঁটা দুটো ঘুরিয়ে একটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি রেখে বলল, "এবার দেখ, কিছুক্ষণের জন্য ঠিক চলতে পার কিনা...... নইলে তোমাকে নিলামে তুলে দেব!"

আবার টেবিলে বসে বলল, "সুসান মাসি!"

"বল।"

"প্রাতরাশ খেয়েছ?"

"হ্যাঁ, একঘণ্টা আগে।"

"খুব ব্যস্ত কি?"

"না-তবে কিছু সেলাই করার আছে। কেন?"

"সঙ্গী কেউ আছে?"

"না, তবে সাড়ে ন'টায় একজনের আসার কথা আছে।"

"আমার কাছেও যদি কেউ আসত। কারও সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"খুব ভাল কথা, আমার সঙ্গেই কথা বল।"

"কিন্তু কথাটা খুবই গোপনীয়।"

"ভয় পেয়ো না-সোজা বলে ফেল, আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।"

"বুঝতে পারছি না বলব কিনা, কিন্তু-"

"কিন্তু কি? আঃ চুপ করে থেক না। এলোঞ্জো, তুমি তো জান আমাকে বিশ্বাস করতে পার-তুমি ভাল করেই তা জান।"

"তা তো জানি মাসি, কিন্তু কথাটা খুবই গুরুতর। এর সঙ্গে আমি গভীরভাবে জড়িত-আমি নিজে, সারা পরিবার-এমন কি সারা সমাজ।"

"ওঃ এলোঞ্জো, আমাকে বল! এর একটি শব্দও কেউ জানবে না। কি ব্যাপার?"

"মাসি, সাহস করে যদি বলতে পারতাম-"

"আঃ এলোঞ্জো, দয়া করে বলে যাও। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার কথা ভাবি। সব কিছু আমাকে বল। আমাকে বিশ্বাস কর। ব্যাপার কি?"

"আবহাওয়া!"

"আবহাওয়া উচ্ছন্নে যাক! লন, আমি ভাবতে পারছি না কেমন করে তুমি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতে পারলে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে মাসি, আমি দুঃখিত। সত্যি বলছি, আমি দুঃখিত। এমন আর কখনও করব না। আমাকে ক্ষমা করলে তো?"

"করলাম; যদিও আমি জানি করা উচিত নয়। যেই আমি আজকের কথা ভুলে যাব অমনি তুমি আবার আমাকে বোকা বানাবে।"

"না, না, তা কিছুতেই করব না, কিন্তু এই আবহাওয়া, ওঃ, এই আবহাওয়া। জোর করে মনকে চাঙ্গা রাখতে হয়। বরফ, বাতাস, ঝড় আর তীব্র ঠাণ্ডা! তোমার ওখানে আবহাওয়া কেমন?"

"গরম, বৃষ্টি, বিষাদ। ছাতা মাথায় শোকযাত্রীরা রাস্তায় চলেছে; ছাতা বেয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। যতদূর চোখ যায় খোলা ছাতার একটা উঁচু পথ যেন এগিয়ে চলেছে। মনকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য ঘরে আগুন, আর ঠাণ্ডা রাখবার জন্য জানালা রেখেছি খুলে। কিন্তু সব বৃথা, কিছুই কোন কাজে আসছে না।"

কি যেন বলতে গিয়েও এলোঞ্জো থেমে গেল। এগিয়ে গিয়ে জানালায় দাঁড়াল। বাইরের শীতার্ত জগতের দিকে তাকাল। ঝড় সামনের বরফকে তীব্রবেগে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে; জানালার খড়খড়ি খট্‌খট্ শব্দে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে; একটা পরিত্যক্ত কুকুর লেজ তুলে মাথা নীচু করে কাঁপতে কাঁপতে দেয়ালের গায়ে এসে আশ্রয় খুঁজছে; একটি তরুণী বাতাসের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটু সমান বরফ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। এলোঞ্জো শিউরে উঠল; দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এর চাইতে তো ময়লা জল আর গুমোট বর্ষাও ভাল।"

জানালা থেকে এক পা সরে এসে কি যেন শোনবার আশায় কান পাতল। একটা পরিচিত গানের অস্পষ্ট মধুর সুর তার কানে বাজল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে সেই সঙ্গীত-সুধা সে পান করতে লাগল; তার হাত-পা নড়ছে না, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা বলা কঠিন। গায়কিতে কিছু ত্রুটি ছিল, কিন্তু এলোঞ্জোর কাছে সেটা ত্রুটি না হয়ে অতিরিক্ত মাধুর্য হয়ে দেখা দিল। গান থেমে গেলে একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলল, "আ, মধুর 'বিদায় ক্ষণে' গানটি এত ভালভাবে গাওয়া আমি কখনও আগে শুনিনি!"

দ্রুতপায়ে টেবিলে ফিরে গিয়ে এক মুহূর্ত কান পেতে শুনে একটু চাপা গলায় বলল, "মাসি, এই স্বর্গীয় গায়িকাটি কে গেল?"

"তার আসার আশায়ই তো এতক্ষণ ছিলাম। মাসখানেক বা মাস দুই আমার কাছেই থাকবে। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মিস-"

"দোহাই তোমার, একটু সবুর কর সুসান মাসি। তুমি যে কি কর একবার ভেবেও দেখ না!"

এক দৌড়ে সে শোবার ঘরে চলে গেল এবং মুহূর্তকাল পরেই বেশবাস পরিবর্তন করে ফিরে এসে রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল:

"চুলোয় যাক! আগুন-রঙা পটি লাগানো আকাশ-নীল ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থাতেই তো মাসি আমাকে এই পরীটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল! একবার একটা কিছু মাথায় চাপলে মেয়েদের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে সাগ্রহে বলল, "মাসি, এবার আমি প্রস্তুত।" বলেই একান্ত আগ্রহে ও শালীন ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে অভিবাদন জানাতে লাগল।

"ঠিক আছে। মিস্ রোজান্না এথেল্টন, আমার প্রিয় বোন-পো মিঃ এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স-এর সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এস! তোমরা দু'জনই ভালমানুষ; দু'জনকেই আমি পছন্দ করি; কাজেই তোমরা দু'জন এবার কথা বল, আমি বরং ততক্ষণ গৃহস্থালীর কিছু কাজকর্ম করি। বস রোজান্না; এলোঞ্জো, তুমিও বস। বিদায়; তবে বেশী দূরে আমি যাব না।"

এলোঞ্জো সারাক্ষণ মাথা নোয়াচ্ছিল আর হাসছিল, এবং কাল্পনিক চেয়ারে কাল্পনিক তরুণীকে বসবার ইঙ্গিত করছিল। এবার নিজেই আসনে বসে মনে মনে বলল, "আঃ, কী ভাগ্য! এবার বাতাস উঠুক, বরফ পড়ুক, আকাশরে মুখে ভ্রূকুটি ফুটুক! আমার তাতে কি যায় আসে।"

শুরু হল কথার পর কথা। নানান কথার ভিতর দিয়ে দুটি যুবক-যুবতীর মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল। সাধারণ পোশাকেই যুবতীটি অপরূপা সুন্দরী। সে যখন কোন উৎসব উপলক্ষে বা নাচের জন্য সাজগোজ করে তখন না জানি তাকে কেমন দেখায়!

এলোঞ্জোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে অনেক সময় কাটিয়ে দিল। যত সময় যায়, তত কথা বাড়ে। কিন্তু এক সময় চোখ তুলে ঘড়িটার দিকে তাকাতেই তার সারা গালে লালের ছোপ ছড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল:

"এবার বিদায় মিঃ ফিজ ক্লারেন্স; আমাকে এবার যেতেই হবে!"

এত তাড়াতাড়ি সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল যে জবাবে যুবকটি যে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল সেটা তার কানেই গেন না। ভ্রূকুটিকুটিল ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক করে বলল:

"এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট! প্রায় দু'ঘণ্টা, অথচ মনে হচ্ছে বিশ মিনিটও নয়! হায়, না জানি উনি আমাকে কি ভাবলেন!"

ঠিক সেই মুহূর্তে এলোঞ্জোও ঘড়ির দিকেই তাকিয়ে ছিল। সেও বলে উঠল:

"তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি! প্রায় দু'ঘণ্টা, আর আমার তো দু'মিনিট বলেও মনে হচ্ছে না! ঘড়িটা কি তাহলে আবার বকর-বকর করতে শুরু করেছে? মিস এথেল্টন! দয়া করে আর এক মিনিট। এখনও ওখানেই আছেন তো?"

"হ্যাঁ; কিন্তু তাড়াতাড়ি করুন। আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"

"দয়া করে বলবেন কি এখন ক'টা বাজে?"

মেয়েটির মুখ আবার রাঙা হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, "আমকে এ কথা জিজ্ঞাসা করছে; লোকটি কি নিষ্ঠুর!" তারপর আশ্চর্য রকমের নকল নিস্পৃহতার সঙ্গে বলল, "এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট।"

"ওঃ, ধন্যবাদ! আপনাকে তো এখন যেতেই হবে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমি দুঃখিত।"

কোন জবাব নেই।

"মিস্ এথেল্টন!"

"বলুন।"

"আপনি-আপনি এখনও আছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ; কিন্তু জলদি করুন। আপনি কি বলতে চান?"

"দেখুন-মানে-বিশেষ কিছু নয়। এখানটা বড়ই নির্জন। আমি জানি, আব্দারটা একটু বেশীই হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি কি আবারও আমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারেন না-মানে, অবশ্য যদি আপনার বিশেষ অসুবিধা না হয়?"

"আমি ঠিক জানি না-কিন্তু ভেবে দেখব। চেষ্টা করব।"

"ওঃ, অনেক ধন্যবাদ মিস এথেল্টন!......ঐ যা! সে চলে গেল, আর আবার ফিরে এল সেই কালো মেঘ, বরফ-ঝড়, আর উত্তাল হাওয়া। কিন্তু সে তো বলে গেল বিদায়, শুভ প্রাতঃকাল তো বলে নি। সে বলেছে বিদায়!.... যাই হোক, ঘড়িটা ঠিকই ছিল। দুটো ঘণ্টা যেন ডানায় বিদ্যুৎ জড়িয়ে এসেছিল!"

আসনে বসে স্বপ্নালু চোখে সে অনেকক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল:

"কী আশ্চর্য! মাত্র দু'ঘণ্টা আগে ছিলাম মুক্ত মানুষ, আর এখন আমার হৃদয় পড়ে আছে সান ফ্রান্সিস্কো-তে!"

ঠিক সেই সময় রোজান্না এথেল্টন তার শোবার ঘরে জানালার পাশে বসে একখানা বই হাতে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে, বর্ষণস্নাত সমুদ্র "গোল্ডেন গেট"-এর উপর আছড়ে পড়ছে, আর মনে মনে বলছে, "বেচারি বার্লে থেকে সে কত আলাদা; বার্লে-র তো খালি মাথা, আর সম্বলের মধ্যে আছে কণ্ঠস্বর নকল করবার অদ্ভুত কৌশল!"

২

চার সপ্তাহ পরে মিঃ সিড্নি এল্‌গারমন বার্লে "টেলিগ্রাফ হিল"-র সুসজ্জিত বসবার ঘরে একটি ভোজ-সভার আয়োজন করে সান ফ্রান্সিস্কোর সাহিত্যিক মহল, কিছু জনপ্রিয় অভিনেতা ও বোনান্‌জা-র জমিদারবাবুদের কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গীর নকল করে সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করছিল। তার বেশবাস সুশোভন, চেহারাও সুদর্শন। শুধু চোখটা ঈষৎ টেরা। তাকে বেশ হাসিখুশিও দেখাচ্ছে। একটা অস্বস্তিকর প্রত্যাশা নিয়ে সে বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। একসময়ে একটি কেতাদুরস্ত পরিচারক এসে গৃহকর্ত্রীর হাতে একটা চিঠি দিল, আর সেও কি বুঝে মাথা নাড়ল। মনে হল, তাতেই মিঃ বার্লের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেল, কারণ তার উৎসাহ ক্রমেই কমতে লাগল, আর তার একচোখে ফুটে উঠল হতাশা, এবং অন্য চোখে দেখা দিল ক্ষোভ।

যথাসময়ে লোকজনরা চলে গেল। রইল শুধু সে আর গৃহকর্ত্রী। তখন সে বলল:

"এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। সে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। সব সময়ই একটা না একটা ওজুহাত তুলছে। শুধু যদি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, কথা বলতে পারতাম-কিন্তু এই প্রতীক্ষা-"

"আপনি যাকে এড়িয়ে চলা বলছেন হয় তো সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। উপরের ছোট বসবার ঘরে গিয়ে একটু আরাম করুন গে। গৃহস্থলীর কাজের কিছুটা সুরাহা করেই আমি তার ঘরে যাব। তখন সে যাতে আপনার সঙ্গে দেখা করে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে পারব।"

ছোট বসবার ঘরটিতে যাবার জন্যই সে উপরে যাচ্ছিল, এমন সময় "সুসান মাসি"-র ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঈষৎ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে একটা পরিচিত উল্লসিত হাসির শব্দ তার কানে এল; কাজেই কোন রকম শব্দ না করেই বা কথা না বলেই সে সাহসের সঙ্গে ঘরের ভিতরে পা দিল। কিন্তু তার উপস্থিতি সম্পর্কে ঘরের লোকদের সচেতন করবার আগেই এমন কিছু কথা সে শুনতে পেল যাতে তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তার তরুণ রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একজন বলছে:

"এই তো এসেছে সোনা!"

তারপর সে শুনতে পেল, তার দিকে পিছন ফিরে রোজান্না এথেল্টন বলছে: "তোমারও এসেছে প্রিয়তম!"

সে দেখল, রোজান্নার শরীর ক্রমাগত নীচু হচ্ছে; সে শুনল, রোজান্না কাকে যেন চুমো খাচ্ছে-একবার নয় বারবার। তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। তাদের মন-ভাঙা সংলাপ সমানেই চলেছে:

"রোজান্না, আমি জানতুম তুমি সুন্দরী, কিন্তু এ রূপ যে চোখকে ঝল্সে দেয়, অন্ধ করে দেয়, নেশা ধরায়!"

"এলোঞ্জো, তোমার মুখে এ কথা শুনতে কী যে ভাল লাগছে। আমি জানি এ সত্য নয়, তবু এ জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি জানতাম তোমার মুখখানি সুন্দর, কিন্তু বাস্তবের সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের কাছে আমার কল্পনার সৃষ্টি যে কত তুচ্ছ!"

অজস্র চুম্বনের শব্দ আবার বার্লের কানে এল।

"রোজান্না আমার, তোমাকে ধন্যবাদ! এ ফটোগ্রাফ আমার চেহারার চাইতে দেখতে ভাল, কিন্তু তুমি যেন তা ভেব না। মনের মানুষ!"

"বল এলোঞ্জো।"

"আমি কত সুখী রোজান্না।"

"আঃ এলোঞ্জো, আমার আগে কেউ কোনদিন জানে নি ভালবাসা কাকে বলে, আর আমার পরেও যারা আসবে তারাও জানবে না সুখ কাকে বলে। একটি উজ্জ্বল মেঘলোকে, মন্ত্রমুগ্ধ বিমূঢ় উল্লাসের সীমাহীন আকাশে আমি ভেসে বেড়াচ্ছি!"

"আঃ, আমার রোজান্না!-তুমি তো আমারই, তাই নয় কি?"

"একান্ত-একান্তই তোমার এলোঞ্জো, আজ এবং চিরদিন! আমার সকল দিন, সকল রাতের স্বপ্নকে ঘিরে একটি মাত্র গানই বাজছে, আর সে গানের একটি মাত্র ভাষা- 'মেইন রাজ্যের ইস্টপোর্ট-এর এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স, এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স!"

"চুলোয় যাক। তার ঠিকানা তো পেলাম!" মনে মনে গর্জে উঠে বার্লে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল।

এলোঞ্জোর অজ্ঞাতেই তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল তার মা বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি হয়ে। মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তার গোটা দেহ এমনভাবে লোমের পোশাকে ঢাকা যে চোখ ও নাক ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে যেন শীতের প্রতীক, কারণ তার সর্বশরীরে

বরফের গুঁড়ো ছড়ানো।

রোজান্নার অজ্ঞাতেই তার পিছনেও দাঁড়িয়ে ছিল "সুসান মাসি", সেও যেন বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি। সে যেন গ্রীষ্মের প্রতীক, কারণ তার পরিধানে স্বল্পবাস, আর সজোরে পাখা চালিয়ে সে তার মুখের ঘাম দূর করবার চেষ্টা করছে।

দুটি নারীর চোখেই আনন্দের অশ্রু।

"এই ব্যাপার!" মিসেস ফিজ ক্লারেন্স হেঁকে উঠল, "এলোঞ্জো, তাহলে এই জন্যই ছ'সপ্তাহ ধরে তোমাকে কেউ ঘর থেকে টেনে বার করতে পারে নি।"

"সুসান মাসিও" হেঁকে বলল, "এই ব্যাপার! রোজান্না, তাহলে এই জন্যই গত ছ'সপ্তাহ যাবৎ তুমি একবারে সন্ন্যাসিনী বনে গিয়েছ!"

দুটি যুবক-যুবতী মুহূর্তে সলজ্জ ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। চোরাই মালের ব্যবসায়ীরা বিচারপতির দণ্ডাদেশের জন্য যে ভাবে অপেক্ষা করে থাকে তাদের অবস্থাও তখন ঠিক সেই রকম।

"আশীর্বাদ করি বাবা! তোমার সুখেই আমার সুখ। মায়ের বুকে এস এলোঞ্জো!"

"আমার বোনপোর জন্যই তোমাকে আশীর্বাদ করি রোজান্না! তুমি আমার বুকে এস!"

তারপর "টেলিগ্রাফ হিল"-এ ও "ইস্টপোর্ট স্কোয়ার"-এ আনন্দাশ্রুর জোয়ার বয়ে গেল, হৃদয়ের সঙ্গে হল হৃদয়ের মিলন।

দুই বাড়িরই বড়রা চাকরদের ডেকে পাঠাল। একজনকে হুকুম করা হল, "হিকোরি কাঠ দিয়ে বড় করে আগুন জ্বালাও, আর আমাকে এনে দাও গরমা-গরম লেমনেড।"

অন্যজনকে হুকুম করা হল, "আগুন নিভিয়ে ফেল, আর আমাকে এনে দাও দু'খানি তালপাতার পাখা এ এক কুঁজো বরফ-জল।"

তারপর যুবক-যুবতীকে ছেড়ে দেওয়া হল। বড়রা মশগুল হয়ে রইল এই মধুর বিস্ময়ের কথা ও বিয়ের আয়োজনের আলোচনায়।

এর কয়েক মিনিট আগেই কারও সঙ্গে দেখা না করে বা মৌখিক বিদায় না নিয়েই মিঃ বার্লে "টেলিগ্রাফ হিল"-র বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। মেলোড্রামার জনপ্রিয় অভিনেতার মতই সে দাঁত কড়মড় করতে লাগল। "ওকে সে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না! এই আমার প্রতিজ্ঞা! মহান প্রকৃতি তার শীতের লোমের পোশাক খুলে ফেলে বসন্তের মরকত শোভায় সাজবার আগেই সে হবে আমার!"

৩

দুই সপ্তাহ পরে। তিন-চারদিন ধরেই কয়েক ঘণ্টা পরে পরেই বেশ ভক্ত-ভক্ত দেখতে একটি সুবেশ পাদরি এলোঞ্জার সঙ্গে দেখা করছে। লোকটির চোখ একটু টেরা। তার কার্ডে পরিচয় লেখা, সিন্সিনাটির রেভাঃ মেল্টন হারগ্রেভ। সে জানিয়েছে, স্বাস্থ্যের জন্যই সে পাদরির কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। যদি সে বলত খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য তাহলে তার সুন্দর চেহারা ও সুগঠিত দেহ দেখেই বোঝা যেত যে সে ভুল বলেছে। টেলিফোনের ব্যাপারে একটি উন্নত ব্যবস্থা সে আবিষ্কার করেছে, আর সেটার ব্যবহারের প্রচলন করেই সে জীবিকা অর্জন করতে প্রয়াসী। সে বলেছে, "বর্তমানে টেলিগ্রাফের মারফতে কোন গান বা কনসার্টকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পাঠাবার সময় যে কেউ ইচ্ছা করলে টেলিগ্রাফের তারে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং তার সঙ্গে নিজের টেলিফোনের সংযোগ করে লুকিয়ে সেই গান শুনতে পারে। আমার এই আবিষ্কার সে সব বন্ধ করে দেবে।"

এলোঞ্জো জবাব দিল, "দেখুন, চুরি করে গান শুনলে তো গানের মালিকের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, কাজেই তাতে তার কি যায় আসে?"

"কিছুই যায় আসে না," রেভারেণ্ড বলল।

"তাহলে?" এলোঞ্জো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

রেভারেণ্ড বলল, "ধরুন, গান-বাজনার বদলে মাঝপথে যদি চুরি করে এমন কিছু শোনা হয় যা প্রেমের ব্যাপার অত্যন্ত গোপনীয় ও পবিত্র, তাহলে?"

এলোঞ্জোর মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শিউরে উঠল। বলল, "স্যার, এটা তো অমূল্য আবিষ্কার। যেমন করে হোক এটা আমার চাই-ই।"

কিন্তু আবিষ্কারটিকে সিন্‌সিনাটি থেকে আনবার পথে একান্ত অকারণেই বিলম্ব ঘটতে লাগল। ধৈর্যহারা এলোঞ্জার আর বিলম্ব সয় না। রোজান্নার মিষ্টি কথাগুলি তার সঙ্গে সঙ্গে একটা হীন চোরও শুনে ফেলবে এ চিন্তাই তার কাছে বিষতুল্য। রেভারেণ্ড মাঝে মাঝেই আসে আর বিলম্বের জন্য দুঃখ জানিয়ে বলে, ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করতে সে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। কিন্তু এলোঞ্জার মন তাতে সান্ত্বনা পায় না।

একদিন বিকেলে রেভারেণ্ড সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলোঞ্জোর দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া নেই। সে ঘরে ঢুকল, সাগ্রহে চারদিকে দেখল, আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর দৌড়ে টেলিফোনটার কাছে গেল। যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ভেসে এল "মধুর বিদায়ক্ষণ" গানটির দূরাগত অপূর্ব সুন্দর সুর-লহরী। গানের মাঝপথেই সে বাধা দিল; এলোঞ্জোর গলার স্বর হুবহু নকল করে কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে বলল:

"হৃদয়ের রাণী!"

"কে? এলোঞ্জো?"

"দয়া করে এ সপ্তাহে ও গানটা আর গেয়ো না-বরং আধুনিক কিছু গাও।"

এমন সময় সিঁড়িতে সুখী মানুষের স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ শোনা গেল। পৈশাচিক হাসি হেসে রেভারেণ্ড জানালার ভেলভেটের ভারী পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এলোঞ্জো যেন উড়ে গেল টেলিফোনের কাছে।

বলল: "প্রিয় রোজান্না, এস একসঙ্গে কিছু গাওয়া যাক।"

তিক্ত বিদ্রুপের স্বরে সে বলল, "আধুনিক কিছু কি?"

"তুমি যদি চাও তো তাই হোক!"

"ইচ্ছা হয় তুমিই গাও!"

কণ্ঠস্বরের কঠোরতর যুবকটি বিস্মিত হল, আহত হল। বলল:

"রোজান্না, এ তো তোমার মত কথা নয়।"

"মিঃ, ফিজ ক্লারেন্স, তোমার অতি ভদ্র উক্তি যদি তোমার উপযুক্ত হয়, তাহলে আমার এই উক্তিও আমার উপযুক্ত।"

"মিস্টার ফিজ ক্লারেন্স রোজান্না, কোন রকম অভদ্র উক্তি তো আমি করি নি।"

"ওঃ, তাই বটে! অবশ্য তাহলে আমিই তোমাকে ভুল বুঝেছি, আর সেজন্য সবিনয়ে ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি। হা-হা-হা! কিন্তু তুমিই তো বললে, আজ আর এ গান গেয়ো না।"

"আজ আর কি গাইবে না বললে?"

"অবশ্যই যে গানের কথা তুমি বলেছ। হঠাৎ আমরা কত দূরে চলে গেছি।"

"আমি কখনও কোন গানের কথা বলি নি।"

"নিশ্চয় বলেছ।"

"না, বলি নি।"

"আমি বলতে বাধ্য যে তুমি বলেছ।"

"আমিও পুনর্বার বলছি, আমি বলি নি।"

"আবারও দুর্ব্যবহার! এই যথেষ্ট স্যার। আমি কোনদিন তোমাকে ক্ষমা করব না। আমাদের সব সম্পর্কের এখানেই ইতি।"

তারপরেই ভেসে এল উচ্ছ্বসিত কান্নার শব্দ। এলোঞ্জো সঙ্গে সঙ্গে বলল:

"ওঃ, রোজান্না, তোমার কথা ফিরিয়ে নাও! এর মধ্যে একটা ভয়ংকর রহস্য আছে, আছে একটা মারাত্মক ভুল। তুমি বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি কোন গান সম্পর্কেই আমি কিছু বলি নি। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও আমি তোমাকে আঘাত দিতে পারি না!...রোজান্না! সোনা!....কথা বল। বলবে না?"

সব চুপ। একটু পরে এলোঞ্জো শুনতে পেল, মেয়েটির ফোঁপানি দূরে সরে যাচ্ছে। তার অর্থ সে টেলিফোনের কাছ থেকে সরে গেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের মনেই বলল, "সব দাতব্য প্রতিষ্ঠান আর দরিদ্রাশ্রমগুলোতে ঢুঁ মেরে মাকে খুঁজে বের করব। একমাত্র মা-ই বোঝাতে পারবে যে ওকে আঘাত দিতে আমি চাই নি।"

মিনিট খানেক পরে শিকারের চলাফেরার খোঁজ জানা বিড়ালের মতই রেভারণ্ড গুঁড়ি মেরে টেলিফোনের কাছে গিয়ে হাজির হল। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, চোখের জলে কাঁপা একটি নরম অনুশোচনা-ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

"প্রিয় এলোঞ্জো, আমারই ভুল হয়েছে। এমন নিষ্ঠুর কথা তুমি বলতে পার না। হয় ঈর্ষার বশে আর না হয় তামাসা করে অপর কেউ নিশ্চয় তোমার গলার স্বর নকল করে কথা বলেছে।"

রেভারেণ্ড এলোঞ্জার গলা নকল করে ঠাণ্ডা স্বরে বলল:

"তুমিই তো বলেছ, আমাদের সব সম্পর্কের ইতি হয়ে গেছে। তবে তাই হোক। তোমার অনুতাপে আমার দরকার নেই, ও সব আমি ঘৃণা করি।"

তারপরই জয়লাভের শয়তানী উল্লাসে সে সেখান থেকে চলে গেল; টেলিফোন সংক্রান্ত কাল্পনিক আবিষ্কার নিয়ে আর কোন দিন সে বাড়ি মাড়াল না।

তার চার ঘণ্টা পরে মাকে খুঁজে নিয়ে এলোঞ্জা বাড়িতে ফিরল। সান ফ্রান্সিস্কোর বাড়িতে খোঁজ-খবর নিল, কিন্তু সেখান থেকে কোন সাড়া মিলল না। নির্বাক টেলিফোনের সামনে বসে তারা অপেক্ষাই করতে লাগল।

অবশেষে সান ফ্রান্সিস্কোতে যখন সূর্য অস্ত গেল, আর ইস্টপোর্টে সন্ধ্যার পরেও সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেল, তখন বার বার উচ্চারিত "রোজান্না!" ডাকের জবাব এল।

কিন্তু হায়রে! এ যে সুসান মাসির গলা। সে বলল: "সারা দিন আমি বাইরে ছিলাম। এইমাত্র ফিরেছি। এখনই দেখছি সে কোথায় আছে।"

ওরা অপেক্ষাই করতে লাগল-দু'মিনিট-পাঁচ মিনিট-দশ মিনিট। তারপর ভয়ার্ত কণ্ঠের এই মারাত্মক কথাগুলি ভেসে এল:

"সে চলে গেছে, মালপত্র নিয়েই গেছে। চাকরদের বলে গেছে, অন্য কোন বন্ধুর কাছে যাচ্ছে। কিন্তু তার টেবিলে এই চিরকুটটি পেয়েছি। শোন 'আমি চলে গেলাম; আমার খোঁজ করো না; আমার বুক ভেঙে গেছে; আর কখনও আমার দেখা পাবে না। তাকে বলো, 'মধুর বিদায় ক্ষণে' গানটি যখনই গাইব তখনই তার কথা আমার মন পড়বে, কিন্তু ওই গানটিকে নিয়ে যে নিষ্ঠুর কথাগুলি সে বলেছে তা আমি ভুলে যাব।' এই তার চিঠি। এলোঞ্জো, এলোঞ্জো, এ সবের অর্থ কি? কি হয়েছে?"

কিন্তু এলোঞ্জো মরার মত বিবর্ণ ও শক্ত হয়ে বসে রইল। তার মা ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে জানালাটা খুলে দিল। ঠাণ্ডা তার মনটা একটু তাজা হল। সব কথা সে মাসিকে জানাল। পর্দাটা সরাবার সময় একটা কার্ড ছিটকে মেঝেয় পড়েছিল। মা সেটা তুলে পড়তে লাগল: "মিঃ সিড্নি এল্গার্নন বার্লে, সান ফ্রান্সিস্কো।"

"দুষ্কৃতকারী!" চেঁচিয়ে কথাটা বলেই এলোঞ্জো ছুটে বেরিয়ে গেল; নকল রেভারেণ্ডকে খুঁজে বের করে সে তাকে উচিত শাস্তি দেবে। কার্ডটা থেকেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে; তাছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ভালবাসার কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তাদের জীবনের পূর্বাপর অন্য সব প্রেমিক-প্রেমিকার কথাই খোলাখুলিভাবে বলেছিল-সব প্রেমিক প্রেমিকারাই তাই করে থাকে।

৪

পরবর্তী দু'মাসে অনেক কিছু ঘটল। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, বেচারি বাপ-মা-হারা রোজান্না অরিগ্ন-এর অন্তর্গত পোর্টল্যাণ্ড-এ তার ঠাকুমার কাছেও যায় নি, অথবা তাকে কোন খবরও দেয় নি; শুধু "টেলিগ্রাফ হিল"-এর বাড়িতে যে চিরকুটটা সে রেখে গিয়েছিল তারই একটা নকল তার কাছে পৌঁচেছে। যেই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকুক-অবশ্য যদি সে এখনও বেঁচে থাকে-তাকে নিশ্চয় বলা হয়েছে যেন কাউকে তার খোঁজ খবর না দেওয়া হয়, কারণ তাকে খুঁজে বের করবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

এলোঞ্জো কি তার আশা ছেড়ে দিয়েছে? না, দেয় নি। সে নিজেকে বুঝিয়েছে, "যখনই মন খারাপ হবে তখনই সেই মধুর গানটি সে গাইবে; সেই গান শুনেই আমি তাকে খুঁজে পাব।" কাজেই বিছানায়র পুটুলি ও একটা বহনযোগ্য টেলিফোন সঙ্গে নিয়ে সে দেশ-দেশান্তরের পথে বেরিয়ে পড়ল। অনেক সময়ই লোকরা অবাক হয়ে দেখল, একটি শীর্ণদেহ, বিবর্ণমুখ, দুঃখজীর্ণ মানুষ অনেক কষ্ট স্বীকার করে নির্জন সব জায়গায় টেলিগ্রাফের থাম বেয়ে উপরে উঠছে, একটা ছোট বাক্সকে কানের কাছে ধরে ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে থাকছে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচে নেমে আবার শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তাকে পাগল ও বিপজ্জনক লোক মনে করে চাষীরা তাকে লক্ষ্য করে অনেক সময় গুলিও ছোড়ে। ফলে তার জামা-কাপড়গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল, শরীরের অনেক জায়গাও কেটে-ছেড়ে গেল। কিন্তু অসীম ধৈর্যে সব কিছুই সে সয়ে গেল।

এই তীর্থযাত্রার গোড়ার দিকে সে বলত, "আহা, 'মধুর বিদায়ক্ষণে' গানটা যদি একবার শুনতে পেতাম!" কিন্তু যাত্রার শেষের দিকে বড় দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বলত, "আহা, অন্য কিছুও যদি শুনতে পেতাম।"

এইভাবে এক মাস তিন সপ্তাহ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত কিছু দরদী লোক তাকে ধর নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এর একটা বেসরকারী পাগলা-গারদে রেখে দিল।

সে কোন রকম হা-হুতাশ করল না, কারণ সে শক্তিও তার ছিল না, আর সেই সঙ্গে ছিল না মন, ছিল না কোন আশা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দয়া করে নিজের আরামদায়ক বসবার ঘর ও শোবার ঘর তাকে ছেড়ে দিল এবং সস্নেহে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল।

এক সপ্তাহের শেষের দিকেই রোগী প্রথম নিজের বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল। একটা সোফায় বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে শুয়ে সে মার্চ মাসের বাতাসের বিষণ্ণ সঙ্গীত ও নীচেকার রাস্তার চলমান মানুষের পদধ্বনি শুনছিল-তখন সন্ধ্যা ছ'টা, সারা নিউ ইয়র্কের লোক কাজের শেষে ঘরে ফিরছে। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে; জ্বলছে দুটো পড়ার বাতি; কাজেই বাইরেটা ঠাণ্ডা হলেও ঘরের ভিতরটা বেশ গরম ও আরামদায়ক। মৃদু হেসে এলোঞ্জো ভাবতে লাগল, কেমন করে প্রেমের উন্মাদনা জগতের চোখে তাকে পাগল প্রতিপন্ন করেছে। এমন সময় অনেক দূর থেকে একটি অস্পষ্ট মধুর সুর ভেসে এসে তার কানে বাজল। তার রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে গেল; ঠোঁট ফাঁক করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে কান পাতল। গানের সুর বয়েই চলেছে-সেও কান পেতে আছে, শুনছে, নিজের অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে উঠে বসেছে। অবশেষে সে চেঁচিয়ে উঠল:

"এই তো! এই তো সে! আহা, সেই স্বর্গীয় সুর-লহরী!"

সাগ্রহে নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের সেই কোণে যেখান থেকে শব্দটা আসছে; পর্দাটা সরাতেই দেখা গেল একটি টেলিফোন। সে ঝুঁকে পড়ল এবং সুরের রেশ কেটে যেতেই সোচ্চারে বলে উঠল:

"ওঃ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত পেলাম! প্রিয়তম রোজান্না, আমার সঙ্গে কথা বল! সে নির্মম রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে; সেই শয়তান বার্লে আমার গলার স্বর নকল করে দুর্বিনীত কথা শুনিয়ে তোমাকে আঘাত দিয়েছিল!"

রুদ্ধশ্বাস নীরবতা। এলোঞ্জোর মনে হল যেন এক যুগের প্রতীক্ষা। তারপর ভাষার রূপ নিয়ে ভেসে এল একটি অস্পষ্ট শব্দ:

"ওঃ এলোঞ্জো, ঐ মূল্যবান কথাগুলো আর একবার বল!"

"এই তো সত্য কথা, আসল সত্য কথা রোজান্না প্রিয়; তোমাকে প্রমাণ দেব, উপযুক্ত, যথাযথ প্রমাণ!"

"ওঃ এলোঞ্জো, আমার পাশে থাক! এক মুহূর্তও আমাকে ছেড়ে যেয়ো না! আমাকে বুঝতে দাও যে তুমি আমার পাশেই আছ! আমাকে বল, আর কোন দিন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হবে না। আহা! কী সুখের মুহূর্ত, কী আনন্দের মুহূর্ত, কী স্মরণীয় মুহূর্ত!"

"এই মুহূর্তটিকে আমরা মনে রাখব রোজান্না। প্রতি বছর ঘড়িতে যখন এই সময়টি বেজে উঠবে, তখন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই মুহূর্তটিকে স্মরণ করে আমরা অনুষ্ঠান করব, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি বছর অনুষ্ঠান করব।"

"তাই করব, তাই করব এলোঞ্জো।"

"রোজান্না আমার, আজ থেকে সন্ধ্যা ছ'টা বেজে চার মিনিট হবে-"

"বিকেল বারোটা বেজে তেইশ মিনিট হবে-"

"সে কি, রোজান্না, তুমি কোথায় আছ?"

"হনলুলু-তে স্যাণ্ডুইচ দ্বীপে। আর তুমি কোথায় আছ? আমার পাশেই থাক; মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। সে আমি সইতে পারি না। তুমি কি বাড়িতেই আছ?"

"না সোনা, আমি আছি নিউ ইয়র্ক-এ-ডাক্তারের হাতে রোগী।"

একটা বেদনাদীর্ণ আর্তনাদ এলোঞ্জোর কানে গুঞ্জন করে উঠল, ঠিক যেন একটা আহত ডাঁশের কর্কশ গুঞ্জন পাঁচ হাজার মাইল পার হয়ে এসে কানে বাজল। এলোঞ্জো তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

"শান্ত হও গো মেয়ে। ও কিছু নয়। তোমার আবির্ভাবের মধুর গুণে এর মধ্যেই আমি ভাল হয়ে উঠেছি রোজান্না!"

"বল এলোঞ্জো। উঃ কী ভয়ই না তুমি পাইয়ে দিয়েছিলে। এবার বল।"

"শুভ দিনটি কবে বলে দাও রোজান্না!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর জবাব এল ভীরু নীচু গলায়, "আমার লজ্জা করছে-কিন্তু আনন্দের সঙ্গে, সুখের সঙ্গে। তুমি-তুমি কি চাও খুব তাড়াতাড়ি হোক?"

"আজ রাতেই রোজান্না! আঃ, আর দেরী করার ঝুঁকি নেওয়া চলে না। এখনই হোক!-আজ রাতে, এই মুহূর্তে!"

"আঃ, কী উতলা মানুষরে বাবা! কিন্তু আমার এক বুড়ো কাকা ছাড়া এখানে তো আর কেউ নেই। তিনি সারা জীবনই ধর্ম-প্রচারকের কাজ করেছেন, এখন অসবর নিয়েছেন। শুধু তিনি আর তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। আমার বড় ইচ্ছা, তোমার মা আর তোমার সুসান মাসি যদি-"

"রোজান্না প্রিয়, বল আমাদের মা ও আমাদের সুসান মাসি।"

"হ্যাঁ, আমাদের মা ও আমাদের সুসান মাসি।"

"হ্যাঁ, আমাদের মা ও আমাদের সুসান মাসি-তুমি যদি খুসি হও তো এই কথা বলে আমিই খুসি। আমার ইচ্ছা, তারাও উপস্থিত থাকেন।"

"আমারও তাই ইচ্ছা। আচ্ছা, সুসান মাসিকে যদি তুমি তার করে দাও, তাহলে তার আসতে কত দিন লাগবে?"

"সানফ্রান্সিস্কো থেকে স্টীমার ছাড়বে আগামী পরশু। পথে লাগবে আট দিন। তাহলে তিনি এসে পৌঁছবেন ৩১ শে মার্চ।

"তাহলে দিন স্থির কর ১লা এপ্রিল; তাই কর রোজান্না।"

"রক্ষে কর! আমরা যে 'এপ্রিল ফুল' হয়ে যাব এলোঞ্জো।"

"আরে, সেদিনের সূর্য যখন সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে তখন আমরাই হব সব চাইতে সুখী দুটি জীব। তাহলে আমাদের কিসের ভয়? ঐ ১লা এপ্রিলই স্থির কর সোনা।"

"আমিও সর্বান্তঃকরণে বলছি, ১লা এপ্রিলই স্থির হোক।"

"আঃ কী সুখ! সময়টাও বলে দাও রোজান্না।"

"আমার পছন্দ সকালবেলা, তখন সব কিছু খুসিতে ভরা থাকে। সকাল আটটা হলে কেমন হয় এলোঞ্জো?"

"সারাদিনের মধুরতম ক্ষণ-কারণ সেই ক্ষনেই তুমি আমার হবে।"

কিছুক্ষণ ধরে একটা অস্পষ্ট অথচ উন্মত্ত শব্দ শোনা গেল-যেন ঠোঁটে তুলো লাগানো বিদেহী দুই আত্মার মধ্যে চুম্বন-বিনিময় হচ্ছে। তারপর রোজান্না বলল, "এক মিনিট অপেক্ষা কর সোনা; একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল; সেই ডাক এসেছে।

যুবতীটি বড় বসবার ঘরে গিয়ে একটা জানালার পাশে বসে বাইরের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকাল। তার মুখ লালা ও গরম হয়ে উঠেছে। সে নিজেকেই হাওয়া করতে লাগল। ছেঁড়া নীল নেকটাই বাঁধা ও আধখানা সিল্কের টুপি মাথায় একটি "কানাকা" ছেলে দরজার ফাঁকে মাথাটা গলিয়ে হাঁক দিল, "ফ্রিস্কো হাওল!"

শরীরটাকে খাড়া করে বেশ একটা গম্ভীর্যপূর্ণ ভাব এনে মেয়েটি বলল, "ভিতরে পাঠিয়ে দাও।" মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝকঝকে বরফে সেজে-তার মানে অত্যন্ত হাল্কা সাদা আইরিশ পোশাকে সেজে-মিঃ সিড্নি এল্গার্নন ঘরে ঢুকল। সে সাগ্রহে সামনে এগিয়ে গেল, কিন্তু মেয়েটি এমন ভঙ্গী করল এবং এমন ভাবে তাকাল যে সহসা লোকটি নিজেকে সংযত করে নিল। নিস্পৃহ গলায় মেয়েটি বলল, "কথামতই আমি এখানে এসেছি। তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম, তোমার অনুরোধ মেনে নিয়েছিলাম, বলেছিলাম দিন স্থির করব। দিন স্থির করেছি ১লা এপ্রিল-সকাল আটটা। এবার যেতে পার।"

"ওঃ, প্রিয়তমা আমার, সারা জীবনের কৃতজ্ঞতা যদি-"

"একটি কথা নয়। ঐ সময় পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আর কোন দেখা সাক্ষাৎ নয়, কোন রকম যোগাযোগ নয়। না-কোন মিনতি নয়; এটাই আমার সিদ্ধান্ত।"

লোকটি চলে গেলে ক্লান্ত দেহে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। নানা দুঃখ-দুর্দশার দীর্ঘ অবরোধ তার শরীরকে ক্ষয় করে দিয়েছে। সে ধীরে ধীরে বলল, "অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি। যদি আর একঘণ্টা আগে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটা থাকত-উঃ, কী সাংঘাতিক, কী বাঁচাই না বেঁচেছি! আর আমি কি না এই প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী বিশ্বাসঘাতক রাক্ষসটাকে ভালবাসতে যাচ্ছিলাম! না, এবার এই শয়তানীর জন্য তাকে অনুতাপ করতে হবে!"

এবার এই ইতিহাসকে শেষ করতে হবে, কারণ বলবার মত আর বিশেষ কিছু নেই। পরবর্তী এপ্রিলের ২রা তারিখে "হনলুলু অ্যাডভার্টাইজার" পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল:

"বিবাহ-গতকাল সকাল আট ঘটিকায় নিউ ইয়র্ক-এর রেভাঃ ন্যাথেলিনয়েল ডেভিস-এর সহযোগিতায় রেভাঃ নাথান্ হেস-এর পৌরহিত্যে যুক্তরাষ্ট্রের মেইন রাজ্যের ইস্টপোর্ট-এর অধিবাসী মিঃ এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণ্ড-এর অধিবাসিনী মিস রোজান্না এথেল্টন-এর বিবাহ-কার্য এই শহরে টেলিফোনযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কনের বান্ধবী সানফ্রান্সিস্কোর মিসেস সুসান হাউল্যাণ্ড, কনের কাকা ও কাকীমা রেভাঃ মিঃ হেস ও তার স্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সানফ্রান্সিস্কো-র মিঃ সিড্নি এল্‌গার্নন বার্লে-ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকিতে পারেন নাই। ক্যাপ্টেন হথর্ন-এর সুন্দর ইয়টখানি মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; সুখী কনে ও তাহার বন্ধুবান্ধবীরা সঙ্গে সঙ্গেই সেই ইয়ট-এ চাপিয়া লাহাইনা ও হ্যালিয়াকালা অভিমুখে শুভযাত্রায় রওনা হইয়া গিয়াছে।"

ঐ একই তারিখের নিউ ইয়র্ক-এর সংবাদপত্রগুলিতেও এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল:

"বিবাহ-গতকাল সকাল আড়াই ঘটিকায় হনলুলু-র রেভাঃ নাথান হেস-এর সহযোগিতায় রেভাঃ ন্যাথেনিয়েল ডেভিস-এর পৌরহিত্যে মেইন রাজ্যের ইস্টপোর্ট নিবাসী মিঃ এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স এবং অরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণ্ড নিবাসিনী মিস রোজান্না এথেল্টন-এর বিবাহ কার্য এই শহরে টেলিফোনযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরের পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবরা উপস্থিত থাকিয়া প্রায় সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রচুর ভূরিভোজনে ও নানা আমোদ-প্রোমোদে আপ্যায়িত হন এবং বরের বর্তমান স্বাস্থ্যের জন্য আরও দূর অঞ্চল ভ্রমণ নয় বলিয়া একুইয়ারিয়াম-এর উদ্দেশ্যে সকলে যাত্রা করিয়াছেন।"

সেই স্মরণীয় দিনটির অবসানকালে মিঃ ও মিসেস এলোঞ্জো ফিজ ক্লারেন্স নানা সময়ে তাদের বিভিন্ন বিবাহ-যাত্রায় স্মৃতি রোমন্থনের মধুর আলোচনায় ডুবে ছিল, এমন সময় সহসা তরুণী স্ত্রীটি বলে উঠল, "ওহো লোনি, বলতে ভুলেই গিয়েছি! যা করব বলেছিলাম তাই করেছি।"

"কি করেছ প্রিয়া?"

"ঠিক করেছি। তাকে 'এপ্রিল ফুল' করেছি। আর এ কতা তাকে বলেওছিলাম। আঃ কি রকম একখানা 'সারপ্রাইজ' দিয়েছি! কালো পোশাক পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে বেচারি দাঁড়িয়েছিল, কতক্ষণে বিয়ে করবে। তার কানে কানে যখন আসল কথাটা বললাম তখন তার মুখের অবস্থাটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলে। আহা, তার শয়তানীর ফলে অনেক হৃদয়-বেদনা আমি ভোগ করেছি, অনেক চোখের জল ফেলেছি, কিন্তু এবার সুদে-আসলে সব মিটিয়ে নিয়েছি। প্রতিশোধের বাসনা বাসা বেঁধেছিল আমার বুকের মধ্যে; তাই তাকে থাকতে অনুরোধ করেছিলাম; বলেছিলাম, তার সব দোষ আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু সে থাকল না। বলে গেল, প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে বেঁচে থাকবে; বলে গেল, আমাদের জীবনকে সে অভিশপ্ত করে তুলবে। কিন্তু তা সে করতে পারবে না। পারবে কি?"

"কখনও পারবে না রোজান্না!"

এই কাহিনী যখন লেখা হচ্ছে তখন পর্যন্ত সুসান মাসি, অরিগন-এর ঠাকুরমা, নব দম্পতি ও তাদের ইস্টপোর্টবাসী বাবা-মা সকলেই সুখে আছে; আর সুখেই থাকবে বলে মনে হয়। সুসান মাসি কনেকে দ্বীপ থেকে এনে তাকে সঙ্গে করে মহাদেশ পেরিয়ে পরস্পরের প্রীতিমুগ্ধ স্বামী ও স্ত্রীর প্রথম মিলনের সাক্ষী হয়ে পরম সুখ ভোগ করেছে-কারণ সেই মুহূর্তটির আগে তারা কেউ কাউকে চোখে দেখে নি।

যার দুষ্ট চালিয়াতির ফলে দুটি যুবক-যুবতীর বুক ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল, নষ্ট হতে বসেছিল তাদের জীবন, সে হতভাগ্য বার্লে

সম্পর্কে একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। জনৈক পঙ্গু ও অসহায় মিস্ত্রি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে এই কথা ভেবে তাকে খুন করতে উদ্যত হতেই বার্লে একটা জ্বলন্ত তেলের কড়াইতে পড়ে যায় এবং তুলে আনবার আগেই তার মৃত্যু ঘটে।

১৮৭৮

এডোয়ার্ড মিল্‌স্‌ ও জর্জ বেনটন: একটি কাহিনী

Edward Mills and George Benton: A Tale

দু'জনের মধ্যে ছিল দূর সম্পর্ক-সাত পুরুষের ভাই-ভাই, বা ঐ রকম একটা কিছু। শিশু কালেই তারা বাবা-মাকে হারায় এবং নিঃসন্তান ব্রাণ্ট দম্পতি তাদের দত্তক নেয়, আর অচিরেই শিশু দুটির প্রতি তাদের খুব মায়া পড়ে যায়। ব্রাণ্ট দম্পতি সব সময়ই তাদের বলত: "পবিত্র হও, সৎ হও, মিতাচারী ও পরিশ্রমী হও, অপরের প্রতি বিবেচনাশীল হও, তবেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।" কথাগুলির অর্থ বুঝবার আগেই শিশু দুটিকে কয়েক হাজার বার তা শুনতে হল; প্রভুর প্রতি প্রার্থনা শিখবার আগেই তারা এই কথাগুলি আওড়াতে শিখে ফেলল; নার্সারীর দরজায় কথাগুলি লিখে দেওয়া হল, আর সম্ভবত তারা প্রথম পড়তেও শিখল এই কথাগুলি, এডোয়ার্ড মিল্‌স্‌-এর জীবনে এটাই হয়ে উঠল অপরিবর্তনীয় বিধান। বাণ্টরা কখনও কখনও কথাগুলিকে একটু বদলে দিয়ে বলত: "পবিত্র, সৎ, পরিশ্রমী ও বিবেচনাশীল হও, কখনও তোমাদের বন্ধুর অভাব হবে না।"

আশেপাশের সকলেই খোকা মিল্‌স্‌কে ভালবাসত। সে যখন মিশ্রি খেতে চেয়ে না পেত, কখনও কেউ বোঝালে সে বুঝত এবং না পেয়েও খুসি থাকত। খোকা বেনটন যখন মিশ্রি খেতে চাইত তখন না পাওয়া পর্যন্ত সমানে কাঁদতে থাকত। খোকা মিল্‌স্‌ তার খেলনাগুলোকে যত্ন করে রাখত, আর খোকা বেনটন অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের খেলনা ভেঙে ফেলে এমন গোলমাল শুরু করে দিত যে বাড়ির শান্তি বজায় রাখতে ছোট্ট এডোয়ার্ডকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার খেলনা বেনটনকে দিয়ে দেওয়া হত।

ছেলেরা একটু বড় হয়ে উঠতেই জর্জি হয়ে উঠল অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ: সে নিজের পোশাকপত্রের মোটেই যত্ন নিত না; ফলে প্রায়ই তার গায়ে উঠত ঝকঝকে নতুন জামা; কিন্তু এডির বেলায় তা হত না। দু'জন একসঙ্গে বাড়তে লাগল। এডি ক্রমাগতই ভাল হতে লাগল, আর জর্জি হতে লাগল দুশ্চিন্তার কারণ। সাঁতার কাটা, স্কেটিং করা, পিকনিক করা, ফল কুড়নো, খেলাধূলা করা-এমনই আব্দার করলে তাকে যদি বলা হয়, 'আমি চাই যে তুমি এটা করবে না' বাস, তাই যথেষ্ট; কিন্তু জর্জি কোন কথাই শুনত না; তার যা চাই তা করতে দিতেই হবে, নইলে সে জোর করবে। স্বভাবতই এ সব কাজের সুযোগ-সুবিধা সে যত পেত তেমনটি কেউ পায় না। ভাল মানুষ ব্রাণ্টরা গ্রীষ্মকালে রাত ন'টার পরে ছেলেদের বাইরে খেলতে দিত না; ঐ সময় তাদের শুতে পাঠানো হত; এডি ঠিক শুয়ে পড়ত, কিন্তু জর্জি প্রায়ই দশটা নাগাদ জানালা গলে বেরিয়ে যেত এবং মাঝরাত পর্যন্ত বাইরে স্ফূর্তি করে বেড়াত। জর্জির এই বদ অভ্যাস দূর করা অত্যন্ত কঠিন বুঝতে পেরে ব্রাণ্টরা শেষ পর্যন্ত আপেল ও মার্বেল কিনে দিয়ে তাকে বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করত। জর্জিকে সংশোধন করবার জন্য বৃথাই তারা তাদের সব সময় ও মনোযোগ ব্যয় করত; চোখের জল ফেলতে ফেলতে তারা বলত, এডি এত ভাল, এত বিবেচক ও সব দিক থেকে এত সুন্দর যে তার জন্য কোন খাটুনিই করতে হয় না।

দেখতে দেখতে ছেলেদের কাজকর্মের বয়স হল; তাদের শিক্ষানবীশ হিসাবে পাঠানো হল: এডোয়ার্ড গেল স্বেচ্ছায়, আর জর্জকে পাঠানো হল ঘুষ দিয়ে, অনেক বলে-কয়ে। এডোয়ার্ড বিশ্বস্তভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগল; ফলে তার জন্য ভাল মানুষ ব্রাণ্টদের কোন খরচই লাগল না; কিন্তু জর্জ কাজ থেকে পালিয়ে যেত, আর তার ফলে তাকে খুঁজে পেতে এনে আবার ফেরৎ পাঠাতে মিঃ ব্রাণ্টের অর্থ ব্যয় হত, ঝামেলাও হত। এইভাবে সে আবার পালাতে লাগল-আবার টাকা ও ঝামেলা। সে তৃতীয় বার পালিয়ে গেল-এবার চুরি করে নিয়ে গেল কিছু ছোটখাট জিনিস। আবার মিঃ ব্রাণ্টকে টাকা খরচ করতে হল, ঝামেলাও হল; তাছাড়া, মালিক যাতে চুরির জন্য ছেলেটিকে কোন রকম শাস্তি না দেয় তার জন্যও অনেক চেষ্টা করতে হল।

এডোয়ার্ড ধীরস্থিরভাবে কাজ করতে লাগল এবং কালক্রমে তার মালিকের ব্যবসার পুরোপুরি অংশীদার হয়ে গেল। জর্জের কোন রকম উন্নতি হল না, প্রবীণ বাবা-মার দুশ্চিন্তা-দুর্ভোগের বোঝাই সে বাড়িয়ে চলল; তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কার করতে হত। বালক বয়সে এডোয়ার্ড রবিবার-বিদ্যালয়, বিতর্কসভা, ছোটখাট সেবা-প্রতিষ্ঠান, ধূমপান-নিবারণী সভা, অশ্লীলতা-বিরোধী সভা ইত্যাদিতে যোগ দিয়েছিল; এখন বড় হয়ে গির্জা, মিতাচারী সমিতি ও মানব উন্নতিমূলক নানাবিধ কাজে সাহায্য করতে লাগল। এসব কাজ করতে তাকে বলতেও হত না-"স্বাভাবিক প্রবৃত্তি" বশেই করত।

শেষ পর্যন্ত বুড়ো-বুড়ি মারা গেল। উইলে প্রকাশ পেল এডোয়ার্ড-এর জন্য তাদের আন্তরিক গর্ব, আর তাদের যৎসামান্য সম্পত্তি দেওয়া হল জর্জকে-তারই সেটা "প্রয়োজন", কিন্তু "করুনাময় ঈশ্বরের উচ্ছায়" এডোয়ার্ড-এর বেলা তা নয়। সম্পত্তি জর্জকে দেওয়া হল বটে, কিন্তু এক শর্তে-এই সম্পত্তির অর্থে তাকে এডোয়ার্ড-এর অংশীদারকে কিনে নিতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তি চলে যাবে

"বন্দী-মিত্র সমিতি" নামক একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে। বুড়ো একখানি চিঠি রেখে গেল, তাতে জানিয়ে দিল, তার প্রিয় পুত্র এডোয়ার্ড যেন তাদের স্থান গ্রহণ করে এবং তাদের মত করেই জর্জের উপর নজর রাখে ও আপদে-বিপদে তাকে রক্ষা করে।

এডোয়ার্ড কর্তব্যবোধেই তাদের কথামত চলতে লাগল; আর জর্জও তার ব্যবসার অংশীদার হল। অংশীদার হিসাবে সে মোটেই দামী নয়; আগে থেকে তার মদ্যপানে আসক্তি জন্মেছিল, এবার সে পাড় মাতাল হয়ে উঠল; তার চেহারা-ছবিতেই সেটা অশোভনভাবে ফুটে উঠল। কিছুদিন হল একটি মিষ্টি ভাল মেয়ের সঙ্গে এডোয়ার্ড-এর প্রণয় চলছিল। তারা পরস্পরকে খুব ভালবাসত। আর-কিন্তু এই সময় জর্জ ভীষণভাবে মেয়েটির পিছনে লাগল; প্রথমে অনুনয়-বিনয় ও শেষ পর্যন্ত চোখের জলও ফেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এডোয়ার্ড-এর কাছে গিয়ে বলল, এ অবস্থায় তার সুউচ্চ পবিত্র কর্তব্য অতি পরিষ্কার-নিজের স্বার্থপর বাসনাকে এই কর্তব্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সে দেবে না; সে "বেচারী জর্জ" কে বিয়ে করে তাকে "ভাল করে তুলবে।" সে জানে, এতে তার হৃদয় ভেঙে যাবে, তবু কর্তব্য কর্তব্যই। কাজেই সে জর্জকেই বিয়ে করল। এতে এডোয়ার্ড-এর বুক বুঝি বা ভেঙে গেল, মেয়েটির অবস্থাও তথৈবচ। যাই হোক, এডোয়ার্ড ক্রমে সে ধাক্কা সামলে উঠল এবং আর একটি মেয়েকে বিয়ে করল-এ মেয়েটিও খুবই চমৎকার।

দুটি পরিবারেই সন্তানাদি হল। স্বামীকে ভাল করে তুলতে মেরি সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ব্যাপার তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। জর্জ-এর মদ খাওয়া সমানেই চলতে লাগল, আর ক্রমে সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করল। প্রতিবেসীরাও সাধ্যমত চেষ্টা করল, কিন্তু তার স্বভাব বদলাল না। বরং একটা নতুন পাপ তাকে ভর করল-ইদানিং সে গোপনে জুয়া খেলতে শুরু করেছে। ফলে তার অনেক টাকা ধার হল; কাউকে না জানিয়ে সে ব্যবসা বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে লাগল এবং এই ব্যাপার এতদূর গড়াল যে একদিন সকালে শেরিফ এসে দোকানের কর্তৃত্ব নিয়ে নিল, আর দুই ভাই হল কপর্দকহীন।

একেই দিনকাল খুব খারাপ, ক্রমে আরও খারাপ হতে লাগল। এডোয়ার্ড সপরিবারে একটা চিলেকোঠায় গিয়ে উঠল এবং কাজের খোঁজে সারা দিন পথে ঘুরতে লাগল। অনেকের কাছে ধর্ণা দিল, কিন্তু কাজ জুটল না। কত তাড়াতাড়ি লোকে তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। এতদিন তার প্রতি লোকের যে আগ্রহ ছিল সেটা এত তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে গেল দেখে সে যেমন অবাক হল, তেমনই মর্মাহত হল। তবু কাজ তার চাই-ই; কাজেই সব কিছু হজম করে সে কাজের খোঁজেই ফিরতে লাগল। অবশেষে একটা কাজ সে পেল; ইট মাথায় নিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠতে হবে; তবু তাতেই সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই থেকেই সকলে যেন তাকে ভুলে গেল। বিভিন্ন নৈতিক প্রতিষ্ঠানে সে যে টাকা দিত তা না দিতে পারায় সেখান থেকে তার নাম কাটা গেল। ফলে তার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

কিন্তু এডোয়ার্ড যত তাড়াতাড়ি জনসাধারণের মন থেকে মুছে গেল, ঠিক তত তাড়াতাড়িই জর্জ সেখানে নিজের আসন করে নিল। একদিন সকালে ছিন্ন বস্ত্রে মাতাল অবস্থায় তাকে একটা পতিতা-পল্লীতে পাওয়া গেল। একটি "মহিলা মিতাচার আশ্রয় সংস্থা" তাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিল, তার জন্য চাঁদা তুলল, সারাটা সপ্তাহ তাকে ভালভাবে রাখল, আর তারপরে তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিল। এই সবের একটা বিবরণও খবরের কাগজে ছাপা হল। ফলে এই অসহায় লোকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল; তাকে নানা ভাবে সাহায্য করতে ও উৎসাহ দিতে অনেক লোক এগিয়ে এল। দু'মাস সে এক ফোঁটা মদ খেল না; ফুলে সে সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তারপর আবার তার পতন হল-আবার পতিতা-পল্লী; সকলেই দুঃখিত হল, হা-হুতাশ করল। সেই মহীয়সী ভগ্নী-সংঘ আবার তাকে উদ্ধার করল। তারা তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল, খেতে দিল, মন দিয়ে তার অনুতাপের করুণ বিলাপ শুনল, আবার তার চাকরিটা পাইয়ে দিল। এই ঘটনার বিবরণও খবরের কাগজে প্রকাশিত হল। মদের পাত্রের যুযুধান শিকার এই অসহায় জন্তুটির পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে গোটা শহর অনেক চোখের জল ফেলল। বেশ বড় করে একটা মিতাচার-সম্মেলন ডাকা হল; অনেক জ্বালাময়ী বক্তৃতা হল; তারপর সভাপতি বলল: "এবার আমরা পাপীদের আহ্বান করছি; এমন একটা দৃশ্য আপনাদরে সামনে উপস্থিত করা হবে যা দেখে অনেকেই চোখের জল রুখতে পারবেন না।" কিছুক্ষণ বাঙ্ময় নীরবতার পরে "মহিলা মিতাচার আশ্রয় সংস্থা"-র জনৈক লাল পোশাকধারিণীর সঙ্গে মঞ্চের সামনে এসে হাজির হল জর্জ বেনটন। প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করল। হাততালিতে বাতাস মুখরিত হল; প্রত্যেকেই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সভার শেষে সকলেই নতুন সদস্যটির সঙ্গে কর-মর্দন করল; পরদিন তার মাইনে বাড়ানো হল; সারা শহরে শুধু তারই কথা; সেই নায়ক। এ ঘটনার বিবরণও খবরের কাগজে প্রকাশিত হল।

প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিতভাবেই জর্জ বেনটন-এর পতন ঘটতে লাগল আর প্রতিবারই বিশ্বস্ত হাতে তাকে উদ্ধার করে এনে নতুন চাকরিতে বহাল করা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাকে সারা দেশ ঘুরিয়ে আনা হল; একজন সংশোধিত মাতাল হিসাবে সর্বত্র সে বক্তৃতা

করল; তাকে মস্ত বড় বাড়ি দেওয়া হল; অনেক সোনাদানা সে সঞ্চয় করে ফেলল।

সে সময়টা সে ভালভাবে থাকে সেই সময় সে স্বদেশে এত বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং সকলের এত বেশী বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল সে একজন গণ্যমান্য নাগরিকের নাম ভাড়িয়ে সে ব্যাংক থেকে অনেক টাকা হাতিয়ে নিল। এই জালিয়াতির ফল ভোগ করার হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হল এবং আংশিক সফলও হল-মাত্র দু' বছরের জন্য তাকে সংশোধনাগারে "পাঠিয়ে দেওয়া হল"। এক বছর পরেই পরোপকারী সংস্থাটির নিরলস প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল; পকেটে একখানি মার্জনা-পত্র নিয়ে সে বেরিয়ে এল সংশোধনাগার থেকে। "বন্দী-মিত্র সমিতি" দরজাতেই তার সঙ্গে দেখা করে একটা ভাল মাইনের চাকরি তাকে দিল; অন্য সব মহানুভব লোকরাও এগিয়ে এসে তাকে দিল পরামর্শ, উৎসাহ ও সাহায্য। অত্যন্ত প্রয়োজনে এডোয়ার্ড মিল্‌স্‌ একবার একটা চাকরির জন্য "বন্দী-মিত্র সমিতি"-তে দরখাস্ত করেছিল; কিন্তু "আপনি কি কখনও কয়েদী ছিলেন?" এই প্রশ্নটিই তার আবেদন নাকচ করার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল।

এদিকে যখন এই সব চলছে, ওদিকে তখন এডোয়ার্ড মিল্‌স্‌ শান্তভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। সে তখনও গরিব, তবে একটা ব্যাংকের সম্মানিত ও বিশ্বাসভাজন ক্যাশিয়ার হিসাবে একটা মোটামুটি ভাল মাইনেই পায়। জর্জ বেনটন কখনও তার কাছে যায় না, বা তার খোঁজ-খবর নেয় না। জর্জ প্রায়ই শহর থেকে বাইরে গিয়ে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে আসে; তার সম্পর্কে নানা রকম খারাপ কথা শোনা যায়, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানা যায় না।

একদা এক শীতের রাতে কয়েকটি মুখোশধারী চোর ব্যাংকে ঢুকে দেখে সেখানে এডোয়ার্ড মিল্‌স্‌ একা আছে। সিন্দুক খুলবার জন্য তারা এডোয়ার্ড-এর কাছে চাবির "নম্বর" জানতে চাইল। সে জানাতে অস্বীকার করল। তারা তাকে জীবনের ভয় দেখাল। সে বলল, মালিকরা তাকে বিশ্বাস করে, সুতরাং সে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারবে না। দরকার হলে সে প্রাণ দেবে, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবে বিশ্বাসভাজন হয়েই বাঁচবে; চাবির "নম্বর" সে কিছুতেই বলবে না। চোররা তাকে খুন করল।

গোয়েন্দারা দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করল; তাদের পাণ্ডা স্বয়ং জর্জ বেনটন। মৃত লোকটির বিধবা পত্নী ও পিতৃহীন সন্তানদের জন্য সকলের মনেই সহানুভূতি জাগল; দেশের সব খবরের কাগজই লেখা হল-নিহত ক্যাশিয়ারের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের স্বীকৃতির প্রমাণ হিসাবে মৃতের সহায়সম্বলহীন পরিবারের জন্য উদারভাবে অর্থ সাহায্য করা দেশের সবগুলি ব্যাংকের অবশ্য কর্তব্য। ফলে মোটা নগদ টাকা চাঁদা উঠল-একটি ব্যাংক উর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ শ' ডলার পর্যন্ত দিল। কিন্তু ক্যাশিয়ারের নিজের ব্যাংক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে জানাল যে, এই নিষ্কলংক কর্মীটির নিজের হিসাবেই গোলমাল ছিল, আর ধরা পড়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে নিজেই একটা মুগুড় দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

জর্জ বেনটনকে বিচারের জন্য ডাকা হল। তখন বেচারি জর্জের প্রতি অনুকম্পায় সকলেই বিধবা ও তার সন্তানদের কথা ভুলে গেল। তাকে বাঁচাবার জন্য অর্থ ও প্রতিপত্তি দিয়ে যা করা সম্ভব সবই করা হল, কিন্তু সবই বৃথা হল; তার মৃত্যুদণ্ড হল। সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডহ্রাস অথবা ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য আবেদন-পত্র নিয়ে গভর্ণরকে ঘেরাও করা হল; আবেদন-পত্রগুলি নিয়ে এল ক্রন্দনরতা বালিকারা; শোকার্ত বুড়িরা; বিপন্ন বিধবাদের প্রতিনিদিরা; ঝাঁকে ঝাঁকে বাপ-মাহারা শিশুরা। কিন্তু না, গভর্ণর-এই একটি ক্ষেত্রে-কোন কথা শুনল না।

এতদিনে জর্জ বেনটন-এর ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল। সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন থেকে তার জেলখানার ঘর সব সময় বালিকা, স্ত্রীলোক ও তাজা ফুলে ভরে উঠতে লাগল; সারাদিন ধরে চলল প্রার্থনা, স্তব-গান, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ধর্মোপদেশ ও অশ্রুবর্ষণ; মাঝে মাঝে জলখাবার জন্য সাময়িক বিরতি ছাড়া এই অনুষ্ঠান চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্নভাবে।

ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত এই সব কাণ্ড-কারখানা চলতে লাগল; দেশের সব চাইতে মিষ্টি ও বিলাসকারীদের সমুখ দিয়ে জর্জ বেনটন কালো টুপি পরে সগর্বে স্বস্থানে চলে গেল। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য তার সমাধিকে তাজা ফুলে ঢেকে দেওয়া হতে লাগল; মাথার দিককার পাথরে উপরের দিক লক্ষ্য করে একটা তীর-চিহ্ন দিয়ে এই কথাগুলি লিখে দেওয়া হল: "তার যুদ্ধ সে ভালভাবেই করে গেছে।"

সাহসী ক্যাশিয়ারের সমাধির মাথার দিককার পাথরে লেখা হল এই কথাগুলি: "পবিত্র, সৎ, মিতাচারী, ও বিবেচনাধীন হও, তাহলে কখনও-"

এ কথাগুলি লিখবার নির্দেশ কে দিয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু নির্দেশটা এই রকমই ছিল।

লোকে বলে, ক্যাশিয়ারের পরিবার এখন খুবই দুঃস্থ অবস্থায় আছে; কিন্তু তাতে কি; বহু গুণমুগ্ধ লোক ভাবল যে এ রকম একটা বীরত্বপূর্ণ সৎকাজ কোন রকম পুরস্কার পাবে না এটা ঠিক নয়; সুতরাং তারা বিয়াল্লিশ হাজার ডলার চাঁদা তুলল-এবং সেই অর্থে একটি স্মৃতি-গির্জা নির্মাণ করল।

১৮৮০

মিসেস্ ম্যাক্‌উইলিয়াম্‌স্ ও বিদ্যুৎ

Mrs. Mcwilliams and the Lightning

দেখুন স্যার-মিঃ ম্যাক্‌উইলিয়াম্‌স্ বলতে লাগল, কারণ এটাই তার আলোচনার সূত্রপাত নয়-বিদ্যুতের ভয় মানুষকে সব চাইতে বেশী কাবু করে থাকে। প্রধানত মেয়েদেরই এ ভয়টা বেশী থাকে; তবে কখনও কখনও ছোট কুকুরের মধ্যেও দেখা যায়, আর কখনও বা পুরুষ মানুষের মধ্যেও। এই ভয়টা বিশেষভাবে ক্লেশকর, কারণ এই ভয়ের ফলে মানুষ যে ভাবে সাহস হারিয়ে ফেলে তেমন আর কোন ভয়ের বেলাতেই হয় না; তাছাড়া বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বা লজ্জা দিয়েও মানুষের মন থেকে এ ভয়কে দূর করা যায় না। যে নারী স্বয়ং শয়তানের-বা একটা ইঁদুরের-মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, সেও কিন্তু বিদ্যুতের ঝিলিকের সামনে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে। তার সে ভয়ের অবস্থা দেখলে সত্যি করুণা হয়।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, "মার্টিমার! মার্টিমার!" বলে একটা অনির্দিষ্ট চাপা চীৎকার কানে আসায় আমি জেগে উঠলাম। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আত্মস্থ হয়ে অন্ধকারেই এগিয়ে গিয়ে বললাম:

"ইভাঞ্জেলিন, তুমি ডাকছ কি? ব্যাপার কি? তুমি কোথায়?"

"জুতোর ঘরে আটকা পড়েছি। বাইরে এমন ভয়ংকর ঝড় হচ্ছে, আর তুমি শুয়ে ঘুমুচ্ছ! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।"

"সে কি? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আবার লজ্জা পাব কেমন করে? এটা খুবই অযৌক্তিক কথা; একটা লোক যখন ঘুমোয় তখন সে লজ্জা পেতে পারে না ইভাঞ্জেলিন।"

"তুমি কখনও চেষ্টা কর না মর্টিমার-তুমি ভাল করেই জান যে তুমি কখনও চেষ্টা কর না।"

চাপা কান্নার শব্দ কানে এল।

আমার ঠোঁটে যে কড়া কথাগুলো এসেছিল সেই শব্দ শুনে সেগুলো মাঠে মারা গেল; তার বদলে আমি বললাম-

"আমি দুঃখিত সোনা, সত্যি দুঃখিত। এ কাজ করতে আমি চাই নি। ফিরে এস, আর-"

"মার্টিয়াম!"

"কী আশ্চর্য! কি হয়েছে তোমার?"

"তুমি কি এখনও বিছানায় শুয়ে আছ?"

"তা তো আছি।"

"এই মুহূর্তে উঠে এস। তোমার নিজের জন্য না হোক, আমার জন্য আর ছেলেমেয়েদের জন্যও তো নিজের জীবনের প্রতি একটু সাবধান হওয়া তোমার উচিত।"

"কিন্তু সোনা-"

"কোন কথা শুনতে চাই না মার্টিমার। তুমি তো জান, এ রকম বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের সময় বিছানার মত এত বিপজ্জনক আর কিছু নেই-সব বইতেই সে কথা বলে; তবু তুমি শুয়েই থাকবে-ইচ্ছা করে জীবনটাকে ছুড়ে ফেলে দেবে-কিন্তু কেন দেবে? শুধুই তর্ক আর তর্ক করবার জন্য, আর-"

"কিন্তু ইভাঞ্জেলিন, এখন আমি আর বিছানায় নেই। আমি-"

[সহসা বিদ্যুৎ চমকাল আর তার পরেই শোনা গেল ম্যাকউইলিয়াম্‌স্‌-এর ভয়ার্ত আর্তনাদ ও প্রচণ্ড বজ্রের শব্দ, আর তার ফলেই আমার কথায় বাধা পড়ল।]

"ঐ শোন! এবার ফলাফল বোঝ। ওঃ মার্টিয়াম, এমন সময়েও দিব্যি করবার মত অসৎ তুমি হলে কেমন করে?"

"আমি তো দিব্যি করি নি। আর করলেও এ সব তো তার ফল হতে পারে না। আমি যদি একটি কথাও না বলতাম তাহলেও এ সব কিছুই ঘটত না। এ সব তো তুমিও ভাল করেই জান ইভাঞ্জেলিন-অন্তত তোমার জানা উচিত-যে আবহাওয়া যখন বিদ্যুতে পূর্ণ হয়-

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তর্কই কর-তর্কই কর-তর্কই কর!-তুমি যখন জান যে এ বাড়িতে একটাও বজ্রবারণ দণ্ড নেই এবং তোমার বেচারী স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের জীবন একান্তভাবেই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তখনও এ কাজ তুমি কেমন করে করছ আমি তো বুঝতে পারছি না। কি করছ তুমি? এ হেন সময়ে দেশলাই জ্বালাচ্ছ! তুমি কি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ?"

"ধুত্তোর মেয়ে মানুষ; বলি, এতে ক্ষতিটা কি? এ স্থানটা তো নরকের মত অন্ধকার। আর-"

"নিভিয়ে ফেল! এক্ষুণই নিভিয়ে ফেল! তুমি কি আমাদের সবাইকে বলি দিতে কৃতসংকল্প? তুমি তো জান, আলো বিদ্যুৎকে যত আকর্ষণ করে এমন আর কিছুতেই করে না। [ফট্‌!-ফট্‌-র্‌! বুম্‌-ব্লুম্‌-বুম্‌-বুম্‌!] ওই শোন! এখন চোখ মেলে দেখ তুমি কি করেছ!"

"না, আমি কি এমন করেছি আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটা দেশলাই বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করতে পারে তা আমি জানি, কিন্তু তাতে কখনও বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় না-সে কথা আমি বাজি ধরে বলতে পারি। তাছাড়া, এক্ষেত্রে তো আমার দেশলাই ওটাকে এক তিলও আকর্ষণ করে নি, কারণ ঐ বিদ্যুৎটা যদি আমার দেশলাইয়ের দিকে তাক করে এসে থাকে তাহলে তো বলতে হবে ওর নিশানার জ্ঞান অত্যন্ত বাজে-লাখে একটাও লক্ষ্যভেদ হবে কিনা-"

"কি লজ্জার কথা মার্টিমার! এখানে আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি কি না কাব্যিক বুলি আওড়াচ্ছ! তোমার যদি ইচ্ছা না হয়-মার্টিমার!"

"বল?"

"আজ রাতে তুমি কি প্রার্থনা করেছিলে?"

"আমি-আমি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তেরোর বারে গুণ কত হয় সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে-"

[ফট্‌!-বুম্‌-বেরুম্‌-বুম্‌! মাম্বল্‌-আম্বল্‌ ব্যাং-ঝন্‌ঝন্‌!]

"হায়, আমরা মারা পড়লাম, আর কোন আশাই নেই! এ রকম সময়েও এ জিনিসকে কী করে যে তুমি উপেক্ষা করতে পারলে?"

"কিন্তু সময়টা তো খারাপ কিছু ছিল না। আকাশে এতটুকু মেঘ ছিল না। আর ও রকম একটুখানি ত্রুটির ফলে যে এতবড় হৈ-চৈ কাণ্ড ঘটবে তাই বা আমি জানব কেমন করে? আমার তো মনে হয়, এ নিয়ে হৈ-চৈ করাও তোমার পক্ষে ঠিক হয় নি, কারণ এ জিনিস তো আর সচরাচর ঘটে না। চার বছর আগে একটা ভূমিকম্প ঘটানোর পর থেকে আর কখনও আমার প্রার্থনা করতে ভুল হয় নি।"

"মার্টিমার! কী বলছ তুমি! পীত-জ্বরের কথাটা কি ভুলেই গেলে?"

"আরে বাবা, তুমি তো সব সময়ই পীত-জ্বরটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। কিন্তু আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা ছাড়া একটা তারবার্তাও যখন মেমফিস পর্যন্ত পাঠানো যায় না, তখন আমার দিক থেকে এতটুকু ভক্তির অভাবে এতবড় কাণ্ডটা ঘটে কেমন করে? ভূমিকম্পটা আমি মেনে নিচ্ছি, কারণ সেটা কাছাকাছিই ঘটেছিল। কিন্তু যে কোন ঘটনার জন্যই যদি আমাকে দায়ী করা হয় তাহলে-"

[ফট্!-বুম্-বেরুম-বুম! বুম্!-ঝনাৎ!]

"হায়, হায়, হায়! ঐ আর একটা কিছুরই উপর পড়ল। আর একটা দিনের আলো আমরা আর দেখতে পাব না। আর আমরা যখন থাকব না তখন যদি এই কথাটি স্মরণ কর যে তোমার এই ভয়ংকর কথাবার্তাই-মার্টিমার!"

"আবার কি হল?"

"তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে-মার্টিমার, সত্যি সত্যি তুমি খোলা অগ্নিকুণ্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে আছ?"

"সেই দুষ্কর্মটাই তো করেছি।"

"এই মুহূর্তে ওখান থেকে সরে যাও! তুমি দেখছি আমাদের সব্বাইকে ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প। তুমি কি জান না, খোলা চিমনির চাইতে ভাল বিদ্যুৎ-পরিবাহী আর কিছু নেই? তুমি কোথায় আছ?"

"এই তো জানালায়।"

"আঃ, দোহাই তোমার। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই মুহূর্তে ওখান থেকে সরে যাও! কোলের ছেলেটাও জানে যে বজ্রসহ ঝড়ের সময় জানালার পাশে দাঁড়ানো খুবই মারাত্মক। হায়, হায়, বুঝতে পারছি, আমাকে দিনের আলো আর দেখতে হবে না! মার্টিমার!"

"বল।"

"খসখস শব্দটা কিসের?"

"আমি করেছি।"

"তুমি কি করছ?"

"পাঁৎলুনের উপরের দিকটা খুঁজছি।"

"শিগগীর! ওটা ছুড়ে ফেলে দাও! না কি ইচ্ছা করেই তুমি এ সময়ে ওগুলি পরছ? অথচ তুমি তো ভাল করেই জান, পশমী জামা-কাপড় যে বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে সে বিষয়ে সব পণ্ডিতরাই একমত। হায়রে, প্রাকৃতিক কারণেই তো মানুষের কত বিপদে ঘটে, কিন্তু তুমি দেখছি সে বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলতেই চেষ্টা করছ। আঃ, গান করো না! তুমি ভেবেছ কি?"

"কেন? এতে ক্ষতিটা কি হচ্ছে?"

"মার্টিমার, তোমাকে একবার বলেছি-হাজার বার বলেছি-গানের ফলে বাতাসে যে কম্পন হয় তাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতি ব্যাহত হয়, এবং-আরে, তুমি আবার দরজাটা খুলছ কেন?"

"কী আশ্চর্য মেয়ে মানুষ! কেন? কেন? তাতে আবার কি ক্ষতি হবে?"

"ক্ষতি? এত মৃত্যু ঘটবে। এ বিষয়ে এতটুকু খবর যে রাখে সেও জানে যে বাতাসের ঝাপ্টা বিদ্যুৎকে ডেকে আনে। দরজাটা তো অর্ধেকটাও বন্ধ কর নি; শক্ত করে বন্ধ করে-তাড়াতাড়ি কর, নইলে সর্বনাশ হবে। আঃ, এ রকম সময়ে একটা উন্মাদকে নিয়ে এক ঘরে কাটানো কী ভয়ংকর। মার্টিমার, কি করছ তুমি?"

"কিছু না। একটু কলটা খুলেছি। ঘরটা বড়ই গরম হয়ে উঠেছে। হাতে-মুখে একটু জল দেব।"

"তোমার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ যখন অন্য জিনিসের উপর একবার পড়ে তকন জলের উপর পরে পঞ্চাশ বার। কল বন্ধকরে দাও। হায়, হায়, বুঝতে পারছি, আজ আর কোন মতেই আমাদের রক্ষা নেই। মনে হচ্ছে-মার্টিমার, ওটা কি হল?"

"ওটা-মানে একটা ছবি। ধাক্কা লেগে পড়ে গেল।"

"তার মানে তুমি দেয়ালের কাছে ঘেঁসেছ! এ রকম অবিবেচনার কথা আমি কখনও শুনি নি! তুমি কি জান না, দেয়াল অপেক্ষা ভাল বিদ্যুৎ-পরিবাহী আর কিছুই নেই? ওখান থেকে সরে এস। আরে, তুমি আবার বকবক করছ। তোমার পরিবারের সকলের এই বিপদ, আর তোমার দুষ্টুমির শেষ নেই! মার্টিমার, আমি যে বলেছিলাম একটা পাগলকে বিছনার অর্ডার দিতে, সেটা দিয়েছিলে কি?"

"না। ভুলে গিয়েছি।"

"ভুলে গিয়েছ! তার ফলে যে তোমার জীবনটাই চলে যেতে পারে। এখন যদি একটা পালকের বিছানা থাকত তাহলে সেটাকে ঘরের মাঝখানে পেতে তার উপর শুয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারতে। এখানে চলে এস-আরও কিছু পাগলামি করবার আগেই চলে এস।"

আমি চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা বন্ধথাকায় সেই ছোট্ট কুটুরিতে আমদের দু'জনকে ধরে না। কিছুক্ষণ হাঁসফাঁস করে আমি জোর করে বেরিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী হাঁক দিয়ে বলল:

"মার্টিমার, তোমাকে বাঁচাবার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। ম্যান্টেলপিসের এক কোণ থেকে জার্মান বইটা আর একটা মোমবাতি আমাকে দাও; জ্বালিও না; একটা দেশলাই দাও, আমি এখানে জ্বালিয়ে নেব। বইটাতে অনেক কিছু নির্দেশ আছে।"

বইটা খুঁজে পেলাম, কিন্তু খুঁজতে গিয়ে একটা পাত্র ও টুকিটাকি কিছু জিনিস ভাঙল। ভদ্রমহিলা মোমবাতিটা নিয়ে দরজা বন্ধকরে দিল। আমি একটুখানি সময় স্বস্তি পেলাম। তারপরেই সে ডেকে বলল:
"মার্টিমার, ওটা কি?"

"একটা বিড়াল; আর কিছু না।"

"বিড়াল! সর্বনাশ! ওটাকে ধর, আটকে রাখ। তাড়াতাড়ি কর সোনা। বিড়াল একেবার বিদ্যুতে ভরা। বুঝতে পারছি, এই এক রাত্রেই আমার সব চুল সাদা হয়ে যাবে।"

আবার সেই চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তা না হলে সেই অন্ধকারে আমি কিছুতেই হাত-পা নাড়তাম না।

যা হোক, কাজে লেগে গেলাম। চেয়ারে ধাক্কা খেলাম, নানা জিনিসের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত চার শ' ডলারের বেশী মূল্যের জিনিসপত্র ভেঙে বিড়ালটাকে কমোডের মধ্যে আটক করলাম। তখন কুটুরির ভিতর থেকে এই চাপা শব্দগুলি শুনতে পেলাম:

"এখানে লেখা আছে, ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে থাকাই সব চাইতে নিরাপদ, আর সেই চেয়ারের পায়াগুলিকে ঢাকা দিয়ে অ-বিদ্যুৎপরিবাহী করে নিতে হবে। তার মানে, চেয়ারের পায়াগুলোকে কাঁচের পাত্রের মধ্যে বসিয়ে নিতে হবে।
[ফট্!-বুম্-ব্যাং!-ঝনাৎ!] শুনতে পাচ্ছ! মার্টিমার, বিদ্যুতাহত হবার আগেই তাড়াতাড়ি কর।"

কাঁচের পাত্র খুঁজতে গিয়ে সবগুলো ভেঙে কোন রকমে অবশিষ্ট চারটি পেলাম। চেয়ারের পাগুলোকে তার মধ্যে বসিয়ে তারপর কি করতে হবে জানতে চাইলাম।

এক গাদা জার্মান শব্দ উচ্চারণ শেষ করে সে বলল, "মার্টিমার, এ কথাগুলোর অর্থ কি? ধাতুর জিনিস কাছে রাখতে হবে, না দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে?"

"দেখ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! জার্মান ভাষার সব পরামর্শই কেমন যেন অল্প-বিস্তর গোলমেলে। তবে যতদূর মনে হয়, এর অর্থ-কিছু ধাতুর জিনিস সঙ্গে রাখতে হবে।"

"হ্যাঁ, তাই হবে। সেটাই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। তুমি তো জান, ও জিনিসপত্রগুলি বজ্রবারণ দণ্ডের মতই কাজ করে। তোমার অগ্নি-নির্বাপক মস্তকাবরণটা পরে নাও মার্টিমার; ওর প্রায় সবটাই ধাতুতে তৈরি।"

সেটা খুঁজে নিয়ে মাথায় চড়ালাম-বদ্ধ ঘরের মধ্যে এই গরমের রাতে জিনিসটা যেমন ভারী ও দেখতে বাজে, তেমনই অস্বস্তিকর মনে হল। এমন কি আমার রাত-পোশাকটাও প্রয়োজনের চাইতে বেশী ভারী মনে হতে লাগল।

"মার্টিমার, মনে হচ্ছে তোমার দেহের মধ্যাংশটাও সুরক্ষিত করা দরকার। দয়া করে তোমার সামরিক তলোয়ারটা কোমরে বেঁধে নাও না?"

সেই মতই কাজ করলাম।

"মার্টিমার, এবার তোমার পা দুটির সুরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। দয়া করে ঘোড়ার কাঁটা পায়ে পরে নাও।"

তাই করলাম-নিঃশব্দে-আর মেজাজটাকেও সাধ্যমত শান্ত করলাম।

আবার সেই বই থেকে একগাদা জার্মান শব্দ আউড়ে সে বলল, "মার্টিমার, এর অর্থ কি এই যে বজ্রসহ ঝড়ের সময় গির্জার ঘণ্টা না বাজানোটাই বিপজ্জনক?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে, কারণ গির্জার চূড়া খুব উঁচু হওয়ার আর "লুফ্‌টযুগ" না থাকায় ঝড়ের সময় ঘণ্টা না বাজানোটা খুবই বিপজ্জনক। তা ছাড়া, যে ভাবে কথাগুলি-"

"ও সব থাক মার্টিমার; বাজে কথার মূল্যবান সময় নষ্ট করো না। বড় খাবার-ঘণ্টাটা নিয়ে এস; ওই হল-ঘরেই আছে। তাড়াতাড়ি মার্টিমার। এবার আমরা প্রায় নিরাপদ। আঃ, মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমরা বেঁচে গেলাম!"

আমাদের ছোট গ্রীষ্মাবাসটি একসারি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। সামনেই উপত্যকা। আশেপাশে কয়েকটা গোলাবাড়ি আছে-সকলের চাইতে কাছেরটা প্রায় তিন-চার শ' গজ দূরে।

চেয়ারের উপর সওয়ার হয়ে প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে সেই ভয়ংকর ঘণ্টাটা বাজিয়েই চলেছি। এমন সময় জানালার খড়খড়িটা বাইরে থেকে সজোরে খুলে ফেলা হল; একটা ঝলমলে ষাঁড়-চক্ষু বাতি জানালা দিয়ে ঢুকল; আর সেই সঙ্গে কানে এল কর্কশ প্রশ্ন:

"এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে?"

জানালায় অনেকগুলি মাথা, আর সেই সব মাথার অনেকগুলি চোখ উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমার রাত-পোশাক ও রণ-সজ্জার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ঘণ্টাটা ফেলে দিলাম; কিছু না বুঝেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামলাম; বললাম:

"ব্যাপার কিছুই না বন্ধুগণ-শুধু এই বজ্রসহ ঝড়ের জন্যে একটু গোলমাল হচ্ছে। বিদ্যুৎকে দূরে রাখবার চেষ্টা করছিলাম।"

"সবজ্র ঝড়? বিদ্যুৎ? সে কি মিঃ ম্যাক্‌উইলিয়াম্‌স্‌, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী সুন্দর তারায় ভরা রাত; ঝড়ের নামগন্ধও তো নেই।"

বাইরে তাকালাম। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলাম না। তারপর বললাম:

"কিছুই বুঝতে পারছি না। পর্দা ও খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, শুনেছি বজ্রের গর্জন।"

একের পর এক লোকগুলো হেসে মাটিতে পড়ল-দু'জন তো মরেই গেল। একজন বলে উঠল:

"বড়ই দুঃখের কথা, পর্দাটা খুলে দূরের ঐ পাহাড়টার দিকে তাকাবার কথাটাও আপনাদের মনেই হয় নি। আপনারা শুনেছেন কামানের শব্দ; আর যা দেখেছেন সেটা কামান দাগবার আগুনের ঝলক। কি জানেন, ঠিক মাঝ রাতে টেলিগ্রাফে কিছু খবর এসেছে; গারফিল্ড মনোনীত হয়েছেন-আসল ব্যাপারটা এই!"

"সত্যি মিঃ টোয়েন, গোড়াতেই আপনাকে যা বলছিলাম (মিঃ ম্যাকউইলিয়ম্স্ বলল), বিদ্যুতের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার বিধি-ব্যবস্থা এতই চমৎকার ও অসংখ্য যে মানুষ কেমন করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সেটা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য।"

এই কথা বলে ঝোলা ও ছাতা হাতে নিয়ে সে চলে গেল, কারণ ট্রেনটা তখন তার শহরে পৌঁছে গেছে।

১৮৮০

একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা

A Curious Experience

যতদূর স্মরণে আছে, মেজর আমাকে এই গল্পটি ই বলেছিল:

১৮৬২-৬৩-এর শীতকালে আমি ছিলাম কন্-এর অন্তর্গত নিউ লণ্ডন-এর ট্রাম্বুল দুর্গের অধিনায়ক। হতে পারে, সেখানে আমাদের জীবন যুদ্ধক্ষেত্রের মত ততটা কর্মব্যস্ত ছিল না; তবু কাজকর্ম একেবারে কম ছিল না-কাজের অভাবে শুধু মাথা চুলকে চিন্তাগুলিকে সতেজ রাখার মত ব্যবস্থা ছিল না। একটা কথা, সারা উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া তখন নানা রহস্যময় গুজবে ভর্তি ছিল-যেমন, বিদ্রোহী গুপ্তচররা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং আমাদের উত্তরাঞ্চলের দুর্গগুলিকে উড়িয়ে দেবার, আমাদের হোটেলগুলি পুড়িয়ে দেবার, আমাদের শহরগুলিতে সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুযুক্ত জামা-কাপড় ছড়িয়ে দেবার জন্য তারা নিজেদের প্রস্তুত করছে। সে সব কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। এই সব নিয়ে আমাদের সর্বদাই সজাগ থাকতে হত, আর তার ফলে আমাদের শিবির-জীবনের চিরাচরিত একঘেয়েমিও অনেকটাই দূর হয়ে যেত। তাছাড়া, আমাদের ঘাঁটিটা ছিল নতুন সৈন্য-সংগ্রহের কেন্দ্র-কাজেই শুয়ে-বসে, ঘুমিয়ে, স্বপ্ন দেখে, ফুর্তি করে কাটিয়ে দেবার মত সময় আমাদের ছিল না। আরে, একটা সারা দিনে যত নতুন সৈন্য ভর্তি করা হত, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও তার শতকরা পঞ্চাশ জনই আমাদের হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে সেই রাতেই আমাদের উপর চড়াও হত। তাছাড়া এত বেশী টাকা-কড়ি তারা পেত যে পালাবার সুবিধা করে দেবার জন্য একজন নতুন সৈনিক শান্ত্রীকে তিন-চার শ' ডলার পর্যন্ত ঘুষ দিতে পারত এবং তারপরেও যে পরিমাণ লুঠের অর্থ তার হাতে থাকত তা দিয়ে একজন গরিব মানুষও প্রচুর সম্পত্তির মালিক হতে পারত। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের জীবন তখন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই কাটত না।

একদিন। আমার বাসায় আমি একা। কিছু লেখার কাজ করছিলাম। এমন সময় চোদ্দ-পনেরো বছরের বিবর্ণ, বিধ্বস্ত চেহারার একটি ছেলে ঘরে ঢুকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল:

"এখানে কি সৈন্যদলে নাম লেখানো হয়?"

"হ্যাঁ।"

"আমার নামটা কি তালিকাভুক্ত করবেন স্যার?"

"না হে দেখ বাবা, তোমার বয়স অল্প, বড়ই অল্প।"

তার মুখে হতাশা ফুটে উঠল; কিছুক্ষণ পরেই দেখা দিল গভীর নৈরাশ্য। চলে যাবার জন্য ঘুরে গিয়েও ইতস্তত করে আবার আমার দিকে ফিরে বলল:

"আমার বাড়ি-ঘর নেই, এ জগতে আমার কোন বন্ধু নেই। আপনি যদি আমার নামটা তালিকাভুক্ত করতেন!"

কিন্তু সে প্রশ্নই উঠতে পারে না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে কথাই তাকে বললাম। তারপর তাকে স্টোভটার পাশে বসে শরীরটাকে গরম করতে বলে আরও বললাম:

"এখনই কিছু খেতেও পাবে। তুমি ক্ষুধার্ত।"

সে কোন কথা বলল না; বলবার দরকার ছিল না; তার বড় বড় দুটি নরম চোখে সে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যেত না। সে স্টোভটার পাশে বসল। আমি লিখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখছিলাম। লক্ষ্য করলাম, নোংরা ও ছেঁড়া হলেও তার জামা-কাপড় ও জুতো স্টাইল ও মাল-মশলার দিকে থেকে বেশ ভাল। বিষয়টা অর্থপূর্ণ। তার উপর তার কণ্ঠস্বর নীচু ও সুরেলা; চোখ দুটি গভীর ও বিষন্ন; তার আচরণ ও ঠিকানা ভদ্রজনোচিত; স্পষ্টই বোঝা যায় ছেলেটি বিপদে পড়েছে। ফলে তার প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে গেল।

যা হোক, ক্রমে ক্রমে আমি আমার কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম এবং ছেলেটির কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। এভাবে কতক্ষণ কেটে ছিল জানি না, কিন্তু এক সময় আমি চোখ তুললাম। ছেলেটির পিঠ ছিল আমার দিকে, কিন্তু তার মুখটা এমন ভাবে ঘোরানো ছিল যে তার একটা গাল আমি দেখতে পাচ্ছিলাম-সেই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ছে।

নিজের মনে বললাম: "ঈশ্বর আমার সহায় হোন! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে ছেলেটি অভুক্ত রয়ে গেছে।" তখন আমার এই পাশবিক আচরণের সংশোধন করতে তাকে বললাম, "আমার সঙ্গে এস বাপু; তুমি আমার সঙ্গেই খাবে। আজ আমি একা আছি।"

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকাল। খুসির আলোয় তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে আমি না বসা পর্যন্ত সে চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বসল। ছুরি-কাঁটা হাতে নিলাম-ঐ হাতেই নিলাম, তারপরই থেমে গেলাম, কারণ ছেলেটি তখন মাথাটা নামিয়ে নীরবে প্রার্থনা করছে। আমার বাড়িরও শৈশব কালের সহস্র স্মৃতি আমার মনের সামনে ফুটে উঠল; দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম ধর্মবোধ এবং আহত মনে তার শান্তির প্রলেপ, তার সান্ত্বনা, আরাম ও শক্তি থেকে আজ আমি কত দূরে সরে এসেছি।

খেতে খেতেই লক্ষ্য করলাম, তরুণ উইক্‌লো-তার পুরো নাম রবার্ট উইক্‌লো-তোয়ালের ব্যবহার জানে; আর-এককথায় বলতে গেলে আমি বুঝতে পারলাম যে ছেলেটি ভাল শিক্ষা-দীক্ষাই পেয়েছে; তার বিস্তারিত বিবরণে কি কাজ। তার সহজ সরলতা আমার মনকে জয় করে নিল। প্রধানত তার সম্পর্কেই নানা কথা প্রসঙ্গে তার ইতিহাস জেনে নিতে আমার কোন অসুবিধাই হল না। সে যখন বলল যে লুসিয়ানাতে তার জন্ম আর সেখানেই সে বড় হয়েছে, তখন তার প্রতি আমার টান আরও বেড়ে গেল, কারণ আমি বেশ কিছুদিন সেই অঞ্চলেই কাটিয়েছি। মিসিসিপির সব "উপকূল" অঞ্চলটা আমি ভালই চিনি, তাকে ভালবাসি, আর এমন কিছু দীর্ঘদিন আগে সেখান থেকে চলে আসি নি যাতে আমার মনের টানে ভাঁটা পড়তে পারে। তার মুখ থেকে প্রতিটি জায়গার নাম শুনতে আমার এত ভাল লাগছিল যে সেই নামগুলি শুনবার জন্যই আমি আলোচনার মোড়কে সেই দিকে ঘুরিয়ে দিতে লাগলাম: ব্যাটন রুজ, প্ল্যাকুমিন, ডোনাল্ড-সন্‌ভিল, ষাট-মাইল পয়েন্ট, বোনেট-কারে, স্টক ল্যাণ্ডিং, ক্যারল্টন, স্টীমশিপ ল্যাণ্ডিং, স্টীমবোট ল্যাণ্ডিং, নিউ অর্লিয়েন্স, ট্সুপিটোলাস স্ট্রীট, এসপ্লানেড, রু দ্য বোঁ এঁফাঁত্ সেন্ট চার্লস হোটেল, টিভোলি সার্কল, শেল রোড, লেক পণ্টচারট্রেন; আমার বিশেষ করে মজা লাগছিল আর. ই. লী. নাটচেজ, এক্লিপ্‌স্, জেনারেল কুইটম্যান, ডানকান এফ, কেনার ও অন্যান্য পুরনো পরিচিত স্টীমারগুলোর নাম শুনতে। এই সব নাম শুনে সে সব জায়গার স্মৃতি এতদূর স্পষ্ট হয়ে আমার মনে ফুটে উঠতে লাগল যে মনে হল বুঝি বা সত্যি আমি সেখানে ফিরে গিয়েছি। সংক্ষেপে এই হল ছোট্ট উইক্‌লোর ইতিবৃত্ত:

যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন সে তার পঙ্গু খুড়ি ও বাবা ব্যাটন রুজ-এর সঙ্গে একটা বড় ও সমৃদ্ধ বাগানে বাস করত। পঞ্চাশ বছর ধরে বাগানটা ছিল ওদের পরিবারেরই সম্পত্তি। বাবা ছিল ইউনিয়ন-এর লোক। নানাভাবে তার উপর নির্যাতন চালান হল, কিন্তু সে তার নীতিকেই আঁকড়ে ধরে রইল। শেষ পর্যন্ত একদিন রাতে একদল মুখোশধারী লোক তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিল আর পরিবারের সকলে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেল। তাড়া খেয়ে তারা আজ এখানে কাল সেখানে কাটাতে লাগল, আর দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্দশা কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল। পঙ্গু খুড়ি শেষ পর্যন্ত শান্তি পেল: দুঃখে ও রোদ-জলে তার মৃত্যু হল; পথচারী বাউণ্ডুলের মত খোলা মাঠের মধ্যে সে মারা গেল; বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারা ঝরে পড়ল তার দেহে; মাথার উপরে চলতে লাগল ঝড়ের গর্জন। তার কিছুদিন পরেই একদল সশস্ত্র লোকের হাতে বাবাও ধরা পড়ল; ছেলেটির কাতর মিনতিতে ভ্রূক্ষেপ না করে তার চোখের সামনেই বাবাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। [এইখানে তরুণটির চোখে একটা বিষময় আলো জ্বলে উঠল; আত্মমগ্ন ভাবেই সে বলতে লাগল: "আমি যদি তালিকাভূক্ত না হতে পারি তো কোন ক্ষতি নেই-একটা পথ আমি পাবই-একটা পথ আমি পাবই।"] বাবার মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে বলে দেওয়া হল যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে যদি ঐ অঞ্চল থেকে চলে না যায় তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। সেই রাতে হামাগুড়ি দিতে দিতে সে নদীর ধারে গেল এবং একটা বাগানের ঘাটের কাছে লুকিয়ে রইল। এক সময় "ডান কান এফ, কেনার" স্টীমারটি সেখানে থামলে সে সাঁতার দিয়ে স্টীমারের পিছনে বাঁধা ডিঙ্গিতে লুকিয়ে পড়ল। সকাল হবার আগেই স্টীমারটা স্টক ল্যাণ্ডিং-এ পৌঁছল, আর সেও লুকিয়ে তীরে গিয়ে উঠল। তিন মাইল হেঁটে নিউ অর্লিয়ান্স-এর গুড চিল্ড্রেন স্ট্রীটে তার এক কাকার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল এবং কিছু দিনের মত তার বিপদ কেটে গেল। কিন্তু এই কাকাও ইউনিয়ন-এর লোক; অনতিবিলম্বে সেও স্থির করল যে দক্ষিণ অঞ্চল ছেড়ে যাওয়াই ভাল। কাজেই তরুণ উইক্‌লোকে সঙ্গে নিয়ে সেও লুকিয়ে একটা সমুদ্রগামী জাহাজে চেপে বসল এবং যথাসময়ে নিউ ইয়র্ক পৌঁছে গেল। সেখানে তারা "অ্যাস্টর হাউস"-এ উঠল। "ব্রড ওয়ে" ধরে হেঁটে বেড়িয়ে উত্তরাঞ্চলের নতুন নতুন দৃশ্য দেখে কিছুদিন উইক্‌লোর বেশ ভালই কাটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা পরিবর্তন দেখা দিল-তাতে অবস্থা আবার খারাপের দিকেই

গেল। প্রথম দিকে কাকা বেশ হাসিখুসি ছিল, কিন্তু এখন তাকে প্রায়ই চিন্তিত ও হতাশ দেখা যেতে লাগল; তাছাড়া, তার মেজাজও খিটখিটে হয়ে উঠল। প্রায়ই বলতে লাগল, টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আয়ের কোন পথ নেই-"দু'জন তো দূরের কথা, একজনের চলার মতো টাকাও নেই।" তারপর একদিন সকালে সেও উধাও হয়ে গেল-প্রাতরাশের টেবিলেও এল না। ছেলেটি আপিসে খোঁজ নিয়ে জানল, তার কাকা আগের দিন রাতেই বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে-করণিকটির বিশ্বাস বোস্টন-এ গেছে, তবে সঠিক সে বলতে পারে না।

ছেলেটি আবার নিঃসঙ্গ বন্ধুহীন হল। কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত স্থির করল, কাকার খোঁজে বের হওয়াই ভাল। স্টীমার ঘাটে গিয়ে জানতে পারল, তার পকেটে যৎসামান্য যা আছে তাতে বোস্টন যাওয়া চলবে না, নিউ লণ্ডন পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে; কাজেই সেই বন্দরের টিকিটই কাটল; মনে মনে ভরসা করল, বাকি পথটা যাবার ব্যবস্থা ঈশ্বরই করে দেবেন। তিন দিন তিন রাত সে নিউ লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, লোকের দয়ায় কখনও কিছু খেয়েছে, কখনও একটু ঘুমিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে; সাহস ও আশা দুইই চলে গেছে। যদি সৈন্যদলে ভর্তি হতে পারে, তার চাইতে কৃতজ্ঞ কেউ হবে না; যদি সৈন্য নাও হতে পারে, একটা ঢাক-বাজিয়ে ছেলেও কি সে হতে পারে না? আহা, সকলকে খুসি করতে সে কঠোর পরিশ্রম করবে, কত কৃতজ্ঞ থাকবে!

বিস্তারিত বিবরণ বাদ দিয়ে উইক্লোর এই ইতিহাসই সে আমাকে বলল। আমি বললাম:

"দেখ বাপু, এখন তুমি একজন বন্ধুর কাছেই আছ-তোমার আর কোন কষ্ট হবে না।" তার চোখ দুটি চক্‌চক্ করে উঠল। সার্জেণ্ট জন রেবার্ণকে ডেকে পাঠালাম-সে হার্টফোর্ড-এর অধিবাসী, এখনও হার্টফোর্ড-এই থাকে; হয় তো তুমি তাকে চেন-আর বললাম: "রেবার্ণ, গায়কদের দলে এই ছেলেটির থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি তাকে ঢাক-বাদক হিসাবে ভর্তি করে নিচ্ছি। আমার ইচ্ছা তুমি ওর দেখাশুনা করবে আর ওর প্রতি যাতে ভাল ব্যবহার করা হয় সেদিকে নজর রাখবে।"

একখনকার মত অবশ্য ঘাঁটির সৈন্যাধ্যক্ষ ও ঢাক-বাদক ছেলেটির মধ্যে যোগাযোগের ইতি ঘটল, কিন্তু অসহায় বন্ধুহীন ছোট ছেলেটি যথারীতি আমার মনের মধ্যে চেপে বসে রইল। আমি তার উপর নজর রাখলাম; আশা করেছিলাম সে খুসিতে ঝলমল করবে, ক্রমেই আনন্দমুখর হয়ে উঠবে, কিন্তু না, দিনের পর দিন কাটতে লাগল, তার কোন পরিবর্তন হল না। সে কারও সঙ্গে মেশে না; সব সময় অন্যমনস্ক থাকে, সর্বদাই কি যেন ভাবে; মুখখানি সর্বদাই বিষণ্ণ। একদিন সকালে রেবার্ণ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। সে বলল:

"আশা করি আপনি কিছু মনে করবে না স্যার; সত্য কথা বলতে কি, গায়করা সব এতই বিরক্ত হয়ে উঠেছে যে তারা কিছু বলতে ইচ্ছুক।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"এই উইক্লো ছোকরাকে নিয়েই গোলমাল স্যার। গায়করা তার উপর এত চটে গেছে যে আপনি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"বলে দাও, বলে যাও। সে কি করেছে?"

"প্রার্থনা করে স্যার।"

"প্রার্থনা!"

"হ্যাঁ স্যার; এই ছোকররা প্রার্থনার জ্বালায় গায়কদের জীবনে কোন শান্তি নেই। সকালে সকলের আগে সে প্রার্থনা করে; সারা দুপুর তাই করে; আর রাতে-দেখুন, রাতের বেলা সে তাদের মধ্যে শুয়ে থাকে যেন একটা ভূতে-পাওয়া মানুষ! ঘুম? দিব্যি করে বলছি, তারা ঘুমুতেই পারে না; সারা রাত সে ওই চালিয়ে যায়। প্রথমে ব্যাণ্ড-মাস্টারকে ধরে; তার হয়ে প্রার্থনা করে। তারপর যায় প্রধান বিউগ্‌ল-বাদকের কাছে; তার হয়ে প্রার্থনা করে। তারপর যায় পিতলের ঢাকির কাছে; তাকেও দলে টানে। এমনি করে একে একে সকলকেই দলে ভেড়াতে চেষ্টা করে। কি জানেন স্যার, তাকে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়েও কোন ফল হয় না; একে তো তখন সেখানে

অন্ধকার, তার উপর বড় ঢাকটার আড়ালে বসে সে প্রার্থনা করে; কাজেই জুতোর ঝড় বয়ে গেলেও তার কিছু যায় আসে না; বরং সেটাকে প্রশংসা বলেই মনে করে। তারা চীৎকার করে বলে, 'আঃ থাম হে বাপু।' 'আমাদের একটু বিশ্রাম করতে দাও।' 'ওকে গুলি কর। 'আঃ, বাইরে একটু বেড়িয়ে এস।' এমনি সব কথা। কিন্তু তাতে কি? সে এ সবে কিছুই মনে করে না!" একটু থেমে আবার বলতে লাগল; "ছেলেটা একটু বোকাও আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সবগুলো জুতো কুড়িয়ে একত্র করবে, জোড়ায়-জোড়ায় আলাদা করবে এবং যার যার জুতো তার জায়গায় রেখে দেবে। জুতোগুলো এত বেশী বার তার দিকে ছোড়া হয়েছে যে সব জুতো সে চিনে ফেলেছে-চোখ বুজেই সেগুলোকে সঠিকভাবে আলাদ করতে পারে।"

আবার একটুখানি বলতে লাগল:

"কিন্তু সব চাইতে শোচনীয় অবস্থা হয় যখন প্রার্থনা শেষ করে-অবশ্য তার প্রার্থনা যদি কখনও শেষ হয়-সে বাঁশি বাজিয়ে গান শুরু করে দেয়। আপনি তো জানেন, যখন সে কথা বলে তখনই তার গলায় মধু ঝরে, আপনি তো জানেন, তার কথা শুনে একটা লোহার কুকুরও দরজা ছেড়ে এসে তার হাত চাটতে চায়। কিন্তু সে যখন গান ধরে, তখন ব্যাপারই আলাদা! ছোকরার গানের কাছে বাঁশির সুরও কর্কশ শোনায়। আঃ, অন্ধকারে তার গলা দিয়ে যখন নীচু স্বরে নরম মিঠে সুরের ফোয়ারা ছোটে তখন মনে হবে আপনি স্বর্গে আছেন।"

"এর মধ্যে শোচনীয় অবস্থাটা কি হল?"

"আহা, সেই কথাই তো বলছি স্যার। সে যখন গান ধরে-

'এই তো আমি-গরীব, ভাগ্যহীন, অন্ধ-

শুধু একটিবার এ গান শুনুন, আপনিও গলতে শুরু করবেন; আপনার চোখ জলে ভরে উঠবে! সে যাই গাক না কেন, তাই আপনার মরমে পশিবে-আপনাকে টেনে নিয়ে আসবে। শুধু কান পেতে শুনুন-

'তুমি শিশু পাপের ও তাপের, বহু দুঃখের ভাপের,
আগামী দিনের কথা থাক, আজই বুঝে নাও যা তোমার ভাগের;
তোমার জন্য আছে ভালবাসা
ঈশ্বরের দেওয়া ভালবাসা'-

ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনলেই আপনার মনে হবে, আমরা সব অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর, দো-পেয়ে জন্তু। সে যখন গানে গানে বলে তার বাড়ির কথা, তার মায়ের ও শৈশবের কথা, অতীত স্মৃতির কথা, যা কিছু আজ আর নেই, মৃত বন্ধুদের কথা, তখনই আপনার মনে পড়ে যাবে জীবনে যা কিছু আপনি ভালবেসেছেন ও ভালবেসে হারিয়েছেন-আহা, সে যে কত সুন্দর, কত স্বর্গীয় স্যার-কিন্তু হায় ভগবান, কী হৃদয়বিদারক! গাইয়ে-বাজিয়ের দলটা-তারা সকলেই কাঁদতে শুরু করে-সব বেটা শয়তান যারা ছেলেটাকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ে তারাই হঠাৎ বাংক থেকে নেমে এসে অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে! হ্যাঁ তাই করে-তাকে কত আদরের নামে ডাকে, ক্ষমা চায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গোটা সেনাবাহিনী যদি ছোকরার একগাছি চুলেও হাত দেয় তো তাদের সঙ্গেই তারা লড়ে যাবে!"

আবার চুপচাপ।

"সব কথা বলা হয়েছে তো?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ স্যার।"

"কিন্তু তাহলে অভিযোগটা কি? তারা কি করতে বলে?"

"কি করবেন? কেন স্যার, তারা চায় আপনি ওর গান করাটা বন্ধ করে দিন।"

"কী আশ্চর্য! তুমিই তো বললে তার গান স্বর্গীয় বস্তু।"

"তা তো বটেই। বড় বেশী স্বর্গীয় যে। মাটির মানুষ তা সইতে পারে না। এতে শরীর গুলিয়ে ওঠে, ভিতরের সবকিছু বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়; দুঃখ যেন উথ্‌লে ওঠে, মন খারাপ হয়ে যায়, দুষ্টবুদ্ধিতে ভর করে, মনে হয় নরক ছাড়া আর কোথাও বুঝি তার স্থান নেই। সব সময় মনটা এত হু-হু করে যে মুখে স্বাদ থাকে না। জীবনে সুখ থাকে না। আর তারপর সে কী কান্না! জানেন-প্রতিদিন সকালে লজ্জায় কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতেও পারে না।"

"দেখ, ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, অভিযোগটাও তেমনই। তাহলে তারা সত্যি সত্যি চায় যে গান বন্ধ হোক?"

"হ্যাঁ স্যার, সেটাই তাদের কথা। বেশী কিছু তারা চায় না; তারা চায় প্রার্থনাটা বন্ধ হোক, অন্ততঃ তার কিছু ছাটকাট করা হোক। কিন্তু আসল জিনিস হল ঐ গান। তারা মনে করে গানটা বন্ধ হলে তারা প্রার্থনাটা কোন রকমে মেনে নেবে।"

সার্জেণ্টকে বললাম, বিষয়টা ভেবে দেখব। সেদিন রাতে লুকিয়ে গায়কদের আস্তানায় ঢুকে কান পাতলাম। সার্জেণ্ট অতিরঞ্জিত করে কিছু বলে নি। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে আসা প্রার্থনা শুনলাম; বিরক্ত লোকগুলির গালাগালি শুনলাম, বাতাসে জুতো ছোড়ার শা-শা শব্দ এবং বড় ঢাকটার উপর ধুপ-ধাপ শব্দ শুনলাম। ব্যাপারটা মনে লাগল, আবার মজাও লাগল। ক্রমে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে ভেসে এল গান। ঈশ্বর, কী তার করুণ আকুতি, কী আকর্ষণ! পৃথিবীতে কেউ কোন দিন এত মিষ্টি, এত মনোরম, এত পবিত্র ও মন গলিয়ে দেওয়া গান শোনে নি। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এলাম; কারণ আমার মধ্যেও যে ভাবে আবেগ উথ্‌লে উঠছিল সেটা একটা দুর্গের অধিনায়কের মোটেই উপযুক্ত নয়।

পরদিন প্রার্থনা ও গান বন্ধকরবার হুকুম জারি করলাম। পরবর্তী তিন চারটি দিন এত উত্তেজনা ও বিরক্তির মধ্যে কেটে গেল যে ঢাকী ছেলেটার কথা একবারও মনে এল না। কিন্তু একদিন সার্জেন রেবার্ণ এসে হাজির হল; বলল:

"স্যার, নতুন ছেলেটি অবাক কাণ্ড করছে।"

"কি রকম?"

"দেখুন স্যার, সারাক্ষণ সে লিখেই চলেছে।"

"লিখছে? কি লিখছে-চিঠি?"

"জানি না স্যার; যখনই সে কাজ থেকে ছুটি পায় তখনই একা একা দুর্গের চারদিকে ঘুর্-ঘুর্ করে বেড়ায়-আমার তো মনে হয় দুর্গের এমন কোন গর্ত বা কোণ নেই যেখানে সে যায় নি-আর সারাক্ষণ কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কি যেন লেখে।"

খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গেলাম। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে চলতে চাইলাম, কিন্তু যে ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ দেখা দিয়েছে তাকে তো উপেক্ষা করা চলে না। উত্তরাঞ্চলে যা সব ঘটে চলেছে তার ফলে আমাদের সদাই সতর্ক থাকতে হয়, সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হয়। মনে পড়ে গেল যে, ছেলেটি এসেছে দক্ষিণ থেকে-দক্ষিণ সীমান্তের লুসিয়ানা থেকে-আর বর্তমান পরিস্থিতিতে এ চিন্তাটা মোটেই স্বস্তিকর নয়। তথাপি রেবার্ণকে নতুন হুকুমটা দিতে আমার খুবই কষ্ট হল। মনে হল, বাবা হয়ে আমি যেন ছেলেকে লজ্জা ও ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছি। রেবার্ণকে বললাম, সে যেন চুপচাপ অপেক্ষা করে থাকে, আর ছেলেটির অজান্তে তার লেখা কোন কাগজ হাতাতে পারলেই যেন আমাকে এনে দেয়। তাকে সতর্ক করে দিলাম, ছেলেটির উপর যে নজর রাখা হয়েছে এ কথা যেন সে কোন মতেই বুঝতে না পারে। আরও হুকুম দিলাম, ছেলেটির স্বাধীন চলাফেরায় যেন বাধা দেওয়া না হয়, তবে যখনই সে শহরের দিকে যাবে তখনই যেন দূর থেকে তাকে অনুসরণ করা হয়।

পরবর্তী দু"দিনে রেবার্ণ বারকয়েক আমাকে খবর দিল। কোন কাজ হয় নি। ছেলেটি লিখেই চলেছে, কিন্তু রেবার্ণ কাছাকাছি হাজির হলেই সে নির্বিকারভাবে কাগজটা পকেটে পুরে ফেলে। দু"বার সে শহরের একটা পরিত্যক্ত, পুরনো আস্তাবলে গেছে, আর, দু"এক মিনিট থেকেই বেরিয়ে এসেছে। এ সব ব্যাপারকে তো উপেক্ষা করা চলে না-সব কিছুই কেমন যেন সন্দেহজনক। ক্রমেই আমিও যে

অস্বস্তি বোধ করছি সে কথাও স্বীকার করছি। নিজের বাসস্থানে ফিরে গিয়ে আমার সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠালাম; খুব বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক অফিসার; জেনারেল জেমন ওয়াটসন ওয়েব-এর ছেলে। সেও চিন্তিত হল, বিস্মিত হল। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে কথাবার্তা বলে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে, একটা গোপন তল্লাসির ব্যবস্থা করা দরকার। স্থির করলাম, নিজেই সে কাজের ভার নেব। সেই মত সকাল দুটো নাগাদ গিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে গায়কদের আস্তানায় হাজির হলাম! তখন সকলেরই নাক ডাকছে। শেষ পর্যন্ত আমার ঘুমন্ত পোষ্যপুত্তুরের কাছে পৌঁছে গেলাম, এবং কারও ঘুম না ভাঙিয়ে তার পোশাক-আসাক ও 'কিট'টা হাতিয়ে নিয়ে আবার চুপিচুপি বুকে হেঁটে ফিরে এলাম। আমার বাসায় ফিরে দেখি ফলাফল জানবার অধির আগ্রহে ওয়েব আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তল্লাসি শুরু করে দিলাম। পোশাক-আসাক আমাদের হতাশ করল। পকেটের মধ্যে পেলাম সাদা কাগজ, পেন্সিল; আর পেলাম একটা ছোট ছুরি আর এমন সব বাজে টুকিটাকি জিনিস যা ছোট ছেলেরা কুড়িয়ে জমা করে রাখে। অনেক আশা নিয়ে 'কিট'টায় হাত দিলাম। পেলাম শুধু ধমকানি!-একখানি ছোট বাইবেল; তার পুস্তানির পাতায় লেখা; "হে অপরিচিত, মায়ের অনুরোধ, আমার ছেলেটির প্রতি করুণা করো।"

ওয়েব-এর দিকে তাকালাম-সে চোখ নামিয়ে নিল; সে আমার দিকে তাকাল-আমি চোখ নামালাম। কারো মুখে কথা নেই। শ্রদ্ধার সঙ্গে বইটাকে যথাস্থানে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে কোন কথা না বলে ওয়েব উঠে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সাহসে বুক বেঁধে আবার সেই অস্বস্তিকর কাজে নেমে পড়লাম; আগের মতই বুকে হেঁটে লুটের জিনিস যথাস্থানে রাখতে গেলাম। যে কাজ করতে চলেছি এটাই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা। কাজটা শেষ করে মনে মনে বেশ খুসি বোধ করলাম।

পরদিন দুপুরে রেবার্ণ যথারীতি খবর জানাতে এল। তাকে বাধা দিয়ে বললাম:

"এসব বাজে কাজকর্ম বন্ধ কর। একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে আমরা ভয়ে তোলপার করে বেড়াচ্ছি, অথচ তার কাছে একখানা ধর্মপুস্তক ছাড়া আর কিছুই নেই।"

সার্জেণ্ট অবাক চোখে তাকিয়ে বলল:

"কিন্তু স্যার, আপনার হুকুম মতই তো আমরা কাজ করছি; আর কিছু লেখাও হাতে এসেছে।"

"তাতে কি হয়েছে? কেমন করে পেলে?"

"চাবির ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম সে লিখছে। যখন মনে হল লেখাটা শেষ হয়ে এসেছে তখন খুক্ করে একটু কাশলাম। দেখলাম সে কাগজটা দলা পাকিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল, আর চারদিক তাকিয়ে দেখল কেউ আসছে কি না। তারপর বেশ নির্বিকারভাবে আরাম করে বসল। তখন আমি ঘরে ঢুকলাম, কিছুক্ষণ আরামে কাটালাম, তারপর একটা কাজে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। কোন রকম অস্বস্তি প্রকাশ না করে সে সোজাসুজি চলে গেল। কয়লার আগুনটা সবে ধরানো হয়েছিল; লেখাটা একটা কয়লার চাঙড়ের ওপাশে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল; সেটাকে বের করলাম; এই সে কাগজটা; দেখুন, মোটেই পুড়ে যায় নি।"

কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে দু'একটা লাইন পড়েই সার্জেণ্টকে বললাম ওয়েবকে পাঠিয়ে দিতে। পুরো কাগজটাতে এই রকম লেখা ছিল:

ফোর্ট ট্রাম্বুল, ৮ই।

কর্ণেল, আমার তালিকায় সবশেষে যে তিনটি বন্দুকের কথা আছে তার ছিদ্রের ব্যাস সম্পর্কে আমার ভুল হয়েছে। সেগুলি ১৮ পাউণ্ডের; বাকি সব অস্ত্র যেমনটি লিখেছি ঠিক তাই। সেনাবাহিনী সম্পর্কে যা জানিয়েছি তাই আছে, শুধু যে দুটি পদাতিক বাহিনীর সীমান্তে যাবার কথা ছিল তারা আপাতত এখানেই থাকছে-কতদিন থাকবে তা এখনই বুঝতে পারছি না, তবে শীঘ্রই পারব। আমরা মনে করি সব কিছু বিবেচনা করে আপাতত ব্যাপারটা স্থগিত রাখাই ভাল যতদিন-

তারপর আর লেখা নেই-রেবার্ণ এই সময়ই কেশে ওঠায় লেখক বাঁধা পায়। ঠাণ্ডা মাথায় তার এই নীচতার দমকা হাওয়ায় ছেলেটির প্রতি আমার স্নেহ, তার প্রতি শ্রদ্ধা, তার দুঃসময়ে তাকে সাহায্য করা-সব একমুহূর্তে নিভে গেল।

কিন্তু সে সব কথা থাক। এখন শুধু কাজ-যে কাজ গভীর মনোযোগসাপেক্ষ। ওয়েব ও আমি চিঠিটা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। ওয়েব বলল:

"বড়ই দুঃখের কথা যে লিখতে লিখতে সে বাধা পেল! একটা কিছু স্থগিত রাখা হচ্ছে, যতদিন-সে কখন? কি সেই ব্যাপার? সম্ভবত সে কথাও সে লিখত-ব্যাটা ধার্মিক বিচ্ছু!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, একটা তাস হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু চিঠির এই 'আমরা' টা কারা? তারা কি দুর্গের ভিতরকার ষড়যন্ত্রকারী, না বাইরের?"

ঐ "আমরা" কথাটা যেমন অস্বস্তিকর তেমনই অর্থপূর্ণ। যা হোক, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে কোন লাভ নেই বুঝে আমরা বাস্তবে নেমে গেলাম। প্রথমত, শান্ত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ করে পাহারার ব্যবস্থাটা কঠোতর করা হল। তারপর ভাবলাম, উইক্‌লোকে ডেকে তার কাছ থেকে সব কথা বের করে নেই; কিন্তু অন্য পদ্ধতি ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত সে কাজটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হল না। আগে আরও কিছু লেখা হস্তগত করতে হবে; কাজেই সে ভাবেই কাজ শুরু হল। এবার মাথায় একটা মতলব এল: উইক্‌লো কখনও ডাকঘরে যায় না-হয় তো পরিত্যক্ত আস্তাবলটাই তার ডাকঘর। আমার ব্যক্তিগত করণিককে ডেকে পাঠালাম-যুবকটি জার্মান, নাম স্টার্ণ; একেবারে জাত-গোয়েন্দা। সব কথা জানিয়ে তাকে কাজে লেগে যেতে বললাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল, উইক্‌লো আবার লিখতে শুরু করেছে। তার পরেই খবর এল, সে শহরে যাবার অনুমতি চেয়েছে। তাকে কিছুক্ষণ আটকে রেখে দেওয়া হল, আর সেই অবসরে স্টার্ণ গিয়ে আস্তাবলে লুকিয়ে রইল। একসময় সে দেখল, উইক্‌লো ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এল, চারদিক ভাল করে দেখল, এককোণে রাখা জঞ্জালের মধ্যে কি যেন লুকিয়ে রাখল, তারপর ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল। স্টার্ণ লুকনো জিনিসটার উপর লাফিয়ে পড়ল-একখানা চিঠি-এবং সেটা আমাদের কাছে এনে দিল। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই, কোন স্বাক্ষরও নেই। আগে যা পড়েছি তারই পুনরাবৃত্তি করে তারপর লেখা হয়েছে:

আমরা মনে করি ব্যাপারটা স্থগিত রাখাই ভাল যতদিন না ঐ দু'দল সৈন্য এখান থেকে চলে যায়। মানে ভিতরকার চারজনের তাই মত; অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি-দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভয়ে। চারজন বলছি কারণ দু'জন এখানে নেই; সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের জায়গায় আরও দু'জনের এখানে আসা একান্তভাবে প্রয়োজন। যে দু'জন চলে গেছে তারা ত্রিশ-মাইল পয়েন্ট থেকে আগত দুই ভাই। খুব গুরুতর সংবাদ আছে, কিন্তু এ ভাবে জানাতে ভরসা পাচ্ছি না; অন্যভাবে চেষ্টা করব।

"বাচ্চা শয়তান!" ওয়েব বলল; "কে ভেবেছিল যে সে একটা গুপ্তচর? যা হোক, ও নিয়ে ভেব না; আমাদের হাতে যা খোঁজ-খবর আছে সেগুলি মিলিয়েই দেখা যাক অবস্থা কি দাঁড়ায়। প্রথম, আমাদের মধ্যে একটি বিদ্রোহী গুপ্তচর আছে; তাকে আমরা চিনি। দ্বিতীয়, আমাদের মধ্যেই এমন আরও তিনজন আছে যাদের আমরা চিনি না। তিন, এই সব গুপ্তচররা ইউনিয়ন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার সহজ সরল পথেই আমাদের মধ্যে এসেছে এবং স্পষ্টতই তাদের দু'জনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে। চতুর্থ, বাইরে অনেক সহকারী গুপ্তচর রয়েছে-সংখ্যা অনির্দিষ্ট। পঞ্চম, উইক্‌লোর হাতে একটা খুব গুরুতর খবর আছে যা সে এইভাবে পাঠাতে ভরসা করছে না বলে অন্যভাবে জানাতে চেষ্টা করবে। এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। আমরা কি উইক্‌লোর কলার চেপে ধরে তার স্বীকারোক্তি আদায় করব? অথবা যে লোক আস্তাবল থেকে চিঠিগুলো নিয়ে যায় তাকে পাকড়াও করে সব কথা বলতে তাকে বাধ্য করব? অথবা এখন চুপচাপ থেকে আরও কিছু জানবার জন্য অপেক্ষা করব?"

স্থির হল, শেষ পন্থাই অবলম্বন করা হবে। ভেবে দেখলাম, এখনই কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার নেই, কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ দুটি পদাতিক বাহিনী চলে না যাওয়া পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীরা অপেক্ষা করবে। স্টার্ণকে আরও অনেক কিছু ক্ষমতা দিয়ে বলে দেওয়া হল, উইক্‌লো-র যোগাযোগের "অন্য পদ্ধতিটা" কি সেটা বের করতে সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমরা একটা বড় রকমের খেলাই খেলতে চাই; আর সেজন্য গুপ্তচরদের যত বেশী দিন সম্ভব সন্দেহের বাইরে রাখতে চাই। কাজেই আমরা স্টার্ণকে নির্দেশ দিলাম, অবিলম্বে আস্তাবলে ফিরে যেতে এবং সব কিছু ঠিক থাকলে উইক্‌লোর চিঠিটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিতে, যাতে ষড়যন্ত্রকারীরা সেটা পেয়ে যায়।

ক্রমে রাত হল। নতুন কিছুই ঘটল না। রাতটা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনই অন্ধকার; একটা ঝড়ো হাওয়া বইছে। অনেক বারই আমি বিছানা

ছেড়ে উঠে গেলাম, নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখলাম, সব কিছু ঠিক আছে কি না, শান্ত্রীরা সতর্ক হয়ে পাহারা দিচ্ছে কি না। সর্বত্রই দেখলাম, তারা সজাগ ও সতর্ক; রহস্যময় বিপদের গুজব বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে; প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করায় সে গুজব সমর্থিত হয়েছে। ভোরের দিকে একবার ওয়েব-এর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল; তীব্র বাতাসের মধ্যে সেও বেরিয়ে এসেছে; বলল, সেও ঘুরে ঘুরে দেখছে সব কিছু ঠিকমত চলছে কি না।

পরের দিন ঘটনার গতি কিছুটা দ্রুততর হল। উইক্‌লো আরও একটা চিঠি লিখল; স্টার্ণ তার আগেই আস্তাবলে পৌঁছে দেখতে পেল চিঠিটা সে যথাস্থানে জমা রাখল; উইক্‌লো সরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিঠিটা হাতিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে উইক্‌লোর পিছু নিল; সাদা পোশাকের একজন গোয়েন্দা আবার তার পিছু নিল, কারণ দরকার হলে সে যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করাই আমরা সমীচিন মনে করেছিলাম। উইক্‌লো সোজা চলে গেল রেলওয়ে স্টেশনে, নিউ ইয়র্ক থেকে ট্রেনটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল, তারপর গাড়ি থেকে যত যাত্রী নামল তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে সবুজ গগল্‌স্ পরা ছড়ি হাতে একটি বয়স্ক লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উইক্‌লোর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং কারও প্রত্যাশায় চারদিকে তাকাতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে ছুটে গিয়ে উইক্‌লো তার হাতে একটা খাম গুঁজে দিল ও তারপরই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক পরের মুহূর্তেই স্টার্ণও চিঠিখানা ছিনিয়ে নিল এবং গোয়ান্দাটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল: "বৃদ্ধ লোকটির পিছু নাও-তাকে দৃষ্টির আড়াল করো না।" তারপরেই সেও ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে সোজা দুর্গে এসে হাজির হল।

দরজা বন্ধকরে আমরা বসে গেলাম। রক্ষীকে নির্দেশ দেওয়া হল কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।

প্রথমে আস্তাবলে পাওয়া চিঠিটা খোলা হল। তাতে লেখা ছিল:

পবিত্র মিত্রপক্ষ। যথারীতি বন্দুকের মধ্যে গত রাতে যথাস্থানে রাখা প্রভুর নির্দেশ পেয়েছি; এর দ্বারা নীচু মহল থেকে পাওয়া পূর্ববর্তী সব নির্দেশ বাতিল করা হয়েছে। নির্দেশ যথাযোগ্য হাতে পৌঁচেছে এই মর্মে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত বন্দুকের মধ্যে রেখে দিয়েছি-

ওয়েব বাধা দিয়ে বলল: "ছেলেটার উপর এখন সর্বদাই নজর রাখা হচ্ছে না কি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ; তার আগেকার চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই তার উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।"

"তাহলে সে কোন জিনিস বন্দুকের মধ্যে ভরছে, আবার বের করে নিচ্ছে, অথচ ধরা পড়ছে না, এটা কেমন করে হয়?"

আমি বললাম, "দেখ, এটা আমিও ভাল করে বুঝতে পারছি না।"

"আমিও পারছি না," ওয়েব বলল। "এর একটিমাত্র অর্থই হতে পারে যে, শান্ত্রীদের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে। কোন না কোন ভাবে তাদের যোগসাজস ছাড়া এ জিনিস ঘটতেই পারে না।"

রেবার্ণকে ডেকে হুকুম দিলাম, সে যেন বন্দুকগুলি পরীক্ষা করে দেখে কিছু পাওয়া যায় কি না। আবার চিঠি পড়া শুরু করলাম:

নতুন নির্দেশগুলি অবশ্য পালনীয়; তাতে বলা হয়েছে, আগামী কাল সকাল ৩ ঘটিকায় MMMMM হবে FFFFF। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ট্রেনে বা অন্য ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আসবে দু'শ' এবং যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হবে। আজই সংকেতটা বিলি করে দেব। যদিও কিছু খবর প্রকাশ পেয়েছে, কারণ শান্ত্রীদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং সেনাপতিরা গতকাল রাতে বেশ কয়েকবার টহল দিয়েছে, তবু আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। W. W. আজ দক্ষিণ থেকে আসবে এবং অন্য পদ্ধতিতে গোপন নির্দেশ পাবে। সকাল ঠিক দুটোর সময় তোমরা দু'জন অবশ্য ১৬৬-তে উপস্থিত থাকবে সেখানেই B.Bএর দেখা পাবে, বিস্তারিত নির্দেশাদি সেই দেবে। সংকেতবাক্য গতকালের মতই থাকছে, শুধু উল্টে দেওয়া হয়েছে-প্রথম অংশটা শেষে ও শেষের অংশটা আগে বসিয়ে নিও। মনে রেখ XXXX। ভুলো না। মনে সাহস রাখ; পরবর্তী সূর্য ওঠার আগেই তোমরা বীরের মর্যাদা পাবে; তোমাদের খ্যাতি হবে চিরস্থায়ী; ইতিহাসে একটি মৃত্যুহীন পাতা তোমরা যোগ করে যাবে। আমেন।

"বজ্র ও দেবতা মার্স," ওয়েব বলে উঠল, "দেখে মনে হচ্ছে অবস্থা বেশ গরম হয়ে উঠেছে!"

আমি বললাম, "অবস্থা যে বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।" তারপর বললাম:

"পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, একটা বেপরোয়া অভিযান আসন্ন হয়ে উঠেছে। প্রশ্নই উঠতে পারে না।" তারপর বললাম:

"পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, একটা বেপরোয়া অভিযান আসন্ন হয়ে উঠেছে। আজ রাতেই যাত্রার শুরু-সেটাও পরিষ্কার। অভিযানের আসল চেহারা অর্থাৎ তার পদ্ধতি-ঐ সব অর্থহীন M ও F-এর পুটুলির মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে; কিন্তু আমার ধারণা, আকস্মিকভাবে ঘাঁটি দখল করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমাদের অত্যন্ত দ্রুত এগোতে হবে। আমি মনে করি, উইক্লোর ব্যাপারে এই লুকোচুরির নীতি চালিয়ে আর কোন লাভ নেই। সকাল দুটোর সময় যাতে সমবেত দলটার উপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের জানতেই হবে '১৬৬' টা কোথায় অবস্থিত, আর সে তথ্য জানবার নিঃসন্দেহ ও দ্রুত পথ হচ্ছে ওই ছেলেটার কাছ থেকে সে কথা আদায় করা। কিন্তু কোন রকম কাজে হাত দেবার আগে প্রথমেই সব ব্যাপারটা সমর দপ্তরের গোচরে আনতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে সর্বময় ক্ষমতা চেয়ে নিতে হবে।"

তারে পাঠাবার জন্য সংকেতের সাহায্যে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হল; সেটা পড়ে অনুমোদন করে পাঠিয়েও দিলাম।

চিঠিটার আলোচনা শেষ করে আমরা খোঁড়া ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা চিঠিটা খুললাম। তার মধ্যে দু'খানা সম্পূর্ণ সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না! আমাদের সব আগ্রহ ও প্রত্যাশার উপর কেউ যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। মুহূর্তের জন্য আমরাও বুঝি ঐ কাগজের মতই ফাঁকা হয়ে গেলাম, আর ততোধিক বোকা। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য; পরক্ষণেই "অদৃশ্য কালি"র কথা আমাদের মনে পড়ে গেল। কাগজখানাকে আগুনের উপর ধরে গরম লেগে তাতে কি লেখা ফুটে ওঠে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু কয়েকটা অস্পষ্ট টান ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তখন সার্জেনকে ডেকে পাঠিয়ে কাগজটা নিয়ে সব রকম পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালাতে বলে দিলাম। তাকে আরও বলে দিলাম, যে মুহূর্তে সঠিক পরীক্ষার দ্বারা চিঠির লেখা ফুটিয়ে তুলতে পারবে তৎক্ষণাৎ যেন সে সব কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। এই বাধা আমাদের বিব্রত করে তুলল; যত দেরী হচ্ছে ততই আমাদের বিরক্তি বাড়ছে; তখনও আমাদের পুরোপুরি আশা যে, এই চিঠিটা থেকেই ষড়যন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা আমরা জানতে পারব।

এমন সময় সার্জেণ্ট রেবার্ণ এসে হাজির। তিনটে গিঁট দেওয়া ফুটখানেক লম্বা এক টুকরো টোয়াইন সুতো পকেট থেকে বের করে আমাদের সামনে তুলে ধরল।

বলল, "উপকূল-সীমান্তের একটা বন্দুকের মধ্যে এটা পেয়েছি। সবগুলো বন্দুকের ভিতর থেকে ঘড়ি'টা বের করে ভাল করে পরীক্ষা করেছি; এই সুতোটা ছাড়া আর কিছুই পাই নি।"

তাহলে "প্রভু"র নির্দেশ যে ভুল হাতে পড়ে নি সেটা বোঝাবার "সংকেত" হিসাবেই উইক্লো এই সুতোর টুকরোটা ব্যবহার করেছে। তখনই হুকুম দিলাম, গত চব্বিশ ঘণ্টা যে সব শাস্ত্রী ওই বন্দুকটার কাছাকাছি ছিল তাদের প্রত্যেককে অবিলম্বে আলাদা আলাদা ভাবে আটক রাখা হোক এবং আমার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া কারও সঙ্গে যেন তাদের যোগাযোগ রাখতে না দেওয়া হয়।

এবার এল সমর-সচিবের কাছ থেকে চিঠি। তাতে লেখা:

হেবিয়াস কর্পাস স্থগিত রাখুন। সামরিক আইনে আটক করুন। প্রয়োজন মত গ্রেপ্তার করুন। উৎসাহ ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করুন। দপ্তরকে অবহিত রাখুন।

এবার কাজে নামবার মত ব্যবস্থা হল। লোক পাঠিয়ে সেই খোঁড়া ভদ্রলোকটিকে গোপনে গ্রেপ্তার করিয়ে সকলের অলক্ষে দুর্গে নিয়ে আসা হল। তাকে কড়া পাহারায় রাখা হল। সব রকম যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হল। প্রথমে তর্জন-গর্জন করলেও পরে সে হাল ছেড়ে দিল।

পরবর্তী খবর হল, উইক্লো যখন দু'জন নবনিযুক্ত সৈনিকের হাতে কিছু গুঁজে দেয় তখন রক্ষীরা তা দেখে ফেলে, আর সে পিছন ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পাকড়াও করে আটক করে। দু'জনের কাছেই একটুকরো কাগজে এই রকম লেখা পাওয়া গেছে:

ঈগল পাখির তৃতীয় অভিযান

স্মরণ রেখ XXXX

১৬৬

নির্দেশ মত সাংকেতিক টেলিগ্রামের মারফৎ দপ্তরকে সব খবর জানিয়ে একটু করো লেখার বিবরণও পাঠিয়ে দিলাম। মনে হচ্ছে উইক্লোর ব্যাপারে সব মুখোশ খুলে ফেলবার মত যথেষ্ট শক্তি আমরা অর্জন করেছি; কাজেই তাকে ডেকে পাঠালাম। "অদৃশ্য কালি"-তে লেখা চিঠিটাও ফেরৎ নিয়ে এলাম; সেই সঙ্গে সার্জন জানাল যে তার পরীক্ষায় এখনও কোন ফল হয় নি, তবে ভবিষ্যতে দরকার হলে অন্য অনেক রকম ভাবে সে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

ইতিমধ্যে উইক্লো ঘরে ঢুকল। তাকে খুব শ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তবে সে বেশ সংযত ও স্বচ্ছন্দই ছিল। যদি কোন রকম সন্দেহ তার মনে জেগেও থাকে, চোখ-মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। একটু সময় দাঁড় করিয়ে রেখে ভালভাবেই বললাম:

"দেখ বাপু, মাঝে মাঝেই তুমি ঐ পুরনো আস্তাবলে যাও কেন?"

কোন রকম অপ্রস্তুত না হয়ে সরলভাবেই সে জবাব দিল:

"দেখুন স্যার, সেটা আমিও ঠিক জানি না; কোন বিশেষ কারণও নেই; শুধু আমি একটু একা থাকতে চাই, আর সেখানে গেলে আমার ভাল লাগে।"

"ভাল লাগে, বলছ?"

"হ্যাঁ স্যার," আগের মতই নির্দোষ সরলতার সঙ্গে সে উত্তর দিল।

"শুধু এই জন্যই সেখানে যাও?"

দুটি বড় বড় নরম চোখে শিশুসুলভ বিস্ময় প্রকাশ করে সে বলল, "হ্যাঁ স্যার।"

"ঠিক বলছ?"

"হ্যাঁ স্যার, ঠিক বলছি।"

একটু থেমে আমি বললাম:

"উইক্লো, তুমি এত লেখ কেন?"

"আমি? আমি তো বেশী লিখি না স্যার।"

"লেখ না?"

"না স্যার। ও হো, ওই সব আঁকিবুকির কথা বলছেন? তা একটু করি, মজা পাবার জন্য।"

"আঁকিবুকিগুলো দিয়ে কি কর?"

"কিছুই করি না স্যার-ফেলে দিই।"

"কখনও কাউকে পাঠাও না?"

"না স্যার।"

হঠাৎ 'কর্নেল"কে লেখা চিঠিটা তার দিকে ছুড়ে দিলাম। ঈষৎ চমকে উঠে পরক্ষণেই সে সামলে নিল। তার গালে একটু লালের ছোপ পড়ল।

"তাহলে এই আঁকিবুকিটা পাঠিয়েছিলে কেন?"

"কোন ক্ষ-ক্ষতি করতে আমি চাই নি স্যার!"

"ক্ষতি করতে চাও নি! সেনাবাহিনীর প্রতি, তোমার পদমর্যাদার প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, আর বলছ ক্ষতি করতে চাও নি?"

মাথা নীচু করে সে চুপ করে রইল।

"কথা বল। মিথ্যে কথা রাখ। এ চিঠি কার জন্য লিখেছিলে?"

এবার সে বিব্রত বোধ করল; কিন্তু শীঘ্রই সে ভাব সামলে নিয়ে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলল:

"আপনাকে সত্য কথাই বলব স্যার-পুরো সত্য। কারও জন্যই ও চিঠি আমি লিখি নি। নিজের মনের সুখেই লিখেছি। এখন বুঝতে পারছি কী ভুল আর বোকামিই না করেছি। বিশ্বাস করুন স্যার, অপরাধ যদি কিছু করে থাকি তো ঐ পর্যন্তই।"

"খুসি হলাম। এ রকম চিঠি লেখা খুবই বিপজ্জনক। তুমি যে এই একটিমাত্র চিঠিই লিখেছ, আশা করি সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ স্যার, সম্পূর্ণ নিশ্চিত।"

তার ধৃষ্টতা বিস্ময়কর। কী আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে সে মিথ্যা কথাগুলি বলে যাচ্ছে। আমার ক্রমবর্ধমান ক্রোধকে শান্ত করতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর বললাম:

"উইক্‌লো, স্মৃতিকে নেড়ে চেড়ে দেখ তো দু'তিনটি ছোটখাট ব্যাপারে যা জানতে চাই তার জবাবা দিতে পার কি না।"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্যার।"

"তাহলে শুরু করি-এই 'প্রভুটি' কে?"

চমকে উঠে সে আমাদের মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মুহূর্তের মধ্যে আবার গম্ভীর হয়ে সে শান্তভাবে জবাব দিল:

"আমি জানি না স্যার।"

"তুমি জান না?"

"না স্যার।"

"ঠিক বলছ তুমি জান না?"

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সে যথেষ্ট চেষ্টা করল, কিন্তু চাপটা বড়ই বেশী; ধীরে ধীরে তার থুত্‌নিটা বুকের উপর ঝুলে পড়ল; সে চুপ করে গেল; সেইখানে দাঁড়িয়ে এমনভাবে বোতামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল যে যত খারাপ কাজই করে থাকুক তবু তাকে দেখে করুণা হল। ইতিমধ্যে নীরবতা ভঙ্গ করে আমি প্রশ্ন করলাম:

"'পবিত্র মিত্রপক্ষ' কারা?"

তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল; দুটি হাত তুলে এমন ভঙ্গী করল যেন কোন হতাশ জীব সহানুভূতির জন্য আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। মাটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েই রইল। সে কি বলে শুনবার অপেক্ষায় তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। দেখতে দেখতে তার গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম:

"আমার প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতেই হবে বাপু। সত্য কথাই তোমাকে বলতে হবে। 'পবিত্র মিত্রপক্ষ' কারা?"

সে নীরবেই কাঁদতে লাগল। তখন আমি কিছুটা শক্ত গলায় বললাম:

"জবাব দাও!"

অনেক চেষ্টা করে আবেদনের ভঙ্গীতে মুখ তুলে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কোন রকমে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল:

"দয়া করুন স্যার। এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না, কারণ আমি জানি না।"

"কি বললে!"

"সত্যি স্যার, আমি ঠিকই বলছি। এই মুহূর্তের আগে 'পবিত্র মিত্রপক্ষ'-এর কথা আমি কখনও শুনি নি। বিশ্বাস করুন স্যার, সত্যি তাই।"

"হায় ভগবান! তোমার এই দ্বিতীয় চিঠিটার দিকে তাকাও; এই যে, 'পবিত্র মিত্রপক্ষ' কথাটা দেখতে পাচ্ছ? এখন কি বলবে?"

যেন তার প্রতি মহা অন্যায় করা হয়েছে তেমনই আহত দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবেগভরে বলে উঠল:

"এটা একটা নিষ্ঠুর তামাসা স্যার; সাধ্যমত ভাল কাজ করতেই আমি চেষ্টা করেছি, কখনও কারও কোন ক্ষতি করি নি, তবু কেন তারা আমার সঙ্গে এমন খেলা খেলছে? কেউ আমার হাতের লেখা নকল করেছে; এ চিঠির একটি লাইনও আমি লিখি নি; এ চিঠিও এর আগে কখনও দেখি নি!"

"আঃ, কী অকথ্য মিথ্যাবাদী তুমি! এই যে, এটার সম্পর্কে তুমি কি বলতে চাও?"-অদৃশ্য কালিতে লেখা চিঠিটা পকেট থেকে বের করে তার চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

তার মুখটা সাদা হয়ে গেল-মরা মানুষের মুখের মত সাদা। টলতে টলতে দেয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলে নিল। একটু পরে শোনা যায় কি যায় না এমনই দুর্বল গলায় জিজ্ঞাসা করল:

"আপনি-আপনি এটা পড়েছেন?"

সত্য কথাই বলতাম, কিন্তু তার আগেই মুখ ফস্কে একটা মিথ্যা "হ্যাঁ" বেরিয়ে গেল। দেখলাম, ছেলেটির চোখে আবার সেই সাহস ফিরে এসেছে। তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সে চুপ করেই রইল। তখন আমি বললাম:

"এই চিঠির যা বক্তব্য সে বিষয়ে তোমার কি বলার আছে?"

পরিপূর্ণ সংযমের সঙ্গে সে জবাব দিল:

"শুধু বলতে চাই, বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণ নিরীহ ও নির্দোষ; তাতে কাউকে আঘাত করা হয় নি।"

তার কথাকে অপ্রমাণ করতে তো পারব না, তাই নিজেই কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। এরপর কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

যা হোক, একটা ধারণা মাথায় আসায় স্বস্তি পেলাম। বললাম:

"তুমি ঠিক বলছ যে 'প্রভু' এবং 'পবিত্র মিত্রপক্ষ' সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না, আর এই চিঠি যেটাকে তুমি জাল বলছ সেটাও তুমি লেখ নি?"

"হ্যাঁ স্যার-ঠিক বলছি।"

ধীরে ধীরে গিঁট দেওয়া টোয়াইন সুতো বের করে বিনা বাক্যব্যয়ে তার সামনে তুলে ধরলাম। নিস্পৃহভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চোখ ফেরাল। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তবু রাগ চেপে স্বাভাবিক গলায়ই বললাম:

"উইক্‌লো, এটা দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এটা কি?"

"একটু করো সুতো বলে মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে! এটা একটু করো সুতোই বটে। এটাকে চিনতে পারছ?"

যতদূর শান্তস্বরে সম্ভব জবাব দিল, "না স্যার।"

কী আশ্চর্য অচঞ্চল ভাব তার! কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলাম, যাতে সেই নীরবতা আমার বক্তব্যকে আরও জোরদার করে তুলতে পারে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে গম্ভীরভাবে বললাম:

"দেখ বাপু, এতে তোমার কোন লাভ হবে না-একেবারেই না। 'প্রভু'র কাছে পাঠানো এই সংকতে, উপকূল-সীমান্তের একটি বন্দুকের মধ্যে পাওয়া এই গিঁট দেওয়া সুতো-"

"বন্দুকের মধ্যে পাওয়া! না, না, না! বন্দুকের মধ্যে বলবেন না, বলুন ঘড়ির একটা ফাটলের মধ্যে!-এটা নিশ্চয় একটা ফাটলের মধ্যে ছিল!" নতজানু হয়ে বসে দুই হাত একত্র করে সে মুখটা তুলল। সে মুখ ভয়ে এতই উদ্‌ভ্রান্ত ও ছাইয়ের মত হয়ে গেছে যে দেখলে করুণা হয়।

"না, এটা বন্দুকের মধ্যে ছিল।"

"ওঃ, কোথাও কিছু ভুল হয়েছে! হা ভগবান, আমি গেলাম!" লাফ দিয়ে উঠে তাকে ধরবার জন্য উদ্যত হাতগুলিকে এড়িয়ে সে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল, সেখান থেকে পালাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পালানো অসম্ভব। তখন আবার হাঁটু ভেঙে বসে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠে সে আমার পা জড়িয়ে ধরল; আর কাতর স্বরে মিনতি করে বলতে লাগল, "হায়, আমার প্রতি করুণা করুন! আমাকে দয়া করুন! আমাকে ধরিয়ে দেবেন না; তাহলে তারা আমাকে এক মুহূর্তও বাঁচতে দেবে না! আমাকে আশ্রয় দিন, রক্ষা করুন। সব কথা বলব!"

তাকে শান্ত করে, তার ভয় দূর করে তার মনটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তখন আমি প্রশ্ন করতে লাগলাম, আর সে অবনত চোখে মাঝে মাঝেই অবিশ্রাম ঝরে পড়া চোখের জল মুছতে মুছতে বিনীতভাবে জবাব দিতে লাগল:

"তাহলে মনেপ্রাণে তুমি বিদ্রোহী?"



"হ্যাঁ স্যার।"

'এবং গুপ্তচর?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বাইরের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারেই তুমি কাজ করছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"স্বেচ্ছায়?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"নিশ্চয়ই খুসি মনে?"

"হ্যাঁ স্যার; অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। দক্ষিণ আমার দেশ; আমার অন্তর দক্ষিণী; আর তার জন্যই আমি সব কিছু করেছি।"

"তাহলে তোমার প্রতি অন্যায় এবং তোমার পরিবারের নির্যাতনের যে কাহিনী তুমি আমাকে বলেছিলে সেটা উপস্থিত মত বানানো ছিল?"

"তারা-তারা আমাকে এই কথাই বলতে বলেছিল স্যার।"

"আর যারা তোমার প্রতি করুণা করেছিল, তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, তুমি চেয়েছিলে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তাদের ধ্বংস করতে। হায় পথভ্রান্ত যুবক, তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি কত নীচ্?"

জবাবে সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"যাক সে কথা। কাজের কথায় এস। এই কর্নেল কে? সে কোথায় থাকে?"

সে ডুকরে কেঁদে উঠল; কিছুতেই জবাব দিতে চাইল না। বলল, একথা বললে তাকে খুন করে ফেলবে। আমি ভয় দেখালাম, সত্য কথা না বললে তাকে অন্ধকার ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কথা দিলাম, সব কথা খুলে বললে যে কোন বিপদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করব। কিন্তু মুখে যেন কুলুপ এঁটে অনমনীয় দৃঢ়তায় সে চুপ করে রইল। তখন আমিও ব্যবস্থা নিলাম।

অন্ধকার সেলটা একনজর দেখেই তার মত পাল্টে গেল। হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে সে সব কথা বলতে স্বীকার করল।

তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। এবার সে "কর্নেল"-এর নাম বলল, তার বর্ণনা দিল। বলল, শহরের সেরা হোটেলে সাধারণ নাগরিকের পোশাকে তাকে পাওয়া যাবে। পুনরায় ভয় দেখালে তবে সে 'প্রভু'র নাম ও বিবরণ বলে দিল। বলল, আর. এফ. গেলর্ড নামে পরিচিত "প্রভু"-কে পাওয়া যাবে নিউ ইয়র্কের ১৫, বণ্ড স্ট্রীট-এ। তখনই শহরের পুলিশের বড়কর্তাকে টেলিগ্রামে ঐ নাম ও বিবরণ জানিয়ে দিয়ে বললাম, গেলর্ডকে গ্রেপ্তার করা হোক, এবং আমি না ডেকে পাঠানো পর্যন্ত আটক করে রাখা হোক।

তারপর বললাম, "আমি জানি কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী বাইরে আছে-সম্ভবত তারা নিউ লণ্ডন-এই আছে। তাদের নাম ও বিবরণ বল।"

তিনজন পুরুষ ও দুটি স্ত্রীলোকের নাম ওবিবরণ সে দিল-তারা সকলেই শহরের বড় হোটেলে আছে। নিঃশব্দে লোক পাঠিয়ে তাদের সব ক'জনকে ও "কর্নেল"-কে গ্রেপ্তার করে দুর্গে এনে আটক করলাম।

"তারপর-এই দুর্গের মধ্যে তোমার যে তিনজন সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারী আছে তাদের সব খবর আমি জানতে চাই।"

মনে হল, এবার সে একটা মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভাঁওতা দিতে যাচ্ছিল; কিন্তু তখনই আমি তাদের দু'জনের কাছে যে রহস্যময় দু' টুকরো কাগজ পাওয়া গিয়েছিল সেটা মেলে ধরলাম তার সামনে, আর তাতে চমৎকার ফল পেলাম। তাকে বললাম, দু'জনকে আমরা ধরতে পেরেছি, তাকে দেখিয়ে দিতে হবে তৃতীয় জনকে। এতে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; চেঁচিয়ে বলল:

"দয়া করে আমাকে ও কাজ করতে বলবেন না; সে সেখানেই আমাকে খুন করে ফেলবে!"

আমি বললাম, ওসব বাজে কথা; তাকে রক্ষা করবার জন্য কাছাকাছি আমি লোক রেখে দেব; তাছাড়া সব লোকদেরই নিরস্ত্র অবস্থায় হাজির করা হবে। আমার হুকুমে সব নবনিযুক্ত সৈনিকদের এক জায়গায় জড়ো করা হল, আর সে বেচারী কাঁপতে কাঁপতে এসে যথাসম্ভব নির্লিপ্তভাবে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের একজনকে একটি কথা বলে পাঁচ পা যেতে না যেতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হল।

উইক্‌লো পুনরায় আমাদের সামনে হাজির হতেই তিনজনকে ডেকে আনা হল। তাদের একজনকে এগিয়ে এসে দাঁড়াতে বলে আমি বললাম:

"উইক্‌লো, মনে থাকে যেন, আসল সত্য থেকে একচুলও সরবে না। এই লোকটি কে, আর এর সম্পর্কে তুমি কি জান?"

কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে ফলাফলের চিন্তা দূরে সরিয়ে সে লোকটির মুখের উপর চোখ রেখে বিনা দ্বিধায় নীচের কথাগুলি বলে গেল:

"এর আসল নাম জর্জ ব্রিস্টো। এসেছে নিউ অর্লিয়েন্স থেকে; দু'বছর আগে ছিল উপকূলবাহী জাহাজ 'ক্যাপিটল'-এর দ্বিতীয় মেট; লোকটি বেপরোয়া; মানুষ খুন করার অপরাধে দু'বার জেল খেটেছে-একবার লোহার রড্ দিয়ে খুন করেছিল একজন খালাসিকে, আর একবার খুন করেছিল একটা মজুরকে সে জল মাপবার ওলনটা তুলতে রাজী হয় নি বলে। ও একটি গুপ্তচর, আর সেই কাজ করবার জন্যই 'কর্নেল' ওকে এখানে পাঠিয়েছে। '৫৮-তে সেণ্ট নিকোলাস জাহাজে যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন ও ছিল সেই জাহাজের তৃতীয় মেট; এবং একটি খালি নৌকোয় করে নিহত ও আহতদের যখন তীরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাদের জিনিসপত্র লুট করবার অপরাধে প্রায় মরতে বসেছিল।"

এইভাবে সে লোকটির পুরো জীবন-বৃত্তান্ত বলে গেল। তার কথা শেষ হলে আমি লোকটিকে বললাম:

"এ বিষয়ে তোমার কি বলার আছে?"

"এ রকম নারকীয় মিথ্যা আর কেউ কখনও বলে নি স্যার।"

তাকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিয়ে একে একে অন্যদের ডাকলাম। ফল একই। ছেলেটি প্রত্যেকেরই বিস্তারিত ইতিহাস বলে গেল; এতটুকু ইতস্তত করল না; কিন্তু দুটি বদমাসই একবাক্যে জানাল যে ছেলেটির কথা সর্বৈব মিথ্যা। তারা কিছুই স্বীকার করল না। তাদেরও কয়েদখানায়া পাঠিয়ে দিয়ে একে একে বাদবাকি সব কয়েদীদের হাজির করলাম। উইক্‌লো তাদের সকলের কথাই বলল-দক্ষিণের কোন্ শহর থেকে তারা এসেছে, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক তারও বিস্তারিত বিবরণ দিল।

কিন্তু তারা সকলেই ছেলেটির কথা অস্বীকার করল এবং কেউই কোন কথা কবুল করল না। পুরুষরা রাগ দেখাল, মেয়েরা কান্নাকাটি করল। তাদের কথা হল, তারা সকলেই নির্দোষ; এসেছে পশ্চিম অঞ্চল থেকে; ইউনিয়নকে তারা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশী ভালবাসে। বিরক্ত হয়ে সবগুলোকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে আবার উইক্‌লোকে জেরা শুরু করে দিলাম।

"নং ১৬৬ কোথায়, এবং B. B. কে?"

কিন্তু এখানে সে অনড় হয়ে দাঁড়াল। উপরোধ বা ভীতিপ্রদর্শন-কোনটাতেই কাজ হল না। সময় বয়ে যাচ্ছে-তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পা বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে দিলাম। যতই যন্ত্রণা বাড়তে লাগল ততই সে চীৎকার করতে লাগল। সে চীৎকার অসহ্য। কিন্তু

আমিও অবিচল। শীঘ্রই সে চীৎকার করে বলল:

"ওঃ, দয়া করে আমাকে নামিয়ে দিন; আমি বলব!"

"না-আগে বল, তারপর নামাব।"

প্রতিটি মুহূর্তই যন্ত্রণাদায়ক। কাজেই তার মুখে কথা ফুটল:

"নং ১৬৬, ঈগল হোটেল!"-উপকূলবর্তী একটা বাজে সরাইখানার নাম করল; সেখানে যত রাজ্যের দিন-মজুর, জাহাজী নাবিক আর কুখ্যাত লোকদের আড্ডা।

তাকে মুক্ত করে দিয়ে জানতে চাইলাম, এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি।

ফোঁস ফোঁস করতে করতেই ঈষৎ উদ্ধতভঙ্গীতে সে বলল, "আজ রাতে দুর্গ দখল করা।"

"ষড়যন্ত্রের সব পাণ্ডাদের ধরতে পেরেছি কি?"

"না। ১৬৬-তে যাদের জমায়েত হবার কথা তাদের ছাড়া বাকিদের হাতে পেয়েছেন।"

"স্মরণ কর 'XXXX'-এ কথার মানে কি?"

কোন কথা নেই।

"১৬৬-তে যাবার সংকেত কি?"

কোন জবাব নেই।

'FFFFF' ও 'MMMM' অক্ষর-গুচ্ছ দুটি অর্থ কি? জবাব দাও। নইলে আবার ফ্যাঁসাদে পড়বে।"

"কিছুতেই জবাব দেব না। তার আগে মরব। এখন করুণ যা আপনার খুসি।"

"উইক্লো, কি বলছ ভাল করে ভেবে দেখ। এই কি শেষ কথা?"

নিষ্কম্প গলায় দৃঢ়স্বরে সে বলল:

"এই শেষ কথা। আমার দেশকে আমি ভালবাসি, আর উপরের সূর্য যত কিছুর উপর কিরণ বর্ষণ করে তাকে করি ঘৃণা-এ যেমন নিশ্চিত, তেমনই নিশ্চিত আমার কথা। এ সব কথা প্রকাশ করবার আগে আমি মৃত্যুকেই বরণ করব।"

আবার তাকে পা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। বেচারী যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল। সে দৃশ্য হৃদয়-বিদারক, কিন্তু তার কাছ থেকে আর কিছুই জানা গেল না। প্রতিটি প্রশ্নের একই জবাব তার আর্তকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল; "আমি মরতে জানি; আমি মরব; কিন্তু কিছুতেই বলব না।"

হাত ছেড়েই দিতে হল। বুঝতে পারলাম, সে মরবে তবু কবুল করবে না। সুতরাং নীচে নিয়ে গিয়ে তাকে কড়া পাহাড়ায় রেখে দেওয়া হল।

তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় সমর দপ্তরে টেলিগ্রাম পাঠাতে এবং নং ১৬৬-তে ঝাঁপিয়ে পড়বার উদ্যোগ-আয়োজন করতেই আমরা ব্যস্ত রইলাম।

সে এক উত্তেজনা-ভরা সময়-সেই অন্ধকার তিক্ত রাত। খবর ফাঁস হয়ে গেছে; সমগ্র বাহিনী সদাসতর্ক। শান্ত্রীর সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে। মাথা লক্ষ্য করে তাক করা বন্দুকের সামনে না দাঁড়িয়ে কেউ দুর্গে ঢুকতে বা দুর্গ থেকে বেরতে পারছে না। যা হোক, ওয়েব ও আমার দুশ্চিন্তা এখন আগেকার চাইতে অনেক কম, কারণ অনেকগুলি বড় বড় পাণ্ডা আমাদের মুঠোয় ধরা পড়ায় ষড়যন্ত্রের জোর এখন স্বভাবতই অনেকটা কমে গেছে।

স্থির করলাম, যথাসময়ে নং ১৬৬-তে হানা দেব, B. B. কে পাকড়াও করব, এবং বাকি সকলের আসার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে থাকব। সকাল একটা পনের মিনিট নাগাদ আধা ডজন বাছাই-করা যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর লোককে সঙ্গে নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় উইক্লো ছোকরাকেও সঙ্গে নিলাম। আমরা চলেছি নং ১৬৬-তে; যদি দেখি যে সে আমাদের মিথ্যা বলে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ঠিক পথ দেখাতে তাকে বাধ্য করতে পারব; অন্যথায় কৃতকর্মের ফল তাকে অবশ্য ভোগ করতে হবে।

চুপি চুপি পা ফেলে সরাইখানাটায় পৌঁছে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম। ছোট মদের ঘরটাতে আলো জ্বলছে; বাকি বাড়িটা অন্ধকার। সামনের দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে সেটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জুতো খুলে সকলে মদের ঘরে ঢুকলাম, জার্মান মালিকটি চেয়ারে বসেই ঘুমুচ্ছে। তাকে আস্তে জাগিয়ে তুলে বললাম, জুতো খুলে আমাদের আগে আগে চল; খবরদার, টু শব্দটি করবে না। বিনা বাক্যব্যয়ে সে কথা মতই কাজ করল; বেচারি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে। ১৬৬-র পথে চলতে হুকুম দিলাম। একদল বিড়ালের মত নরম পায়ে বেশ কিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা লম্বা হলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দরজার ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে ভিতরকার আবছা আলো দেখতে পেলাম। অন্ধকারে আমার গা ছুঁয়ে মালিক ফিস্ফিস্ করে জানাল, এটাই ১৬৬। দরজায় চাপ দিলাম-ভিতর থেকে বন্ধ। একটি দশাসই চেহারার সৈনিকের কানে কানে হুকুম জারি করলাম; তারপর সকলে কাঁধ লাগিয়ে চাপ দিতেই দরজাটা কব্জা থেকে খুলে গেল। পলকের জন্য বিছানায় একটি মূর্তিকে দেখতে পেলাম-তার মাথাটা তীরের মত মোমবাতির দিকে ঝুঁকে পড়ল; আলোটা নিভে গেল; আমাদের ঘিরে নেমে এল নিরন্ধ্র অন্ধকার। একলাফে বিছানার উপর পড়ে আমার হাঁটু দিয়ে লোকটাকে চেপে ধরলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য বন্দী ভীষণভাবে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে তার গলাটাও সজোরে চেপে ধরলাম। সেই অবস্থায়ই রিভলবারটা বের করে ঘোড়াটাকে টেনে তার ঠাণ্ডা নলটা তার গালের উপর চেপে বসালাম।

বললাম, "এবার যে কেউ একটা আলো জ্বালাও! একে আমি বাগে এনেছি।"

তাই করা হল। দেশলাই জ্বলে উঠল। বন্দীর দিকে তাকালাম। হায় জর্জ! এ যে একটি স্ত্রীলোক!

তাকে ছেড়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলাম; বেশ একটু ভয়ই পেয়েছি। প্রত্যেকেই বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে আছে। সকলেরই যেন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সত্যি, কাণ্ডটা যেমন আকস্মিক, তেমনই চমকপ্রদ।

তরুণীটি কাঁদতে শুরু করে দিল; বিছানার চাদরে মুখ ঢাকল। মালিক সবিনয়ে বলল:

"আমার মেয়ে; এমন একটা কাজ সে করছিল যেটা ঠিক নয়।"

"তোমার মেয়ে? এই তরুণী তোমার মেয়ে?"

"হ্যাঁ, সে আমার মেয়ে। কিছুটা অসুস্থ অবস্থায় আজ রাতেই সে সিনসিনাটি থেকে বাড়ি এসেছে।"

"বড়ই গোলমেলে ব্যাপার; ছেলেটা আবার মিথ্যা বলেছে। এটা সঠিক ১৬৬ নয়; এও B. B. নয়। ওহে উইক্লো, সঠিক ১৬৬-তে আমাদের নিয়ে চল, নইলে-আরে! ছেলেটা কোথায় গেল?"

পালিয়েছে; নির্ঘাৎ পালিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। কী ভয়ংকর পরিস্থিতি। কেন তাকে বেঁধে একজন সৈন্যের হাতে রেখে দিই নি সে বোকামি তো আমারই। কিন্তু সে কথা ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। এ অবস্থায় কি করা উচিত-সেটাই আসল প্রশ্ন। এই মেয়েটিও তো B. B. হতে পারে। আমি তা বিশ্বাস করি না। কিন্তু অবিশ্বাসকে তো প্রমাণ বলে মানা যায় না। কাজেই শেষ পর্যন্ত হলঘরের অপর প্রান্তে ১৬৬-র উল্টো দিকের একটা খালি ঘরে আমার লোকজনদের মোতায়েন করে

হুকুম জারি করে দিলাম, যে কেউ মেয়েটির ঘরের দিকে যাবে তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে এবং পুনরাদেশ পর্যন্ত সরাইখানার মালিককেও যেন কড়া নজরে তাদের সঙ্গেই রাখা হয়। তারপরই দুর্গের অবস্থা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে অতিদ্রুত সেদিকে পা চালিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ, সবই ঠিক ছিল। আর ঠিকই রইল। সারা রাত জেগে বসে রইলাম। কিছুই ঘটল না। আবার ভোর হয়েছে দেখে, এবং তারকা-রেখালাঞ্ছিত পতাকা যে তখনও ট্রাম্বুল দুর্গের মাথায় উড়ছে এ কথা সরকারী দপ্তরকে টেলিগ্রামে জানাতে পেরে মনে অবর্ণনীয় পুলক অনুভব করলাম।

বুকের উপর থেকে মস্ত বড় একটা বোঝা নেমে গেল। তবু কড়া পাহারা বা উদ্যোগ-আয়োজনে কোন রকম ঢিল দিলাম না; বর্তমান পরিস্থিতিতে তা করা চলে না। বন্দীদের একে একে ডেকে তুললাম, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের জ্বালাতন করলাম, কিন্তু কোন কাজ হল না। তারা দাঁত কড়মড় করল, চুল ছিঁড়ল, কিন্তু কোন কথাটি ফাঁস করল না।

দুপুর নাগাদ নিখোঁজ ছেলেটির খবর এল। সকাল ছ'টায় এখান থেকে আট মাইল দূরে তাকে দেখা গেছে-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে পায়ে হেঁটে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনীর একজন লেফ্টেন্যাণ্ট ও একটি সাধারণ সৈনিককে পাঠিয়ে দিলাম তার খোঁজে। বিশ মাইল গিয়ে তবে তারা তার দেখা পেল। একটা বেড়া ডিঙিয়ে কর্দমাক্ত মাঠ পেরিয়ে সে শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে গ্রামের শেষ প্রান্তের একটা পুরনো ধাঁচের অট্টালিকার দিকে। একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘুর পথে এগিয়ে গিয়ে লেফ্টেন্যাণ্ট উল্টো দিক থেকে সে বাড়িতে পৌঁছে গেল এবং ঘোড়া থেকে নেমে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। কেউ কোথাও নেই; পাশের একটা ঘরে ঢুকে গেল; সেটাও ফাঁকা; সে ঘর থেকে সামনের ঘর বা বসবার ঘরে যাবার দরজাটা খোলা সে ঘরে পা দিতে যাবে এমন সময় একটা নীচু গলা তাদের কানে এল; কে যেন প্রার্থনা করছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা থামল। লেফ্টেন্যাণ্ট মাথাটা ভিতরে গলিয়ে দেখতে পেল বসবার ঘরের এক কোণে একটি বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধা নতজানু হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধ লোকটিই প্রার্থনা করছিল। তার প্রার্থনা শেষ হবার মুখেই উইক্লো ছোকরা সামনের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল। দুই বুড়ো-বুড়ি লাফ দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বলতে লাগল:

"আমাদের খোকা! আমাদের সোনা! ঈশ্বরের আশীর্বাদ। হারানো মানিক ফিরে পেয়েছি! মৃত্যুর পরেও সে জীবিত ফিরে এসেছে!"

কি রকম বুঝছেন স্যার? সেই ক্ষুদে শয়তান এই রকম বাড়িতে জন্মেছে, লালিত-পালিত হয়েছে; মাত্র একপক্ষ কাল আগে আমার বাসায় ঢুকে একটা করুণ কাহিনীর জাল বুনে আমাকে ধোঁকা দেবার আগে জীবনে সে কোন দিন এ বাড়ি ছেড়ে পাঁচ মাইলও যায় নি। এ কথা বেদ-বাক্যের মতই সত্য। ঐ বৃদ্ধ তার বাবা-একজন শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত পাদরি; আর ঐ বৃদ্ধা তার মা।

ঐ ছেলে ও তার ক্রিয়াকাণ্ড বোঝাতে আরও দু'একটি কথা বলছি। পরে জানা গেল, ছেলেটি সস্তা উপন্যাস ও চাঞ্চল্যকর গল্পে ভর্তি পত্র-পত্রিকা রাক্ষসের মত গিলত-সুতরাং গভীর রহস্য ও ঝকমকে বীরত্বের কল্পনা তাকে সব সময় হাতছানি দিত। তারপর আমাদের চারপাশে বিদ্রোহী গুপ্তচরদের গোপন চলাফেলা, তাদের মহৎ উদ্দেশ্য ও তাদের দু'তিনটে লোমহর্ষক কার্যকলাপের বিবরণ খবরের কাগজের প্রতিবেদনে পড়ে পড়ে তার কল্পনা একেবারে উদ্দাম হয়ে ওঠে। কয়েকমাস যাবৎ তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এক ইয়াংকি যুবক। সে যেমন কথা বলতে ওস্তাদ, তেমনিই তার কল্পনাশক্তিও প্রবল। মিসিসিপি নদী ধরে নিউ অর্লিয়ান্স থেকে দু' তিনশ' মাইল উজান পর্যন্ত চলাচলকারী একটা মালবাহী নৌকোয় সে যুবকটি বছর দুই "মাড ক্লার্ক" [তার মানে ছোট ভাণ্ডারী)-এর কাজ করেছিল-কাজেই সেই অঞ্চলের কিছু নাম ও বিবরণ সে সহজেই আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এদিকে যুদ্ধের আগে দেশের ঐ অঞ্চলটায় আমি দু'তিন মাস কাটিয়েছিলাম; ফলে ঐ অঞ্চলটার যৎ সামান্য যে জ্ঞান আমার হয়েছিল তার ফলে ছেলেটি সহজেই আমাকে বোকা বানাতে পেরেছিল; কিন্তু একজন আজন্ম লুসিয়ানিয়াবাসী মাত্র পনেরো মিনিট কথা বললেই তার সব ফাঁকিবাজী ধরে ফেলতে পারত। তার রাজদ্রোহাত্মক কাজের কয়েকটি জটিল কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে সে কেন বলেছিল যে সে মরবে তবু বলবে না তা জানেন কি? তার কারণ সে নিজেই তা জানত না!-সেগুলির কোন অর্থই হয় না; অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেচিন্তেই কল্পনার বশেই সে কথাগুলো বলে ফেলেছিল; ফলে হঠাৎ যখন সেগুলো বুঝিয়ে দেবার ডাক পড়ল তখন কোন ব্যাখ্যাই তার মাথায় এল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'অদৃশ্য কালি'-তে লেখা চিঠিতে কি কথা লুকিয়েছিল তা সে বলতে পারে নি, তার কারণ ঐ চিঠিতে কোন গুপ্ত কথাই ছিল না, ওটা নেহাতই একটা সাদা পাতা। বন্দুকের মধ্যে সে কখনও কিছু রাখে নি, তার রাখবার ইচ্ছাও তার হয় নি,-কারণ আসলে সে চিঠিগুলো লিখত সব কাল্পনিক লোকদের উদ্দেশ্য করে; যখনই সে আস্তাবলে একটা চিঠি লুকিয়ে রেখে দিত তখনই আগের দিন রেখে যাওয়া চিঠিটা তুলে নিত; ঠিক সেই রকম গিঁট-দেওয়া সুতোটাও সে চিনত না, কারণ আমি যখন তাকে সেটা দেখালাম

তখনই সে প্রথম সেটা দেখল; কিন্তু যখনই আমি তার কাছে জানতে চাইলাম ওটা কোথা থেকে এসেছে, তখনই সে রোমাণ্টিকভাবে একটা গল্প ফেঁদে বসল এবং বেশ ভাল ফলও পেল। মিঃ "গেলর্ড"ও তারই আবিষ্কার; ঠিক সেই সময় ১৫ বণ্ড স্ট্রীটে কোন বাড়িই ছিল না-তিন মাস আগেই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছিল। "কর্ণেল"ও তারই আবিষ্কার; অন্য যে সব হতভাগ্যদের গ্রেপ্তার করে তার সামনে হাজির করেছিলাম তাদের কাল্পনিক জীবন-বৃত্তান্তও তারই কল্পনার সৃষ্টি; B. B.-ও তার সৃষ্টি; বলা যেতে পারে যে নং ১৬৬-ও তারই আবিষ্কার, কারণ সেখানে পৌঁছবার আগে সে জানতই না যে ঈগল হোটেল-এ ঐ নম্বরের কোন ঘর আছে। দরকার মতই সে যে কোন মানুষ বা ঘটনার মন-গড়া বিবরণ তৈরি করেছে। আমি যখন "বাইরের" গুপ্তচরদের কথা জানতে চাইলাম তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই যে সব অপরিচিত লোকের বিবরণ বলে গেল তাদের সে হয় তো হোটেলে দেখেছিল এবং ঘটনাক্রমে তাদের নামগুলিও শুনেছিল। আরে, সেই সব উত্তেজনাপূর্ণ দিনের একটা আড়ম্বরপূর্ণ, রহস্যময়, রোমাণ্টিক জগতে সে বাস করত; আমি তো মনে করি, সে জগৎটাই তার কাছে সত্য; সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সে জগৎটাকে সে উপভোগ করত।

কিন্তু আমাদের সে যথেষ্ট বিপদে ফেলে দিল; অসম্মানের এক শেষ হল। বুঝতেই পারছেন, তার জন্য পনেরো বিশ জনকে গ্রেপ্তার করে দুর্গের মধ্যে আটক করা হল; প্রত্যেকের দরজায় শান্ত্রী মোতায়েন করা হল। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই ছিল সৈন্যদলের লোক তাই তাদের কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হয় নি; কিন্তু বাকিরা ছিল দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রথম শ্রেণীর সব নাগরিক; ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের খুসি করা বড় শক্ত। তারা তো রেগে আগুন হয়ে গেল; কেলেংকারীর আর শেষ রইল না। আর ঐ দুটি মহিলা-একজন ওহিয়োর জনৈক কংগ্রেসী সদস্যের স্ত্রী, অপর জন পশ্চিমের জনৈক বিশপ-এর বোন-দেখুন, আমাকে লক্ষ্য করে যে ঘৃণা, বিদ্রূপ, ও ক্রুদ্ধ অশ্রুজল তারা বর্ষণ করলেন তার স্মৃতি আমার অনেক কাল মনে থাকবে-আর আমিও মনে করে রাখব। গগ্‌ল্‌স্ পরা সেই বৃদ্ধ খোঁড়া ভদ্রলোক ফিলাডেলফিয়ার একটি কলেজের প্রেসিডেণ্ট-এখানে এসেছিলেন ভাই-পোর শেষকৃত্যে যোগদান করতে। তিনি আগে কখনও উইক্‌লোকে চোখেও দেখেন নি। অথচ শেষকৃত্যে যোগদান করার পরিবর্তে বিদ্রোহী গুপ্তচর হিসাবে তাকে জেলে তো ঢুকতে হলই, উপরন্তু উইক্‌লো আমার বাসায় আমার সামনেই দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় এক নাগাড়ে বলে গেল যে সে একটি জালিয়াৎ, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী ঘোড়া-চোর, এবং গালভেস্টন-এর কুখ্যাত গুণ্ডার আড্ডার একজন পাক্কা বদমাস। বেচারি বুড়ো ভদ্রলোকটি এ ধাক্কা সামলাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আর সমর দপ্তরের কথা! হায় আমার কপাল, কাহিনীর সে অংশের এখানেই যবনিকা পড়ুক!

মন্তব্য। এই পাণ্ডুলিপিটা আমি মেজরকে দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন: সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় আপনি কিছু ছোটখাট ভুল করেছেন। তবু বিবরণটা খুবই সুন্দর হয়েছে-চালিয়ে দিন; সামরিক লোকরা সেগুলি পড়ে একটু হাসবে, আর বাকি পাঠকরা ধরতেই পারবে না। ইতিহাসের আসল ঘটনাগুলি আপনি ঠিকই ধরেছেন এবং ঠিক যেভাবে ঘটেছিল সেই ভাবেই লিখেছেন। এম. টি.

১৮৮১

অকর্মার কাহিনী

The Invalid's Story

দেখলে মনে হবে আমার বয়স ষাট বছর আর আমি বিবাহিত, কিন্তু এ সবই আমার অবস্থা ও দুঃখ ভোগের ফল, কারণ আসলে আমি অবিবাহিত, আর আমার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। আপনার হয় তো বিশ্বাস করা শক্ত যে আজ আমি একটি ছায়ামাত্র, অথচ মাত্র দু'বছর আগে আমি ছিলাম সুস্থ ও সবল-লৌহকঠিন একটি মানুষ, একজন ক্রীড়াবিদের প্রতিমূর্তি-অথচ এটাই সরল সত্য কথা। কিন্তু যেভাবে আমি আমার স্বাস্থ্য হারিয়েছি সে ঘটনা এর চাইতেও বিস্ময়কর। এক শীতের রাতে দু'শ' মাইল রেলযাত্রায় এক বাক্সভর্তি বন্দুক পাহারার কাজে সাহায্য করতে গিয়েই হারিয়েছিলাম আমার স্বাস্থ্য। এটাই আসল সত্য, আর সেই কথাই আপনাকে বলব।

আমি ওহিয়ো-র অন্তর্গত ক্লীভল্যাণ্ড-এর মানুষ। দু' বছর আগে এক শীতের প্রচণ্ড বরফ-ঝড়ের মধ্যে সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে প্রথমেই শুনলাম যে আমার ছেলেবেলার প্রিয়তম বন্ধু ও সহপাঠী জন বি. হ্যাকেট আগের দিন মারা গেছে এবং মরবার আগে এই শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছে, আমি যেন তার মৃতদেহকে তার উইস্কন্সিন-এর বাড়িতে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেই। খবর শুনে খুবই আঘাত পেলাম, দুঃখ পেলাম, কিন্তু ভাবাবেগে নষ্ট করবার মত সময় ছিল না; তখনই আমাকে যাত্রা করতে হবে। "ডিয়েকন লভি হ্যাকেট" লেখা কার্ডটা নিয়ে সেই ঝড়ের মধ্যেই রেলওয়ে-স্টেশনে ছুটলাম। সেখানে পৌঁছে বর্ণনা মতই একটা লম্বা সাদা পাইন কাঠের বাক্স দেখতে পেলাম। কয়েকটা পেরেক দিয়ে কার্ডটা বাক্সের গায়ে আটকে দিলাম, নিরাপদে সেটাকে এক্সপ্রেস ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলাম এবং একটা স্যাণ্ডউইচ ও গোটাকয় চুরুট সংগ্রহ করতে খাবার-ঘরের দিকে দৌড়ে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম ইতিমধ্যে আমার কফিন-বাক্সটা ফিরে এসেছে এবং একটি যুবক একটা কার্ড, কিছু পেরেক ও হাতুড়ি নিয়ে সেটাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে! যেমন বিস্মিত তেমনই বিচলিত হলাম। সে পেরেক দিয়ে কার্ডটা মারতে শুরু করতেই চাইলাম। কিন্তু না-সেই এক্সপ্রেস গাড়িতে আমার বাক্সটা তো ঠিকই রয়েছে; সেটাকে সরানোই হয় নি। [আসল কথা, আমার অজ্ঞাতেই একটি বিস্ময়কর ভুল হয়ে গেছে। এই যুবকটি যে বন্দুকের বাক্সটাকে ইলিয়ন-এর অন্তর্গত পিওরিয়া-র একটি রাইফেল কোম্পানিতে "বুক" করতে স্টেশনে এসেছিল সেটাই নিয়ে চললাম আমি, আর সেই যুবকটি নিয়ে চলল আমার মৃতদেহটা!] ঠিক সেই সময় চালক হাঁক দিয়ে "সকলে গাড়িতে উঠে পড়ুন", আর আমিও লাফিয়ে এক্সপ্রেস-গাড়িতে উঠে পড়লাম এবং একটা বালতির বস্তার উপর আরামদায়ক আসনও পেয়ে গেলাম। এক্সপ্রেসের লোকটি খুবই কর্মব্যস্ত-সাদাসিধে লোকটির বয়স পঞ্চাশ বছর, সরল, সৎ ভালমানুষের মত মুখখানি, চালচলনের মনোরম আন্তরিকতার আমেজ। ট্রেনটা চলতে চলতেই একটি অপরিচিত লোক লাফিয়ে গাড়িতে উঠে এল এবং এক বস্তা বিশেষভাবে পাকানো "লিম্বার্জার" পনির রাখল আমার কফিন-বাক্সটার-মানে বন্দুকের বাক্সটার-ঠিক এক প্রান্তে। অর্থাৎ আমি এখন জেনেছি যে ওটা ছিল "লিম্বার্জার" মাখন, কিন্তু সে সময় আমি জীবনে ও বস্তুটির নামও কখনও শুনি নি এবং তার বৈশিষ্ট্যও কিছুই জানতাম না। দেখুন, সেই উন্মত্ত রাতের ভিতর দিয়ে আমরা চলতে লাগলাম; প্রচণ্ড ঝড় সমানে বয়ে চলেছে; ক্রমেই একটা নিরানন্দ দুঃখ যেন আমাকে পেয়ে বসল; আমার মন যেন ক্রমেই ডুবে যেতে লাগল-নীচে, আরও, আরও নীচে! এক্সপ্রেসের বুড়ো লোকটি এই ঝড় ও মেরু অঞ্চলের আবহাওয়া সম্পর্কে কয়েকটি কটু মন্তব্য করল, তার দরজাটা টেনে দিয়ে খিল লাগিয়ে দিল, জানালাটা নামিয়ে দিয়ে শক্ত করে আটকে দিল, তারপর সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্য এখান-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সারাক্ষণ মনের সুখে নীচু গলায় সুর ভাঁজতে লাগল "বিদায় হে প্রিয়"। ইতিমধ্যে জমাট বাতাসে একটা বিশ্রী বদগন্ধ ভেসে এসে নাকে লাগতে লাগল। এই গন্ধ আমার মৃত বন্ধুর শরীর থেকে আসছে এ কথা ভেবে আমার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। এই রকম মূক করুণ পথ বেয়ে সে আমার স্মৃতিতে জেগে থাকবে এ কথা চিন্তা করা আমার পক্ষে এতদূর দুঃখজনক যে চোখের জল রোধ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। এক্সপ্রেসের বুড়ো লোকটির জন্যই আমার দুঃখ আরও বেড়ে গেল, কারণ আমার ভয় হতে লাগল যে সে হয় তো গন্ধটা টের পেয়ে যাবে। যা হোক, শান্তভাবে গান করতে করতে সে চলে গেল; কোন রকম ভাবান্তর চোখে পড়ল না; আর সে জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বটে কিন্তু তবু আমার অস্বস্তি গেল না; প্রতিটি মুহূর্তেই আমার অস্বস্তি বাড়তে লাগল, কারণ যত সময় যেতে লাগল ততই সে গন্ধ আরও ঘন হতে লাগল, ক্রমেই তা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সব কিছু মনের মত করে গুছিয়ে নিয়ে লোকটি কিছু কাঠ যোগাড় করে তার স্টোভে বেশ করে আগুন জ্বেলে নিল। তাতে আমি এতদূর বিচলিত বোধ করলাম যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, কারণ আমি না ভেবে পারলাম না যে এটাও ভুল হচ্ছে। আমি ঠিক জানতাম, আমার মৃত বন্ধুটির উপর এর প্রতিক্রিয়া হবে ক্ষতিকর। টম্পসন-সেই রাতেই আমি জেনেছিলাম যে এক্সপ্রেসের লোকটির নাম টম্পসন-এবার গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল এবং যেখানেই কোন রকম ফুঁটো-ফাঁটা দেখতে পেল সেটাই বন্ধ করে দিতে লাগল, আর বলতে লাগল যে বাইরে রাতের অবস্থা যাই হোক না কেন, সে আমাদের আরামে যাবার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে।

আমি কিছু বললাম না, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে সে ভুল পথ বেছে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সে কিন্তু আগের মতই গুন গুন করছে, আর তার স্টোভটাও ক্রমেই বেশী করে গরম হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেলেও নীরবেই সে কষ্ট সহ্য করতে লাগলাম, মুখে কিছু বললাম না। অচিরেই খেয়াল হল যে "বিদায় হে প্রিয়" ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে হতে একসময় থেমে গেল; নেমে এল একটা অশুভ স্তব্ধতা। কয়েক মিনিট পরে টম্পসন বলল-

"ফু! আমি কি এই স্টোভটা দারচিনি দিয়ে বোঝাই করেছি!"

দু'একবার ঢোক গিলে সে এগিয়ে গেল কফি-বন্দুকের বাক্সের দিকে, "লিম্বার্জার" পনিরের বাক্সের উপর ক্ষণেকের জন্য বসেই আবার ফিরে এসে আমার পাশে বসল। কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে ইঙ্গিতে বাক্সটা দেখিয়ে বলল-

"আপনার বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ", আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম।

"বেশ পাকা বলে মনে হচ্ছে, কি বলেন!"

মিনিট দুই আর কোন কথা হল না; প্রত্যেকেই যার যার চিন্তায় মশগুল। তারপর নীচু ভীত গলায় টম্পসন বলল-

"অনেক সময়ই ঠিক বোঝা যায় না তারা সত্যি গেছেন কি না-কি জানেন মনে হয় চলে গেছেন-শরীর গরম, গিঁট গুলো নরম-আর তাই যদিও আপনি ভাবছেন তারা চলে গেছেন, আসলে কিন্তু তা নয়। আমার গাড়িতেই এ রকম ঘটনা ঘটেছে। ব্যাপারটা খুবই ভয়ানক, কারণ তারা কখন যে উঠে বসে আপনার দিকে তাকাবেন তা আপনি জানেন না!" তারপর একটুখানি থেমে কনুইটাকে বাক্সটার দিকে ঈষৎ তুলে,-"তিনি কিন্তু মোটেই অচৈতন্য হন নি! না স্যার, আমি বাজি ধরে বলতে পারি!"

চুপচাপ বসে ভাবছি, আর বাতাসে ও ট্রেনের গর্জন শুনছি। তখন টম্পসন বেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল:

"আরে মশাই, সকলকেই তো যেতে হবে; কারও ছাড়াছাড়ি নেই। শাস্ত্রেই বলেছে, নারীর গর্ভে যার জন্ম দু'দিন আগে আর পরে তাকে তো যেতেই হবে। হ্যাঁ, যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, ব্যাপারটা যেমন গুরুগম্ভীর তেমনই আশ্চর্য: এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই; সকলকেই যেতে হবে-বলতে পারেন প্রত্যেককেই। আজ আছেন সুস্থ ও সবল, আবার কালই কাটা ঘাসের মত ঢলে পড়লেন; একদিন যারা আপনাকে এত চিনত তারাই গেল ভুলে। কী আশ্চর্য বলুন। আজ হোক আর কাল হোক, সকলকেই যেতে হবে; তার হাত থেকে রেহাই নেই।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ; তারপর-

"কিসে মারা গেলেন?"

বললাম আমি জানি না।

"কতক্ষণ মারা গেছেন?"

সম্ভবপর কিছু বলাই সঙ্গত মনে করে বললাম:

"দু' তিন দিন।"

কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না; টম্পসন-এর চোখের আহত দৃষ্টি দেখে মনে হল সে যেন বলতে চায়, "দুই বা তিন বছর বলুন।" তারপরেই আমার কথাকে শান্তভাবে উপেক্ষা করে মৃতের সৎকারের কাজটা দীর্ঘকাল ফেলে রাখাটা যে অবিবেচকের মত কাজ সে সম্পর্কে সে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করে দিল। তারপর বাক্সটার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েই দ্রুত পায়ে ফিরে এসে বলল:

"এ কাজটা যদি গত বছর গ্রীষ্মকালে শুরু করা হত তাহলেই সব দিকে থেকে ভাল হত।"

আসনে বসে পড়ে টম্পসন লাল রেশমী রুমালে মুখটা ঢাকল এবং এমন ভাবে শরীরটাকে ধীরে ধীরে সামনে-পিছনে দোলাতে লাগল যেন অসহ্য কোন কিছু সহ্য করতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। ততক্ষণে সেই সুগন্ধে-সেটাকে যদি সুগন্ধ বলা যায়-প্রায় দম আটকে আসবার মত অবস্থা দেখা দিয়েছে। টম্পসন-এর মুখটা ধূসর হয়ে উঠছে; আমি জানতাম আমার মুখে তখন কোন রঙই নেই। এক সময়ে হাঁটুর উপর কনুই রেখে বাঁ হাতের উপর কপালটা রেখে অন্য হাতে লাল রুমালটা বাক্সটার দিকে ওড়াতে ওড়াতে টম্পসন বলল:

"এ ধরনের মাল আমি অনেক বয়ে নিয়ে গিয়েছি-কতকগুলি তো বেশ কিছু দিনের পুরনো মাল-কিন্তু ইনি দেখছি সকলের উপর টেক্কা দিয়েছেন-আর বেশ অনায়াসেই দিয়েছেন। আরে বাবা, এনার তুলনায় তারা তো সব সূর্যমুখী।!"

এই বিষন্ন পরিস্থিতিতে বন্ধুবরের প্রশস্তি শুনে আমি বেশ খুসি হলাম, কারণ কথাগুলির মধ্যে প্রশংসার একটা সুর ছিল।

অচিরেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম একটা কিছু করা দরকার। চুরুট ধরাবার প্রস্তাব করতে টম্পসন সেটা সমর্থন করল। বলল:

"হয় তো তাতে কিছুটা সংশোধন হবে"।

ভয়ে ভয়ে চুরুট টানতে লাগলাম আর ভাবতে চেষ্টা করলাম যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তাতেও উপকার কিছু হল না। অনতিবিলম্বে কোন রকম পরামর্শ না করে দুটো চুরুট একই সময়ে আমাদের স্নায়ুবিহীন আঙুলের ফাঁক দিয়ে আস্তে খসে পড়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টম্পসন বলল:

"না কর্তা, এক তিলও কমল না। কি জানেন, এতে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে, কারণ এতে তার মনেও হয়তো ধূমপানের বাসনা জাগছে।"

আমার মুখে কোন কথা যোগাল না; আসলে কথা বলতে আমি ভরসাই পাচ্ছিলাম না। টম্পসন মন-মরা হয়ে কাটা-কাটা ভাবে এই রাতটার শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল, আর সেই প্রসঙ্গে আমার বন্ধুকে নানা উপাধিতে ভূষিত করে চলল-কখনও সামরিক মর্যাদা, আবার কখনও বা অসামরিক; মোট কথা আমার বন্ধুর প্রভাব যত বাড়তে লাগল, টম্পসনের উপাধির মর্যাদাও ততই বেড়ে চলল। অবশেষে সে বলল:

"আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। ধরুন কর্নেল সাহেবকে একটা বক্লস দিয়ে বেঁধে যদি গাড়ির পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাই, -এই ফুট দশেক, তাহলে তার প্রভাব এতটা আর থাকবে না। বুঝলেন তো?"

বললাম, মতলবটা ভাল। সুতরাং তাজা বাতাসে ভাল করে শ্বাস টেনে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে সেই মারাত্মক পনিরের উপর ঝুঁকে পড়ে বাক্সটাকে জড়িয়ে ধরলাম। টম্পসন মাথা নেড়ে হাঁক দিল, "হেঁইয়ো জোয়ান;" আর আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঠেলা মারলাম; কিন্তু টম্পসন পা পিছনে ছিটকে পড়ল বাক্সটার উপরে; তার ভাঙা জায়গায় তার নাক থুব্‌ড়ে পড়ল পনিরের মধ্যে, তার দম আটকে এল। হাঁসফাঁস করতে করতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার দিকে যাবার চেষ্টায় সে কড়া গলায় চেচাতে লাগল, "আমায় বাধা দেবেন না! -রাস্তা ছাড়ুন! আমি মরে যাচ্ছি; রাস্তা ছাড়ুন!" সেই ঠাণ্ডা প্ল্যাটফর্মের উপর বসে পড়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। একটু সুস্থ হয়ে সে বলল:

"আপনার কি মনে হয় না যে জেনারেলকে আমরা নড়াতে পেরেছিলাম?"

আমি বললাম, "না; তাকে একটুও নড়াতে পারি নি।"

"তাহলে ও মতলবে গুলি মারুন। অন্য কিছু ভাবতে হচ্ছে। উনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে চান; আর এই যদি তাঁর মনোভাব হয় যে তিনি স্বস্থান থেকে নড়তে চান না, তাহলে তাঁর ইচ্ছামতই তো আমাদের চলতে হবে। হ্যাঁ, উনি যেখানে আছেন সেখানেই

থাকুন, যতক্ষণ ইচ্ছা থাকুন।"

কিন্তু সেই ভয়ানক ঝড়ে আমরা সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না; থাকলে বরফে জমে গিয়েই মারা যাব। কাজেই ভিতরে ঢুকে আবার আমরা দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। এক সময়ে কোন একটা স্টেশন থেকে ট্রেনটা সবে ছেড়েছে এমন সময় টম্পসন খুসিতে নাচতে নাচতে বলে উঠল:

"এতক্ষণে পেয়েছি! এবার কমোডর সাহেবকে বাগে পেয়েছি। এখন এমন জিনিস পেয়েছি যাতে সব সুগন্ধ দূর হয়ে যাবে।"

জিনিসটা কার্বলিক এসিড। এক বোতল ভর্তি। সে চারদিকে সেটাকে ছিটিয়ে দিল; প্রকৃত পক্ষে রাইফেলের বাক্স, পনির-সব কিছু একেবারে ভিজিয়ে দিল; তারপর বেশ আশা নিয়েই বসে পড়ল। কিন্তু বেশীক্ষণ চলল না। কি জানেন, ক্রমেই দুটো গন্ধ এক সঙ্গে মিলে গেল-আর অচিরেই আবার আমরা দরজা খুলে বাইরে গেলাম। রঙিন রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হতাশভাবে সে বলল:

"এতেও কোন কাজ হল না। ওনার সঙ্গে লড়াইতে পারা যাবে না। ওনাকে সংশোধন করতে যা কিছু ব্যবহার করি তাকেই তিনি নিজের কাজে লাগিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। কেন কর্তা, আপনি কি নিজেই দেখছেন না যে প্রথম দিককার তুলনায় ব্যাপারটা একশ'-গুণ খারাপ হয়ে পড়েছে। এ রকমটা করতে তো আর কাউকে কখনও দেখি নি; না স্যার, এ রাস্তায় তো এতদিন ধরে চলাফেরা করছি, এ রকম অনেককেই বয়ে নিয়েছি, কিন্তু এ রকমটা কখনও দেখি নি।"

বরফে জমে গিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে পড়লাম; কিন্তু এখন আর টেকা যাচ্ছে না। ছিটকে বেরিয়ে গেলাম, বরফের কামড় খেয়ে আবার ভিতরে ঢুকলাম; এমনই টানা-পোরেন চলতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর একটা স্টেশনে আমরা থামলাম। সেটা ছেড়ে যাবার পরে টম্পসন একটা বস্তা নিয়ে ঢুকে বলল-

"কর্তা, আর একবার চেষ্টা করে দেখছি-কুল্লে একবার। এতেও যদি ওনাকে নাড়াতে না পারি তাহলে আর কিছু করবার থাকবে না। অন্তত আমি তো তাই বুঝি।"

সে বয়ে এনেছে এক বোঝা মুরগির পালক, শুকনো আপেল, তামাকপাতা, ছেঁড়া কাপড়, পুরনো জুতো, গন্ধক, হিং, এমনই টুকিটাকি অনেক কিছু। মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা লোহার পাতের উপর সেগুলো স্তূপ করে সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

সে সব বস্তু যখন জ্বলতে লাগল তখন একটা মরা মানুষও যে কেমন করে তা সহ্য করতে পারে আমি তো ভেবে পেলাম না। আগে যা ছিল সে সব তো এ গন্ধের তুলনায় কবিতা-কিন্তু মনে রাখবেন এ সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু আগেই গন্ধটা স্বমহিমায়ই বিরাজ করছে-আসলে ব্যাপার কি জানেন, অন্য সব গন্ধ মিলে সে গন্ধটাকে আরও জোরদার করেছে। অহো, সে কি গন্ধ এ সব কথা কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবি নি-সে সময়ই ছিল না-ভেবেছিলাম প্ল্যাটফর্মে নেমে। প্ল্যাটফর্মে নামতে গিয়ে তার আগেই টম্পসন দম বন্ধ হয়ে গড়িয়ে পড়ল। আমার নিজের অবস্থাও খুবই কাহিল হলেও কলার ধরে টেনে তাকে বাইরে বের করে আনলাম। দু'জনই কিছুটা সুস্থ হবার পরে টম্পসন হতাশ ভঙ্গীতে বলল:

"এখানেই আমাদের থাকতে হবে কর্তা, এখানেই থাকতে হবে। আর কোন পথ নেই। গভর্ণর যখন একাই ভ্রমণ করতে চান তখন তিনি সহজেই আমাদের হারিয়ে দিতে পারেন।"

তারপর আরও বলল:

"আপনি কি জানেন যে আমাদের শরীরে বিষ ঢুকেছে। এটাই যে আমাদের শেষ যাত্রা সে বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। এর ফলে দেখা দেবে সান্নিপাতিক জ্বর; তার আবির্ভাব আমি এখনই বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার, আমরা যে জন্মেছিলাম সেটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনই সত্যি যে আমাদের ডাক এসেছে।"

এক ঘণ্টা পরে বরফে জমে অচৈতন্য অবস্থায় আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে নেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর হল। তারপর তিনটি সপ্তাহের কথা আর কিছুই মনে নেই। পরে জেনেছিলাম, সেই ভয়ংকর রাতটা আমি কাটিয়েছিলাম এক বাক্স নির্দোষ রাইফেল ও এক

লট নিরীহ পনিরের সঙ্গে; কিন্তু সংবাদটা যখন জানলাম তখন আমার দফা রফা হয়ে গেছে; অতিরিক্ত কল্পনা-শক্তির ফলই ফলেছে; আমার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভেঙে গেছে; বারমুডাতেই যাই আর যেখানেই যাই, কোন স্থানই আমার সে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এটাই আমার শেষ যাত্রা; আমি বাড়ি চলেছি সেখানেই মরব বলে।

ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ পরিবার ও চোর-ঘণ্টা

The Mcwilliamses and the Burglar Alarm

আলোচনাটা তর্‌তর্ করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার পথে আবহাওয়া থেকে ফসল, ফসল থেকে সাহিত্য, সাহিত্য থেকে কেলেংকারী, কেলেংকারী থেকে ধর্ম; আর তারপরই একলাফে হঠাৎ চলে গেল চোর-ঘণ্টাতে। আর এই প্রথম মিঃ ম্যাকউইলিয়াম্‌স্-এর ভাবান্তর দেখা গেল। এই লোকটির মুখ-মণ্ডলে যখনই এই ভাবান্তর ফুটে উঠতে দেখি, তখনই আমি তার স্বার্থ বুঝতে পারি, নিজে চুপ করে যাই, আর তার মনের বোঝা হাল্কা করবার সুযোগ তাকে দেই। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে সে বলতে শুরু করল:

মিঃ টোয়েন, চোর-ঘণ্টার পিছনে আমি এক পয়সাও খরচ করি না-একটি পাই-পয়সা নয়-আর কেন নয় সেটাই আপনাকে বলব। বাড়িটা যখন শেষ করে এনেছি তখন দেখলাম জল-মিস্ত্রির অগোচরেই তার হিসাব বাবদ আমাদের হাতে কিছু নগদ টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। আমি চাইলাম, টাকাটা আলোর পিছনে খরচ করি, মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ বলল, না, তার চাইতে একটা চোর-ঘণ্টা কেনা যাক। এই মীমাংসা প্রস্তাবেই আমি রাজী হলাম। এখানে বলা দরকার যে যখনই আমি কোন জিনিস চাই তখনই মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ চায় অন্য জিনিস, আর মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ যে জিনিসটা চায় সেটা নেওয়াই আমরা স্থির করি-সব সময়ই তাই করি, আর সেটাকেই মিসেস বলে মীমাংসা। ঠিক আছে: লোকটি নিউ ইয়র্ক থেকে এসে চোর-ঘণ্টাটা বসিয়ে দিল; তার জন্য তিন শ' পঁচিশ ডলার চার্জ করল, আর বলে গেল যে এবার আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব। ঘুমুলামও কিছু দিন-ধরুন এক মাস। তারপর একদিন রাতে ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে ভাবলাম, উঠে গিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা কি। একটা মোমবাতি জ্বলে সিঁড়ির দিকে এগোতেই একটা চোরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অন্ধকারে নিরেট রূপোর বাসন বলে ভুল করে টিনের বাসন ভর্তি একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরুচ্ছে। মুখে একটা পাইপ। আমি বললাম, "বন্ধু এ ঘরে ধূমপানের অনুমতি আমরা দেই না।" সে বলল, সে নতুন এসেছে, কাজেই এ বাড়ির নিয়ম-কানুন তার জানবার কথা নয়। সে আরও বলল, এ বাড়ির মত আরও অনেক বাড়িতেই সে গেছে, কিন্তু আর কোথাও ধূমপানে আপত্তি করা হয় নি। তাছাড়া, সে যতদূর জানে, এ ধরনের নিয়ম-কানুন কোন অবস্থাতেই চোরদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

আমি বললাম: "তাই যদি রীতি হয় তাহলে ধূমপান করুন। অবশ্য আমি মনে করি, যে সুবিধা একজন বিশপকে দেওয়া হয় না তা যদি একজন চোরকে দেওয়া হয় তাহলে সেটা আমাদের কালের নীতিভ্রষ্টতারই একটা স্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও চোর-ঘণ্টাটা না বাজিয়ে এ ভাবে চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকতে গেলেন কেন?"

তাকে খুব বিচলিত ও লজ্জিত মনে হল; থতমত খেয়ে বলল: "আমি হাজারবার ক্ষমা চাইছি। আমি জানতাম না যে আপনাদের একটা চোর-ঘণ্টা আছে; জানলে নিশ্চয় বাজাতাম। আমার মিনতি, এ কথা যেন আমার বাবা-মার কানে না যায়, কারণ তারা বৃদ্ধ ও দুর্বল; আমাদের খৃষ্টীয় সভ্যতার পবিত্র প্রথার এই স্বেচ্ছাকৃত লংঘনের কথা হয় তো চিরপরিবর্তনশীল বর্তমান ও অনন্তকালের গম্ভীর মহান গভীরতার মধ্যবর্তী তুচ্ছ ভঙ্গুর সেতুটাকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে বসবে। কষ্ট করে একটা দেশলাই দেবেন কি?"

আমি বললাম: "আপনার ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু যদি অনুমতি করেন তো বলি, অলংকার শাস্ত্রে আপনার দখল ভাল নয়। কিন্তু এবার কাজের কথায় যাওয়া যাক: এখানে ঢুকলেন কেমন করে?"

"দোতলার জানালা দিয়ে।"

কথাটা সত্যি। বিজ্ঞাপনের খরচ-খরচা বাদে দালালের দরেই টিনের বাসনগুলি তার কাছ থেকে খালাস করে নিলাম, চোরকে শুভ রাত্রি জানালাম, জানালাটা বন্ধকরে দিলাম এবং থানায় রিপোর্ট করলাম। পরদিন সকালে চোর-ঘণ্টার লোকটাকে ডেকে পাঠালাম; সে এল; সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, বাড়ির নীচের তলাটা ছাড়া অন্য কোন অংশের সঙ্গে চোর-ঘণ্টার যোগ ছিল না বলেই সেটা বাজে নি। কী বোকার মত কথা। শুধু এক পায় বর্ম এঁটে যুদ্ধে যাওয়ার চাইতে বর্ম ছাড়াই তো যুদ্ধে যাওয়া ভাল। বিশেষজ্ঞ লোকটি তখন পুরো দোতলাটাকে চোর-ঘণ্টার আওতায় এনে তার জন্য তিন শ' ডলার মজুরি নিয়ে চলে গেল। তার কিছুদিন পরে একদা রাত্রে দেখতে পেলাম একটি চোর নানাবিধ সম্পত্তি নিয়ে তিনতলা থেকে মই বেয়ে নেমে যাচ্ছে। প্রথমেই ভাবলাম, বিলিয়ার্ডের লাঠিটা দিয়ে মাথাটা ভেঙে দেই; কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় মনে হল, সে কাজ থেকে বিরত থাকাই ভাল কারণ সে দাঁড়িয়েছিল আমার ও

বিলিয়ার্ডের সরঞ্জামের ঠিক মাঝখানে। দ্বিতীয় চিন্তাটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে হল; কাজেই প্রথম চিন্তা থেকে বিরত থেকে তার সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেললাম। যেহেতু মইটা ছিল আমার তাই সেটা বাবদ শতকরা দশ বাদ দিয়ে আগেকার দরেই মালগুলি খালাস করে নিলাম। পরদিন আবার বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠালাম এবং তিনতলাটাকেও চোর-ঘণ্টার সঙ্গে যুক্ত করে নিলাম, আর সে জন্য খরচ হল আরও তিন শ' ডলার।

এতদিনে "ঘোষক-বোর্ড"টা পেল্লায় বড় হয়ে পড়েছে। তাতে বসানো হয়েছে সাতচল্লিশটা "ট্যাগ" আর লেখা হয়েছে বিভিন্ন ঘর ও চিমনির নাম ও নম্বর; ফলে সেটা ছোটখাট একটা পোশাকের আলমারীর আকার ধারণ করেছে। ঘণ্টাটা হয়েছে হাত-মুখ ধোঁয়ার একটা বড় বাটির মত। সেটাকে লাগানো হয়েছে আমাদের বিছানার মাথার কাছে। বাড়ি থেকে আস্তাবলে কোচয়ানের ঘর পর্যন্ত একটা তার টানা হয়েছে, আর একটা বড় ঘণ্টা বসানো হয়েছে তার বালিশের পাশে।

একটি ত্রুটি ছাড়া আর সব ব্যবস্থাই এখন বেশ আরামদায়ক হয়েছে। প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় রাঁধুনি এসে যথারীতি দরজা খুলতেই ঘণ্টাটা ঢং ঢং করে বেজে ওঠে। প্রথম যেদিন এ রকমটা ঘটল, আমি তো ভেবেছিলাম যে শেষের যে ভয়ংকর দিন বুঝি সমাগত। ঘণ্টাটা যে বিছানায় বাজছে তা মনেই হয় নি-মনে হল বুঝি বাইরে কোথাও-কারণ সেই ঘণ্টার শব্দ প্রথম ধাক্কাতেই আপনাকে ছুড়ে ফেলে দেবে, দেয়ালের গায়ে ঠুঁসে দেবে, এবং তালগোল পাকিয়ে আপনাকে একটা মাকড়শার মত স্টোভের ঢাকনাটার উপর মুচড়ে ফেলে দেবে। কেউ এসে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করলে তবে রেহাই পাবেন। মোদ্দা কথা, সেই ভীষণ গর্জনের সঙ্গে তুলনা করবার মত আর কোন শব্দই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই মহাবিপদ ঘটতে লাগল প্রতিদিন সকাল পাঁচটায়, আর আমাদের তিন ঘণ্টার ঘুম নষ্ট হতে লাগল। ভেবে দেখুন, সেই শব্দ যখন আপনাকে জাগায়, সে শুধু আপনাকে ঘুম থেকে জাগায় না, আপনার সমগ্র সত্তাকেই জাগিয়ে তোলে; তার ধাক্কায় পরবর্তী আঠারোটি ঘণ্টা আপনাকে খোলা চোখে জেগে থাকতে হয়। এক রাতে একজন অপরিচিত লোক আমাদের হাতে মারা পড়লে তাকে ঘরে রেখে আমরা রাতের মত বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। সেই অপরিচিত লোকটি কি শেষ বিচারের দিনটির জন্য অপেক্ষা করে ছিল? না মশাই; সকাল পাঁচটা বাজতেই সে তড়াক করে জেগে উঠেছিল। আমি জানতাম সে জাগবে; ভাল করেই জানতাম। জীবন-বীমার টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে সে পরম সুখে বাস করতে লাগল, কারণ সে যে সত্যি সত্যি মারা গিয়েছিল তার প্রচুর প্রমাণ ছিল তার হাতে।

এইভাবে প্রাত্যহিক ঘুমের অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে ক্রমেই আমরা পরলোকের দিকে এগোতে লাগলাম। কাজেই শেষ পর্যন্ত আবার সেই বিশেষজ্ঞকে ডাকা হল, আর সে এসে দরজার বাইরে একটা তার টেনে দিল আর সেখানে একটা সুইচ বসিয়ে দিল। তার ফল এই দাঁড়াল যে খানসামা টমাস সব সময়ই একটা ছোট ভুল করতে লাগল-রাতে শুতে যাবার সময় সে চোর-ঘণ্টার সুইচটাকে "অফ" করে দিত, আর সকালে রাঁধুনির রান্নাঘরের দরজা খুলবার সময় হতেই সে আবার সুইচটা "অন" করে দিত; ফলে ঘণ্টাটা আবার আমাদের ঘরের মধ্যে ছুড়ে দিত এবং কেউ না কেউ একটা জানালা ভেঙে ফেলত। এক সপ্তাহ পরে বুঝতে পারলাম যে এই সুইচের ব্যাপারটাই একাধারে একটা ভ্রান্তি ও একটা ফাঁদ। আরও আবিষ্কার করলাম যে, একদল চোর সারা রাত আমাদের বাড়িতে আস্তানা পাতে-ঠিক চুরির জন্য তারা আসে না, চুরি করার মত জিনিসপত্র এখন আর বিশেষ কিছু নেই; তারা আসে পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানে আশ্রয় নিতে; বুদ্ধিমানের মত তারা বুঝে নিয়েছে যে গোটা আমেরিকার মধ্যে সব চাইতে ভাল রকম চোর-ঘণ্টার ব্যবস্থাসমন্বিত এই বাড়িতেই যে চোরের দল এসে আশ্রয় নিতে পারে এ কথা গোয়েন্দাপ্রবররা কখনও ভাবতে পারবে না।

আবার ডেকে পাঠানো হলে বিশেষজ্ঞটি এসে একটা চমৎকার নতুন ব্যবস্থা করল-জিনিসটাকে এমনভাবে বসাল যাতে রান্নাঘরের দরজা খুললেই ঘণ্টাটা থেমে যায়। ব্যবস্থাটা খুবই ভাল, আর মজুরিটাও সেই অনুপাতেই নিল। কিন্তু ফলাফল যে কি হল তা তো বুঝতেই পারছেন। প্রতিদিন শোবার সময় আমি নিজেই ঘণ্টার সুইচটা 'অন' করে দিতাম; টমাসের ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর আর ভরসা করতাম না। আরো আলো নিভে যেতেই চোররা রান্নাঘরের দরজায় এসে চোর-ঘণ্টার সুইচটা 'অফ' করে দিত, সকালে এসে রাঁধুনি কাজটা করবে বলে ফেলে রাখত না। বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থা কি রকম সঙিন হয়ে দাড়ালা। মাসের পর মাস কোন লোক বাড়িতে আসত না। বাড়িতে একটাও বাড়তিও শয্যা নেই; সব চোরদের দখলে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই প্রতিকারের একটা ব্যবস্থা করলাম। বিশেষজ্ঞকে ডেকে এনে মাটির নীচ দিয়ে একটা তার টানালাম এবং সেখানে এমন ভাবে একটা সুইচ বসিয়ে নিলাম যাতে কোচয়ানই চোর-ঘণ্টার সুইচ চালাতে ও বন্ধ করতে পারে। তাতে খুব ভাল কাজ হল। একটা মরশুম বেশ শান্তিতে কাটল। আবার বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করে এনে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুর্দমনীয় চোর-ঘণ্টাটা আবার একটা রোগ বাধিয়ে বসল। একদা শীতের রাতে সেই ভয়ংকর ঘণ্টার আকস্মিক শব্দে আমরা বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম এবং হুড়মুড় করে "ঘোষক-বোর্ড"-এর কাছে গিয়ে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দেখলাম "নার্সারীটা" খোলা রয়েছে। মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্ মূর্চ্ছিত হয়ে মরার মত পড়ে গেল; আমার অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। কোন রকমে শটগানটাকে হাতে নিয়ে কোচয়ানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ভয়ংকর ঘণ্টাটা বেজেই চলেছে। আমি জানতাম, ঐ শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে, আর কোন রকমে জামা-কাপড় পরেই সেও অবিলম্বে বন্দুক নিয়ে ছুটে আসবে। যখন মনে হল যে সময় হয়ে গেছে, তখন আমি গুটি-গুটি নার্সারীর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম; জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, নীচের উঠোনে কোচয়ানও সশস্ত্র অবস্থায় সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন নার্সারিতে ঢুকেই বন্ধুক ছুড়লাম; সঙ্গে সঙ্গে কোচয়ানও আমার বন্দুকের ঝলকটা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। দু'জনেরই লক্ষ্য অব্যর্থ। আমার গুলিতে একটা নার্স খোঁড়া হল, আর কোচয়ানের গুলি আমার পিছনের চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। গ্যাসটা জ্বালিয়ে সার্জনকে টেলিফোন করলাম। চোরের চিহ্নমাত্র নেই; একটা জানালাও খোলা হয় নি। শুধু একটা কাঁচ নেই; সেটার ভিতর দিয়েই কোচয়ানের গুলিটা এসেছিল। এও এক অদ্ভুত রহস্য-মাঝরাতে চোর-ঘণ্টাটা আপনা থেকেই বেজে উঠল, আর আশে পাশে চোরের দেখা নেই!

ডাক পেয়েই বিশেষজ্ঞ যথারীতি এসে জানাল, চোর-ঘণ্টাটা "মিছিমিছি" বেজেছে, অল্পেতেই ঠিক হয়ে যাবে। নার্সারীর জানালাটা মেরামত করে দিয়ে মোটা টাকা মজুরি নিয়ে সে চলে গেল।

এই "মিছিমিছি" ঘণ্টা বাজার ফলে পরবর্তী তিনটে বছর কী কষ্ট যে আমরা ভোগ করলাম কোন লেখক তা বর্ণনা করতে পারে না। পরের তিন মাস যথারীতি বন্দুক হাতে নিয়ে আমি নির্দেশিত ঘরের দিকে ছুটতে লাগলাম, আর কোচয়ানও তার বন্দুক নিয়ে ছুটে আসত আমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু গুলি করবার মত কাউকে পেতাম না, -জানালাগুলি ঠিকঠাক মত বন্ধই থাকত। প্রতিবারই পরদিন বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠাতাম; সে এসে জানালাটা মেরামত করত; দিন সাতেক ভালভাবে চলত; আর প্রতিবারই এই রকম একটা বিল পাঠাতে ভুল হত না:

তার......পাউণ্ড ২.১৫
ঢাকনা.......৭৫
দু' ঘণ্টার মজুরি...১.৫০
মোম.......৪৭
ফিতে.......৩৪
স্ক্রু.......১৫
ব্যাটারি চার্জ-করা....৯৮
তিন ঘণ্টার মজুরি...২.২৫
সুতো.......০২
চর্বি.......৬৬
পণ্ড-এর নির্যাস...১.২৫
স্প্রিং ৫০ হিঃ...২.০০
রেলের ভাড়া...৭.২৬
পাউণ্ড ১৯.৭৭

শেষ পর্যন্ত যা হবার হল-"মিছিমিছি" ঘণ্টা শুনে তিন চারশ' বার ছুটাছুটি করবার পরে-ঘণ্টা শুনে আমরা হৈ-চৈ করতাম না। হ্যাঁ, ঘণ্টা বাজলে ধীরে সুস্থে বিছানা থেকে উঠে শান্ত মনে "ঘোষক বোর্ড"টা দেখতাম, নির্দেশিত ঘরের নম্বরটা টুকে নিয়ে শান্তভাবে ঘণ্টার সঙ্গে সেই ঘরটায় যোগসূত্রটা কেটে দিতাম, এবং যেন কিছুই ঘটে নি এইভাবে আবার গিয়ে শুয়ে পড়তাম। উপরন্তু সে ঘরের যোগসূত্র স্থায়ীভাবে কেটে দিতাম এবং বিশেজ্ঞকে আর ডেকে পাঠাতাম না। দেখুন, বলাই বাহুল্য যে এইভাবে ক্রমে ক্রমে সবগুলি ঘর থেকেই যোগাযোগ কেটে দেওয়া হল এবং পুরো যন্ত্রটাই অকেজো হয়ে পড়ে রইল।

এই অরক্ষিত অবসরেই ঘটল সব চাইতে বড় বিপদ। একদিন রাতে চোররা ঘরে ঢুকে চোর-ঘণ্টাটা নিয়েই পালিয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার, তার ছাল-চামড়া সব; দাঁত, নখ কিছুই রেখে গেল না; স্প্রিং, ঘণ্টা, ব্যাটারি, সব কিছু; সেই সঙ্গে নিয়ে গেল দেড়শ' মাইল লম্বা তামার

তার; এমনভাবে সব কিছু ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে গেল যে তার চিহ্ন মাত্রও আর বাড়িতে রইল না।

সেটাকে ফিরে পেতে অনেক চেষ্টা করা হল; শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেলাম-অবশ্য টাকা খসল। চোর-ঘণ্টার কোম্পানি বলল, এবার ওটাকে ভাল করে বসাতে হবে-যাতে "মিছিমিছি" ঘণ্টা না বাজে সে জন্য জানালায় লাগাতে হবে নতুন পেটেণ্ট-করা স্প্রিং; এবং একটা নতুন পেটেণ্ট করা ঘড়ি এমনভাবে বসাতে হবে যাতে মানুষের সহায়তা ছাড়াই সকালে ও রাতে ঘণ্টা বাজা বন্ধকরা ও শুরু করা চলে। পরিকল্পনাটা ভালই মনে হল। তারা কথা দিল, দশ দিনের মধ্যেই সব কাজ শেষ করে দেবে। তারা কাজ শুরু করল; আমরাও গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাইরে চলে গেলাম। দু'দিন কাজ করে তারাও গরমের ছুটি নিল। তারপর চোরের দল বাড়িতে ঢুকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে লাগল। গরম কেটে গেলে ফিরে এসে দেখি, সারা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। নতুন জিনিসপত্রে বাড়ি-ঘর সাজিয়ে বিশেষজ্ঞকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালাম। সে এসে কাজকর্ম শেষ করে বলল: "এবার ঘড়িটা এমনভাবে ঠিক করে দিলাম যাতে প্রতিদিন রাত ১০টায় চোর-ঘণ্টা সঙ্গে যোগ হবে আর সকাল ৫-৪৫-এ সেটা কেটে যাবে। আপনাদের একমাত্র কাজ হবে প্রতি সপ্তাহে ঘড়িতে দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া-তারপর চোর-ঘণ্টার সব দায় সেটাই নেবে।"

তারপর তিনটে মাস খুবই শান্তিতে কাটল। বিলটা বেশ মোটা রকমেরই হল; তবে বলে দিলাম যে নতুন যন্ত্রটা যতদিন ত্রুটিহীন প্রমাণিত না হবে ততদিন টাকা দেব না। এ জন্য সময় দেওয়া হল তিন মাস। কাজেই বিলের টাকা দিয়ে দিলাম, আর তার ঠিক পরদিনই সকাল দশটার সময় দশ হাজার মৌমাছির গুঞ্জন-ধ্বনির মত চোর-ঘণ্টাটা সশব্দে বাজতে শুরু করল। পূর্ব-নির্দেশ মত ঘড়ির কাঁটা দুটোকে বারো ঘণ্টা ঘুরিয়ে দিতেই ঘণ্টা বাজা বন্ধহয়ে গেল; কিন্তু সেই দুর্বিপাক রাতের বেলা আবার দেখা দিল; আবারও কাঁটা দুটোকে বারো ঘণ্টা ঘুরিয়ে সেটা বন্ধকরা হল। এই অর্থহীন বোকা ব্যবস্থা চলল দু'এক সপ্তাহে; তারপর বিশেষজ্ঞ এসে একটা নতুন ঘড়ি বসিয়ে দিয়ে গেল। সেই থেকে তিন বছর ধরে প্রতি তিন মাস অন্তর সে একবার করে আসত, আর একটা নতুন ঘড়ি বসিয়ে দিয়ে যেত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তার সবগুলি ঘড়িরই একই উল্টো রোগ; তারা দিনের বেলায় ঘণ্টা বাজাত, আর বাজাত না রাত্রে; জোর করে কোন ব্যবস্থা করলেও মুখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব বানচাল হয়ে যেত।

এই হোল সেই চোর-ঘণ্টার ইতিহাস-ঠিক যেমনটি ঘটেছিল, এতটুকু বাড়িয়ে বলি নি, বা ঈর্ষাবশত কাটছাট করি নি। হ্যাঁ স্যার, এইভাবে ন'টা বছর চোরদের সঙ্গে ঘুরলাম; সব সময় একটা দামী চোর-ঘণ্টা বাড়িতে বসানো রইল-চোরদেরই সুরক্ষার জন্য, আমার নয়; তার পুরো খরচটাই বহন করতে হল আমাকে, একটা কানা-কড়িও তারা দিল না। তখন বাধ্য হয়ে মিসেস ম্যাকউইলিয়াম্‌স্‌কে বললাম কুকুরের বিনিময়ে সেগুলো বেচে দিলাম এবং কুকুরটাকে গুলি করে মেরে ফেললাম। মিঃ টোয়েন, চোর-ঘণ্টা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত আমি জানি না, কিন্তু আমি মনে করি যে চোরদের স্বার্থেই ওগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে। হ্যাঁ স্যার, অগ্নিকাণ্ড, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও একটা হারেম-এর যত কিছু আপত্তিকর দিক আছে সে সবই একসঙ্গে বাসা বেঁধে থাকে একটা চোর-ঘণ্টার মধ্যে; অথচ পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলির কাছ থেকে একটা না একটা সুখ-সুবিধা যা সাধারণত পাওয়া যায় তার কোনটাই চোর-ঘণ্টার কাছে থেকে পাওয়া যায় না। আচ্ছা নমস্কার; আমি এখানেই নামব।

শ্বেতহস্তী চুরির কাহিনী

The Stolen White Elephant

[এই রচনাটি "A Tramp Abroad" গ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ মনে হয়েছিল যে এর কোন কোন বিবরণ অতিরঞ্জিত এবং কোনটা অসত্য। এই আশংকা যখন অমূলক প্রমাণিত হল ততদিনে বইটি ছাপতে চলে গিয়েছিল। এম. টি.]

রেলের জনৈক সহযাত্রী আমাকে এই বিচিত্র কাহিনীটি বলেছিল। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের উপরে; তার শান্ত ভদ্র মুখমণ্ডল আর আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণে তার মুখনিসৃত প্রতিটি কথাই আমার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হয়েছিল। সে বলেছিল:

আপনি তো জানেন শ্যামদেশের রাজকীয় শ্বেত হস্তীকে সে দেশের মানুষ কত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আপনি জানেন সে হাতি রাজার কাছেও পবিত্র বস্তু, একমাত্র রাজাই সে হাতি রাখতে পারে, আর এক অর্থে সে রাজার চাইতেও বড়, কারণ সে হাতি শুধু সম্মানই পায় না, পূজাও পায়। খুব ভাল কথা; পাঁচ বছর আগে গ্রেট বৃটেন ও শ্যামের মধ্যে যখন সীমান্ত নিয়ে গোলযোগ দেখা দিল, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে শ্যামেরই দোষ। সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়ে গেল; বৃটিশ প্রতিনিধি জানালেন, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, কাজেই অতীতের সবকিছু ভুলে যাওয়া উচিত। শ্যামের রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং কিছুটা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, আর কিছুটা হয় তো ইংলণ্ডের মনে যদি তখনও কিছুটা অসন্তোষ থেকে থেকে সেটা মুছে ফেলবার জন্য রাজার মনে বাসনা হল রাণীকে একটি উপহার পাঠাবেন-প্রাচ্য দেশীয়দের ধারণা, শত্রুকে প্রসন্ন করবার সেটাই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। সে উপহার শুধু রাজকীয় হলেই চলবে না, সর্বতোভাবে রাজার উপযোগী হওয়া চাই। সুতরাং শ্বেতহস্তী ছাড়া আর কোন্ উপহার সে মর্যাদার অধিকার হতে পারে? ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আমার পদমর্যাদা বিবেচনা করে আমাকেই মহামান্য রাণীর কাছে সেই উপহার বহন করে নিয়ে যাবার সম্মান লাভের উপযুক্ত বলে মনে করা হল। আমি, আমার ভৃত্যাদি, অফিসারবর্গ ও হাতির পরিচারকদের জন্য একটা জাহাজের ব্যবস্থা করা হল। যথাসময়ে নিউ ইয়র্ক বন্দরে পৌঁছে জার্সি শহরের একটা চমৎকার বাড়িতে রাজ-অতিথিকে রাখা হল। নতুন করে যাত্রা শুরু করবার আগে হাতিটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সেখানেই কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল।

এক পক্ষকাল বেশ ভালই কাটল-তারপরেই শুরু হল আমার বিপদ। সাদা হাতিটা চুরি গেল! গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে এই ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের কথা আমাকে জানানো হল। ত্রাসে ও উৎকণ্ঠায় কয়েক মুহূর্ত একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম; আমি তখন বড়ই অসহায়। তারপর শান্ত হয়ে ভাবতে বসলাম। অচিরেই পথ খুঁজে পেলাম-বস্তুত, একজন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে একটিমাত্র পথই খোলা ছিল। অনেক রাত হলেও তৎক্ষণাৎ নিউ ইয়র্ক চলে গেলাম এবং একজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে হাজির হলাম। সৌভাগ্যক্রমে যথাসময়েই সেখানে হাজির হলাম, কারণ গোয়েন্দাবাহিনীর প্রধান বিখ্যাত ইন্সপেক্টর ব্লাণ্ট তখন বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মাঝারি উচ্চতার শক্ত-সমর্থ লোকটি; যখনই গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করেন তখনই তার ভুরু দুটো জুড়ে যায়, আর চিন্তিতভাব আঙুল দিয়ে কপালে টোকা মারতে থাকেন; তখন তাকে দেখলেই আপনার মনে হবে যে যার সামনে আপনি দাঁড়িয়েছেন তিনি যে-সে লোক নন। তাকে দেখামাত্রই নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পেলাম; মনে আশা জাগল। সব কথা বললাম। তিনি মোটেই ব্যস্ত হলেন না; আমি যদি বলতাম যে কেউ আমার কুকুরটা চুরি করেছে তাহলে তার মনের যে ভাব হত এই সংবাদ শুনে তার কঠোর আত্মসংযমে তার চাইতে বেশী কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। ইঙ্গিতে একটা আসন দেখিয়ে তিনি শান্তভাবে বললেন:

"দয়া করে এক মিনিট আমাকে ভাবতে দিন।"

এই কথা বলে টেবিলের সামনে বসে তিনি হাতের উপরমাথাটা রাখলেন। ঘরের অপর কোণে কয়েকজন করণিক কাজ করছিল; পরবর্তী ছ' সাত মিনিট ধরে তাদের কলমের খস্-খস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না। ইন্সপেক্টর একইভাবে চিন্তায় ডুবে রইলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা তুললেন। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো দেখেই বুঝতে পারলাম যে তার মস্তিষ্কের কাজ সমাধা হয়েছে-পরিকল্পনা প্রস্তুত। তিনি কথা বললেন-গলার স্বর নীচু, অথচ জোরালো:

"ঘটনাটা সাধারণ নয়। প্রতিটি পা সতর্কভাবে ফেলতে হবে; পরবর্তী পদক্ষেপের আগে প্রথম পদক্ষেপ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হবে। গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে-গভীর ও পরিপূর্ণ গোপনীয়তা। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবেন না-এমনকি সংবাদপত্রের

প্রতিবেদকদেরও নয়। তাদের ভার আমি নেব; তারা যেটুকু জানলে আমার কাজের সুবিধা হবে শুধু সেইটুকুই তারা জানবে।" ঘণ্টায় হাত দিলেন; একটি যুবক এল। "আলারিক, প্রতিবেদকদের আপাতত অপেক্ষা করতে বল।" ছেলেটি চলে গেল। "এবার কাজের কথায় যাওয়া যাক-একের পর এক। কঠোর পুংখানুপুংখ পদ্ধতি ছাড়া আমার এ কাজে কিছুই করা যায় না।"

একটা কলম ও কাগজ নিলেন। "এবার-হাতিটার নাম?"

"হাসান বেল আলি বেন সেলিম আব্দাল্লা মহম্মদ মুসে আলহাম্মাল জামসেৎজেজিভয় দিলীপ সুলতান এবু ভুদ্‌পুর।"

"খুব ভাল। ডাক নাম?"

"জাম্বো।"

"খুব ভাল। জন্মস্থান?"

"শ্যামের রাজধানী শহর।"

"বাপ-মা বেঁচে আছে?"

"না-মৃত।"

"এটি ছাড়া তাদের আর কোন সন্তান ছিল?"

"না। এটি একমাত্র সন্তান।"

"খুব ভাল। এই খাতে এগুলিই যথেষ্ট। এবার দয়া করে হাতিটার বর্ণনা দিন; যত তুচ্ছই হোক-মানে, আপনার দিক থেকে তুচ্ছ-কোন বিবরণই বাদ দেবেন না। আমার পেশার যারা লোক তাদের কাছে তুচ্ছ বিবরণ বলে কিছু নেই; থাকতে পারে না।"

আমি বললাম-তিনি লিখে নিলেন। আমার বলা শেষ হলে বললেন:

"এবার শুনুন। আমি কোন ভুল করে থাকলে সংশোধন করে দেবেন।"

তিনি পড়তে লাগলেন:

"উচ্চতা ১৯ ফুট; মাথার সীমানা থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট; শুঁড়ের দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট; লেজের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট; শুঁড় ও লেজ সমেত মোট দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট; দাঁতের দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় ফুট; কান দুটি এই মাপের অনুপাতিক; বরফের মধ্যে একটা পিপে উপুড় করলে যে রকম দেখায় পায়ের ছাপ সেই রকম; গায়ের রং একঘেয়ে সাদা; অলংকার পরবার জন্য প্রত্যেক কানে প্লেটের আকারে একটি করে গর্ত আছে; দর্শকদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেবার এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলের সঙ্গেই শুঁড় দিয়ে খারাপ ব্যবহার করবার অভ্যাসটা বেশী মাত্রায় আছে; ডান দিকের পিছনের পা-টা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে, আর এক সময়ে ফোড়া হওয়ার ফলে বাঁ দিকের বগলে একটা ছোট দাগ আছে; চুরি যাবার সময় পনেরো জন বসবার মত আসনসহ একটা হাওদা ছিল, আর সাধারণ কার্পেটের মাপের সোনালী কাপড়ের জিন পাতা ছিল।"

কোন ভুল ছিল না। ইন্সপেক্টর ঘণ্টায় হাত দিলেন। আলারিকের হাতে বিবরণটা দিয়ে বললেন:

"এখনই এটার পঞ্চাশ হাজার কপি ছাপিয়ে এই মহাদেশের প্রতিটি গোয়েন্দা-আপিসে ও দালালদের দোকানে ডাকযোগে পাঠিয়ে দাও"। আলারিক চলে গেল। "এই তো-এ পর্যন্ত তো হল। এরপর আমার চাই ঐ মালের একটি ফটোগ্রাফ।"

দিলাম। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন:

"এর চাইতে ভাল কিছু যখন নেই, তখন এতেই চলবে। কিন্তু শুঁড়টা বেঁকিয়ে মুখের মধ্যে ভরা আছে; এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়; ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, কারণ সে তো স্বাভাবিকভাবে ঐ অবস্থায় থাকে না।" আবার ঘণ্টায় হাত দিলেন।

"আলারিক, সকালে তোমার প্রথম কাজই হবে এই ফটোগ্রাফের পঞ্চাশ হাজার কপি ছাপিয়ে বিবরণ-সম্বলিত কাগজের সঙ্গেই ডাকে দেওয়া।"

আলারিক হুকুম তামিল করতে চলে গেল। ইন্সপেক্টর বলল:

"অবশ্য একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা দরকার। তার অংকটা কত হবে?"

"আপনি কত বলেন?"

"শুরুতেই বলছি-তা, পঁচিশ হাজার ডলার। খুবই জটিল ও কঠিন কাজ। পালিয়ে যাবার ও লুকিয়ে থাকবার হাজার পথ ও সুযোগ খোলা আছে। সর্বত্র এই চোরদের বন্ধু ও ওস্তাদরা আছে-"

"আচ্ছা, তারা কে তা কি জানেন?"

সেই সতর্ক মুখ মনের চিন্তা ও ভাবকে গোপন করতেই অভ্যস্ত; সে মুখ দেখে কোন হদিস পেলাম না; শান্তভাবে উচ্চারিত যে কথাগুলি বললেন তা থেকেও কিছু বুঝতে পারলাম না। বললেন:

"ও সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি জানতেও পারি, আবার নাও পারি। কাজের ধরণ ও আকাংখিত শিকারের চেহারা থেকেই আমরা সাধারণত প্রার্থিত লোকটি সম্পর্কে একটা ধারণা করে থাকি। একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এ ক্ষেত্রে কোন পকেট-মার বা ছিঁচকো চোরকে নিয়ে আমাদের কারবার নয়। কোন শিক্ষানবীশ এ মালকে "তুলে" নিয়ে যায় নি। কিন্তু, যে কথা বলছিলাম, যে পরিমাণ পথে হাঁটাহাঁটি করতে হবে এবং চোরের দল যেতে যেতে যে রকম পরিশ্রমের সঙ্গে তাদের চলার সব চিহ্ন মুছে দিয়ে যাবে, তাতে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড হয় তো কিছুটা অল্পই হবে, তবু ঐ দিয়েই শুরু করা যেতে পারে বলেই আমি মনে করি।"

কাজেই শুরুতে ঐ টাকাই স্থির হল। তখন তিনি বললেন:

"গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ক্ষুধার বিশেষত্ব বিচার করেই অনেক সময় অপরাধীদের ধরা হয়েছে। তাহলে, এই হাতিটা কি খায়, এবং কতটা খায়?"

"দেখুন, কি খায় যদি বলেন-তো সব কিছুই খায়। সে মানুষ খাবে, বাইব্‌ল খাবে-মানুষ থেকে আরম্ভ করে বাইব্‌ল পর্যন্ত সব কিছু খাবে।"

"ভাল-সত্যি খুব ভাল, তবে বড়ই সাধারণ। বিস্তারিত বিবরণ দরকার-আমাদের পেশায় বিস্তারিত হচ্ছে একমাত্র মূল্যবান বস্তু। ঠিক আছে-মানুষের কথাই ধরা যাক। একবারে অথবা আপনার যদি সুবিধা হয় তো সারাদিনে-তাজা মানুষ সে ক'জন খেতে পারে?"

"তাজা কিনা তাতে তার কিছু যায়-আসে না; একবারে পাঁচটি সাধারণ মানুষকে সে খেতে পারে।

"খুব ভাল; পাঁচ জন; তাই লিখে নিচ্ছি। কোন্ জাতির মানুষ তার পছন্দ?"

"জাতির ব্যাপারে সে নির্বিকার। পরিচিত লোকজনই তার পছন্দ, কিন্তু অপরিচিত লোকেও তার আপত্তি নেই।"

"খুব ভাল। এবার বাইব্‌লের কথা। একবারে কতগুলি বাইব্‌ল খেতে পারে?"

"একটা পুরো সংস্করণই খেতে পারে।"

"এটা যথেষ্ট পরিষ্কার হল না। আপনি কি সাধারণ 'অক্টোভো'র কথা বলছেন, নাকি চিত্রসম্বলিত পারিবারিক সংস্করণের কথা বলছেন?"

"মনে হয় ছবি-টবির ব্যাপারে সে নিস্পৃহ; অর্থাৎ সাধারণ ছাপার চাইতে ছবিকে সে বেশী দাম দেবে না।

"না, আমার কথাটা আপনি ধরতে পারেন নি। আমি বলতে চাইছি আয়তনের কথা। সাধারণ 'অক্টোভো' বাইব্লের ওজন হয় আড়াই পাউণ্ডের মত, আর চিত্রসম্বলিত বড় 'কোয়ার্টো' সংস্করণের ওজন হয় দশ থেকে বারো পাউন্ড। ক'খানা 'ডোরে বাইব্ল' সে একবারে খেতে পারে?"

"হাতিটাকে চিনলে আপনি এ প্রশ্ন করতেন না। যা দেবেন তাই সে খেয়ে নেবে।"

"দেখুন, ডলার আর সেন্টের হিসাবে বলুন। আমাদের তো একটা আন্দাজ করতে হবে। রুশীয় চামড়ায় মাপমত বাঁধানো 'ডোরে'-সংস্করণ একখানা বইয়ের দাম একশ' ডলার।"

"তাহলে তার খাবার খরচ পড়বে পঞ্চাশ হাজার ডলারের মত-ধরুন পাঁচশ, বইয়ের একটি পুরো সংস্করণ।"

"এটা অনেকটা সঠিক কথা। লিখে নিচ্ছি। ঠিক আছে; মানুষ ও বাইব্ল দুইই তার পছন্দ; খুব ভাল কথা। আর কি খায়? আমি চাই বিস্তারিত বিবরণ।"

সে বাইব্ল ফেলে ইট খাবে, ইট ফেলে বোতল খাবে, বোতল ফেলে কাপড় খাবে, কাপড় ফেলে বিড়াল খাবে, বিড়াল ফেলে ঝিনুক খাবে, ঝিনুক ফেলে শুয়োর খাবে, শুয়োর ফেলে চিনি খাবে, চিনি ফেলে শুঁটি খাবে, শুঁটি ফেলে আলু খাবে, ভূষি ফেলে খড় খাবে, খড় ফেলে খই খাবে, খই ফেলে চাল খাবে, কারণ প্রধানত চাল খেয়েই সে বড় হয়েছে। একমাত্র ইওরোপের মাখন ছাড়া হেন জিনিস নেই যা সে খাবে না, আর একবার স্বাদ পেলে সে জিনিসও সে খাবে।"

খুব ভাল। খাদ্যের সাধারণ পরিমাণ-ধরুন মোটামুটি -"

"তা সিকি থেকে আধ টন।"

"আর পানীয় কি চলে-"

"যে কোন তরল পদার্থ। দুধ, জল, হুইস্কি, ঝোলাগুড়, ক্যাস্টর ওয়েল, ক্যাম্ফিন, কার্বলিক এসিড-অত কথা বলে কি হবে; যা কিছু তরল পাবেন, সামনে ধরে দেবেন। একমাত্র ইওরোপীয় কফি ছাড়া যে কোন তরল পদার্থই সে পান করে।"

"খুব ভাল। পরিমাণটা কি?"

"তা পাঁচ থেকে পনেরো পিপে ধরে রাখুন-তার তেষ্টার কম-বেশী আছে, যদিও খাবার বেলায় সেটা নেই।"

"এ সব কিছুই বেশ অসাধারণ। তাকে খুঁজে পাওয়ার পক্ষে এগুলো বেশ ভাল সূত্র হওয়া উচিত।"

সে ঘণ্টায় হাত দিল।

"আলারিক, ক্যাপ্টেন বার্ণস্‌কে ডাক।"

বার্ণস্ এল। ইন্সপেক্টর ব্লাণ্ট বিস্তারিতভাবে সব কথা খুলে বলল। তারপর স্পষ্ট, স্থিরসিদ্ধান্ত সূচক স্বরে আদেশের ভঙ্গীতে বলল: "ক্যাপ্টেন বার্ণস্, গোয়েন্দা জোন্স, ডেভিস, হাস্‌লি, বেটস্ ও হ্যাকেটকে হাতির খোঁজে পাঠিয়ে দিন।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"গোয়েন্দা মোজেস, ডাকিন, মারফি, রোজার্স, টুপ্পার, হিগিন্স ও বার্থোলোমিউকে পাঠান চোরদের খোঁজে।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"যেখান থেকে হাতিটা চুরি গেছে তার চারদিকে কড়া পাহাড়া বসান-বাছাই ত্রিশ জনের রক্ষীদল আর ত্রিশ জনের 'রিলিফ' দল; দিন রাত তারা খাড়া পাহাড়ায় থাকবে; একমাত্র সংবাদপত্রের প্রতিবেদক ছাড়া আমার লিখিত অনুমতি ব্যতীত কাউকে সেখানে যেতে দেবে না।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"রেলওয়ে, স্টীমার ও ফেরিঘাটে এবং জার্সি সিটি থেকে বের হবার সব বড় রাস্তায় সাদা পোশাকের গোয়েন্দা মোতায়েন করুন; তাদের উপর নির্দেশ দিন-যে কোন সন্দেহভাজন লোককেই যেন তল্লাসী করা হয়।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"হাতিটা ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ আটক করে টেলিগ্রাম করে যেন আমাকে খবর পাঠানো হয়।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"জন্তুটির পায়ের ছাপ বা ঐ ধরনের যে কোন সূত্র পেলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর দিতে হবে।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"হুকুম জারী করে দিন, বন্দর-পুলিশ যেন সারা উপকূল জুড়ে সতর্কতার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"উত্তরে কানাডা পর্যন্ত, পশ্চিমে ওহিয়ো পর্যন্ত, দক্ষিণে ওয়াশিংটন পর্যন্ত রেলপথের সর্বত্র সাদা পোশাকের গোয়েন্দ পুলিশ পাঠান।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"টেলিগ্রাফের যে কোন সংবাদ ধরবার জন্য সব টেলিগ্রাফ আপিসে বিশেষজ্ঞ বসান; যে কোন সাংকেতিক তার-বার্তা যেন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এ সবই যেন করা হয় অত্যন্ত গোপনে-মনে রাখবেন, অতীব দুর্ভেদ্য গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"যথাসময়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সব জানাবেন।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"যান!"

"হ্যাঁ স্যার।"

সে চলে গেল।

ইন্সপেক্টর ব্লাণ্ট কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করল। ধীরে ধীরে তার চোখের আগুন ঠাণ্ডা হতে হতে মিলিয়ে গেল। তারপর আমার দিকে ঘুরে শান্ত স্বরে বলল:

"আমি গর্ব করি না, গর্ব করা আমার স্বভাব নয়; কিন্তু-হাতিটাকে আমরা খুঁজে বের করবই।"

সাদরে করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। লোকটি কে যত দেখছি ততই তাকে ভাল লাগছে, ততই তাকে প্রশংসা করতে ইচ্ছা করতে, ততই তার কাজের রহস্যময় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি। তারপর আমরা রাতের মত বিদায় নিলাম; যে মন নিয়ে তার আপিসে ঢুকেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশী খুসি মন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম।

২

পরদিন সকালে সব কথাই খবরের কাগজে প্রকাশিত হল-পুংখানুপুংখ বিবরণসহ। কিছু কিছু যোগ করাও হয়েছে-কি ভাবে ডাকাতিটা হল, সে ডাকাত কারা, ডাকাতির মাল নিয়ে তারা কোন্ দিকে সরে পড়েছে, সে সম্পর্কে গোয়েন্দা অমুক, গোয়েন্দা তমুক ও গোয়েন্দা শমুক-এর নানাবিধ "থিয়োরি"। এ রকম এগারোটা থিয়োরি ছাপা হয়েছে, আর তাতেই সব রকম সম্ভাবনার কথা বলা হয়ে গেছে। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই বোঝা যায় গোয়েন্দাদের চিন্তাধারা কত স্বাধীন। কোন দুটো থিওরি এক রকম নয়; এমন কি একটি বিশেষ ব্যাপার ছাড়া তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্যও নেই; আর সেই একটি ব্যাপারে এগারোটি থিয়োরিই একমত। সেই একটি ব্যাপার হল-যদিও আমার তাঁবুর পিছন দিকটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং তার একমাত্র দরজাটা তালাবদ্ধই রয়েছে, তবু সে ছেঁড়া জায়গা দিয়ে হাতিটাকে বের করে নেওয়া হয় নি, নেওয়া হয়েছে অন্য কোন (অনাবিষ্কৃত) পথে। সকলেই একমত যে গোয়েন্দাদের ভুলপথে চালাবার জন্যই ডাকাতরা তাঁবুটাকে ছিঁড়ে রেখে গেছে। হয় তো এ সত্যটা আমার মনে বা অন্য কোন সাধারণ লোকের মনেই উঠত না, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তারা গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিতে পারে নি। কাজেই, যে ব্যাপারে কোন রকম রহস্যই নেই বলে আমার মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সেখানেই আমি ভুল করেছিলাম সব চাইতে বেশী। এগারোটা থিয়োরির সবগুলোতেই সম্ভাবিত ডাকাতদের নাম বলা হয়েছে, কিন্তু দুটো থিয়োরিতেই একই ডাকাতদলের নাম করা হয় নি; এ ধরনের সন্দেহজনক লোকের সংখ্যা মোট সাঁইত্রিশ। বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিবরণের শেষেই প্রকাশ করা হয়েছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অভিমতটি-সে অভিমত প্রধান ইন্সপেক্টর ব্লান্ট-এর। তার বিবৃতির একটি অংশ নিম্নরূপ:

"গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা দু'জন প্রধান পাণ্ডা অর্থাৎ 'ইট' ডাফি ও 'লাল' ম্যাকফাডেনকে চেনেন। ডাকাতি হওয়ার দু'দিন আগেই তিনি এরকম একটা প্রচেষ্টার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং চুপিচুপি এই দুই কুখ্যাত শয়তানের পিছু নিয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঘটনার দিন রাতে তাদের খোঁজটা হারিয়ে যায় এবং পুনরায় সেটা ফিরে পাবার আগেই পাখি উড়ে গেছে-অর্থাৎ হাতি উধাও।

"ডাফি ও ম্যাকফাডেন এ কাজের দুই দুঃসাহসিক বদমাশ; আমাদের প্রধানের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে গত শীতকালে এক তীব্র শীতের রাতে এরা দু'জনই গোয়েন্দা হেড কোয়ার্টার থেকে স্টোভটা চুরি করেছিল-আর তার ফলেই প্রধান ও উপস্থিত অন্যসব গোয়েন্দাই কেউ ঠাণ্ডায় জমাট পা নিয়ে, কেউ জমাট আঙুল, কান বা অন্য অঙ্গ নিয়ে সকালের আগেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন বাধ্য হয়েছিল।"

বিবরণের প্রথম অংশ পড়েই এই আশ্চর্য লোকটির বিস্ময়কর দূরদর্শিতায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সে যে শুধু বর্তমানকেই স্পষ্ট চোখে দেখতে পায় তাই নয়, ভবিষ্যৎকেও তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা যায় না। অচিরেই তার আপিসে গিয়ে জানালাম, আমার ইচ্ছা এই লোকগুলিকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে অধিক গোলযোগ ও ক্ষতির পথ বন্ধ করা হোক; কিন্তু যে জবাব পেলাম সেটা যেমন সরল তেমনই তর্কাতীত।

"অপরাধ বন্ধ করা আমাদের এক্তিয়ার নয়, আমাদের কাজ অপরাধীর শাস্তি বিধান করা। কিন্তু অপরাধ না ঘটা পর্যন্ত তো আমরা শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি না।"

আমি বললাম, যে গোপনীয়তা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, সংবাদপত্রগুলো তো সে সবই পণ্ড করে করে দিয়েছে; শুধু ঘটনাবলীই নয়, আমাদের সব ফন্দি-ফিকিরও প্রকাশ পেয়ে গেছে; এমন কি সন্দেহজনক লোকগুলোর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা

হয়েছে; ফলে তারা হয় তো ছদ্মবেশ নেবে, আর না হয় তো গা-ঢাকা দেবে।

"তা দিক। সময় যখন হবে তখন নিয়তির অমোঘ হাতের মতই আমার হাতও যে কোন গোপন স্থানে তাদের উপর ঠিকই নেমে আসবে। আর সংবাদপত্রের কথা? তাদের সঙ্গে মানিয়েই আমাদের চলতে হবে। যশ, খ্যাতি, প্রকাশ্যে অবিরাম নাম-ঘোষণা-একজন গোয়েন্দার পক্ষে এইগুলিই তো রুটি-মাখনের মত। কিছু ঘটনা তাকে প্রকাশ করতেই হবে, অন্যথায় লোকে ভাববে তার হাতে কোন ঘটনাই নেই; তার থিয়োরিও অবশ্য প্রকাশ করতে হবে, কারণ একজন গোয়েন্দার থিয়োরির মত আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় আর কিছু নেই, আর এই থিয়োরিই তাকে এনে দেয় বিস্ময়কর সম্মান; কাজের পরিকল্পনাও প্রকাশ করতেই হয়, কারণ পত্রিকাগুলি তাই চায়, আর না দিলে তাঁরা গোঁসা করে। আমরা কতদূর কি করছি সেটা জনসাধারণকে সব সময়ই জানাতে হবে, নইলে তারা মনে করবে যে আমরা কিছুই করছি না। কোন সংবাদপত্র কড়া বলবে, বা তার চাইতেও যেটা খারাপ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করব; তার চাইতে তারা যদি লেখে, 'ইন্সপেক্টর ব্লান্ট-এর সুকৌশলী ও অসাধারণ থিয়োরিটা এই রকম', তাহলে সেটাই তো শুনতে অনেক ভাল লাগে।'

"আপনার কথার সারবত্তা আমি ধরতে পেরেছি। কিন্তু এটাও আমার চোখে পড়েছে যে আজ সকালেই কোন একটা কাগজে বেরিয়েছে যে একটি ছোটখাট বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করতে আপনি অস্বীকার করেছেন।"

"হ্যাঁ, ওটা আমরা সব সময়ই করে থাকি; এরও একটা ভাল ফল আছে। তাছাড়া, ও বিষয়ে এখনও আমি কোন মতামতই গড়ে তুলি নি।"

চলতি খরচপত্র বাবদ ইন্সপেক্টরের হাতে বেশ মোটা টাকা জমা দিয়ে খবরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলাম। আশা করেছিলাম, যে কোন মুহূর্তেই টেলিগ্রাম আসতে শুরু করবে। ইতিমধ্যে আবার নতুন খবরের কাগজগুলো ও আমাদের ঘোষণা-পত্রগুলো পড়তে লাগলাম। তা থেকেই বুঝতে পারলাম, পঁচিশ হাজার ডলারের পুরস্কারটা শুধু গোয়েন্দাদেরই দেওয়া হবে। আমি বললাম, আমার ধারণা ছিল যে কেউ হাতিটাকে ধরে দিতে পারবে পুরস্কারটা তাকেই দেওয়া হবে। তখন ইন্সপেক্টর বলল:

"গোয়েন্দারাই তো হাতিটাকে খুঁজে বের করবে, কাজেই পুরস্কারও ঠিক জায়গায়ই যাবে। অন্য লোক যদি সেটাকে পায় তাহলে বুঝতে হবে গোয়েন্দাদের গতিবিধির উপর নজর রেখে এবং তাদের কাছ থেকে চরিকরা সূত্র ও নির্দেশের সুযোগ নিয়েই তারা সেটা পেয়েছে, আর সেই কারণে শেষ পর্যন্ত পুরস্কারটা গোয়েন্দাদেরই প্রাপ্য হবে। এই সব পুরস্কারের আসল উদ্দেশ্যই হল, এই ধরনের কাজের পিছনে যারা তাদের সময় ও শিক্ষিত পটুত্বকে নিয়োজিত রাখে তাদেরই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা; যারা নিজেদের ক্ষমতা বা পরিশ্রমের মূল্যে সুবিধাটা অর্জন করার পরিবর্তে হঠাৎই একটা কাজ গুছিয়ে ফেলে সেই সব আকস্মিক নাগরিকদের তুষ্টি বিধান করা নয়।"

নিশ্চয়ই বক্তব্যটা খুবই যুক্তিযুক্ত। এতক্ষণে ঘরের কোণের টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা শব্দ করে উঠল, আর তার ফলে নিম্নলিখিত বার্তাটা বেরিয়ে এল:

ফ্লাওয়ার স্টেশন, এন. ওয়াই., সকাল ৭-৩০ মিঃ একটা সূত্র পেয়েছি। কাছেই একটা গোলাবাড়িতে পরপর অনেকগুলি গভীর পায়ের দাগ দেখেছি। সেগুলি অনুসরণ করে পূব দিক দু'মাইল হেঁটেছি, কোন ফল হয় নি; মনে হয় হাতি পশ্চিম দিকে গেছে। এবার সেই দিকেই তার পিছু নেব।......

ডার্লি, গোয়েন্দা

ইন্সপেক্টর বলল, "ডার্লি বিভাগের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মী। শীঘ্রই তার কাছ থেকে আবার খবর পাব।"

২ নং টেলিগ্রাম এল:
বার্কর'স্ এন. জে., সকাল ৭-৪০ মিঃ

এই মাত্র পৌঁছেছি। কাঁচের কারখানা ভেঙে চুরমার রাতের বেলা। আট শ' বোতল নিখোঁজ। পাঁচ মাইলের মধ্যে বড় জলাশয় নেই। হাতিটা অবশ্য তৃষ্ণার্ত হবে। বোতলগুলি খালি ছিল।

বেকার, গোয়েন্দা

ইন্সপেক্টর বলল, "কাজ ভালই এগোচ্ছে। বলেছিলাম না, জন্তুটার ক্ষিধে সূত্র হিসাবে খারাপ হবে না।"

৩ নং টেলিগ্রাম:

টেলরভিল, এল. আই., সকাল ৮-১৫ মিঃ

কাছেই একটা খড়ের গাদা রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সম্ভবত কিছুতে খেয়েছে। একটা বড় সূত্র পেয়েছি। চলে যাচ্ছি।

হিউবার্ড, গোয়েন্দা

ইন্সপেক্টর বলল, "কি রকম ছুটে বেড়াচ্ছে! জানতাম, কাজটা বড়ই কঠিন। কিন্তু তবু তাকে আমরা ধরবই।"

আবার টেলিগ্রাম:

পায়ের ছাপ ধরে পশ্চিম দিকে তিন মাইল ছুটেছি। পায়ের দাগ বড়, গভীর, অসমান, এই মাত্র একজন কৃষকের সঙ্গে দেখা। সে বলছে, এ গুলো হাতির পায়ের ছাপ নয়। বলছে, গত শীতকালে মাটির উপর যখন বরফ জমেছিল তখন ছায়া-তরুর জন্য যে সব চারা গাছ সে খুঁড়ে তুলেছিল এগুলি তারই শর্ত। কি ভাবে অগ্রসর হব নির্দেশ পাঠান।

ডার্লি, গোয়েন্দা

"আঃ! যত সব চোরের স্যাঙাৎ! অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে," ইন্সপেক্টর বলল। ডার্লি-কে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাল:

লোকটাকে গ্রেপ্তার কর আর তার সঙ্গীদের নাম বলতে বাধ্য কর। পায়ের দাগ ধরে এগিয়ে যাও-দরকার হলে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত।

প্রধান ব্লাণ্ট

পরবর্তী টেলিগ্রাম:

রাতের বেলা গ্যাস-আপিস ভেঙে তচনচ করেছে আর তিন মাসের বকেয়া গ্যাস-বিল নিয়ে গেছে। সূত্র পেয়েছি। চলে যাচ্ছি।

মারফি, গোয়েন্দা

ইন্সপেক্টর বলল, "হা ভগবান! সেটা কি গ্যাস-বিলও খায়?"

"হয় তো না জেনে খেয়েছে; কিন্তু তা খেয়ে তো বাঁচবে না। অন্তত আর কিছু না খেতে পেলে।"

তার পরেই এল এই চাঞ্চল্যকর টলিগ্রাম:

আয়রণভিল, এন. ওয়াই., সকাল ৯-৩০ মিঃ

এই মাত্র পৌঁছেছি। গ্রাম আতংকিত। আজ সকাল পাঁচটায় এখান দিয়ে হাতি গেছে। কেউ বলছে পূর্বে গেছে, কেউ বলছে পশ্চিমে, কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিণে-কিন্তু সকলেই বলছে ভালভাবে লক্ষ্য করবার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নি। একটা ঘোড়া মেরেছে; আঘাতের ধরণ দেখে মনে হয় বাঁ-হাতে আঘাত করেছে। ঘোড়াটা যে অবস্থায় পড়ে আছে তাতে মনে হয়, হাতিটা বার্কলে রেলপথ বরাবর উত্তর দিকে গেছে। সাড়ে চার ঘণ্টা আগে চলে গেছে, কিন্তু আমি এই মুহূর্তেই তার পায়ের দাগ ধরে যাত্রা করছি।

হয়েস, গোয়েন্দা

আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। ইন্সপেক্টর পাথরের মূর্তির মত গম্ভীর। শান্তভাবে সে ঘণ্টায় হাত দিল।

"আলারিক, ক্যাপ্টেন বার্নস্‌কে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

বার্নস্ এল।

"আপনার হুকুমের অপেক্ষায় কত লোক প্রস্তুত আছে?"

"ছিয়ানব্বুই জন স্যার।"

"এখনই তাদের উত্তরে পাঠিয়ে দিন। আয়রণভিল-এর উত্তরে বার্কলে রোড বরাবর তাদের মোতায়েন থাকতে বলুন।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তারা যেন অত্যন্ত গোপনে অগ্রসর হয়। যারা এখন বাইরে আছে, তাদের হুকুমের অপেক্ষায় তৈরি থাকতে বলুন।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"যান!"

"হ্যাঁ স্যার।"

ইতিমধ্যে আর একটা টেলিগ্রাম এল:

সেজ কর্ণার্স, এন. ওয়াই., ১০-৩০ মিঃ

এই মাত্র পৌঁছেছি। ৮-১৫ মিঃ-এ হাতি এখান দিয়ে গেছে। একটি পুলিশ ছাড়া সকলেই শহর ছেড়ে পালিয়েছে। স্পষ্টতই হাতি পুলিশকে আঘাত করে নি আঘাত করেছে ল্যাম্প-পোস্টটাকে। দুটোই গেছে। সূত্র হিসাবে পুলিশের একটা অংশ সংগ্রহ করেছি।

স্টাম, গোয়েন্দা

ইন্সপেক্টর বলল, "হাতিটা তাহলে পশ্চিম দিকে ঘুরেছে। যা হোক, সে পালাতে পারবে না, কারণ আমাদেরর লোক ও অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।"

পরবর্তী টেলিগ্রামের কথা:

গ্লোভার্স, ১১-১৫ মিঃ

এই মাত্র পৌঁছেছি। রুগ্ন ও বৃদ্ধ ছাড়া গ্রাম পরিত্যক্ত। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে হাতি এখান দিয়ে গেছে। মদ্যপান-নিবারণী জনসভার অধিবেশন চলছিল; একটা জানালায় শুঁড় লাগিয়ে জালার জল ছড়িয়ে সব ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। কেউ কেউ আকণ্ঠ জল গিলেছিল-পরে মারা গেছে; কিছু লোক ডুবে গেছে। গোয়েন্দা ক্রস্ এবং ও' শৌঘ্নেসি শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দক্ষিণ দিকে যাওয়ায়-হাতিতে দেখতে পায় নি। চারদিকে বহু মাইল পর্যন্ত গোটা অঞ্চল আতংকের কবলে-লোকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই হাতি। অনেকে মারা পড়েছে।

ব্র্যান্ট, গোয়েন্দা

এই ধ্বংসকাণ্ড আমাকে বিচলিত করল, চোখে বুঝি জল এসে গেল। কিন্তু ইন্সপেক্টর শুধু বলল:

"দেখছেন-তাকে কেমন ঘিরে ধরেছি। আমাদের চাপ সে বুঝতে পেরেছে; আবার পূবদিকে মোড় নিয়েছে।"

তখনও আরও খারাপ খবর আমাদের জন্য জমা ছিল। সে খবর আনল এই টেলিগ্রামটি:

হোগান্স্পোর্ট, ১২-১৯ মিঃ

এইমাত্র পৌঁছেছি। আধ ঘণ্টা আগে হাতি এখান দিয়ে গেছে। সর্বত্র তীব্র ভয় ও উত্তেজনা। হাতি রাস্তা বরাবর যাচ্ছিল। দু'জন জল-মিস্ত্রি যাচ্ছিল। একজনকে মেরেছে-অন্যজন পালিয়েছে। সকলেই দুঃখিত।

ও' ফ্লাহার্টি, গোয়েন্দা

ইন্সপেক্টর বলল, "এবার আমার লোকজন তাকে ঘিরে ফেলেছে। আর তার রক্ষা নেই।"

সারা নিউ জার্সি ও পেন্সিল্ভানিয়াতে ছড়িয়ে থাকা গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পর পর টেলিগ্রাম আসতে লাগল। আক্রান্ত গোলাবাড়ি, কারখানা ও রবিবার-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রভৃতির সূত্র ধরে অনেক আশা নিয়ে-প্রায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাস নিয়ে এই সব গোয়েন্দারা কাজ করে বেড়াচ্ছে। ইন্সপেক্টর বলল:

"এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি উত্তরে যাবার হুকুম দিতে পারতাম তাহলে ভাল হত; কিন্তু সে তো অসম্ভব। একজন গোয়েন্দা প্রতিবেদন পাঠাতে শুধু টেলিগ্রাম আপিসেই যায়, আর তারপরেই উধাও হয়; তখন যে কোথায় গেলে তাকে ধরা যাবে তা কেউ জানে না।"

এবার এল এই তারটা:

ব্রিজপোর্ট, সি. টি., ১২-১৫ মিঃ

এখন থেকে শুরু করে গোয়েন্দারা হাতিটাকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত সেটাকে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকারের জন্য বার্ণাম বার্ষিক ৪,০০০ পাউণ্ড দেবার প্রস্তাব রেখেছে। তার গায়ে সার্কাসের বিজ্ঞাপন সেঁটে দিতে চায়। অবিলম্বে জবাব চাইছে।

বগ্স্, গোয়েন্দা

"সেটা তো একেবারেই অসম্ভব!" আমি বললাম।

ইন্সপেক্টর বলল, "নিশ্চয়। মিঃ বার্ণাম নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে; সে আমাকে চেনে না; কিন্তু আমি তাকে চিনি।"

তারপর টেলিগ্রামের এই জবাব সে লিখে নিতে বলল:

মিঃ বার্ণাম-এর প্রস্তাব বাতিল। হয় ৭,০০০ পাউণ্ড, নইলে কিছুই না।

প্রধান ব্লাণ্ট

"ঠিক আছে। জবাব আনতে বেশী দেরি হবে না। মিঃ বার্ণাম বাড়িতে নেই; সে এখন টেলিগ্রাম আপিসে-হাতে কাজ থাকলে এটাই তার রীতি। তিনজনের ভিতরে-"

"কথা পাকা।"-পি. টি. বার্ণাম

টেলিগ্রাম যন্ত্রটার ক্লিক-ক্লিক শব্দ তার কথায় বাধার সৃষ্টি করল। এই অদ্ভুত অধ্যায়টি সম্পর্কে কোন রকম মন্তব্য করবার আগেই নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি এসে আমার চিন্তাধারাকে আর একটি দুর্বিপাকের দিকে ঘুরিয়ে দিল:

১১-৫০ মিনিটের সময় হাতিটা দক্ষিণ দিক থেকে এখানে এসে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে; পথে একটা শব-যাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে এবং শবযাত্রীদের সংখ্যা দু'জন কমিয়ে দিয়েছে। নাগরিকরা তাকে লক্ষ্য করে কয়েকটা ছোট কামানের গোলা ছুড়ে পালিয়ে যায়। গোয়েন্দা বার্ক ও আমি দশ মিনিট পরে উত্তর দিক থেকে সেখানে হাজির হই এবং পথের খোড়াখুড়িকে পায়ের দাগ বলে ভুল করে অনেকটা সময় নষ্ট করি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ ধরে জঙ্গল পর্যন্ত অগ্রসর হই। তারপর হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে পায়ের ছাপের উপর কড়া নজর রেখে চলি এবং একটা ঝোপ পর্যন্ত এগিয়ে যাই। বার্ক ছিল আগে। দুর্ভাগ্যবশত জন্তুটা তখন বিশ্রাম করছিল। মাথা নীচু করে পায়ের দাগ দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়ে সে সোজা হাতিটার পিছনের পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খায়; হাতিটা যে এত কাছে ছিল তা সে বুঝতেই পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ায় এবং লেজটা ধরে সহর্ষে চীৎকার করে ওঠে, 'আমিই পেয়ে গেছি পুর-'কিন্তু তার মুখের কথা আর শেষ হল না, প্রকাণ্ড শুঁড়ের একটি আঘাতেই সাহসী সঙ্গীটির বিচূর্ণিত দেহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আমি পিছন ফিরে ছুটতে লাগলাম, আর হাতিটা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে তাড়া করে জঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত ছুটে এল। প্রচণ্ড গতিবেগ তার; তাই আমার মৃত্যুও ছিল অনিবার্য, কিন্তু ভাগ্যক্রমে অবশিষ্ট শব যাত্রীরা সেখানে এসে পড়ায় তার মনোযোগ সেই দিকে ঘুরে গেল। এইমাত্র জানতে পারলাম, সেই শবযাত্রীদের কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু এ ক্ষতি কোন ক্ষতিই নয়, কারণ আমরা প্রচুর তথ্যাদি হাতে পেয়ে গেছি। এদিকে হাতিটা আবার উধাও হয়েছে।

মাল্‌রুনি, গোয়েন্দা

নিউ জার্সি, পেন্‌সিল্‌ভানিয়া, ডেলাওয়ার ও ভার্জিনিয়াতে নতুন নতুন সূত্র ধরে কর্মরত গোয়েন্দাদের কাছ থেকে ছাড়া আর কোন সংবাদ এল না। অবশেষে বেলা দুটোর একটু পরেই এই টেলিগ্রামটি এল:

বক্সটার সেণ্টার, ২-১৫ মিঃ

সারা গায়ে সার্কাসের বিজ্ঞাপন সাঁটা অবস্থায় হাতিটা এখানে এসেছিল; নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে জীবনের অনেক নবীন পথিককে পায়ে দলেছে; নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নাগরিকরা অনেক লেখালেখি করে একজন পাহারাদার বসিয়েছে! তার কিছু সময় পরেই গোয়েন্দা ব্রাউন ও আমি সেখানে পৌঁছেই এবং ভিতরে ঢুকে ফটোগ্রাফ ও অন্য বিবরণের সাহায্যে হাতিটাকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করি। সব চিহ্নই ঠিক ঠিক মিলে গেছে, শুধু একটি বাদে-বগলের নীচেকার ক্ষত-চিহ্নটা আমরা দেখতে পাই নি। সঠিকভাবে জানবার জন্য ব্রাউন হামাগুড়ি দিয়ে হাতিটার পেটের নীচে ঢুকে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গেই সাবাড়-মাথাটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে, যদিও ফল কিছুই হয় নি। সকলেই পালিয়ে যায়; হাতিটাও; তবে যাবার আগে ডাইনে-বাঁয়ে যাকে পায় তাকেই মারে। পালিয়েছে বটে, কামানের গোলার ঘায়ের দরুণ রক্তাক্ত পদচিহ্ন রেখে গেছে। ধরা অবশ্য পড়বে। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে গেছে।

ব্রেণ্ট গোয়েন্দা

এটাই শেষ টেলিগ্রাম। রাতের দিকে এত ঘন কুয়াশা হল যে তিন ফুট দূরের কোন জিনিসও দেখা যায় না। সারা রাত এই রকম চলল। খেয়া নৌকা ও অমনিবাসগুলোও চলাচল বন্ধরাখতে বাধ্য হল।

৩

পরদিন সকালে সব সংবাদপত্রগুলিই আগের দিকের মত গোয়েন্দাদের নানা রকম থিয়োরিতে ভর্তি হয়ে বের হল; এই সব শোচনীয় ঘটনার সবিস্তার বিবরণ তো তাতে ছিলই, উপরন্তু ছিল তার-যোগে পাওয়া বিশেষ প্রতিনিধিদের নানাবিধ প্রতিবেদন। বড় বড় শিরোনামে কলমের পর কলম ভর্তি সংবাদ-সে সব পড়তেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। সে সবেরই মূল সুর অনেকটা এই রকম:

শ্বেত হস্তী ছাড়া পেয়েছে! শুরু করেছে মারাত্মক অভিযান! ভয়ার্ত অধিবাসীরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে! তার আগে চলে তীব্র আতংক, আর পিছনে চলে মৃত্যু ও ধ্বংস! তারপর আছে গোয়েন্দারা! গোলাবাড়ি বিধ্বস্ত, কারখানা চুরমার, ফসল উদরস্থ, জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ, আর সেই সঙ্গে অবর্ণনীয় নরহত্যার দৃশ্য! গোয়েন্দা বাহিনীর চৌত্রিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত! গোয়েন্দা-প্রধান ব্লাণ্ট-এর অভিমত!

"শুনলেন তো!" ইন্সপেক্টর ব্লান্ট-এর কণ্ঠে ও উত্তেজনার প্রকাশ "কী চমৎকার! কোন গোয়েন্দা-প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে এতবড় প্রশংসা আর কখনও জোটে নি। এই সুখ্যাতি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে, নিরবধি কাল বেঁচে থাকবে, আর সেই সঙ্গে থাকবে আমার নাম।"

কিন্তু আমার মনে সুখ নেই। আমার মনে হতে লাগল, এই সব রক্তাক্ত অপরাধ বুঝি আমারই কৃতকর্ম, আর এই হাতিটা বুঝি আমারই দায়িত্বহীন প্রতিনিধি। আর দুষ্কর্মের তালিকা কি ভাবে বেড়ে চলেছে! এক জায়গায় "নির্বাচক-ক্ষেত্রে হানা দিয়ে সে পাঁচজন বক্তাকে হত্যা করেছে।" তারপরেই মেরেছে ও' ডোনেহিউ ও ম্যাকফ্লানিগান নামক দুটি গরীব মানুষকে; "মাত্র একদিন আগে তারা এসে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে এবং এই প্রথম ভোট-কেন্দ্রে গিয়ে মার্কিন নাগরিকের মহান অধিকার পালনে ব্রতী হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই শ্যামদেশীয় শয়তানের নৃশংস হাত তাদের উপর নেমে এসেছিল। আর এক জায়গায় সে মেরেছে একজন বজ্রবারণ দণ্ডের প্রতিনিধিকে। এই ভাবে তালিকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, আরও রক্তাক্ত হচ্ছে, আরও হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠেছে। ষাটজন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে দু'শ' চল্লিশজন। বিবরণগুলিতে সব শেষে মন্তব্য করা হয়েছে, "তিন লক্ষ নাগরিক ও চারজন গোয়েন্দা এই ভয়ংকর জীবটিকে প্রত্যক্ষ করেছে; তাদের মধ্যে দু'জন গোয়েন্দা নিহত হয়েছে।"

টেলিগ্রাফ-যন্ত্রটা পুনরায় ক্লিক করে উঠতেই আমার ভয় ধরে গেল। খবরের পর খবর আসতে লাগল। সেগুলো শুনে আমি হতাশ হলেও খুসি হলাম। শীঘ্রই বোঝা গেল যে হাতিটার সব চিহ্ন হারিয়ে গেছে। কুয়াসার ফলে একটা ভাল লুকোবার জায়গা সে পেয়ে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে টেলিগ্রাম আসতে লাগল, অমুক অমুক সময়ে কুয়াসার ভিতর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড কিছু দেখা গেছে, আর সেটা "নিঃসন্দেহে হাতি।" এ ধরনের একটা অস্পষ্ট প্রকাণ্ড কিছু দেখা গেছে নিউ হ্যাভন-এ, কিড জার্সিতে, পেনসিলভানিয়াতে, নিউ ইয়র্ক-এর শহরতলীতে, ব্রুকলীন-এ, এমন কি খাস নিউ ইয়র্ক শহরে পর্যন্ত! কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সেই অস্পষ্ট প্রকাণ্ড কিছু দ্রুত অদৃশ্য হয়েছে এবং কোন চিহ্ন পর্যন্ত রেখে যায় নি। বিরাট গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিটি লোক ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা দিক দেশ থেকে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। প্রত্যেকেই একটা না একটা সূত্র পেয়েছে, কোন না কোন কিছুকে অনুসরণ করেছে এবং অনেক সময়ই তাকে তাড়া করে ফিরেছে।

কিন্তু একটা দিন বিফলে গেল।

পরদিনও তাই।

তার পরদিনও ঠিক তাই।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন একঘেয়ে হয়ে উঠল; ঘটনা আছে, তাতে নতুনত্ব নেই; সূত্র আছে, তার কোন অর্থ নেই; থিয়োরি আছে, কিন্তু বিস্ময় ও আনন্দের চমক নেই।

ইন্সপেক্টরের পরামর্শক্রমে পুরস্কারের অংক দ্বিগুণ করা হল।

আরও চারটি একঘেয়ে দিন কেটে গেল। তারপরেই এল কঠোর পরিশ্রমী বেচারি গোয়েন্দাদের উপর নির্মম আঘাত-সাংবাদিকরা তাদের থিয়োরি ছাপতে অস্বীকার করে বসল; ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমাদের একটু বিশ্রাম দিন।"

হাতি নিরুদ্দেশ হবার দু'সপ্তাহ পরে ইন্সপেক্টরের পরামর্শে পুরস্কার বাড়িয়ে করা হল পঁচাত্তর হাজার ডলার। টাকাটা খুবই বেশী, কিন্তু আমি ভাবলাম, আমার যথাসর্বস্ব যায় যাক, তবু আমার সরকারের কাছে আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকুক। গোয়েন্দাদের তখন দুর্দিন চলছে; তাই সংবাদপত্রগুলো তাদের উপর চড়াও হল; কড়া বিদ্রূপের হুল ফোটাতে লাগল তাদের গায়ে। সুযোগ বুঝে যত রাজ্যের চারণের দল গোয়েন্দার মত সাজপোশাক পরে রঙ্গমঞ্চের উপর হৈ-হৈ করে হাতি খোঁজা শুরু করে দিল।

ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পীরা গোয়েন্দাদের এমন সব ছবি আঁকতে লাগল যাতে দেখান হল, গোয়েন্দারা "স্পাই-গ্লাস" চোখে লাগিয়ে গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়াচ্ছে আর হাতিটা পিছন থেকে এসে তাদের পকেট থেকে আপেল তুলে নিচ্ছে।

গোয়েন্দাদের তকমা (ব্যাজ)-র নানা রকম ব্যঙ্গাত্মক ছবি তারা আঁকতে শুরু করল-গোয়েন্দা-উপন্যাসের মলাটে সোনার জলে ছাপা

সে তকমা আপনারা অবশ্যই দেখেছেন-সেই বিস্ফারিত চোখ আর তার নীচ লেখা, "আমরা কখনও ঘুমোই না।" গলা ভেজাবার জন্য গোয়েন্দারা দোকানে ঢুকলে সুরসিক মালিকটি একটি অপ্রচলিত উক্তি করে বলল, "চোখ খোলার যন্ত্র সঙ্গে আছে তো?" ঘরের বাতাস ঠাট্টা-বিদ্রূপে ভারী হয়ে উঠল।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুর মধ্যেও একটি মানুষ রইল স্থির, অবিচল, অনুদ্বেগ। যেন ওক-কাঠে গড়া হৃদয়। যে মানুষ প্রধান ইন্সপেক্টর। তার সাহসী চোখ দুটি কখনও আনত হল না; তার গম্ভীর আত্মবিশ্বাস এতটুকু কাঁপল না। সে সর্বদাই বলত:

"ওদের চালাতে দিন; যে সকলের শেষে হাসতে পারে সেই তো হাসির রাজা।"

লোকটির জন্য আমার প্রশংসা ক্রমে পূজায় পরিণত হয়েছে। সব সময় তার পাশেপাশেই থাকি। তার আপিসটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল; দিনের পর দিন সে ভাব বেড়েই চলেছে। তথাপি সে যখন সইতে পারছে তখন আমিও সইতে পারব-অন্তত যতদিন পারি। কাজেই নিয়মিত সেখানে যেতাম-বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র আমিই যেতাম। সকলে অবাক হয়ে ভাবত এ কাজ আমি পারছি কেমন করে; এক এক সময় মনে হত, তাকে ছেড়ে যাব, কিন্তু তার সেই শান্ত, আপাত-অচঞ্চল মুখখানি দেখলেই আমার মত বদলে যেত।

হাতি নিরুদ্দেশের তিন সপ্তাহ পরে একদিন সকালে সবে বলতে যাচ্ছি যে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে এবার আমাকে যেতে হবে, এমন সময় সেই মহান গোয়েন্দা আর একটি মোক্ষম চাল দিয়ে আমার সব চিন্তা ভেস্তে দিল।

ডাকাতদের সঙ্গে একটা মিটমাটের প্রস্তাব এল। পৃথিবীর বড় বড় মানুষের সঙ্গে আমার অনেক যোগাযোগ ঘটেছে, কিন্তু এই লোকটির মত আবিষ্কারের উর্বরতা আগে কখনও দেখি নি। সে বলল, তার খুবই বিশ্বাস এক লক্ষ ডলার হলেই সে একটা মিটমাট করে হাতিটাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি বললাম, টেনেটুনে আমি না হয় টাকাটা যোগাড় করলাম, কিন্তু যে গোয়েন্দারা এত খাটা-খাটুনি করল তাদের কি হবে? সে বলল:

"মিটমাটের ক্ষেত্রে তারা সব সময়ই অর্ধেক পেয়ে থাকে।"

আমার একমাত্র আপত্তিও দূর হল। আর ইন্সপেক্টর এই মর্মে দুটো চিরকুট লিখল:

"প্রিয় ম্যাডাম, আমার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করলে আপনার স্বামী প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে (আইনের দিক থেকেও তার সম্পূর্ণ সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে)।

প্রধান ব্লাণ্ট"

নির্ভরযোগ্য পত্রবাহকের হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠাল "ইট" ডাফির "ডাকসাইটে" স্ত্রীর কাছে, আর অপরটি পাঠাল "লাল" ম্যাকফাডেন-এর "ডাকসাইটে" স্ত্রীকে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই দু'খানি মারাত্মক জবাব এল:

"ওরে বুড়ো ভাঁড়: লাল ডাফি তো দু' সন আগেই পটল তুলেছে।"

ব্রিজেট মেহনি

"ধেঁড়ে বাদুর-লাল ম্যাকফাডেন-কে তো ঝুলিয়ে দিয়েছে; এখন ১৮ মাসের ধাক্কা। গোয়েন্দা ছাড়া যে কোন গর্দভই তো তা জানে।

মেরি ও' হুলিগান

"অনেক আগেই আমি সন্দেহ করেছিলাম," ইন্সপেক্টর বলল; "আমার সহজবুদ্ধি যে কত অভ্রান্ত এতেই তা প্রমাণ হল।"

একটা উপায় বিফল হলেই সে আর একটা উপায় বের করে ফেলে। তৎক্ষণাৎ প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের জন্য সে একটা বিজ্ঞাপন লিখে ফেলল। আমি তার একটা নকল রেখে দিলাম:

A.-xwblv, 242 N. Tjnd-fz 328 wmlg, Ozo-2m! ogw, Mum.

সে বলল, চোর যদি বেঁচে থাকে তাহলে এটাই তাকে এই বৈঠকে টেনে আনবে। সে আরও বুঝিয়ে বলল, সাধারণত এ ধরনের বৈঠকে গোয়েন্দা ও অপরাধীরাই তাদের ব্যবসায়িক লেন-দেন করে থাকে। বৈঠক বসবে কাল রাত বারোটায়।

তার আগে আর কিছু করবার নেই। সময় নষ্ট না করে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এ সুযোগ পেয়ে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।

পরদিন রাত এগারোটায় এক লক্ষ ডলারের ব্যাংক নোট নিয়ে প্রধানের হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সে বিদায় নিল; তার চোখে তখনও সেই অকম্পিত আত্মবিশ্বাসের স্থির দীপ্তি। একটি প্রায়-অসহনীয় ঘণ্টা কেটে গেল; তার প্রার্থিত পদশব্দ শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম। দুটি সুন্দর চোখে জয়ের অগ্নিশিখা জ্বলছে! সে বলল:

"মিটমাট হয়ে গেছে! জোকাররা কাল নতুন সুরে গান ধরবে! আসুন আমার সঙ্গে!"

একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে ভূগর্ভস্থ মস্ত বড় ঘরটায় ঢুকল। ষাট জন গোয়েন্দা সেখানে সব সময় ঘুমোয়, আর এখন জন কুড়ি বসে তাস খেলে সময় কাটাচ্ছিল। আমি তার পিছন পিছনই ঢুকলাম। সে দ্রুতপায়ে ঘরের অন্ধকার কোণটায় চলে গেল, আর দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে যন্ত্রণায় আমার মূর্ছা মত অবস্থা ঠিক তখনই একটা প্রচণ্ড কিছুর ভূপাতিত দেহের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে নীচে পড়ে গেল। পড়তে পড়তেই সে চীৎকার করে বলে উঠল:

"আমাদের মহান জীবিকার জয় হয়েছে। এই আপনার হাতি!"

আমাকে আপিস-ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। কার্বলিক এসিড দিয়ে আমার মূর্ছা ভাঙানো হল। গোটা গোয়েন্দা বাহিনী এসে ঘরের মধ্যে ভিড় করল, আর এমন বিজয়োৎসব শুরু করে দিল যেমনটি আগে কখনও দেখি নি। সংবাদপত্রের লোকদের ডাকা হল, শ্যাম্পেনের বাক্সের পর বাক্স খুলে দেওয়া হল, সকলের স্বাস্থ্য পান হল, আর অবিরাম গতিতে চলল সোৎসাহ করমর্দন ও অভিনন্দন। স্বভাবতই গোয়েন্দা-প্রধানই হল উৎসবের নায়ক; তার খুসি এতই পরিপূর্ণ এবং এত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সার্থকভাবে অর্জিত যে তা দেখে আমার ভালই লাগল; অবশ্য আমি তখন একটি গৃহহীন ভিক্ষুকের মত সেখানে দাঁড়িয়ে; আমার অমূল্য হাতিটি মৃত; আর একটি মহান দায়িত্ব পালনে মারাত্মক অসতর্কতার ফলস্বরূপ দেশের সেবায় আমার মর্যাদা একেবারেই ভূলুণ্ঠিত। বহু চোখের সবাক দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছে তাদের প্রধানের প্রতি ঐকান্তিক প্রশংসা, অনেক গোয়েন্দার কণ্ঠেই ধ্বনিত হচ্ছে একটি বাণী, "ওঁর দিকে তাকাও-আমাদের জীবিকার ক্ষেত্রে উনি তো রাজা; শুধু একটি সূত্র ধরিয়ে দাও, সেটাই শুধু তার দরকার, তাহলেই যা কিছু লুকনো থাকে সব তিনি টেনে বের করবেন।" বেশ আনন্দের সঙ্গেই পঞ্চাশ হাজার ডলারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল। নিজের অংশটা পকেটে ভরতে ভরতে প্রধান একটি ছোট বক্তৃতায় বলল, "তোমরা আনন্দ কর হে, এটা তোমরা অর্জন করেছ; তার চাইতেও বড় কথা, গোয়েন্দা-বৃত্তির জন্য তোমরা জয় করে এনেছ মৃত্যুহীন খ্যাতি।"

একটা টেলিগ্রাম এল; তাতে লেখা:

মন্‌রো, মিচ্‌, রাত ১০টা

তিন সপ্তাহেরও বেশী হয়ে গেল এই প্রথম আমি টেলিগ্রাফ-আফিসের দরজায় পা ফেললাম। ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের পথে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এখান থেকে হাজার মাইল ছুটেছি; প্রতিদিনই ছাপগুলির গভীরতর, বৃহত্তর ও আগের চাইতে তাজা দেখতে পেয়েছি। দুশ্চিন্তা করবেন না-আর এক সপ্তাহের মধ্যেই হাতিকে পেয়ে যাব। একথা মোক্ষম সত্য।

ডার্লি, গোয়েন্দা

"ডার্লি আমাদের বাহিনীর একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন" এই কথা উচ্চারণ করে তিনবার তার জয়ধ্বনি করে গোয়েন্দা-প্রধান হুকুম দিল, তাকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হোক, সে যেন বাড়ি এসে তার পুরস্কারের অংশটা নিয়ে নেয়।

হাতি চুরির বিস্ময়কর কাহিনী এইভাবে শেষ হল। পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে আর একপ্রস্থ প্রশংসা-বাণী প্রকাশ করা হল; ব্যতিক্রম শুধু একটি নগণ্য সংবাদপত্র। তাতে লেখা হল, "গোয়েন্দাপ্রবর মহান! একটা হারানো হাতিকে খুঁজে বের করতে হয়তো তার একটু বিলম্ব ঘটেছে-তিন-তিনটে সপ্তাহ ধরে তিনি হয় তো সারাদিন তাকে খুঁজেছেন তার সারাটা রাত তার গলিত শবের সঙ্গে কাটিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করবেনই-অবশ্য যে লোক হাতিটাকে সরিয়েছিল সে যদি এসে জায়গাটা তাকে দেখিয়ে দেয় তবেই!"

বেচারি হাসানকে আমি চিরদিনের মত হারালাম। কামানের গোলা তাকে মারাত্মকভাবে জখম করেছিল, কুয়াসার মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় সে ঢুকে পড়েছিল, আর সেখানেই শত্রু পরিবৃত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়বার আশংকার মধ্যে ক্ষুধায় ও যন্ত্রণায় তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে শান্তি লাভ করেছে।

মিটমাট করতে আমার ব্যয় হয়েছে এক লক্ষ ডলার; গোয়েন্দাদের দরুন ব্যয় হয়েছে আরও বিয়াল্লিশ হাজার ডলার; আর কখনও আমি সরকারের কাছে চাকরির জন্য আবেদন করি নি; আমার সর্বস্ব গেছে; পৃথিবীর পথে আজ আমি পথিক-কিন্তু যে লোকটিকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বলে বিশ্বাস করি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আজও অম্লান আছে এবং শেষ পর্যন্ত থাকবে।

১৮৮২

একটি ভূতের গল্প

A Ghost Story

ব্রড ওয়ে ধরে অনেকদূর গিয়ে একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ির একটা বড় ঘর আমি নিয়েছিলাম। আমি আসবার অনেক বছর আগে থেকেই বাড়িটার উপরের তলাগুলো সম্পূর্ণ খালি পড়ে ছিল। বাড়িটাকে যেন ধূলো আর মাকড়শার জাল, নির্জনতা ও নীরবতার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম যেদিন সিঁড়ি বেয়ে আমার ঘরে উঠলাম, মনে হল আমি বুঝি গোরস্থানের ভিতর দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের গোপনতাকে আক্রমণ করতে চলেছি। জীবনে এই প্রথম একটা কুসংস্কারগত ভয় আমাকে পেয়ে বসল; সিঁড়ির একটা অন্ধকার কোণে মোড় নিতেই একটা অদৃশ্য মাকড়শার জালের সূক্ষ্ম তন্তুগুলো যখন আমার মুখের উপর ঝুলে পরে সেখানে লেগে রইল, তখন আমি যেন ভূত দেখার মত শিউরে উঠলাম।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সেই অপচ্ছায়া ও অন্ধকারকে বিদায় করে তবে স্বস্তি পেলাম। চুল্লিতে আরামপ্রদ আগুন জ্বলছিল; আরামের নিঃশ্বাস ফেলে তার সামনে বসে পড়লাম। দু'ঘণ্টা সেখানে বসে অতীতের কথা ভাবতে লাগলাম; মনে পড়ল কত অতীতের দৃশ্য; অতীতের কুয়াসা ভেদ করে ফুটে উঠল কত আধ-ভোলা মুখ; কল্পনায় শুনতে পেলাম সেই সব কণ্ঠস্বর যা অনেকদিন আগেই চিরকালের মত নীরব হয়ে গেছে, আর সেই সব পরিচিত গান যা এখন আর কেউ গায় না। আমার জাগ্রত-স্বপ্ন যখন ধীরে ধীরে করুণ থেকে করুণতর সুরে নেমে গেল, তখন বাইরের ঝড়ের হাহাকার পরিণত হল মৃদু বিলাপে, জানালার কাঁচের উপরে বৃষ্টির ক্রুদ্ধ আঘাত অস্ফুট মৃদু শব্দে পরিণত হল, রাস্তার সব শব্দ একে একে থেমে গেল, এবং সর্বশেষ বিলম্বিত পথিকের দ্রুত পদশব্দও দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল; কোথাও একতি শব্দ রইল না।

আগুনটা নিভে আসছে। একটা নির্জনতাবোধ যেন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। উঠে পোশাক ছাড়লাম, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করলাম পা টিপে টিপে, যা কিছু করছি সবই চুপি চুপি; যেন আমার চারপাশে এমন সব শত্রুরা ঘুমিয়ে আছে যাদের ঘুম ভাঙালে মারাত্মক বিপদ ঘটবে। বিছানায় শুয়ে পড়লাম; শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের গর্জন ও অনেক দূরের সব জানালা বন্ধ করার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম তা জানি না। হঠাৎ দেখি ঘুম ভেঙে গেছে। আর একটা রোমহর্ষক প্রত্যাশায় বুকটা ভরে উঠেছে। চারদিক স্তব্ধ। শুধু আমার বুকের ভিতরটা ছাড়া-সেখানে হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিছানার চাদরগুলো পায়ের দিকে নেমে যেতে লাগল, যেন কেউ সেগুলিকে ধরে টানছে! আমি নড়তে পারছি না; কথা বলতে পারছি না। কম্বলগুলো তখনও নেমে যাচ্ছে; আমার বুক পর্যন্ত খোলা হয়ে পড়ল। তখন অনেক চেষ্টায় সেটাকে চেপে ধরে মাথার উপর পর্যন্ত টেনে দিলাম। অপেক্ষা করে রইলাম, কান পাতলাম। অপেক্ষা করেই আছি। আবার সেই টান শুরু হল; একশ' সেকেণ্ড ধরে আবার আমি জড়বৎ পড়ে রইলাম; শেষ পর্যন্ত আবার আমার বুক পর্যন্ত খোলা হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করে কম্বলটাকে যথাস্থানে টেনে এনে শক্ত হাতে চেপে ধরে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার একটা আল্‌তো টান অনুভব করলাম; সঙ্গে সঙ্গে মুঠোটাও শক্ত করলাম। আল্‌তো টান ক্রমে জোরদার হতে লাগল-আরও, আরও জোরদার হল। আমার হাত থেকে খসে গিয়ে এই তৃতীয়বার কম্বলটা পড়ে গেল। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। বিছানার পায়ের দিক থেকে জবাবে আর একটা আর্তনাদ উঠল। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল। আমি তখন যেটুকু বেঁচে আছি, মরে গেছি তার চাইতে বেশী। ইতিমধ্যে ঘরের ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম-মনে হল, একটা হাতির পা-মানুষের পায়ের মত মোটেই নয়। তবে শব্দটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে-এই যা ভরসা। শুনতে পেলাম, শব্দটা দরজার কাছে গেল, হুড়কো বা তালা না খুলেই বেরিয়ে গেল, দালান ও কড়িকাঠ নাড়াতে নাড়াতে দালান পার হয়ে গেল-আবার সেই স্তব্ধতা নেমে এল।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে নিজে নিজেই বললাম, "এটা স্বপ্ন-একটা বীভৎস স্বপ্নমাত্র। এই কথা ভাবতে ভাবতে একসময় দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে সত্যি এটা স্বপ্নই ছিল; তখন একটা সুখকর হাসিতে আমার ঠোঁট দুটি ভরে উঠল; আবার খুসি হয়ে উঠলাম। উঠে একটা আলো জ্বালালাম; হুড়কো ও তালা যেমন ছিল তেমনই আছে; আর একটা স্বস্তির হাসি বুকের মধ্যে উথলে উঠে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। পাইপটা তুলে নিয়ে ধরালাম। তারপর আগুনের সামনে বসবার উপক্রম করতেই-আমার কাঁপা আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাইপটা নীচে পড়ে গেল, গাল থেকে উবে গেল সব রক্ত, আঁতকে উঠতেই আমার শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসও থেমে গেল! অগ্নিকুণ্ডের পাশে ছাইয়ের উপর আমার পায়ের ছাপের পাশাপাশি আর একটা পায়ের ছাপ-ছাপটা এত বড় যে তার তুলনায় আমার পায়ের ছাপটা যেন

কোন শিশু র! তাহলে সত্যি অতিথি এসেছিল; আর হাতির পায়ের শব্দের ব্যাপারটাও বোঝা গেল।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ভয়ে অবশ দেহ নিয়ে বিছানায় ফিরে গেলাম। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান পেতে রইলাম। মেঝের উপর দিয়ে কোন ভারী দেহকে নেবার মত একটা ঘস্-ঘস্ আওয়াজ মাথার উপর শুনতে পেলাম; তারপর দেহটাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, আর তার ধাক্কায় আমার জানালাগুলো কেঁপে উঠল। বাড়িটার দূরবর্তী অংশগুলোতে সশব্দে দরজা বন্ধকরার শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরে পরেই শুনতে পেলাম, চুপি চুপি পায়ে কেউ যেন দালান দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, আর বেরিয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর নামছে। কখনও বা সেই শব্দ আমার দরজার কাছে এসে একটু ইতস্তত করে আবার চলে যাচ্ছে। দূরবর্তী দালান-পথে শিকলের অস্পষ্ট ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনতে পেলাম, কান পাতলাম; ঝন্-ঝন্ শব্দ কখনও এগিয়ে আসছে-কখনও শ্রান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে; অপদেবতার প্রতিটি পদক্ষেপের তালে তালে বাড়তি শিকলের ঝন্-ঝন্ শব্দ হচ্ছে। কিছু অস্পষ্ট কথাও কানে এল; অর্ধ-উচ্চারিত কিছু আর্তনাদকে যেন জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হল; অদৃশ্য পোশাকের খস্-খস্ শব্দ, অদৃশ্য পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ। তখন মনে হল, কেউ আমার ঘরটাকে আক্রমণ করেছে-এখানে আমি একা নই। আমার বিছানাকে ঘিরে দীর্ঘশ্বাস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ; রহস্যময় ফিস্ফিস্ কথা। ঠিক মাথার উপরে দেখতে পাচ্ছি সিলিং-এর গায়ে নরম প্রস্ফুরক আলোর তিনটি ছোট বৃত্ত; মুহূর্তকাল সেখানে জ্বলতে জ্বলতে ঝুলে রইল, তারপর নীচে পড়ে গেল-দুটো আমার মুখের উপর, আর একটা বালিশের উপর। তরল পদার্থের মত চট্চট্ করতে লাগল, গরম লাগল। আমার মন বলল, সেগুলো রক্তের ডেলা-আলো জ্বালিয়ে সেগুলো দেখার দরকারও বোধ করলাম না। তারপরই দেখলাম কতকগুলি অনুজ্জ্বল পাণ্ডুর মুখ, উর্দ্ধে তোলা সাদা হাত, বিদেহী অবস্থায় বাতাসে ভাসছে; তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল। সব ফিসফিসানি, সব কণ্ঠস্বর, সব শব্দ থেমে গেল। নেমে এল নিস্তব্ধতা। কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে হল, আলো দেখতে না পেলে আমি মরে যাব; ভয় আমাকে দুর্বল করে তুলেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। মুখের উপর একটা চটচটে হাতের ছোঁয়া লাগল। আমার সব শক্তি নিমেষে উধাও হয়ে গেল; আহত পঙ্গুর মত বিছানায় পড়ে গেলাম। তখন পোশাকের খস্খস্ শব্দ শুনতে পেলাম-মনে হল সেটা দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আবার সব কিছু শান্ত হলে রুগ্ন, দুর্বল দেহ নিয়ে গুড়ি মেরে বিছানা থেকে নামলাম; গ্যাসটা জ্বালাতে হাত কাঁপতে লাগল একশ' বছরের বুড়োর মত। আলো দেখে মনে কিছুটা বল ফিরে এল। আসনে বসে ছাইয়ের উপরকার বড় বড় পায়ের কথাই যেন স্বপ্নের ঘোরে ভাবতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সব কিছু কেমন ঝাঁপসা হয়ে এল। চোখ তুলে তাকালাম; গ্যাসের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই হাতির পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সেটা আসছে-কাছে, আরও কাছে, ছাতা-পরা হল-ঘর পেরিয়ে; সেটা যত কাছে আসছে ঘরের আলো ততই ম্লান হতে ম্লানতর হচ্ছে। পায়ের শব্দ আমার দরজার কাছে এসে থামল-আলো কমতে কমতে একটা ঈষৎ নীল রঙে রূপান্তরিত হল; আমার চারপাশে সব কিছু যেন একটা ভৌতিক গোধূলির আলোয় আচ্ছন্ন। দরজা খোলে নি, অথচ বাতাসের একটা মৃদু ঝলক এসে আমার গালে লাগল; আমার সামনে এসে দাঁড়াল একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়াটে দেহ। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখতে লাগলাম। একটা পাণ্ডুর আভা জিনিসটার উপর ছড়িয়ে পড়ল; ধীরে ধীরে সেই ধোঁয়া আকার গ্রহণ করল-একটা হাত দেখা দিল, তারপর দুটি পা, তারপর শরীর এবং সকলের শেষে বাষ্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানি বিষণ্ণ মুখ। জালের বাসা থেকে মুক্ত হয়ে মহামান্য "কার্ডিফ্ দানব"তার পেশীবহুল সুন্দর উলঙ্গ দেহ নিয়ে আমার মাথার উপরে দেখা দিল!"

আমার সব দুঃখ অন্তর্হিত হল-কারণ একটি শিশুও জানে যে এই সদয় মুখ কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না। আমার মনের খুসির ভাব তৎক্ষণাৎ ফিরে এল, আর তার সঙ্গে মিল রেখেই বুঝি গ্যাসের আলোটা আবার উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠল। এই দানব বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমি যত খুসি হলাম, কোন নির্জন সমাজ পরিত্যক্ত মানুষই সঙ্গ লাভ করে তত খুসি হয় না।

"আরে, এ সব তাহলে তুমি ছাড়া কেউ নয়? তুমি কি জান, দু' তিন ঘণ্টা ধরে আমি ভয়ে মরতে বসেছিলাম? তোমাকে দেখে সত্যি খুব ভালো লাগছে। আহা, একটা এমন চেয়ার যদি থাকত-এখানে,ওটার মধ্যে বসতে চেষ্টা করো না!"

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি বাধা দেবার আগেই সে ওটার মধ্যে ঢুকতেই ওটা সবেগে নীচে নেমে গেল-জীবনে কখনও একটা চেয়ারকে ও ভাবে খান্-খান্ হয়ে ভেঙে যেতে আমি দেখি নি।"

"থাম, থাম, তুমি তো সব কিছু ধ্বংস-"

আবার অনেক দেরী। আবার একটা শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চেয়ার ভেঙে খান্-খান্।

"কী আশ্চর্য! তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিচ্ছু নেই? তুমি কি এখানকার সব আসবাবপত্র ভেঙে ফেলতে চাও? এখানে, এখানে, ওরে কাঠ মুখ্খু-"

কিন্তু সবই বৃথা। আমি ধরে ফেলবার আগেই সে বিছানার উপর বসে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা শোচনীয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

"আচ্ছা, এটা কি রকম আচরণ তোমার? প্রথমে তো ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে একগাদা ভবঘুরে ভূতকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে ভয়ে আধ-মরা করে ফেললে; তার পরে এমন অশালীন পোশাক পরে এলে যা একমাত্র সম্ভ্রান্ত রঙ্গমঞ্চ ছাড়া অন্য কোন সভ্য সমাজই বরদাস্ত করত না, এমন কি ঐ উলঙ্গ-বাহার বেশ যদি তোমার জাতির হত তাহলে সেটাও তারা বরদাস্ত করত না, তবু যাহোক করে আমি যেই সেটাকেও মেনে নিলাম অমনই তুমি তার প্রতিদানে বসবার মত যে আসবাব পাচ্ছ সেটাকেই ভেঙে চুরমার করে ফেলছ? কেন এ রকম করছ? যেমন নিজের ক্ষতি করছ, তেমনই আমারও ক্ষতি করছ। তোমার শিরদাঁড়ার শেষ প্রান্তটা ভেঙেছ; জংঘাস্থিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে এমনভাবে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে যে, একটা শ্বেত পাথরের উঠোনের মত দেখাচ্ছে। এর জন্য তোমার যে লজ্জিত হওয়া উচিত-সেটা বুঝবার মত বয়স তোমার হয়েছে।"

"আচ্ছা, আর কোন আসবাব ভাঙব না। কিন্তু আমিই বা কি করব? একটা শতাব্দী ধরে একটু বসবার ফুরসুৎ পেলাম না।" তার চোখে জল এসে গেল।

আমি বললাম, "আহা বাছারে, তোমার প্রতি এতটা কঠোর হওয়া আমার উচিত হয় নি। হাজার হোক, তোমার বাপ-মা নেই। তবে এখানে মেঝেতে বস-আর কোন কিছুই তো তোমার ভর সইবে না-আর তাছাড়া, মাথার উপরে ওখানে বসে থাকলে তো তোমার সঙ্গে আমরা মিশতে পারব না; তাই আমার ইচ্ছা তুমি এখানে নীচে বস, তাহলেই ঐ উঁচু টুলটার উপর উঠে আমি তোমার মুখোমুখি বসে গল্প করতে পারব।"

সে মেঝেতে বসে পড়ল। আমার দেওয়া চুরুট ধরিয়ে আমার লাল কম্বলটা গলার জড়িয়ে নিল এবং আমার স্নানের গামলাটাকে উল্টো করে শিরস্ত্রাণের মত মাথায় চাপিয়ে নিজেকে একটি দেখবার মত আরামদায়ক জীব করে তুলল। তারপর হাঁটু দুটো ভেঙে তার মৌচাকের মত গর্তওয়ালা অদ্ভুত পায়ের পাতা দুটোকে গরম করবার জন্য আগুনের দিকে মেলে ধরল।

"তোমার পায়ের পাতা ও পায়ের পিছন দিকটা ও রকম গর্ত আর কাটাকাটা কেন?"

"ও তো নারকীয় শীতের ফাটা-নিউয়েল-এর গোলাবাড়িতে বিশ্রাম করতে গিয়ে মাথার পিছন দিকটা পর্যন্ত সবটা শরীর ঐ ভাবে ফেটে গেছে। তবু জায়গাটা আমার খুব পছন্দ; লোকে যেমন নিজের পুরনো বাড়ি ভালবাসে, আমিও তেমনই ওই জায়গাটাকে ভালবাসি। সেখানে থেকে যে শান্তি পাই তেমন শান্তি আর কোথাও নেই।"

এইভাবে আধ-ঘণ্টা গল্প করবার পরে আমার মনে হল তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সেও সেই কথাই বলল।

"ক্লান্ত? তা হবে। এবার তোমাকে সব কথা বলব, কারন তুমি আমার সঙ্গে বড় ভাল ব্যাবহার করেছে। রাস্তার ওপাশে যাদুঘরে যে "প্রস্তরীভূত মানুষ"টি আছে আমি তারই আত্মা। আমি"কার্ডিফ দনব" -এর ভূত। ওই দেহটিকে যতদিন কবর না দিচ্ছে ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। মানুষ যাতে আমার এই মনোবাসনা পূরণ করে সে জন্য আমার কি করা স্বাভাবিক বল? ভয় দেখিয়ে তাদের এ কাজে বাধ্য করা -দেহটা যেখানে আছে সেখানেই ভয় করা! তাই তো রাতের পর রাত আমি যাদুঘরের উপরে ভয় করছি। অন্য সব ভুতদের সাহায্যই আমি পেয়েছি। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। কারন মাঝরাতে কেউ যাদুঘরে আসে না। তখন মনে হল, পথের মাঝখানে এই জায়গাটাতে একটু ভর করলে মন্দ হয় না। মনে হল, আমার কথাগুলি যদি কাউকে শোনাতে পারি, তাহলেই কাজ ফতে করতে পারব, কারণ পরোলোকে এসে আমি খুব ভাল সঙ্গীসাথী পেয়েছি। রাতের পর রাত আমরা এই ছাতা-পরা হল-ঘরের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে বেড়িয়েছি, পায়ের শিকল টেনে টেনে চলেছি, আর্তনাদ করেছি, ফিস্ফিস্ করে কথা বলেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি আর নেমেছি, আর তাতেই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আজ রাতে যখন তোমার ঘরে আলো দেখতে পেলাম, তখন নতুন উদ্যম নিয়ে

নবীন উৎসাহে কাজে নেমে পড়লাম। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত-শ্রান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছি। তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে কিছুটা আশা দাও!"

উত্তেজনায় আমার আসন থেকে ছিটকে পড়ে আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম: "এ যে ভয়ংকর বাড়াবাড়ি! এ রকমটা তো কখনও ঘটে নি! আরে ভুল-সর্বস্ব বুড়ো জীবাশ্ম, তোমার সব পরিশ্রম যে জলে গেছে-তুমি তো ভর করেছ তোমার একটা প্লাস্টারের মূর্তির উপর-আসল "কার্ডিফ দানব" তো রয়েছে আলবানী-তে*। এমন ভুলটা করলে তুমি? তোমার নিজের দেহাবশেষকেও তুমি চেন না?"

কারও মুখে এতখানি লজ্জা ও শোচনীয় অপমানের দৃষ্টি আমি আগে কখনও দেখি নি।

"প্রস্তরীভূত মানুষ"টা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল; বলল:

"ঠিক করে বল তো, এ কথা সত্য?"

"আমি যেমন এখানে বসে আছি সেই রকম সত্য!"

মুখ থেকে পাইপটা নিয়ে সে ম্যান্টেল-এর উপর রাখল, এক মুহূর্ত ইতস্তত করল (পুরনো অভ্যাসমত নিজের অজ্ঞাতেই যেখানে পাতলুনের পকেট থাকবার কথা সেখানে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল) এবং শেষ পর্যন্ত বলল:

"দেখ, এত অদ্ভুত আমার কখনও লাগে নি। "প্রস্তরীভূত মানুষ" সবাইকে বিক্রি করেছে, কিন্তু এবার দেখছি তার নীচে ফাঁকিবাজী এতদূর নেমে গেছে যে শেষ পর্যন্ত সে নিজের প্রেতাত্মাকেও বিক্রি করে দিয়েছে। দেখ বাবা, আমার মত একটি অসহায় বন্ধুহীন প্রেতাত্মার জন্য তোমার হৃদয়ে যদি এতটুকু করুণা থাকে তাহলে আজকের এই ঘটনা কখনও প্রকাশ করো না। ভাব তো, নিজে যদি নিজেকে এভাবে বোকা বানাতে তাহলে তোমার মনের ভাবটা কি হত।"

তার রাজকীয় পদশব্দ এক ধাপ এক ধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পরিত্যক্ত রাজপথে মিলিয়ে গেল। বেচারি! সে চলে যাওয়াতে আমার দুঃখ হল-আরও দুঃখ হল এই জন্য যে সে আমার লাল কম্বল ও স্নানের গামলাটাও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

**এটা ঘটনা। মূল নকল মূর্তিটা থেকে সুকৌশলে আর একটা নকল মূর্তি তৈরি করে সেটাকেই "একমাত্র আসল" কার্ডিফ-দানব হিসাবে নিউ ইয়র্ক-এ প্রদর্শিত হয়েছিল, আর ঠিক সেই একই সময়ে আলবনী-র যাদুঘরেও সে মূর্তি প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করেছিল।*

১৮৮৮

ভাগ্য
Luck

*[**এটা কোন কাল্পনিক চিত্র নয়। চল্লিশ বছর আগে উলউইচ-এ শিক্ষক ছিলেন এ রকম একজন পাদরির কাছে এটা আমি পেয়েছি, আর তিনি শপথ নিয়ে বলছেন যে এটা সত্য ঘটনা।]*

এ যুগের দু'জন বা তিনজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংরেজ সামরিক বিভাগীয় ব্যক্তির অন্যতম একজনের সম্মানে আয়োজিত লণ্ডনের একটি ভোজসভায় ব্যাপারটা ঘটেছিল। কোন কারনে (কারণটা অচিরেই প্রকাশ পাবে) তার আসল নামও খেতাব উহ্য রেখে আমি তাকে বলল লেফ্‌টেন্যাণ্ট-জেনারেল লর্ড আর্থার স্কোর্স বি, ওয়াই সি., কে. বি., ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। একটি বিখ্যাত নামের কী আর্কষণ! রক্ত-মাংসের আসল মানুষটি বসে আছে। ত্রিশ বছর আগে ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ যেদিন তার নামটা একেবারে তুঙ্গে উঠেছিল সেদিন থেকে হাজার হাজার বার তার নামটা আমি শুনেছি। সে নাম চিরদিনই বিখ্যাত হয়ে থাকবে ঐ অর্দ্ধ-ঈশ্বরের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকা যেন আমার ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার জল; ভাল করে দেখা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, দেখা আর লিখে রাখা: ঐ প্রশান্তি, ঐ সংযম, মুখের ঐ মহৎ গাম্ভীর্য; যে সরল সাধুতা তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে তা; স্বীয় মহত্ত্ব সম্পর্কে তার মধুর উদাসীনতা-তার উপর নিবদ্ধ শত শত ভক্তের দৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীনতা, ঐ সব লোকের বুকের ভিতর থেকে স্বতঃ উৎসারিত ঐকান্তিক পূজার প্রবহমান স্রোত সম্পর্কে উদাসীনতা।

আমার বাঁ দিকে যে পাদরিটি বসে আছে সে আমার অনেক দিনের পরিচিত-এখন পাদরি বটে, কিন্তু জীবনের প্রথম অর্ধেকটা কাটিয়েছে শিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রে এবং উলউইচ সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে। এই মুহূর্তে আমি যখন কথা বলছি তখন তার চোখে একটা অদ্ভুত আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল; ভোজসভার নায়কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটু ঝুঁকে পড়ে আমার কানে বলতে লাগল:

"গোপনে বলছি-এই লোকটি একটি মহামূর্খ!"

তার কথা শুনে অবাক হলাম। তার বক্তব্যের লক্ষ্য যদি নেপোলিয়ন, বা সক্রেটিস, বা সলোমন হত, তাহলেও আমি এর চাইতে বেশী অবাক হতাম না। দুটি বিষয় আমি খুবই সচেতন: মাননীয় ভদ্রলোকটি কঠোর সত্যবাদী, এবং মানুষ সম্পর্কে তার ধারনা আভ্রান্ত। আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম যে আজকের নায়ক সম্পর্কে মানুষের ধারনাটা ভুল: সে একটি বোকা লোক। কাজেই তখন ভাবলাম, নিজে নিঃসঙ্গ, নির্জনে যাপন করলেও এই গোপন তথ্য সে কি করে সংগ্রহ করল, সুযোগ মত সে খবরটা পাদরি মশায়ের কাছে থেকে জেনে নিতে হবে।

কয়েকদিন পরেই সুযোগটা এল, আর পাদরি আমার এই কথাগুলি বলল:

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি ছিলাম উলউইচ-এর সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তরুণ স্কোর্সবি-র যখন প্রথামিক পরীক্ষা চলছিল তখন আমি একটা বিভাগে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন সত্যি আমার করুণা হয়েছিল, কারণ ক্লাসের আর সমস্ত চটপট সুন্দর উত্তর দিল, কিন্তু সে-আরে, বলতে গেলে সে তো কিছুই জানতে না। ছেলেটি এমনিতে সৎ, মিষ্টি, মনের মত ও সরল; কাজেই সে যখন পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এবং এমন সব জবাব দিতে লাগল যেগুলি বোকামি ও অজ্ঞানতার চরম পরাকাষ্ঠা, তখন তাকে দেখে সত্যি কষ্ট হয়েছিল। তার জন্য অনুকম্পায় আমার মনটা গলে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবলাম, আবার যখন তার পরীক্ষা শুরু হবে তখন তো সে চিৎপটাং হবেই; কাজেই তার সেই অবধারিত পতনকে যদি একটু মোলায়েম করে দিতে পারি তো তাতে কারও কোন ক্ষতি হবে না। তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে দেখলাম যে সিজারের ইতিহাসটা তবু সে খানিকটা জানে, আর কিছুই জানে না। তাই সিরাজ সম্পর্কে যে ধরনের বাঁধা প্রশ্ন সাধারণতই পরীক্ষায় কার হয়ে থাকে আমি বিশেষ যত্ন নিয়ে সেগুলিই তাকে পাখি পড়ার মত করে শিখিয়ে দিলাম। আপনি কি বিশ্বাস করবেন, পরীক্ষার দিন সেই ছেলে কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়ে গেল! স্রেফ পাখি-পড়া বিদ্যা নিয়ে সে পাশ করল, প্রশংসাও পেল, আর অন্য যারা তার চাইতে হাজার গুণ বেশী জানে তারা ফেল করে বসল। এমনই অদ্ভুত তার ভাগ্য-তেমন ভাগ্য এক শতাব্দীতে দু'বার ঘটে না-যে তাকে শেখানো বুলির বাইরে একটা প্রশ্নও তাকে করা হল না।

ঘটনাটা হতবুদ্ধিকর। দেখুন, একটি পঙ্গু ছেলের প্রতি মায়ের মনে যে মমতা থাকে সেই মনোভাব নিয়ে পুরো পাঠক্রমটায় আমি তাকে

সাহায্য করে গেলাম; সব ক্ষেত্রেই সে উদ্ধার পেয়ে গেল-স্রেফ অলৌকিক ভাগ্যের জোরে।

অবশ্য আমি জানতাম, শেষ পর্যন্ত গণিতের বেলায়ই তার সব বিদ্যা ধরা পড়ে যাবে, সে মারা পড়বে। স্থির করলাম, তার মৃত্যুটাকে যতটা সহজসাধ্য করা যায় চেষ্টা করে দেখব; কাজেই আমি তাকে নিয়ে শুরু করে দিলাম যে ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষকরা সাধারণত করে থাকেন তাই নিয়ে অনুশীলন আর পাখি-পড়ানো, পাখি-পড়ানো আর অনুশীলন, আর তারপরে তাকে ছেড়ে দিলাম ভাগ্যের হাতে। ভাবুন তো স্যার, ফলটা কি হল: আমাকে হতবাক করে দিয়ে সে প্রথম পুরস্কারটি বাগিয়ে নিল! তাই তাই নিয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর সে কি হিড়িক!

ঘুম? একটা পুরো সপ্তাহ আমি ঘুমুতে পারলাম না। দিনরাত বিবেক আমাকে দংশন করতে লাগল। আমি যা করেছি করুণাপরবশ হয়েই করেছি, বেচারির পতনটাকে একটু সহনীয় করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু যা ঘটল সে রকম ভয়ংকর ফলাফলের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। নিজেকে ফ্রাংকেন্স্টিনের মতই দোষী ও শোচনীয় মনে হতে লাগল। একটা কাঠের মাথাকে আমি তো উজ্জ্বল ভিবষ্যৎ ও গুরু দায়িত্বের পথে তুলে দিলাম। কিন্তু এর ফলে তো এও হতে পারে: প্রথম সুযোগেই সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে সে একেবারে পপাত ধরণীতলে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সবে বেঁধেছে। নিজের মনেই বললাম, যুদ্ধ তো বাঁধতেই হবে। শান্তি বজায় রেখে তো ধরা পড়বার আগে এই গাধাটাকে আমরা মরবার একটা সুযোগ দিতে পারতাম না। একটা ভূমিকম্পের জন্যই আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। ভূমিকম্প এল। কিন্তু যখন এল তখন আমারই মুণ্ডু ঘুরে গেল। একটি যুদ্ধযাত্রী সেনাবাহীনীতে তার ক্যাপ্টেন হবার খবর গেজেট-এ ছাপা হল। সেনাদলের অনেক ভাল লোককে ঐ পদে উঠতে বুড়ো হয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলতে হয়। অথচ এ রকম অপরিপক্ক ও অনুপযুক্ত কাঁধে যে এত বড় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে তা আগে কে জানত? তাকে যদি একজন পতাকাবাহী সৈনিক করা হত তাও না হয় সইতে পারতাম; কিন্তু একেবারে ক্যাপ্টেন-ভাবুন তো! মনে হল আমার সব চুল সাদা হয়ে যাবে।

ভাবুন তো আমি কি করলাম-এই আমি যে বিশ্রাম করতে ও নিষ্কর্মা থাকতেই এত ভালবাসে। নিজেকে বললাম, এর জন্য দেশের কাছে আমিই দায়ী, আর তাই তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যতটা পারি তার হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। তাই অনেক বছর ধরে অনেক খাটুনি খেটে অনেক কষ্ট করে পয়সা বাঁচিয়ে যৎসামান্য যে অর্থ আমি সঞ্চয় করেছিলাম সেটা হাতে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে গিয়ে তার সেনাবাহিনীতেই একজন পতকাবাহী সৈনিকের চাকরি প্রায় কিনে ফেললাম এবং দু'জনে একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে পা বাড়ালাম।

আর সেখানে-আরে মশায়, সে কী ভয়ংকর অবস্থা। ভুল?-আরে, সে তো ভুল ছাড়া আর কিছুই করে নি। কিন্তু লোকটার গোপন কথা তো কেউ জানত না। সকলই ভুল করে তার উপরেই আলো ফেলত, আর প্রতিবারই তার কাজকর্মের ভুল ব্যাখ্যা করত। ফলে তার বোকা-বোকা ভুলগুলোকে তার প্রতিভার প্রকাশ বলে মনে করত। ভাল মনেই তারা তা করত! তার অতি ছোটখাট ভুলও যে কোন লোককে কাঁদিয়ে তুলতে যথেষ্ট; সেগুলি সত্যি সত্যি আমাকে কাঁদিয়েই ছাড়ত-গোপনে তা নিয়ে আমি রেগে কাঁই হতাম। আর সে সব ভাবসাব দেখে ভয়ে আমার ঘাম ঝড়ত তা হল-যত সে নতুন নতুন ভুল করে চলল ততই তার সুনাম বাড়তে লাগল! নিজেকে বললাম, একদিন সে এত উঁচুতে উঠবে যে সব কথা যেদিন ফাঁস হয়ে যাবে সেদিন তার পতন হবে আকাশ থেকে সূর্যটারই ছিটকে পড়ার মত।

সে এগিয়েই চলল; উন্নতির ধাপের পর ধাপ পরিয়ে, তার উর্দ্ধতন অনেক অফিসারের মৃতদেহকে মাড়িয়ে। তারপর একদিন-যুদ্ধের চরম মুহূর্তে আমাদের কর্ণেলের পতন হল, আর আমার বুকটা কেঁপে উঠল, কারণ পদাধিকারের দিক থেকে তারপরেই স্কোর্সবির স্থান। বললাম, এবার সময় হয়েছে; দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা শেওল-এ নামতে পারব।

ভীষণ লড়াই চলছে; মিত্রপক্ষ রণক্ষেত্রের সর্বত্রই ধীরে ধীরে হটে যাচ্ছে। আমাদের বাহিনীর অবস্থানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এখন একটা ভুলের অর্থই ধ্বংস। সেই সংকট মুহূর্তে সেই চিরকালের মূর্খ লোকটি করল কি-সেনাবাহিনীকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে নিকটবর্তী এমন একটা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবার হুকুম দিল যেখানে একটি শত্রুসৈন্যও থাকবার কথা নয়! নিজেকে বললাম, "এবার হয়ে গেল! শেষের দিনটি ঐ এল!"

আমরা এগিয়ে চললাম। এই অভিযানের পাগলামিটা ধরা পড়বার আগেই আমরা পাহাড়ের উপরে উঠে গেলাম। সেখানে কি দেখলাম? অপ্রত্যাশিত একটা গোটা সংরক্ষিত রুশ সেনাদল! আর কি ঘটল? আমরা কচু-কাটা হলাম? প্রতি একশ'টার মধ্যে নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে তাই অবশ্য ঘটবার কথা। কিন্তু না; একটিমাত্র সেনাদল সেই সময়ে সেখানে ফূর্তি করতে আসবে এ কথা রুশরা ভাবতেই পারে নি। নিশ্চয় গোটা ইংরেজ বাহিনীটাই উঠে এসেছে, এবং রুশদের চালাকি ধরা পড়ে গেছে, তাদের পথ আটকে দেওয়া হয়েছে কাজেই তারা লেজ গুটিয়ে যে যে ভাবে পারল সদলবলে পাহাড় থেকে নেমে মাঠ ধরে ছুটতে লাগল, আর আমরাও তাদের পিছন থেকে তাড়া করলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে রুশদের শক্ত ব্যূহটা তারাই ভেঙ্গে ফেলল; তার ভিতর দিয়ে তারাই প্রাণপণে ছুটে চলল। ফলে একটা অভূতপূর্ব বিশৃংখলার সৃষ্টি হল এবং তার ফলে মিত্রপক্ষের পরাজয় রূপান্তরিত হল একটি চূড়ান্ত চমৎকার জয়ে! মার্শাল ক্যান্‌রবার্ট বিস্ময়ে, প্রশংসায়, আনন্দে অভিভূত হয়ে সব দেখল; তখনই ডেকে পাঠাল স্কোর্সবি-কে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, আর সমবেত বাহিনীর সামনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই তাকে নতুন সম্মানে ভূষিত করল!

আর তখন স্কোর্সবি কি ভুল করেছিল জানেন? শুধুমাত্র তার ডান হাতটাকে বাঁ হাত বলে ভুল করেছিল-বাস, ঐটুকুই। তার উপর হুকুম এসেছিল, পিছিয়ে গিয়ে আমাদের ডান দিকটাকে জোরদার করতে হবে; তার পরিবর্তে সে এগিয়ে গেল সামনে, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল বাঁ দিকে। কিন্তু সেদিন এক আশ্চর্য সামরিক প্রতিভা হিসাবে যে সুনাম সে অর্জন করেছিল তাতে সারা জগৎ তার গৌরব-গাথায় ভরে উঠল, আর ইতিহাসের পুথিগুলি যতদিন থাকবে ততদিন সে গৌরব ম্লান হবে না।

একটা মানুষ যতদূর ভাল হতে পারে, মিষ্টি স্বভাব, প্রিয় ও সরল হতে পারে, সেও তাই, কিন্তু বৃষ্টি নামলে যে কি করতে হবে সেটাও সে জানে না। এটাই সম্পূর্ণ খাঁটি কথা। সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গর্দভ; সে এবং আমি ছাড়া এ কথাটা আধ ঘণ্টা আগেও আর কেউ জানত না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একটা অসাধারণ বিস্ময়কর ভাগ্য তাকে তাড়া করে ফিরেছে। এক যুগ ধরে আমাদের সবগুলো যুদ্ধের সে এক সফল সৈনিক; তার সমস্ত সামরিক জীবনটাই ভুলে ভর্তি, অথচ এমন একটি ভুলও সে করে নি যার ফলে সে নাইট, বা ব্যারনেট, বা লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয় নি। তার বুকের দিকে তাকিয়ে দেখুন; দেশী ও বিদেশী সম্মান-নিদর্শনে বুকটা ভর্তি হয়ে গেছে। কি জানেন স্যার, ওর প্রতিটি পদক কোন না কোন সোচ্চার নির্বুদ্ধিতার স্মারক; আর সবগুলি মিলিয়ে তারা এই কথাই প্রমাণ করছে যে, এ জগতে মানুষের কপালে সব চাইতে বড় জিনিস যা জুটতে পারে সে হল ভাল ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করা। ভোজসভায় যা বলেছি, আবারও সেই কথাই বলছি, স্কোর্সবি একটি মহামূর্খ।

১৮৯১

ভ্রমণসঙ্গীর ভূমিকায়

Playing Courier

এমন দিন তো আসবেই যখন আমাদের যেতে হবে আই-লে-বাই থেকে জেনেভায় এবং সেখান থেকে অনেকগুলি বিশৃংখল একদিনের পথ পেরিয়ে ব্যাভেরিয়ার বেরুথ-এ। আমার মত এ রকম একটা বড় যাত্রীদলের দেখাশুনা করবার জন্য আমাকে একজন ভ্রমণ-সঙ্গী তো অবশ্যই নিতে হবে।

কিন্তু আমাকে দীর্ঘসূত্রতায় পেয়ে বসল। সময় কাটতে লাগল। অবশেষে হঠাৎ একদিন আমার চৈতন্য হল যে আমাদের যাত্রা আসন্ন এবং কোন ভ্রমণ-সঙ্গী যোগাড় হয় নি। তখন একটা বোকার মত কাজ করে বসলাম, অবশ্য তখন এতটা বুঝি নি। ভাবলাম-প্রথম দিকটা কোন রকম সাহায্য ছাড়াই চালিয়ে নেব-আর তাই করলাম।

চারজনের দলকে নিয়ে নিজেই আই থেকে জেনেভা পৌঁছলাম। আড়াই ঘণ্টার দূরত্ব, আর গাড়ি বদলের কোন ব্যাপার ছিল না। কোন রকম দুর্ঘটনাই ঘটল না; শুধু একটা চামড়ার ব্যাগ ও কিছু টুকিটাকি জিনিস প্ল্যাটফর্মে ফেলে যাওয়া ছাড়া; অবশ্য তাকে তো আর দুর্ঘটনা বলা যায় না, সে রকম তো হামেশাই ঘটে। কাজেই বেরুথ পর্যন্ত সারাটা পথ আমিই দলকে নিয়ে যেতে রাজী হলাম।

এটাই হল ভুল, যদিও তখন তা মনে হয় নি। এমন অনেক ব্যাপার আছে যার কথা আমি ভাবিই নিঃ ১, কয়েক সপ্তাহ আগে যে দু'জনকে জেনেভার বোর্ডিং হাউসে রেখে গিয়েছিলাম তাদের এনে হোটেলে তুলতে হবে: ২, বড় জাহাজ-ঘাটায় যারা ট্রাংক জমা রাখে তাদের জানাতে হবে, সেখানে রেখে আসা আমাদের সাতটা ট্রাংক হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে এবং হোটেলের ছোট ঘরে স্তূপ করে রাখা সাতটা ট্রাংক নিয়ে যেতে হবে: ৩, আমাকে খুঁজে বের করতে হবে ইওরোপের কোন্ অঞ্চলে বেরুথ অবস্থিত এবং সেখানকার জন্য সাতখানা রেলের টিকিট কিনতে হবে: ৪, নেদারল্যাণ্ডে জনৈক বন্ধুর কাছে টেলিগ্রাম করতে হবে: ৫, এখন বিকেল দুটো; আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে এবং রাতের প্রথম ট্রেনটা ধরতে হবে, আর শয়নব্যবস্থাযুক্ত টিকিটের ব্যবস্থা করতে হবে; ৬, ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হবে।

আমার মনে হল, শয়ন-ব্যবস্থাযুক্ত গাড়ির টিকিটটাই সব চাইতে জরুরী; কাজেই নিশ্চিত হবার জন্য স্টেশনে গেলাম; হোটেলের পিয়নরা সব সময় কাজের লোক হয় না। দিনটা খুব গরম; গাড়িতে যাওয়াই আমার উচিত ছিল; কিন্তু ভাবলাম যে হেঁটে গেলে কিছু অর্থের সাশ্রয় হবে। তা কিন্তু হল না, কারণ আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলে দূরত্বটা তিনগুণ বাড়িয়ে ফেললাম। টিকিট চাইতেই তারা জানতে চাইল আমি কোন্ পথে যেতে চাই; তাতেই আমি গোলমালে পড়ে গেলাম, আর মাথাও ঘুরে গেল। পথের হদিস আমি কিছুই জানি না, আর পথ যে দুটো হতে পারে সে ধারণাও আমার ছিল না; কাজেই ফিরে গিয়ে মানচিত্র দেখে পথ ঠিক করে তারপর আবার ফিরে আসাই ভাল বলে মনে হল।

এবার একটা গাড়ি নিলাম। কিন্তু হোটেলে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই মনে পড়ল সিগারেট ফুরিয়ে গেছে; কাজেই ভাবলাম, মনে থাকতে থাকতেই কিছু সিগারেট নিয়ে আসাই ভাল। মোড়েই সিগারেটের দোকান, তাই গাড়ির কোন দরকারই নেই। কোচয়ানকে একটু অপেক্ষা করতে বলে গেলাম। টেলিগ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে এবং কি লেখা হবে সেটা মনে মনে ঠিক করতে গিয়ে সিগারেট ও গাড়ির কথা কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সমানে হাঁটতে লাগলাম। টেলিগ্রামটা হোটেলের লোক দিয়েই করাব ভেবেছিলাম, কিন্তু যেহেতু ডাকঘরটা তখন আর বেশী দূরে ছিল না তাই ভাবলাম নিজেই করে যাই। কিন্তু যত কাছে ভেবেছিলাম আসলে তা নয়। শেষ পর্যন্ত ডাকঘরে পৌঁছে টেলিগ্রামটা লিখে করণিকের হাতে দিলাম। করণিকটি রুক্ষদর্শন, অস্থিরচিত্ত মানুষ ; এমন গড়গড় করে ফরাসী ভাষায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল যে সে সব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জানাল, টেলিগ্রামটা কোথায় পাঠাতে হবে তাই সে জানতে চাইছে। তাকে কিছু বলতে পারলাম না, কারণ টেলিগ্রামটা আমার নয়; তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, দলের একজন লোকের হয়ে আমি টেলিগ্রামটা করছি মাত্র। কিন্তু ঠিকানা না পেলে করণিক কিছুতেই শান্ত হল না; তখন আমি বললাম, সে যদি একান্তই ঠিকানাটা চায় তাহলে আমি ফিরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসতে পারি।

যা হোক, ভাবলাম প্রথমে গিয়ে লোক দুটিকে নিয়ে আসি, কারণ সব কাজই শৃংখলার সঙ্গে পর পর করা উচিত, এবং এক সঙ্গে একটা

কাজ করাই ভাল। তখন মনে পড়ে গেল, ওদিকে আর একটা গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার টাকা ধ্বংস করছে; কাজেই আর একটা গাড়ি ডেকে কোচয়ানকে বললাম, হোটেলে গিয়ে সেই গাড়িটাকে ডেকে নিয়ে এসে আমি না আসা পর্যন্ত যেন ডাকঘরেই অপেক্ষা করে।

গরমের মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে তবে লোক দুটির কাছে পৌঁছলাম। সঙ্গে অনেক মোটাঘাট থাকায় তারা আমার সঙ্গে আসতে পারল না, কারণ তাদেরও একটা গাড়ি দরকার। একটা গাড়ি ডাকতে বেরিয়ে গেলাম। কোন গাড়ি পাবার আগেই এক সময় দেখলাম, বড় জাহাজঘাটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি-অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল-তাই ভাবলাম, আর কয়েক পা এগিয়ে ট্রাংকগুলোর ব্যবস্থা করে গেলে তো অনেক সময় বেঁচে যাবে। প্রায় মাইল খানেক হেঁটেও বড় জাহাজঘাটার দেখা পেলাম না, কিন্তু পেলাম একটা চুরুটের দোকান; তখনই চুরুটের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, বেরুথ পর্যন্ত যখন যাচ্ছি তখন তো পথে অনেক চুরুট দরকার। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আমি কোন্ পথে যাচ্ছি। বললাম, আমি জানি না। জুরিখ ও অন্য আরও অনেকগুলি জায়গার নাম করে সে জানাল, সেই পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। সে আবার জানাল, রেল-কর্তৃপক্ষ তাকে যে বাটা দিয়ে থাকে সেটা বাদ দিয়েই সে প্রতি টিকিট বাইশ ডলার হিসাবে আমাকে সাতখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর "থ্রু" টিকিট দিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়ে চড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাজেই তার কাছ থেকেই টিকিট কিনলাম।

ক্রমে ন্যাচারেল অ্যাণ্ড কোং-এর গুদাম-ঘর পেয়ে গেলাম; তাদের বললাম, আমাদের সাতটা ট্রাংক হোটেলে পাঠিয়ে দিয়ে যেন ছোট ঘরটায় ডাই করে রেখে দেয়। মনে হল, সব কথাগুলো টেলিগ্রাম করা হল না, কিন্তু ওর চাইতে বেশী কিছু আমার মাথায় এল না।

তারপর ব্যাংকটা দেখতে পেয়ে কিছু টাকা চাইলাম, কিন্তু আমার প্রত্যয়পত্রটা কোথায় যেন ফেলে রেখে আসায় টাকা তুলতে পারলাম না। মনে পড়ল, যে টেবিলে টেলিগ্রামটা লিখেছি নিশ্চয় সেখানেই ফেলে এসেছি; কাজেই একটা গাড়ি নিয়ে ডাকঘরে ছুটলাম;উপরে উঠে গেলে তারা বলল, একটা প্রত্যয়পত্র টেবিলের উপর ছিল বটে, কিন্তু এখন সেটা পুলিশ কর্তৃপক্ষের হাতে এবং আমাকেই সেখানে গিয়ে প্রমাণ দাখিল করে তবে সেটা নিতে হবে। তারা একটা ছেলেকে আমার সঙ্গে দিল; আবার সেই একই পথে ফিরে গিয়ে মাইল দুই হেঁটে তবে সেখানে পৌঁছলাম; তারপরই গাড়ি দুটোর কথা আমার মনে পড়ে গেল; ছেলেটিকে বলে দিলাম, ডাকঘরে ফিরে গিয়ে সে যেন গাড়ি দুটোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তখন রাত হয়ে গেছে; মেয়র খেতে গেছে। ভাবলাম, আমিও খেয়ে আসি, কিন্তু ভারপ্রাপ্তকর্মচারীটি অন্য রকম ভাবায় আমি থেকেই গেলাম। মেয়র ঘরে ঢুকল সাড়ে দশটায়, কিন্তু এসেই বলল, এত রাতে আর কিছু করা যাবে না-আমি যেন পরদিন সকাল ৯-৩০-এ আসি। অফিসারটি আমাকে সারা রাত আটকে রাখতে চাইল; বলল, আমি একটি সন্দেহভাজন লোক, সম্ভবত প্রত্যয়পত্রটি আমার কাছে নেই, এবং প্রত্যয়পত্র কাকে বলে তাই আমি জানি না, কিন্তু প্রত্যয়পত্রের আসল মালিককে ওটা ফেলে যেতে দেখেই জিনিসটা হাতাতে চাইছি, কারণ আমার প্রকৃতিই নাকি এমন যে মূল্যবান হোক আর নাই হোক যা পাওয়া যায় তাই আমি হাতিয়ে নিতে চাই। কিন্তু মেয়র জানাল যে সে আমার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাচ্ছে না, আমিএকটি সাধারণ মানুষ, শুধু একটু মনভোলা এই যা। কাজেই মেয়র আমাকে ছেড়ে দিল, আর আমিও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনটে গাড়ি নিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেলাম।

যেহেতু আমি তখন একেবারে হাড়-পরিশ্রান্ত, এবং ভেবেচিন্তে কোন রকম জবাব দেবার মত মনের অবস্থাও আমর নেই, তাই ভাবলাম যে এত রাতে আর "অভিযাত্রী দল"-কে বিরক্ত করে কাজ নেই, কারণ আমি জানতাম যে হলের অপর প্রান্তেই একটা খালি ঘর আছে; কিন্তু সেখানে আমারআর পৌঁছনো হল না, কারণ আমার জন্য গভীর উদ্বেগবশত আমার উপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল। পরপর চারটে চেয়ারে অভিযাত্রীদল খাড়া বসেছিল-শাল প্রভৃতি সব কিছুই তাদের গায়ে চড়ানো, আর ঝুলি-ঝোলা ও পথনির্দেশিকা কোলের উপর জড়ো করা। চার ঘণ্টা ধরে তারা ঐ একভাবে বসে আছে আর বোতলের পর বোতল চালিয়েছে। সত্যি, তারা অপেক্ষা করেই ছিল-আমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। বুঝতে পারলাম, একটা সুপরিকল্পিত আকস্মিক অথচ চমৎকার কৌশল ছাড়া এই লৌহকঠিন সীমান্তকে ভেঙে নিজের পথ করে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই; সুতরাং আমার টুপিটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুঁড়ে দিয়ে লাফ-ঝাঁপ করে সেদিকে এগোতে এগোতে চেঁচিয়ে বললাম:

"হা-হা-হা, আমি এসেছি-এসেছি বঁধু হে!"

কিন্তু সব একেবারে নিশ্চুপ। একটুকু সাড়াশব্দ হল না। তবে আমি চালিয়েই গেলাম; তা ছাড়া কিছু তো করবার ছিল না, কারণ যেটুকু আত্মবিশ্বাস আমার ছিল ততক্ষণে এই মারাত্মক বাধার সামনে তাও কার্যত নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মন যতই ভারী থাকুক তবু আমি হাসিখুসি হতে চেষ্টা করলাম। হাল্কা হাসি-তামাসা দিয়ে ওদের হৃদয়কে ছুঁতে চেষ্টা করলাম, ওদের মুখের তিক্ততার ভাবকে নরম করতে চাইলাম; চাইলাম এই বিশ্রী পরিস্থিতিটাকে একটা খুসির মেজাজ ছড়িয়ে দিতে; কিন্তু আমার ব্যবস্থাটা সুপরিকল্পিত হয় নি। পরিবেশটা তার উপযুক্তই নয়। কারও মুখে একটুকরো হাসি ফুটল না; বিরক্ত-কুঞ্চিত মুখগুলির একটা রেখাও নরম হল না; ঐ সব বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের জমাট বরফ আমি এতটুকু গলাতে পারলাম না। আর একটা খুসির হাওয়া বহাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অভিযাত্রী দলের কর্তা মাঝ পথেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল:

"কোথায় ছিলেন?"

কথার ভঙ্গীতেই বুঝলাম, সোজাসুজি কাজের কথায় যাওয়া চাই। তাই আমার ভ্রমণ-কাহিনী শুরু করে দিলাম। কিন্তু তাতেও কথার মাঝখানেই বাধা।

"আর দু'জন কোথায়? তাদের জন্য আমাদের উদ্বেগের সীমা নেই।"

"ওঃ, তারা ভাল আছেন। একটা গাড়ি নিয়ে যাবার কথা ছিল। এখনই সেখানে যাচ্ছি, আর-"

"বসে পড়ুন! আপনার কি খেয়াল নেই যে এখন এগারোটা বাজে? তাদের কোথায় ছেড়ে এসেছেন?"

"বোর্ডিং হাউসে।"

"সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন?"

"কারণ তাদের ঝোলাঝুলিগুলো বয়ে আনা যায় না। তাই ভাবলাম-"

"ভাবলেন! ওসব ভাবনা-চিন্তা ছাড়ুন। বোর্ডিং-হাউসটা এখান থেকে দু'মাইলের পথ। আপনি কি গাড়ি না নিয়েই গিয়েছিলেন?"

"আমি-মানে, ইচ্ছেটা তা ছিল না, তবে পাকেচক্রে ঘটে গেল।"

"কি করে ঘটল?"

"আমি ছিলাম ডাকঘরে; সেখানেই মনে পড়ল, এখানে একটা গাড়ি দীড় করিয়ে রেখে গিয়েছি;তাই খরচ বাঁচাবার জন্য আর একটা গাড়িকে পাঠালাম-"

"কোথায় পাঠালেন?"

"এখন ঠিক মনে পড়েছে না; তবে যতদূর মনে হয়, নতুন গাড়িটা এসে হোটেল থেকেই যাতে পুরনো গাড়িটাকে ভাড়া মিটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে।"

"তাতে লাভটা কি হত?"

"লাভ কি হত? কেন, তাতে খরচটা কমত;কমত না কি?"

"তার জায়গায় নতুন গাড়িটা ভাড়া করে ধরে রেখে খরচ কমত?"

কোন কথা বললাম না।

"নতুন গাড়িটাকে আপনার কাছেই ফিরে যেতে বললেন না কেন?"

"ওহো, তাই তো করেছিলাম। এবার মনে পড়ছে। হ্যাঁ, তাই করেছিলাম। মনে পড়েছে, আমি যখন-"

আহা, তাহলে সেটা আপনার কাছে ফিরে যায় নি কেন?"

"ডাকঘরে? গিয়েছিল তো।"

"তাহলে বোর্ডি-হাউসে আপনি হেঁটে গেলেন কেন?"

"আমি-আমি ঠিক মনে করতে পারছি না কি ঘটেছিল। ও, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। নেদারল্যাণ্ডস্-এ পাঠাবার জন্য টেলিগ্রামটা লিখেছিলাম এবং-"

"তবু ভাল যে একটা কাজ করেছেন! ওটাও যদি না পাঠাতেন-কি হল! ওভাবে অকাচ্ছেন কেন! আপনি আমার দৃষ্টিকে এড়াতে চাইছেন। ঐ টেলিগ্রামটা খুবই জরুরী-ওটা আপনি পাঠান নি!"

"পাঠাই নি তা তো বলি নি।"

"বলবার দরকার হয় না। হা ভগবান, টেলিগ্রামটা যে ভাবেই হোক পাঠানো উচিত ছিল। কেন পাঠান নি?"

"দেখুন এত কাজ ছিল, এত কিছু ভাববার ছিল। আমি-মানে ওখানকার লোকগুলো আবার ভারি কড়া, আমি টেলিগ্রামটা লিখবার পরে-"

"খুব হয়েছে, ও সব কথা রাখুন;কৈফিয়তে তো কাজটা হবে না-না জানি আমাদের সম্পর্কে সে কি ভাববে?"

"আহা, ঠিক আছে, ঠিক আছে; সে ভাববে যে টেলিগ্রামটা আমরা হোটেলের লোকদের দিয়েছিলাম, আর তারাই-"

"ঠিকই তো! তাই বা করলেন না কেন? সেটাই তো বুদ্ধিমানের মত কাজ হত।"

"তা ঠিক। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল যে, আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, ব্যাংকে যেতে হবে, কিছু টাকা তুলতে হবে-"

"দেখুন, এত সব ভাবতে পারার জন্য নিশ্চয় আপনার কিছুটা বাহাদুরি আছে, আর আপনার প্রতি আমি কঠোরও হতে চাই না;তবু আপনি নিশ্চয় শিকার করবেন যে আপনি আমাদের সকলকেই যথেষ্ট বিপদে ফেলেছেন, এবং তার সবটাই কিছু অনিবার্য ছিল না। কত টাকা তুলেছেন?"

"দেখুন, আমি-আমি ভেবেছিলাম যে-যে-"

"যে কি?"

"যে-দেখুন, আমার মনে হচ্ছে এ অবস্থায়-আপনি তো জানেন আমরা অনেক লোক, এবং-এবং-"

"কি মিন্‌মিন্ করছেন? এদিকে মুখ ফেরান, আমাকে বলুন-সে কি, আপনি টাকা তোলেন নি?"

"দেখুন, ব্যাংকের লোকটি বলল-"

"ব্যাংকের লোকের কথা থাক। আপনার নিজের তো একটা বুদ্ধিবিবেচনা থাকা দরকার। ঠিক বুদ্ধির কথা বলছি না, কিন্তু এমন কিছু-"

"দেখুন, সোজা কথা হল আমার প্রত্যয়পত্রটা তখন সঙ্গে ছিল না।"



"প্রত্যয়পত্র সঙ্গে ছিল না?"

"প্রত্যয়পত্র সঙ্গে ছিল না।"

"বারবার একই কথা বলবেন না। কোথায় ছিল?"

"ডাকঘরে।"

"সেখানে কি করছিল?"

"দেখুন, আমিই ভুল করে সেখানে ফেলে এসেছিলাম।"

"বলেন কি! অনেক ভ্রমণ-সঙ্গী আমি দেখেছি, কিন্তু তাদের কেউই-"

"আমি তো যথাসাধ্য করেছি।"

"তা তো অবশ্যই করেছেন, আর আপনাকে বকাও আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি তো আমাদের জন্য খাটতে খাটতে মরে যাচ্ছেন, আর সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে আমরা শুধু এখানে বসে বসে নিজেদের বিরক্তির কথাই ভাবছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো সকাল ৭-৩০ মিনিটের ট্রেনটাও ধরতে পারি। টিকিটগুলো কিনেছেন তো?"

"তা কিনেছি-আর বেশ সস্তায়ই কিনেছি। দ্বিতীয় শ্রেণী।"

"খুব ভাল। অন্য সকলেই তো দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে, কাজেই আমরাও তো ঐ সর্বনেশে বাড়তি খরচটা বাঁচাতেই পারি। কত লাগল?"

"টিকিট প্রতি বাইশ ডলার-একটানা বেরুথ পর্যন্ত।"

"আরে, লণ্ডন ও প্যারিস ছাড়া আর কোথাও একটানা টিকিট কিনতে পাওয়া যায় বলে তো জানতাম না।"

"অনেকে হয় তো কিনতে পারে না; কিন্তু অনেক পারে-আর মনে হচ্ছে আমিও তাদের একজন।"

"দামটা নিশ্চয় বেশী লেগেছে।"

"ঠিক উল্টো; কারবারী তার কমিশনটাও ছাড়া দিয়েছে।"

"কারবারী?"

"হ্যাঁ-একটা চুরুটের দোকান থেকে টিকিটগুলো কিনেছি।"

"তাই বুঝি। আমাদের তো খুব সকালে উঠতে হবে, কাজেই বাঁধাছাদার সময় পাওয়া যাবে না। আপনার ছাতা, আপনার রবারের ছুতো, আপনার চুরুট-কি হল?"

"রেখে দিন ও সব; চুরুটগুলো ব্যাংকে ফেলে এসেছি।"

"শোন কথা! আর ছাতা?"

"ওটা ঠিক আছে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।"



"তার মানে?"

"আহা, ঠিক আছে; সে আমি বুঝব-"

"ছাতাটা কোথায়?"

"এই তো এক পা এগোলেই-বেশী সময়-"

"কোথায় আছে?"

"দেখুন, মনে হচ্ছে চুরুটের দোকানে ফেলে এসেছি; কিন্তু সে যাই হোক-"

"আপনার পা বের করুন তো। ঠিক যা ভেবেছি! আপনার রবারের জুতো কোথায়?"

"সে দুটো-মানে-"

"কোথায় রবারের জুতো?"

"চারদিকে এমন শুকনো-আর সকলেই বলছে আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি হবে না-"

"আপনার-রবারের-জুতো-কোথায়?"

"দেখুন-ব্যাপারটা এই রকমভাবে ঘটেছে। প্রথমত, অফিসার বললেন-"

"কোন্ অফিসার?"

"পুলিশ অফিসার; কিন্তু মেয়র, তিনি-"

"কোথাকার মেয়র?"

"জেনেভার মেয়র;কিন্তু আমি বললাম-"

"থামুন; আপনার হয়েছে কি?"

"আমার? কিছু হয় নি তো। তারা দু'জনই আমাকে থাকতে বলল, এবং-"

"কোথায় থাকতে বলল?"

"দেখুন ব্যাপারটা হল-"

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? কি কাজে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাইরে ছিলেন?"

"ওহো, দেখুন, প্রত্যয়পত্রটা হারিয়ে ফেলবার পরে আমি-"

"কি আজেবাজে বকে চলেছেন। এবার এক কথায় আমার প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনার রবারের জুতো জোড়া কোথায়?"

"সেগুলো-দেখুন, সেগুলো জেলার জেলখানায় আছে।"

একটু মন-কড়া হাসি হাসলাম, কিন্তু তাতে কাজা হল না। আবহাওয়া বিরূপ। তিন-চার ঘণ্টা জেলখানার কাটানোটা অভিযাত্রী দলের কাছে হাসির ব্যাপার বলে মনে হল না। তলিয়ে দেখলে, আমার কাছেও মনে হবার কথা নয়।

সব ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে বললাম; তখন দেখা গেল, আমরা সকালের ট্রেনটা ধরতে পারি না, কারণ তা হলে আমার প্রত্যয়পত্রটা ফেলে রেখেই যেতে হয়। এক সময় মনে হয়েছিল যে একটা মনোমালিন্য নিয়েই আমাদের শুতে যেতে হবে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেটা ঘটল না। কথাপ্রসঙ্গে ট্রাংকের কথা উঠলে আমি জানালাম, সে ব্যবস্থাটা আমি করে এসেছি।

"এ ব্যাপারে আপনি খুবই ভাল, চিন্তাশীল পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান লোকের মতই কাজ করেছেন;কাজেই আপনার এতখানি দোষ ধরা আমাদের দিক থেকে খুবই লজ্জার ব্যাপার হয়েছে; ও বিষয়ে আর একটা কথাও বলা হবে না। সব কাজটাই আপনি সুন্দরভাবে, প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ন করেছেন; আপনার সম্পর্কে অকৃতজ্ঞের মত কথা বলায় আমি দুঃখিত।"

এ কথায় আমি আরও বেশী আঘাত পেলাম; আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল; কারণ ট্রাংকঘটিত ব্যাপারটায়ও আমি খুব একটা নিশ্চিত ছিলাম না। কোথায় যেন কিছু একটা ত্রুটি থেকে গেছে; ত্রুটিটা ঠিক যে কোথায় তাও বুঝতে পারছি না, আবার এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়াও করতে পারছি না, কারণ ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

অবশ্য সকালে যখন দেখা গেল যে সকালের ট্রেনে আমরা যেতে পারছি না তখন তা নিয়ে একটু হৈ-চৈ হল। কিন্তু আমার অপেক্ষা করবার মত সময় ছিল না। গোলমালের শুরুটা শুনেই আমি প্রত্যয়পত্রের খোঁজ বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রাংকের ব্যাপারটার যদি কোন্ সুরাহা করা যায় সেই ভরসায় সেখানে গেলাম। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভারপ্রাপ্ত লোকটি জানাল আগের দিন সন্ধ্যায়ই ট্রাংকগুলো জাহাজে করে জুরিখ-এ পাঠানো হয়ে গেছে। আমি জানতে চাইলাম, টিকিট ছাড়াই সে কাজটা করা হল কেমন করে।

"সুইজারল্যাণ্ডে টিকিট দরকার হয় না। ট্রাংকের মাশুলটা দিলেই যেখানে খুসি পাঠাতে পারেন। আপনার হাত-ব্যাগটা ছাড়া আর কিছুই বিনা মাশুলে নিতে পারবেন না।"

"সে বাবদ কত খরচ হয়েছে?"

"একশ' চল্লিশ ফ্রাঁ।"

"আটশ' ডলার। ট্রাংকের ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে।"

তারপর কুলির সঙ্গে দেখা করলাম। সে বলল:

"আপনার ভাল ঘুম হয় নি, তাই না? আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি যদি একজন ভ্রমণ-সঙ্গী চান তো একটি ভাল লোক কাল রাতে এসেছে; নাম লুডি; পাঁচ দিন তার কোন কাজ নেই। আমরা তাকে সুপারিশ করছি; গ্রাণ্ড হোটেল বিউ রিভাজ-ও তাকে সুপারিশ করেছে।"

সে প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলাম। আমার মনোবল এখনও ভেঙে পড়ে নি। তাছাড়া এ ভাবে ধরা পড়তেও আমি চাই নি। ন'টা নাগাদ আমি জেলার জেলখানায় ছিলাম, আশা করেছিলাম মেয়র হয় তো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই একবার আসতে পারে; কিন্তু তা আসে নি।সেখানে খুবই একঘেয়ে লেগেছিল। যতবার কোন কিছুতে হাত দিতে গিয়েছি, বা কোন কিছু দেখতে চেষ্টা করেছি, বা কিছু করতে চেয়েছি, প্রতিবারই পুলিশ বলেছে ওটা "নিষিদ্ধ"। ভাবলাম, ফরাসী ভাষায় একটু কথা বলে দেখি, কিন্তু তাও শুনবে না। তার নিজের ভাষা শুনে যেন আরও চটে গেল।

শেষ পর্যন্ত মেয়র এল আর সব গোলমালের অবসান হল। এক মিনিটের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট বসানো হল-কোন মূল্যবান সম্পতি নিয়ে বির্তক দেখা দিলেই এ কাজটি করা হয়-যথারীতি সব ব্যবস্থা হল, সান্ত্রী বসানো হল, গির্জার প্রার্থনা হল, আমার বিনা সিলের চিঠিটা

এনে খোলা হল, তার মধ্যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না; কারণ এতক্ষণে আমার মনে পড়ল যে ফটোগ্রাফগুলো রাখবার জন্য আমি প্রত্যয়পত্রটা খামের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে অন্য পকেটে রেখে দিয়েছিলাম; আমার সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য পকেট থেকে সেটা বের করে সকলকে দেখিয়ে অত্যন্ত পুলক অনুভব করলাম। কোর্টের সদস্যরা তখন উদাস চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল তারপর আমার দিকে তাকাল, এবং পুনরায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে দিল; কিন্তু আমার একা একা ঘোরা উচিত নয় এই মন্তব্য করে আমার পেশার কথা জানতে চাইল। আমি বললাম, আমি একজন ভ্রমণ-সঙ্গী। শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা চোখ তুলে তাকাল, আর আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাংকের দিকে ছুটলাম।

যা হোক ভ্রমণ-সঙ্গী হিসাবে ইতিমধ্যেই আমি খুব বেশী করে নিয়ম শৃংখলা মানতে শিখে গেছি; তাই ডাকঘরে না গিয়ে আগে ছুটলাম অভিযাত্রী দলের সেই দু'জন লোকের সন্ধানে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আরাম করছিল; অনেক বলে-কয়ে সেটাতেই উঠে বসলাম। এতে গতি কিছু বাড়ল না, তবে আরামে যাওয়া হল, আর সেটা আমার ভালই লাগল। সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ষষ্ঠ শতবার্ষিকী এবং চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলেছে পুরো দমে; রাস্তায় রাস্তায় পতাকার সমারোহ।

ঘোড়া ও গাড়ির চালক তিন দিন তিন রাত ধরে মদ গিলেছে, বিছানার সাথে কোন সম্পর্কই হয় নি। আমার মত তাদেরও তখন ঘুমে ঢুলু-ঢুলু ভাব। কিন্তু এক সময়ে আমরা পৌঁছে গেলাম। ভিতরে ঢুকে ঘণ্টা বাজালাম এবং দাসীকে বললাম আমার সঙ্গী দু'জনকে তাড়াতাড়ি বের করে দিতে। সে যে কি বলল কিছুই বুঝতে না পেরে আবার আমার রথেই ফিরে এলাম।

চুপচাপ বসে রইলাম। এক সময় কাঁধের উপর একটা হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলাম। আগন্তুক একজন পুলিশ। তাকিয়ে দেখলাম ইতিমধ্যেই একটা নতুম দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। একটা ভিড় জমে গেছে। সকলের চোখেই কৌতূহল ও সন্দেহ। ঘোড়াটা ঘুমিয়ে আছে। কোচোয়ানও তথৈবচ। কতকগুলি ছোকরা পথের পতাকাগুলি চুরি করে এনে তাকে ও আমাকে অপূর্ব সাজে সাজিয়েছে। সে এক বিশ্রী দৃশ্য। পুলিশ-অফিসার বলল:

"আমি দুঃখিত, কিন্তু এ ভাবে তো আপনাকে সারা দিন এখানে ঘুমুতে দিতে পারি না।"

আমি আহত হলাম। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, "ক্ষমা করবেন, আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম না; একটু ভাবছিলাম।"

"দেখুন, ইচ্ছা হলে আপনি অবশ্যই ভাবতে পারেন, কিন্তু আপনাকে ভাবতে হবে নিজের মনে; আপনি যে গোটা অঞ্চকেই বিরক্ত করে তুলেছেন।"

অত্যন্ত সস্তা ঠাট্টা। সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। রাতের বেলা কখনও কখনও আমার নাক ডাকে; কিন্তু দিনের বেলায় এ হেন জায়গায় আমি যে সে কাজ করব তা তো সম্ভব নয়। যা হোক, ভীড় সরিয়ে দিয়ে অফিসার জানাল যে, আমাদের আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকা চলবে না, অন্যথায় সে ভাড়া আদার করতে বাধ্য হবে-সে বলল, এটাই আইন, তবে যেহেতু আমাকে দেখে সেকেলে লোক বলে মনে হচ্ছে তাই-"

এবার তাকে গম্ভীরভাবে বাধা দিয়ে আমি বললাম যে, আজকের দিনে আমিও তো একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে পারি, বিশেষ করে যখন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগ রয়েছে।

"ব্যক্তিগত যোগ? কেমন করে?"

"কারণ ছ'শ' বছর আগে আমার এক পূর্বপুরুষই এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।"

লোকটা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল; তারপর আমাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে বলল:

"পূর্বপুরুষ! আমার তো মনে হয় আপনি নিজেই স্বাক্ষর করেছিলেন। কারণ পুরাকালের যে সব প্রাচীন নিদর্শন আমি-কিন্তু যাক সে কথা। এখানে কি জন্য আপনি এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন?"

আমি বললাম:

"আমি মোটেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি না। মাত্র পনেরো মিনিট হল এখানে আছি; তারা দস্তানা ও বই ফেলে এসেছে, তাই সেগুলো আনতে গেছে।" তখন তারা কে আর আমিই বা কি জন্যে এসেছি সব তাকে বললাম।

পুলিশটি খুব বিগলিত হয়ে উঠল এবং জানালা দিয়ে বের-করা মাথা ও গলাগুলোকে লক্ষ্য করে আমার সঙ্গী দু'জনের কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল। তখন একটি মেয়ে সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল:

"ওঃ, তারা? সে কি, আমিই তো তাদের একটা গাড়ি ডেকে দিলাম; তারা তো অনেকক্ষণ হল চলে গেছে-তা সাড়ে আটটায়।"

গোলমেলে ব্যাপার। আমি ঘড়িটা দেখলাম, মুখে কিছু বললাম না। অফিসারটি বলল:

"দেখুন, বারোটা বেজে গেছে। আপনার আরও ভাল করে খোঁজ করা উচিত ছিল। এই প্রচণ্ড রোদে আপনি পৌনে এক ঘণ্টা ধরে ঘুমুচ্ছেন। রোদে যে পুড়ে গেছেন-কালো হয়ে গেছেন। আশ্চর্য! হয় তো ট্রেনটাই ধরতে পারবেন না। আপনি খুব মজার লোক মনে হচ্ছে। কাজকর্ম কি করেন?"

বললাম, আমি একজন ভ্রমণসঙ্গী। লোকটা যেন হতভম্ব হয়ে গেল। তার সম্বিৎ ফিরে আসার আগেই আমরা হাওয়া।

হোটেলের তিন তলায় উঠে দেখি আমাদের ঘরগুলো ফাঁকা। তাতে আমি অবাক হলাম না। ভ্রমণ-সঙ্গী নজরের বাইরে গেলেই দলের লোকটা কেনাকাটা করতে বেরিয়ে যায়। ট্রেনের সময় যত এগিয়ে আসে ততই তারা বেশী করে বাইরে যায়। বসে বসে ভাবছি কি করা যায় এমন সময় চাকরটা আমাকে দেখতে পেয়ে জানাল, অভিযাত্রী দল আধ ঘণ্টা হল স্টেশনে চলে গেছে। এই সর্বপ্রথম তারা একটা বুদ্ধির কাজ করেছে। কিন্তু আমাকে যে গোলমালে ফেলে দিল। এ ধরনের কাজের ফলেই ভ্রমণ-সঙ্গীদের বড়ই অসুবিধার পড়তে হয়। সব কিছু সে ঠিকঠাক করে এনেছে এমন সময় দলের লোকটা এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যাতে সব ব্যবস্থা একেবারে তচনচ হয়ে যায়।

দুপুর ঠিক বারোটায় ট্রেন ছাড়বার কথা। এখন বারোটা বেজে দশ। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। হাতে যথেষ্ট সময় নেই, কারণ এটা একটা বিদ্যুৎগতি এক্সপ্রেস ট্রেন, আর ইওরোপে বিদ্যুৎগতি এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি বিজ্ঞাপিত দিনেই ছাড়ার ব্যাপারে বেশ কিছুটা খুঁতখুঁতে। প্রতীক্ষালয়ে শুধু আমার দলের লোকরাই বসে আছে; অন্য সকলেই গিয়ে ট্রেনে চড়ে বসেছে। তারা সকলেই শ্রান্ত, বিচলিত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে আমরা ছুটে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু না; এখানেও আমাদের কপাল খারাপ। দ্বাররক্ষী টিকিটগুলো দেখে সন্তুষ্ট হল না। অত্যন্ত সতর্কতা ও সন্দেহের সঙ্গে নেড়ে চেড়ে দেখল; তারপর আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অপর একজন কর্মচারীর ডাকল। দু'জনে টিকিটগুলো ভাল করে দেখে আর একজন কর্মচারীকে ডাকল। তারা আবার অন্যদের ডাকল, সকলে মিলে আলোচনার পর আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল, নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল; শেষ পর্যন্ত আমি কাকুতি-মিনতি করে বললাম, সময় বয়ে যাচ্ছে, কাজেই তারা যেন তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে আমাদের ছেড়ে দেয়। তখন তারা অতিশয় ভদ্রভাবে জানাল যে টিকিটগুলোতে কিছু গোলমাল আছে; কাজেই তারা জানতে চাইলে, টিকিটগুলো আমি কোথা থেকে নিয়েছি।

এতক্ষণে গোলমালের কারণটা বুঝতে পারলাম। আপনারা তো জানেন, একটা চুরুটের দোকান থেকে আমি টিকিটগুলো কিনেছিলাম, কাজেই সেগুলোর গায়ে তামাকের শুল্ক বিভাগ থেকে পাশ করিয়ে নেওয়া এবং ঐ গন্ধের দরুন প্রাপ্য শুল্কটা আদায় করা। সুতরাং স্থির করলাম যে এ সব ক্ষেত্রে সব কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। তাই বললাম:

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের ফাঁকি দিতে চাই না। এই রেলের টিকিটগুলো-"

"মাফ করবেন মঁসিয়ে? এগুলো মোটেই রেলের টিকিট নয়।"

"ওহো, তাহলে এই দোষ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মঁসিয়। এগুলো লটারির টিকিট; আর সে লটারিও হয়ে গেছে দু'বছর আগে।"

আমি এমন ভাব দেখালাম যেন ব্যাপারটা ভারী মজার ; এ অবস্থায় এ ছাড়া আর কিছু তো করার থাকে না; আর কোন লাভও নেই; অথচ চারদিক থেকে সকলে করুণা করতে থাকে, আপনার কাজেই জন্য লজ্জাবোধ করে। একদিকে দুঃখ ও পরাজয়ের মর্মপীড়া, আর অন্যদিকে আপনার দলের লোক, যারা আপনার প্রাণের প্রাণ, আধুনিক সভ্যতার রীতি অনুসারে যাদের কাছে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই আপনার প্রাপ্য, তারাও অপরিচিত জনের কাছে আপনাকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে অপমানিত ও বিভ্রান্ত।

খুসি-খুসি মেজাজে আমি বললাম, ঠিক আছে, এ রকম ছোটখাট দুর্ঘটনা তো সকলের বেলায়ই ঘটতে পারে-দু'মিনিটের মধ্যেই আমি সঠিক টিকিট নিয়ে আসছি; তারপর ট্রেনে চেপে সারা পথ ফূর্তি করতে চলে যাব। যথাসময়ে টিকিটও পেলাম, ছাপ-টাপ দেওয়া ঠিক-ঠিক টিকিট, কিন্তু সগুলি আমার আর নেওয়া হল না, কারণ ঐ হারানো লোক দুটিকে খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ে আমি ব্যাংকে যেতেই ভুলে গেছি, অতএব টাকাও তোলা হয় নি। কাজেই ট্রেন ছেড়ে দিল, আর আমাদেরও হোটেলে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইল না। তাই গেলাম।

হোটেলে ফিরে আমাদের ভাল ঘরগুলো পাওয়া গেল না; এদিক-ওদিক ছড়ানো ঘর পাওয়া গেল। যা হোক করে ওতেই চলে যাবে। ভাবলাম, এবার সব কিছু ভালভাবে চলবে, কিন্তু দলের প্রধান হুকুম করল, "ট্রাংকগুলো উপরে পাঠিয়ে দিন।" মন খারাপ হয়ে গেল। ঐ ট্রাংকের ব্যাপারে নিশ্চয় সন্দেহজনক কিছু আছে। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সে কথা বলতে গেলাম, কিন্তু হাতের ইসারায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে জানাল, আমরা এখানেই তিন দিন থাকব ও বিশ্রাম নেব।

আমি বললাম, ঠিক আছে; ঘণ্টা বাজাবার দরকার নেই; আমি নিজেই গিয়ে ট্রাংকের ব্যবস্থা করছি। একটা গাড়ি নিয়ে আমি সোজা মিঃ চার্লস্ ন্যাচরেল-এর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, তাদের কি নির্দেশ দিয়েছিলাম।

"সাতটা ট্রাংক হোটেলে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

"কোন ট্রাংক ফিরিয়ে আনবার কথা ছিল কি?"

"না।"

"আপনি ঠিক জানেন যে ডাঁই করা সাতটা ট্রাংক ফিরিয়ে আনতে আপনাকে বলি নি?"

"নিশ্চয় বলেনি নি।"

"তাহলে পুরো চোদ্দটা ট্রাংকই জুরিখ, বা জেরিকো, বা অন্য কোথাও চলে গেছে, আর অভিযাত্রী দল সেখানে পৌঁছে দেখবে যে হোটেলে সব কিছু মিলে একটা তালগোল-"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না; আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। এ অবস্থায় কথা শেষ হল কি না হল তা কারও খেয়ালই থাকে না; বরং ভয় হয় বুঝি বা কোন গাড়ি, বা গরু বা অন্য কিছুতে চাপা পড়ে যাব।

গাড়িটার কথাও ভুলে গেলাম। পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে যেতে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম পদত্যাগ করব, কারণ অন্যথায় আমাকেই ছাড়িয়ে দেবে। কিন্তু নিজে গিয়ে পদত্যাগ করাটা কোন কাজের কথা নয়; একটা চিঠি লিখেই তো সে কাজ হতে পারে। কাজেই মিঃ লুডিকে ডেকে পাঠালাম; তাকে বললাম, নানা রকম অসুবিধার জন্য একজন ভ্রমণসঙ্গী শীঘ্রই পদত্যাগ করছে, এবং যেহেতু তার হাতে এখনও চার পাঁচ দিন সময় আছে সেই হেতু সে যদি চায় তো ঐ শূন্যস্থানে তাকে আমি ভর্তি করে দিতে পারি। সব কিছু ব্যবস্থা করে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে অভিযাত্রী দলকে জানিয়ে দিলাম যে, মিঃ ন্যাচরেল-এর লোকজনদের ভুলে এখানে আমাদের কোন ট্রাংকই নেই, যদিও জুরিখ-এ যথেষ্টই আছে; কাজেই মালগাড়ি হোক আর মেরামতি গাড়িই হোক, তারা যেন প্রথম ট্রেন ধরেই

অবিলম্বে যাত্রা করে।

সে কাজ সেরে এসে মিঃ লুডি আমাকেও যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল-হ্যাঁ আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। তারপর দু'জনে মিলে ব্যাংকে গেলাম টাকা তুলতে ও আমার চুরুট এবং তামাক নিতে, চুরুটের দোকানে গেলাম লটারির টিকিট ফেরৎ দিয়ে টাকা বুঝে নিতে ও ছাতাটা ফেরৎ নিতে, মিঃ ন্যাচরেল-এর কাছে গেলাম তাড়া মিটিয়ে গাড়িটাকে ফেরৎ পাঠাতে, এবং জেলার জেলখানায় গেলাম আমার রবারের জুতো নিতে ও মেয়র এবং সুপ্রিম কোর্টকে বিদায়কালীন চিঠি (p.p.c) দিতে; আর সেই ফাঁকে মিঃ লুডি আমাকে জানাল অভিযাত্রীদলের গরম হাওয়ার কথা। বুঝলাম, কাজটা ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছি।

বিকেল ৪টা পর্যন্ত জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম; মনে আশা, ততক্ষণে হাওয়া যদি একটু ঠাণ্ডা হয়। তারপর জুরিখ-গামী তিনটের এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরবার জন্য যথাসময়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম এবং অভিযাত্রীদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। তারা এখন লুডি-র লোক। দেখলাম, তাদের সব রকম জটিল ব্যবস্থাকেই সে অনায়াসে ও বেশ ভালভাবেই চালিয়ে নিচ্ছে।

দেখুন, যতদিন স্বপদে ছিলাম, ক্রীতদাসের মত খেটেছি এবং সাধ্যমত সব কাজ করেছি; অথচ এই সব লোক শুধু আমার ত্রুটিগুলির কথাই মনে রেখেছে, ভাল কাজের কথা নয়। আমার হাজারটা ভাল কাজের কথা ভুলে গিয়ে শুধু একটা কথা নিয়েই অনবরত মাথা ঘামিয়েছে-কথাটা হল, জেনেভার ভ্রমণসঙ্গী হয়ে যত কাজ আমি করেছি তাতে একটা সার্কাসের দলকে জেরুজালেম-এ নিয়ে যাওয়া যায়, অথচ আমার দলটাকে আমি শহর থেকেই বের করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম যে এ কথা আমি আর শুনতে চাই না, শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাদের মুখের উপর বলে দিয়েছি যে কারও প্রাণ বাঁচাতে আমি আর কখনও ভ্রমণসঙ্গী হব না। যদি বেঁচে থাকি তো এ কথা আমি প্রমাণ করে যাব। এ কাজ অত্যন্ত শক্ত, মাথা ঘুলিয়ে দেয়, অতি-পরিশ্রমে শরীর কাহিল হয়ে যায়; এতে তিলমাত্র কৃতজ্ঞতার স্থান নেই; শুধু হৃদয় আহত হয় আর মন হয় রক্তাক্ত।

১৮৯১

আদম ও ইভ-এর দিন-পঞ্জী

The Diary of Adam and Eve

অংশ ১-আদম-এর দিন-পঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি

সোমবার। লম্বা চুলওয়ালা এই নতুন জীবটি পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, আমি যেখানে যাই সেখানেই যাচ্ছে। এটা আমি পছন্দ করি না; কারও সঙ্গে থেকে আমি অভ্যস্ত নই। অন্য প্রাণীদের সঙ্গে থাকলেই তো পারে।...দিনটা মেঘলা, পূবের বাতাস বইছে; মনে হচ্ছে, আমরা বৃষ্টি পাব...আমরা? এ শব্দটা কোথায় পেলাম?-এখন মনে পড়ছে-নতুন জীবটি কথাটা ব্যবহার করে।

মঙ্গলবার। বড় জলপ্রপাতটা ভাল করে দেখেছি। মনে হয়, দেশের সব চাইতে সুন্দর বস্তু। নতুন জীবটি ওটাকে বলে নায়াগারা জলপ্রপাত-কেন বলে আমি জানি না। বলে ওটাকে দেখতে নায়াগারা জলপ্রপাতের মত। এটা কোন কারণই নয়, এটা একগুঁয়েমি ও নির্বুদ্ধিতামাত্র। কোন কিছুর নামকরণের সুযোগই আমি পাই না কোন কিছু চোখে পড়ামাত্রই আমি আপত্তি জানাবার আগেই নতুন জীবটি সব কিছুর একটা নাম বলে দেয়। আর সব সময় সেই একই ওজুহাত দিয়ে বলে-জিনিসটা সেই রকমই দেখতে। যেমন ডোডো-র কথাই ধরা যাক। এক নজর দেখেই বলে ওঠে ওটা "ডোডো"-র মত দেখতে। আর সেই নামটাই থেকে যায়। এ নিয়ে তর্ক করতে আমার ভাল লাগে না, আর তর্ক করে কোন লাভও নেই। ডোডো! আমাকে যেমন ডোডোর মত দেখতে নয়, তেমনই ওটাও তাই।

বুধবার বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য একটা আশ্রয় তৈরি করেছি, কিন্তু সেখানেও শান্তিতে থাকতে পারি না। নতুন জীবটি এসে ঢুকে পড়ে। তাকে বের করে দিতে চেষ্টা করলে তার মুখে সব কিছু দেখার যে গর্ত দুটো আছে তা দিয়ে জল ঝরতে থাকে; থাবার পিছন দিকটা দিয়ে সে জল মুছে সে এমন শব্দ করতে থাকে যা অন্য প্রাণীরা দুঃখে পড়লে করে। সে যদি কথা না বলত তাহলেই ভাল হত: সব সময় বক্-বক্ করে। কথাটা শুনতে বেচারির প্রতি একটু কটূক্তির মত শোনায়, কিন্তু সে ভাবে আমি কথাটা বলি নি। আগে তো কখনও মানুষের গলা শুনি নি, তাই এখানকার এই স্বপ্নভরা নির্জনতার গম্ভীর নৈঃশব্দের মধ্যে কোন নতুন বিচিত্র শব্দ হলেই সেটা আমার কানে লাগে এবং বেসুরো মনে হয়। আর এই নতুন শব্দটা হয় আমার এত কাছে, একেবারে ঘাড়ের উপরে, প্রথম এদিকে, তার পরে ওদিকে; অথচ সাধারণত আমি তো দূর থেকে আগত শব্দ শুনতেই অভ্যস্ত।

শুক্রবার। নামকরণের কাজটা বেপরোয়াভাবে এগিয়ে চলেছে; আমার যেন কিছুই করার নেই। জায়গাটার একটা খুব ভাল নাম আমি দিয়েছিলাম, নামটা যেমন সুরেলা তেমনই সুন্দর-ইডেন উদ্যান (Garden of Eden)। এখনও গোপনে আমি ঐ নামেই ডাকি, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। নতুন জীবটি বলে যে জায়গাটা তো জঙ্গল, পর্বত আর দৃশ্যাবলীতে ভরা। কাজেই উদ্যানের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। সে বলে এটাকে দেখতে একটা পার্কের মত, পার্ক ছাড়া আর কোন কিছুর মতই এটাকে দেখায় না। ফলে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই এটার নতুন নাম রাখা হয়েছে-নায়াগারা জলপ্রপাত পার্ক। আমার মনে হয়, কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছে। আর এর মধ্যেই একটা নির্দেশিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে:

ঘাস থেকে দূরে থাকুন

আমার জীবনে আর আগের মত সুখ নেই।

শনিবার। নতুন জীবটি বড় বেশী ফল খায়। মনে হচ্ছে আমরা শীঘ্রই ফলের অভাব বোধ করব। আবার "আমরা" -কথাটা তার; তবে বারবার শুনতে শুনতে এখন আমার সয়ে গেছে। সকালে খুব কুয়াসা পড়েছে। কুয়াসায় আমি বাইরে যাই না। নতুন জীবটি যায়। সে সব ঋতুতেই বের হয়, আর কাদা-মাখা পা নিয়ে ফিরে আসে। আর কথা বলে। জায়গাটা আগে মনোরম ও শান্ত ছিল।

রবিবার। সময় কাটছে। দিনকাল ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছে। গত নভেম্বরে এই দিনটিকেই বিশ্রামের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। আগে সপ্তাহে ছ'দিনই আমার বিশ্রাম ছিল। আজ সকালে দেখলাম নতুন জীবটি সেই নিষিদ্ধ গাছ থেকে আপেল সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

সোমবার। নতুন জীবটি বলে, এটার নাম ইভ। বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই। বলে, এটাকে যখন কাছে ডাকব তখন যেন ঐ নামেই ডাকি। আমি বললাম, এর কোন দরকার ছিল না। তবে এটা ভাল, শব্দটা বারবার উচ্চারণ করা যায়। সে বলে, এটা (It) নয়, বলতে হবে সে (She)। এ কথা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে আমার কাছে দুইই সমান; সেই হোক আর যাই হোক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না, শুধু সে একা একা থাকলেই হল, কথা না বললেই হল।

মঙ্গলবার। জঘন্য নাম আর আপত্তিজনক নির্দেশিকা দিয়ে সে সমস্ত জায়গাটাকে ভরে দিয়েছে:

এই পথে জলাবর্ত
এই পথে অজ দ্বীপ
বায়ুগুহায় যাবার এই পথ

সে বলে, প্রথাটা প্রচলিত হলে এই পার্কটা একটা সুন্দর গ্রীষ্মাবাস হয়ে উঠবে। গ্রীষ্মাবাস-তার আর একটা আবিষ্কার-শুধুই কথা, কোন অর্থ নেই, গ্রীষ্মবাস আবার কি? কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল, সব কিছুরই একটা ব্যাখ্যা সে দিতে পারে।

শুক্রবার। আমি যাতে প্রপাতে না যাই সে জন্য আমাকে সে মিনতি করতে শুরু করেছে। তাতে ক্ষতিটা কি? বলে, ওকথা ভাবলেই তার গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তো অবাক; আমি তো সব সময়ই এ কাজ করে এসেছি-ওখানে ডুব দিয়েছি, ঠাণ্ডা হয়েছি। আমার তো ধারণা প্রপাতগুলো এই জন্যই হয়েছে। আমি তো তাদের আর কোন উপকারিতা দেখি না, কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তো তাদের বানানো হয়েছিল। সে বলে, ওগুলো বানানো হয়েছে শুধু দেখার জন্য-গণ্ডার ও মাস্টোডোনদের মত।

একটা পিপে নিয়ে প্রপাতে গিয়েছিলাম-সেটা তার পছন্দ নয়। গামলা নিয়ে গিয়েছিলাম-তাও পছন্দ নয়। ডুমুরের পাতার পোশাকে জলাবর্তে ও তীব্র স্রোতে সাঁতার কেটেছিলাম। তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাই আমার বাড়াবাড়ি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। এখানে অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। আমাকে জায়গা বদলাতে হবে।

শনিবার। গত মঙ্গলবার রাতে পালিয়ে এসেছি। দুই দিন একটানা হেঁটে এখানে এসেছি। নির্জন জায়গা দেখে নতুন আশ্রয় তৈরি করেছি। যতদূর সম্ভব আমার পায়ের দাগ মুছে দিয়ে এসেছি, কিন্তু একটা পশুর সাহায্যে সে আমাকে খুঁজে বের করেছে; পশুটা তার পোষা; সে নেকড়ে বলে ডাকে। এখানে এসেই আবার সেই করুণ শব্দ করতে শুরু করেছে, আর দেখার দুটো গর্তের ভিতর থেকে থেকে জল ঝরাতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার পালাব। অনেক বাজে কাজ নিয়ে সে মাথা ঘামায়। যেমন, সে জানতে চায়, সিংহ এবং ব্যাঘ্র নামক প্রাণীদের যে রকম দাঁতের গড়ন তাতে তাদের উচিত ছিল পরস্পরকে খাওয়া, কিন্তু তার বদলে কেন তারা ঘাস-পাতা-ফুল খেয়ে বাঁচে এটা সে জানতে চায়। কি বোকার মত কথা। আরে, তাহলে তো একে অপরকে হত্যা করবে, আর তার অর্থই হল যাকে বলে "মৃত্যু"-কে আমদানি করা। কিন্তু আমি তো শুনেছি, মৃত্যু এখনও পার্ক-এ প্রবেশাধিকার পায় নি। এটা তো খুবই দুঃখের কথা।

রবিবার। দিন কাটছে।

সোমবার। মনে হচ্ছে সপ্তাহের উদ্দেশ্যটা আমি বুঝতে পারছি: রবিবারের ক্লান্তির পরে ওটাই বিশ্রামের সময়। ধারণাটা বেশ ভাল বলেই মনে হয়।....সে আবার ঐ গাছে উঠেছে। ঢিল ছুড়ে তবে নামিয়ে এনেছি। সে বলল, কেউ তাকে দেখতে পায় নি। সে কোন বিপদের ঝুঁকি নেবার পক্ষে সেটাকেই সে বড় যুক্তি বলে মনে করে। সে কথা তাকে বলেছি। যুক্তি কথাটার সে প্রশংসা করছে-আবার ঈর্ষাও করেছে বলে মনে হয়। কথাটা বেশ ভাল।

মঙ্গলবার। সে আমাকে বলল, আমার শরীরের একটা পাঁজর নিয়েই নাকি তাকে তৈরি করা হয়েছে। কথাটা সন্দেহজনক তো বটেই, তবে তার চাইতে বেশী কিছু নয়। আমার কোন পাঁজর তো খোয়া যায় নি।....বাজ পাখিটাকে নিয়ে সে খুব মুস্কিলে পড়েছে; বলছে, সেটার ঘাস খেতে ভাল লাগছে না; তার ভয় হচ্ছে, সেটা হয় তো বাঁচবে না; তার ধারণা, তার বাঁচার কথা পচা মাংস খেয়ে। যা খেতে দেওয়া হবে তাই খেয়েই বাজ পাখিটার যথেষ্ট সুস্থ থাকা উচিত। বাজ পাখির সুবিধার জন্য তো আমরা সব বিধি-ব্যবস্থা পাল্টাতে পারি না।

শনিবার। গতকাল পুকুরের জলে নিজেকে দেখতে গিয়ে সে জলে পড়ে গিয়েছিল। এ কাজ সে সব সময়ই করে। তার প্রায় দম আটকে আসছিল; বলছে,তার খুব অস্বস্তি লেগেছিল। তাই জলের মধ্যে যে জীবরা থাকে তাদের জন্য তার খুব দুঃখ হয়েছে; তাদের সে ডাকে মাছ বলে; যে কোন জিনিসের একটা নাম দেবার অভ্যাস তার এখনও আছে; তাদের নামের কোন দরকারই নেই, নাম ধরে ডাকলে তারা আসেও না; সেএত বোকা যে তাতেও তার কিছু আসে যায় না। কাল রাতে অনেকগুলো মাছ ধরে এনে গরম রাখবার জন্য। আমার বিছানায় ছেড়ে দিয়েছে; সারাটা দিনই আমি তাদের উপর নজর রেখেছি; তারা যে আগের চাইতে কিছু সুখে আছে তা তো মনে হয় না, বরং কিছুটা চুপচাপ আছে বলা যায়। রাত হলেই সেগুলোকে বাইরে ফেলে দেব, কারণ দেখতে পাচ্ছি গায়ে কিছু না থাকলে তাদের সঙ্গে একত্র শুয়ে থাকা খুবই অস্বস্তিকর।

রবিবার। দিন কাটছে।

মঙ্গলবার। এবার একটা সাপ নিয়ে পড়েছে। অন্য জীবজন্তুরা এতে খুসি হয়েছে, কারণ সে সব সময়ই তাদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের নানা ভাবে উৎপাৎ করছে; আর আমি খুসি হয়েছি কারণ সাপটা কথা বলে, আর তার ফলে আমি বেশ কিছুটা বিশ্রাম পাই।

শুক্রবার। সে বলছে, সাপটা তাকে ঐ গাছের ফল খাবার পরামর্শ দিয়েছে; বলেছে, তার ফলে একটা উদার সুমহান শিক্ষা লাভ হবে। আমি তাকে বলেছি, আরও একটা ফলও হবে-তার ফলে পৃথিবীতে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটবে। বলাটা ভুল হয়েছে-কথাটা নিজের মনে রাখলেই ভাল ছিল; এতেই ধারণাটা তার মাথায় গজিয়েছে-তাহলে তো সে রুগ্ন বাজ পাখিটাকে বাঁচাতে পারে; হতাশ সিংহ ও বাঘদেরও তাজা মাংস খাওয়াতে পারে। আমি তাকে গাছটা থেকে দূরে থাকবার পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু সে তা শুনবে না। বিপদের আভাষ পাচ্ছি। চলে যাব।

বুধবার। বিচিত্রভাবে সময় কাটছে। গতরাতে পালিয়েছি; সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়েছি; মনের আশা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্ক ছেড়ে চলে যাব, বিপদ শুরু হবার আগেই অন্য কোন দেশে লুকিয়ে পড়ব; কিন্তু তা হবার নয়। সূর্য উঠবার ঘণ্টাখানেক পরে একটা ফুলে ঢাকা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি; হাজার হাজার জীবজন্তু ঘাস খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, যার যেমন খুসি পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে; হঠাৎ তাদের উপর দিয়ে আর্ত চীৎকারের ঝড় বয়ে গেল; মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত প্রান্তরটা উন্মত্ত উত্তেজনায় ভরে গেল; প্রতিটি জন্তু তার প্রতিবেশীকে সংহার করতে লাগল। এর অর্থ আমি জানতাম-ইভ সেই ফল খেয়েছে, আর মৃত্যু নেমে এসেছে পৃথিবীতে।...আমার নির্দেশ না মেনে বাঘ আমার ঘোড়াটাকে খেয়ে ফেলল; কাছে থাকলে আমাকেও খেত-কিন্তু আমি সেখানে থাকি নি, অতি দ্রুত সরে পড়েছি।....পার্কের বাইরে এই জায়গাটা পেলাম, কয়েক দিন আরামে কাটল, কিন্তু সে আমাকে আবার খুঁজে পেয়েছে। আমাকে পাবার পরে জায়গাটার নাম দিয়েছে টোনাওয়াণ্ডা-বলছে এটা দেখতে সেই রকম। আসলে সে আসায় আমি দুঃখিত হই নি, কারণ এখানে খাবার জিনিস খুব কম, আর সে ঐ আপেল কিছু নিয়ে এসেছে। এত ক্ষিধে পেয়েছিল যে আমি বাধ্য হয়ে সে আপেলগুলি খেয়েছি। এ কাজটা আমার নীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে পেট ভরা না থাকলে নীতির কোন সত্যিকারের জোর থাকে না। ....সে এবার এসেছিল গাছের ডাল ও পাতার গুচ্ছে নিজের দেহকে ঢেকে; যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ সব আজেবাজে কাজের অর্থ কি এবং ডালপালাগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলাম, তখন সে লজ্জা পেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। এর আগে কখনও কাউকে লজ্জা পেতে বা মুখ টিপে হাসতে দেখি নি; আমরা মনে হল, ও কাজটা যেমন অশোভন তেমনই বোকা-বোকা। সে বলল, ও রকম অবস্থা আমিও শিগ্‌গিরই টের পাব। কথাটা ঠিক। খুব ক্ষুধার্ত হলেও আধ-খাওয়া আপেলটা আমি রেখে দিলাম-মরশুমের শেষে এ রকম ভাল আপেল বড় একটা দেখা যায় না-এবং ঐ ফেলে দেওয়া ডালপালায় নিজেকে ঢেকে নিলাম। তারপর কঠোর গলায় তাকে হুকুম করলাম,এখনই গিয়ে আরও কিছু আপেল যেন সে নিয়ে আসে এবং এবার যেন ওরকম সং সেজে না আসে। সে তাই করল। তারপর যেখানটায় বন্যপশুদের লড়াই হয়েছিল আমরা দু'জন হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গেলাম, কিছু চামড়া সংগ্রহ করলাম এবং তা দিয়ে উৎসবের উপযোগী দুটো পোশাক বানিয়ে নিলাম। একথা ঠিক যে সেগুলো অস্বস্তিকর, কিন্তু বেশ কেতাদুরুস্ত, আর পোশাকের সেটাই তো আসল কথা।....এখন দেখছি সাথী হিসাবে সে ভালই। মনে হচ্ছে, তাকে ছাড়া আমার খুব নিঃসঙ্গ ও মন-মরা লাগবে। আর একটা কথা; সে বলছে, এখন থেকে আমাদের খাবার আমরা নিজেরাই তৈরি করব। এটাই বিধি। সে কাজ করবে। আমি তদারক করব।

দশ দিন পরে। আমাদের দুর্বিপাকের কারণ হিসাবে সে আমাকেই দায়ী করেছে। সে বলছে, আপাতদৃষ্টিতে আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গেই বলেছে, নিষিদ্ধ ফল যে আপেল নয়, সেটা বাদাম-সে কথা সাপ তাকে নিশ্চিত করেই বলেছে। আমি বললাম, তাহলে তো

আমি নির্দোষ, কারণ কোন রকম বাদাম আমি খাই নি। সে জানাল, সাপ তাকে জানিয়েছে যে "বাদাম" একটি আলংকারিক শব্দ; তার অর্থ একটি সেকেলে ছাতা-পরা ঠাট্টা। আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কারণ সময় কাটাবার জন্য ও ধরনের ঠাট্টা। আমি অনেক করেছি, অবশ্য ঠাট্টা করবার সময় আমার ধারণা ছিল যে ওগুলো সবই নতুন। সে জানতে চাইল, ঠিক দুর্বিপাকের সময় কোন ঠাট্টা আমি করেছিলাম কিনা। আমি বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছি যে মনে মনে একটা ঠাট্টা আমি করেছিলাম, যদিও সেটা মুখে উচ্চারণ করি নি। সেটা এই। প্রপাতের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মনে বলেছিলাম, "সেই প্রচণ্ড জলধারা সেখানে যেভাবে আছড়ে নীচে পড়ছে দেখতে অবাক লাগে।" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল; আমি বললাম, "সেটা যদি সেখানে উথলে উপরে ওঠে তাহলে সেটা আরও অবাক ব্যাপার হবে!"-সে কথা ভাবতে গিয়ে হাসতে হাসতে আমার প্রায় খুন হবার যোগাড় এমন সময় গোটা প্রকৃতি জুড়েই যুদ্ধ ও মৃত্যুর উন্মাদ নৃত্য শুরু হয়ে গেল, আর আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেলাম। সে বিজয় গৌরবে বলে উঠল, "ঐ তো, এটাই ব্যাপার; এই ঠাট্টাটা উল্লেখ করেই সাপ এটাকে বলেছে 'প্রথম বাদাম' আর এটা সৃষ্টির গোড়া থেকেই আছে।" হায়রে, সত্যি আমারই তো দোষ। অতটা চতুর যদি আমি না হতাম; আহা, ঐ উজ্জ্বল চিন্তাটা যদি আমার মনে না আসত!

পরের বছর। আমরা তার নাম রেখেছি কেইন। এরি-র উত্তর তীরে আমি যখন জাল ফেলে বেড়াচ্ছিলাম তখন সে ওকে ধরেছে। আমাদের গর্তের আশ্রয় থেকে মাইল দুই দূরে-চার মাইলও হতে পারে কি না সে সঠিক জানে না-একটা গাছ থেকে সে তাকে ধরেছে। সেটা দেখতে অনেকটা আমাদের মত; আমাদের কোন আত্মীয়ও হতে পারে। তার তাই ধারণা, কিন্তু আমার মতে এটা ভুল। আকারের পার্থক্য থেকেই প্রমাণ হয় যে সেটা একটা নতুন ধরনের জীব-হয় তো মাছ, যদিও ব্যাপারটা বুঝবার জন্য আমি যখন সেটাকে জলে ফেলে দিলাম তখন সেটা ডুবে গেল, আর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগেই সে জলে ডুব দিয়ে সেটাকে উপরে তুলে নিয়ে এল। আমি এখনও মনে করি সেটা মাছ, কিন্তু তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই; সেটা যাই হোক না কেন, তাকে নিয়ে কোন রকম পরীক্ষা চালাতে সে আমাকে দেবে না। আমি এটা বুঝতে পারি না। এই জীবটির আসার ফলে তার স্বভাবের বেশ পরিবর্তন হয়েছে; পরীক্ষা করার ব্যাপারে কোন যুক্তিই সে মানে না। অন্য কোন জীবের চাইতে সেটার সম্পর্কে সে অনেক বেশী ভাবনা-চিন্তা করে; কেন করে তা বোঝাতে পারে না। তার মনটাই এলোমেলো হয়ে গেছে-সব কিছু থেকেই তা বোঝা যায়। মাছটা যখন খুঁতখুঁত করে আর জলে যেতে চায় তখন অর্ধেক রাত সে তাকে কোলে নিয়ে কাটায়। সে সময় মুখের সে জায়গা দিয়ে সে দেখে সেখান থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মাছটার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় মুখে অস্পষ্ট শব্দ করে তাকে শান্ত করে এবং আরও শতেক রকমে দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। অন্য কোন মাছকে নিয়ে তাকে কখনও এ রকম করতে দেখি নি। তাই আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি হারাবার আগে সে এই ভাবে বাঘের বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত, তাদের সঙ্গে খেলা করত; কিন্তু সে তো ছিল খেলামাত্র; তারা যখন খেতে চাইত না তখন তো সে তাদের নিয়ে এ রকম করত না।

রবিবার। রবিবারে সে কোন কাজ করে না; ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, আর মাছটা তার বুকের উপর খেলা করতে থাকে; সেটাকে খুসি করবার জন্য নানা রকম অর্থহীন শব্দ করে, কখনও থাবাটা কামড়ে দেবার ভান করে, আর সেটা হেসে ওঠে। হাসতে পারে এ রকম কোন মাছ আমি আগে দেখি নি। তাই আমার সন্দেহ হয়....আমি নিজেও বুঝি রবিবারকে ভালবাসতে শিখেছি। সারা সপ্তাহ তদারকির কাজ করে এত শ্রান্ত হয়ে পড়ি। আরও রবিবার থাকা উচিত। আগেকার দিনে রবিবারগুলো ছিল কঠোর। কিন্তু এখন তারা আরামের হয়ে উঠেছে।

বুধবার। এটা মাছ নয়। এটা যে কি তাও বুঝতে পারি না। ক্ষেপে গেলেই এটা অদ্ভুত সব শয়তানী শব্দ করতে থাকে, আর খুসি থাকলে "গু-গু" করে। এটা আমাদের কেউ নয়, কারণ এ হাঁটে না; এটা পাখি নয়, কারণ ওড়ে না; এটা ব্যাঙ নয়, কারণ লাফায় না; এটা সাপ নয়, কারণ বুকে হাঁটে না; আমি নিশ্চিত জানি যে এটা মাছও নয়, যদিও এটা সাঁতার কাটতে পারে কি না সে পরীক্ষা করার সুযোগ এখনও পাই নি। এটা শুধু শুয়ে থাকে, অধিকাংশ সময়ই চিৎ হয়ে পা নাচায়। আগে কখনও কোন জীবকে এ রকম করতে দেখি নি। আমার বিশ্বাস, এটা একটা প্রহেলিকা। সে কিন্তু অর্থ না বুঝেই কথাটার খুব প্রশংসা করল। আমার মতে এটা প্রহেলিকাও নয়, ছারপোকাও নয়। এটা যখন মারা যাবে, তখন এটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখব এর মধ্যে কি আছে। আর কোন কিছুই আমাকে এতটা হতবুদ্ধি করতে পারে নি।

তিন মাস পরে। হতবুদ্ধিকর ভাবটা কমার বদলে বেড়েই চলেছে। সামান্যই ঘুম হয়। এটা এখন শুয়ে না থেকে চার পায়ে ঘুরে বেড়ায়। অথচ অন্য সব চার-পেয়ে জন্তুর থেকে এটা আলাদা, কারণ এর সামনের পা দুটো অস্বাভাবিক রকমের ছোট; ফলে এর শরীরের বেশীর ভাগ অংশটাই অস্বস্তিকরভাবে উঁচু হয়ে থাকে, আর সেটা দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। এর দেহ-গঠন অনেকটা আমাদের

মতই, কিন্তু চলাফেরার ধরন দেখে মনে হয় এটা আমাদের সন্তান নয়। সামনের ছোট পা আর পিছনের লম্বা পা দেখে মনে হয় এটা ক্যাঙারু জাতের প্রাণী, কিন্তু এটা ক্যাঙারু নয়, একটা আলাদা শ্রেণী, কারণ সত্যিকারের ক্যাঙারু লাফিয়ে চলে, আর এটা কখনও লাফায় না। তবু এটা একটা বিচিত্র আকর্ষণীয় জীবশ্রেণী; এখনও এদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় নি। যেহেতু আমি একে আবিষ্কার করেছি, তাই এর সঙ্গে আমার নামটা জুড়ে দিয়ে সেই আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করবার অধিকার অবশ্যই আমার কাছে, আর সেই জন্যই এটার নাম দিয়েছি "ক্যাঙারুরাম আদমিয়েন্‌সিস্"।.....যখন এসেছিল তখন নিশ্চয় খুব ছোট ছিল, কারণ তারপর থেকে এটা অনেকটা বেড়ে গেছে। আকারে তখনকার তুলনায় পাঁচ গুণ বড় হয়ে গেছে, আর রাগলে যা শব্দ করতে পারে সেটা আগের তুলনায় বাইশ থেকে আটত্রিশ গুণ বেশী। জোর করলে এটার গলা থামে না, বরং উল্টো ফল হয়। সে কারণে আমি জোর করা ছেড়ে দিয়েছি। সে কিন্তু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এটাকে শান্ত করে, এমন সব জিনিস দিয়ে এটাকে ভোলায় যা সে কাউকে দেবে না বলে আগে আমাকে বলত। আগেই বলেছি, এটা যখন প্রথম আসে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না; সে আমাকে বলেছিল, জঙ্গলের মধ্যে এটাকে পেয়েছি। এটাও আশ্চর্য যে এ রকম প্রাণী শুধু একটাই আছে; অথচ আসলে তাই, কারণ আমার সংগ্রহে এ রকম আর একটি প্রাণী যোগ করতে, এবং এটার জন্য একটি খেলার সাথীর ব্যবস্থা করতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এ রকম আর একটি প্রাণী খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান হয়ে গেছি। এ রকম আর একটি খেলার সঙ্গী পেলে এটা অনেক শান্ত থাকত, এবং এটাকে পোষ মানানোও অনেক সহজ হত। কিন্তু কোথাও পাই নি, কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে নি; আর সব চাইতে আশ্চর্য, একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। একে তো মাটির উপরেই থাকতে হয়, তাহলে পায়ের ছাপ না রেখে চলাফেরা করে কেমন করে? এক ডজন ফাঁদ পেতেছি। কোন ফল হয় নি। ঐ রকমটি ছাড়া আর সব রকম ছোট প্রাণী ধরেছি। সাধারণত ফাঁদের ভিতরকার দুধের লোভেই সে সব জীব ফাঁদে ঢোকে। কিন্তু এরা কখনও দুধ খায় না।

তিন মাস পরে। ক্যাঙারু ক্রমেই বড় হচ্ছে; সেটাই আরও আশ্চর্য ও হতবুদ্ধিকর। এত দীর্ঘদিন ধরে বড় হতে তো কোন প্রাণীকে দেখি না। এখন এটার মাথায় লোম গজিয়েছে; ক্যাঙারুর মত লোম নয়, অনেকটা আমাদের চুলের মত, তবে আরও পাতলা ও নরম, এবং কালোর বদলে লাল। জীব জগতের এই বিচিত্র খেয়ালী সৃষ্টিটির খামখেয়ালী ও হতবুদ্ধিকর কাণ্ড-কারখানা দেখে আর মাথা খারাপ হবার যোগাড়। যদি আর একটাকে পেতাম-কিন্তু সে আশাও নেই; এটা একটা নতুন জীবশ্রেণী: একমাত্র নিদর্শন; সেটা পরিষ্কার। যাই হোক, একটা সত্যিকারের ক্যাঙারু ধরে নিয়ে এলাম; ভাবলাম, এটা তো একেবারেই সঙ্গীহীন অবস্থায় আছে, তাই হয় তো একটা সঙ্গী পেলে তবু কিছুটা স্বস্তি পাবে। কিন্তু আমারই ভুল হয়েছিল-ক্যাঙারুটাকে দেখেই এটা এমন ক্ষেপে গেল যে বুঝতে পারলাম আগে এ কখনও ক্যাঙারু দেখেই নি। বেচারির জন্য আমার করুণা হয়, কিন্তু কিছুতেই তো এটাকে সুখী করতে পারছি না। যদি পোষ মানাতে পারতাম-কিন্তু সে প্রশ্নই ওঠে না; সে চেষ্টা যত করেছি অবস্থা ততই বেশী শোচনীয় হয়েছে। বেচারি যখন দুঃখে ও ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তখন আমিও দুঃখ পাই। আমি এটাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তো তা শুনবে না।

পাঁচ মাস পরে। এটা ক্যাঙারু নয়। না, কারণ তার আঙুল ধরে এটা এখন দাঁড়াতে পারে; পিছনের পায়ে ভর রেখে কয়েক পা এগিয়েই পড়ে যায়। সম্ভবত এটা এক ধরনের ভালুক; কিন্তু এর তো লেজ নেই, আর মাথার উপরে ছাড়া আর কোথাও লোমই নেই। এটা এখনও বেড়েই চলেছে-সেটাই আরও আশ্চর্য, কারণ ভালুকদের বাড় আরও আগেই থেমে যায়। ভালুকরা বড়ই বিপজ্জনক; সেটা যে সব সময় আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে সেটা আমি চাই না। তাকে বললাম, এটাকে ছেড়ে দিলে তাকে একটা ক্যাঙারু এনে দেব; কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না-আমাদের সব রকম অকারণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে সে যেন বদ্ধপরিকর। মাথা খারাপ হবার আগে সে এ রকম ছিল না।

পক্ষকাল পলে। এটার মুখ পরীক্ষা করে দেখেছি। এখনও ভয়ের কিছু নেই: মাত্র একটা দাঁত গজিয়েছে। এখনও কোন লেজ নেই। এখন আগের চাইতে অনেক বেশী হট্টগোল করে-বিশেষ করে রাতে। আমি বেরিয়ে এসেছি, সকালে যখন প্রাতরাশ খাব তখন আর একবার দেখব আরও দাঁত উঠেছে কি না। মুখ ভর্তি দাঁত উঠলেই এটাকে তাড়াব,লেজ হোক আর নাই হোক, কারণ বিপজ্জনক হবার জন্য ভালুকের কোন লেজের দরকার হয় না।

চার মাস পরে। এক মাস হল এমন একটা অঞ্চলে শিকার করতে ও মাছ ধরতে এসেছি যাকে সে "মহিষ" বলে; কেন বলে তা জানি না, তবে এ অঞ্চলে কোন মোষ নেই সেটা কারণ হলেও হতে পারে। ইতিমধ্যে ভালুকটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে একা একাই হাঁটতে পারে এবং "পপ্‌সা" ও "মম্‌সা" বলে। অবশ্যই এটা একটা নতুন ধরনের জীব। এই কথার মিল সম্পূর্ণ আকস্মিকও হতে পারে, হয় তো এর কোন উদ্দেশ্য বা অর্থও নেই, কিন্তু তবু এটা খুবই অসাধারণ এবং আর কোন ভালুকই এ রকমটা করতে পারে না। এই কথা

নকল করবার ক্ষমতা, লোম ও লেজ না থাকা-সব মিলিয়ে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা নতুন ধরনের ভালুক। একে নিয়ে আরও পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় হবে। ইতিমধ্যে আমি উত্তরের অরণ্যে বহু দূরে অভিযানে বের হব এবং ব্যাপক অনুসন্ধান চালাব। কোথাও না কোথাও এটার একজন সাথী অবশ্য আছে, আর তাকে পেলেই এর বিপজ্জনক ভাব অনেকটা কেটে যাবে। আমি সোজা চলে যাব; কিন্তু তার আগে এটার মুখে লাগাম পরিয়ে দেব।

তিন মাস পরে। অনেক খুঁজেছি, খুঁজে হয়রান হয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে না বেরিয়েই সে আর একটাকে ধরেছে! এমন ভাল কপাল আমি আর দেখি নি। আমি তো একশ' বছর ধরে বনে বনে ঘুরলেও আর একটার দেখা পেতামা না।

পরদিন। পুরনোটার সঙ্গে নতুনটাকে মিলিয়ে দেখেছি; এটা খুবই পরিষ্কার যে তারা একই বংশের সন্তান। আমার সংগ্রহশালার জন্য দুটোর একটাকে খড় ভর্তি

করে রেখে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যে কারণেই হোক সে তার ঘোর বিরোধী। কাজেই সে চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি, যদিও আমি মনে করি যে এটা ভুল হয়েছে। তারা পালিয়ে গেলে বিজ্ঞানের পক্ষে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বড়টা আগের চাইতে অনেক শান্ত হয়েছে; এখন হাসতে পারে, তোতা পাখির মত কথা বলতে পারে; অবশ্য তোতা পাখিটার সঙ্গে এত বেশী সময় থাকার জন্য এবং নকল করবার অত্যধিক ক্ষমতার ফলেই সেটা এ সব শিখতে পেরেছে। এটা একটা নতুন ধরনের কাকাতুয়া হয়ে ওঠে তাহলে খুবই অবাক হব; অথচ অবাক হওয়া উচিত নয়, কারণ সেই প্রথম দিকে এটা যখন মাছ ছিল তারপর থেকে সেটা তো অনেক কিছুই হয়েছে। বড়টা গোড়ায় যে রকম কুৎসিত ছিল নতুনটাও এখন ঠিক সেই রকম দেখতে; সেই একই গন্ধক ও কাঁচা মাংস মেশানো রং, সেই একই লোমহীন মাথা। সে এটার নাম রেখেছে আবেল।

দশ বছর পর। দুটিই ছেলে; অনেকদিন আগেই সেটা বুঝেছি। খুব ছোট, অপরিণত আকার নিয়ে এসেছিল বলেই আমরা বুঝতে পারি নি; এ রকমটা দেখতে তো আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। আবেল ভাল ছেলে। কেইন যদি ভালুকই থাকত তাহলে এটা তাকে ভাল করে তুলত। এত বছর পরে বুঝতে পারছি যে গোড়ায় ইভ সম্পর্কে আমারই ভুল হয়েছিল; তাকে ছাড়া উদ্যানের ভিতরে থাকার চাইতে তাকে নিয়ে উদ্যানের বাইরে থাকাই ভাল। প্রথমে ভেবেছিলাম সে বড় বেশী কথা বলে; কিন্তু আজ যদি সে কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে যায় আমার জীবন থেকে বিদায় নেয়ে তাহলে আমি বড় দুঃখ পাব। যে বাদাম আমাদের দু'জনকে কাছে এনেছিল এবং তার অন্তরের সততা ও আত্মার মধুরতা জানবার শিক্ষা আমাকে দিয়েছিল,তার জয় হোক!

অংশ ২-ইভ-এর দিনপঞ্জী

(মূল থেকে ভাষান্তরিত)

শনিবার। আমার বয়স এখন প্রায় পুরো একদিন। আমি কাল এসেছি। আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে। আর আসলেও তাই, কারণ গত-পরশু বলে কিছু যদি থাকেও তখন আমি ছিলাম না; থাকলে আমার মনে থাকত। অবশ্য এও হতে পারে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল, কিন্তু আমি খেয়াল করি নি। খুব ভাল কথা;এখন থেকে আমি সতর্ক থাকব; যদি কোন গত-পরশু দেখা দেয়, আমি সেটা টুকে রাখাব। শুরুটা সঠিক হওয়াই ভাল; কোন প্রামাণ্য দলিল গোলমেলে হওয়া ঠিক নয়; আমার মন বলছে, এই সব বিবরণ একদিন ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। আমার নিজেকেও একটা পরীক্ষা বলে মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে 'আমাকে নিয়েই একটা পরীক্ষা চলেছে। ক্রমেই আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে আসলে এটাই আমার অস্তিত্ব-আমি একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নই।'

আমি যদি একটা পরীক্ষা হই, সে ক্ষেত্রেও আমিই কি সে পরীক্ষার সব? না তা মনে করি না; আমার ধারণা, বাকিটাও তারই অংশ। আমি প্রধান অংশ হলেও, বাকিদেরও এতে অংশ আছে বলে মনে করি। আমার এই প্রাধান্য কি নিশ্চিত, না কি সেজন্য আমাকে সতর্ক থাকতে হবে, যত্নবান হতে হবে? হয় তো পরেরটাই ঠিক। আমার মন বলছে, চিরন্তন প্রহরা দিয়েই প্রাধান্যের মূল্য দিতে হয়। [কথাটা বড় ভাল বলে আমার মনে হয়।]

গতকালের তুলনায় আজ সব কিছুই ভাল মনে হচ্ছে। গতকাল তাড়াহুড়া করে শেষ করতে গিয়ে পাহাড়গুলোকে এবড়ো-খেবড়ো অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছিল, আর প্রান্তরগুলোকে আজেবাজে জিনিস দিয়ে এতই ভর্তি করে রাখা হয়েছিল যে দৃশ্যগুলো খুবই পীড়াদায়ক লাগছিল। মহৎ ও সুন্দর শিল্পসৃষ্টির বেলায় কখনও তাড়াহুড়া করতে নেই; আর এই বিরাট নতুন জগৎটা নিশ্চয়ই একটা

মহৎ ও শিল্পকর্ম। সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও এ সৃষ্টি বিস্ময়করভাবে সম্পূর্ণতার প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। কোথাও তারাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে, আবার কোথাও বা কম হয়েছে; তবে এ ত্রুটি কে তো অচিরেই সংশোধন করা যাবে। গত রাতে চাঁদটা খসে পড়ে পুরো পরিকল্পনাটার বাইরে চলে গিয়েছিল-সেটা খুবই বড় রকমের ক্ষতি; সে কথা ভাবলেও আমার বুক ভেঙে যায়।অলংকরণ ও সাজসজ্জার দিক থেকে এমন আর কিছু নেই যাকে সৌন্দর্য ও নৈপুণ্যের বিচারে এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। চাঁদটাকে আরও ভাল করে এঁটে দেওয়া উচিত ছিল। আবার যদি তাকে ফিরে পেতাম-

কিন্তু সে চাঁদ যে এখন কোথায় আছে তা কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া, যেই ওটাকে পাবে সেই তো লুকিয়ে ফলবে। আমি জানি, কারণ আমিও তাই করতাম। আমার বিশ্বাস, অন্য সব ব্যাপারে আমি সৎ হতে পারি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি উপলব্ধি করছি যে সুন্দরের প্রতি ভালবাসাই আমার অন্তরের প্রকৃত স্বরূপ; আর চাঁদ যদি অপরের সম্পত্তি হয় এবং সেই অপর লোক যদি না জানে যে চাঁদটা আমার কাছে আছে, তাহলে সে চাঁদের ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করাটা মোটেই নিরাপদ নয়। দিনের বেলায় চাঁদকে পেলে আমি হয় তো দিয়ে দিতে পারতাম, কারণ সে ক্ষেত্রে আমার ভয় থাকত যে কেউ হয়তো দেখে ফেলেছে; কিন্তু অন্ধকারে পেলে কোন না কোন অজুহাতে নিশ্চয় কাউকে কিছু বলতামই না। কারণ চাঁদদের আমি ভালবাসি, তারা এত সুন্দর,এত রোমান্টিক। পাঁচ ছ'টা চাঁদ থাকলে কত ভাল হত; শুতেই যেতাম না; শেওলা-ধরা নদী-তীরে শুয়ে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে কখনও শ্রান্ত বোধ করতাম না।

তারারাও ভাল।তাদের কয়েকটিকে যদি আমার চুলে গুঁজে রাখতে পারতাম। কিন্তু তা বোধ হয় কোন দিনই পারব না। তারা যে কত দুরে থাকে তা জানলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, কারণ তাদের দেখে সেটা বোঝা যায় না। গত রাতে প্রথম যখন তাদের দেখলাম, তখন একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে কয়েকটাকে পাড়তে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু-লাঠিটা অত দূর গেল না দেখে আমার অবাক লাগল; তারপর ঢিল ছুড়তে চেষ্টা করলাম। ক্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু একটা তারাও পেলাম না। তার কারণ আমি ন্যাটা, তাই ভাল ছুড়তে পারি না তাতে আমার কান্না পেল; আমার বয়সের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে একটা ঝুড়ি হাতে সেই জায়গাটার উদ্দেশে যাত্রা করলাম যেখানে আকাশের বৃত্তটা মাটির সঙ্গে মিশেছে এবং তারাগুলি মাটির এত কাছাকাছি এসেছে যে হাত বাড়িয়েই তাদের তুলে নিতে পারব। আসলে সেই ব্যবস্থাই তো ভাল, কারণ এতে তারাগুলোকে না ভেঙেই আস্ত তুলে নেওয়া যাবে। কিন্তু জায়গাটা যত কাছে ভেবেছিলাম তা নয়; তাই সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। এত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে পা আর চলতে চায় না; তাছাড়া, পায়ে বেশ ঘাও হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতেও ফিরতে পারলাম না; অনেকটা পথ, আর বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল; কতকগুলো বাঘের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাদের কাছেই আশ্রয় নিলাম। বেশ আরামেই কাটল; তাদের নিঃশ্বাস বেশ মিষ্টি ও সুখকর, কারণ তারা স্ট্রবেরি ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। আগে কখনও বাঘ দেখি নি, কিন্তু গায়ের ডোরা-কাটা দাগ দেখে এক মিনিটেই চিনে ফেললাম। তাদের একটা চামড়া যদি পেতাম তাহলে চমৎকার একটা গাউন হত।

আজ দূরত্ব সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক বেড়েছে। কোন ভাল জিনিস দেখলেই সেটা নিতে ইচ্ছা করছে; অনেক সময় জিনিসটা অনেক দূরে, আবার অনেক সময় মাত্র ছ' ইঞ্চি দূরে হলেও মনে হয় যেন এক ফুট দূরে। যাহোক সেটাকে ধরতে গিয়েই দেখি কাঁটা বিধছে। একটা শিক্ষা হল; নিজের মাথা থেকে একটা সত্যও আবিষ্কার করলাম-এই আমার প্রথম সত্য: কাঁটাকে পরিহার করে চল। আমার মত অল্প বয়সীর পক্ষে এটা জানা খুব ভাল।

আরও একটা পরীক্ষার বস্তুকে দেখলাম। গতকাল অপরাহ্নে দূর থেকে দেখলাম। প্রথম বুঝতে পারলাম না। মনে হল একটা মানুষ। আগে কখনও মানুষ দেখি নি, কিন্তু এটা দেখতে মানুষেরই মত; সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। মনে হল, অন্য সব সরীসৃপের চাইতে এটার প্রতি আমার কৌতূহল বেশী। আমার ধারণা এটাও সরীসৃপ, কারণ এরও চুল নোংরা, আর চোখ নীল; দৃষ্টিও সাপের মত। এর উরু নেই; গাজরের মত উঠে গেছে; যখন দাঁড়ায় তখন ভারোত্তলক যন্ত্রের মত ছড়িয়ে পড়ে; তাই আমি মনে করি এটা সরীসৃপ, যদিও কোন স্থাপত্যও হতে পারে।

প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, যতবার এটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল ততবারই দৌড়তে শুরু করেছিলাম, কারণ মনে হয়েছিল যে এটা আমাকে তাড়া করবে; কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারলাম, এটাই পালাবার চেষ্টা করছে; কাজেই আমার ভয় ভেঙে গেল; গজ বিশেক দূরে থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে এটার পিছু নিলাম; শেষ পর্যন্ত খুব চিন্তিত হয়ে এটা একটা গাছে চড়ে বসল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

আজ আবার সেই একই ঘটনা। আবার এটা গাছে চড়ে বসল।

রবিবার। এটা এখনও গাছেই রয়েছে। নিশ্চয় বিশ্রাম করছে। কিন্তু ওটা চালাকি: রবিবার তো বিশ্রামের দিন নয়; সেজন্য রয়েছে শনিবার। মনে হচ্ছে, এ জীবটি সব চাইতে বেশী ভালবাসে বিশ্রাম করতে। এত বিশ্রাম নিলে তো আমি ক্লান্ত বোধ করতাম। বসে বসে গাছটাকে পাহারা দিতেই তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কেন যে ওখানে বসে আছি জানি না; কিছুই তো করতে দেখি না।

গতকাল তারা চাঁদটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে আমার যে কী ভালই লাগছে! তারা খুব সৎ লোক। চাঁদটা আবার ঝুলে খসে পড়ল; কিন্তু এবার আমার দুঃখ হল না; এত ভাল প্রতিবেশী থাকলে দুঃখের কোন কারণ নেই; তারা আবার ওটা এনে দেবে। কোন রকমে এই কাজের জন্য তাদের যদি ধন্যবাদ জানাতে পারতাম। তাদের জন্য কিছু তারা পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, কারণ আমাদের তো দরকারের চাইতেও বেশী তারা আছে। আমাদের নয়, আমি বলতে চেয়েছি আমার, কারণ ঐ সরীসৃপটি এ সব নিয়ে মাথাই ঘামায় না।

এটার রুচি খুব নীচু, আর মোটেই দয়ালু নয়। কাল গোধূলি বেলায় সেখানে গিয়ে দেখি, নীচে নেমে এসে জলাশয়ের চিত্র-বিচিত্র ছোট মাছগুলোকে ধরবার চেষ্টা করছে; ঢিল ছুড়ে এটাকে আবার গাছে চড়তে বাধ্য করে তবে মাছগুলিকে বাঁচালাম। কী আশ্চর্য, এটার কি এই কাজ নাকি? এটার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? ঐ ছোট প্রাণীগুলির প্রতি ওর কি মমতা নেই? এ রকম অভদ্র কাজের জন্যইচ কি ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? দেখে তো তাই মনে হল। একটা ঢিল পিঠে লাগতেই এটা কথা বলেছিল। শুনে আমার খুব ভাল লেগেছিল, কারণ নিজের কথা ছাড়া এই প্রথম আমি কারও কথা শুনলাম। কথাগুলোর অর্থ আমি বুঝি নি, কিন্তু মনে হল সেগুলো অর্থপূর্ণ।

যখন দেখলাম এটা কথা বলতে পারে তখনই ওর প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। কারণ আমি কথা বলতে ভালবাসি; সারাদিন কথা বলি, ঘুমের মধ্যেও কথা বলি; কথা বলতে আমার ভাল লাগে, কিন্তু কথা বলার একজন সঙ্গী পেলে আরও দ্বিগুণ ভাল লাগত; তাহলে কেউ চাইলে আমি কথা থামাবই না।

এই সরীসৃপটা যদি মানুষ হয়, তাহলে তো আর "এটা" বলা চলে না। সেটা ব্যাকরণ সম্মত হবে না, হবে কি? মনে হয়, হওয়া উচিত-সে। আমি তো তাই মনে করি। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদে শব্দটা এই রকম হবে: কর্তৃকারকে-সে; কর্মকারকে-তাকে; সম্বন্ধপদে-তার। যাই হোক, যতদিন অন্য পরিচয় প্রকাশ না পাচ্ছে ততদিন আমি ওকে মানুষ বলেই মনে করব। নানান অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার চাইতে এটাই সুবিধাজনক।

পরের সপ্তাহ রবিবার। সারাটা সপ্তাহ তার পিছনে ঘুরে পরিচয় করতে চেষ্টা করলাম। যা কিছু কথা আমাকেই বলতে হল, কারণ সে বড়ই লাজ্জুক। তাতে আমি কিছু মনে করি নি। আমাকে পেয়ে তাকে খুসিই মনে হল। আমিও বারবার "আমরা" কথাটাই ব্যবহার করলাম, আর তাকে এ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত করায় সে একটু আহ্লাদিত হল বলেই মনে হল।

বুধবার। আমাদের দিন খুব ভালই কাটছে; পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। সে আর আমাকে এড়িয়ে চলতে চায় না। এটা খুব ভাল লক্ষণ; এতেই বোঝা যায়, সে চায় যে আমি তার সঙ্গে থাকি। তাতে আমিও খুশি; সব রকমেই আমি তার কাজে লাগতে চাই, যাতে আমার প্রতি তার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। গত দু'একদিন যাবৎ জিনিসপত্রের নামকরণের কাজটা তার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছি; এ ব্যাপারে তার কোনরকম দক্ষতা না থাকায় সেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে এবং অবশ্যই আমার প্রতি কৃতজ্ঞও হয়েছে। যখনই কোন নতুন জীব দেখতে পাই, আমিই আগ বাড়িয়ে তার নামকরণ করে ফেলি, যাতে তার অর্থহীন নীরবতাটা ধরা পড়ে না যায়। এই ভাবে অনেক অসুবিধার হাত থেকে তাকে আমি রক্ষা করেছি। তার মত ত্রুটি আমার নেই। যে কোন জন্তুর উপর চোখ পড়লেই আমি বুঝতে পারি সেটা কি। মুহূর্তও ভাবতে হয় না; যেন অন্তর্নিহিত কোন প্রেরণা থেকেই সঠিক নামটা জিতে এসে যায়। সত্যি তাই, কারণ আধ মিনিট আগেও আমি ওই নামটা জানতাম না। তার আকৃতি ও কাজের ধরন দেখেই আমি বুঝতে পারি সেটা কোন জন্তু।

যখন ডোডোকে দেখলাম, তখন সে ভেবেছিল ওটা বনবিড়াল-তার চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে বাঁচিয়ে দিলাম। কিন্তু পাছে তার গর্বে আঘাত লাগে সেদিকেও আমার খেয়াল ছিল। স্বাভাবিক বিস্ময়ের সঙ্গেই আমি বলে উঠলাম, 'আরে, আমি বলছি, এটা ডোডো না হয়েই যায় না।" কেমন করে ওটাকে ডোডো বলে চিনলাম সে কথা বুঝিয়ে বললাম, যদিও এমন ভাব দেখালাম যে আমি কিছুই বুঝিয়ে বলছি না। যদিও আমার মনে হল যে এতে তার অভিমানে একটু আঘাত লেগেছে, তবু সে

আমার প্রশংসাই করল। তার এই আচরণ আমার খুব ভাল লাগল; ঘুমোবার আগে অনেকবার খুশি মনে কথাটা ভাবলাম। যত সামান্যই হোক, অর্জিত কোন সুখ আমাদের কত খুসিই না করে!

বৃহস্পতিবার। আমার প্রথম দুঃখ। গতকাল সে আমাকে এড়িয়ে গেল; মনে হল আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না; মনে হল কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আমি তার সঙ্গে থাকতে ভালবাসি, তার কথা শুনতে ভালবাসি, তাহলে আমি কিছু না করা সত্ত্বেও সে আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হবে কেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্য বলে মনে হল। সেখান থেকে সরে গিয়ে আমি একা একা সেইখানটায় গিয়ে বসলাম যেখানে একদা সকালে তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। সেদিনই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল; আমি তাকে চিনতাম না, তাকে নিয়ে আমার কোন আগ্রহও ছিল না। কিন্তু আজ সেটা বড়ই দুঃখের জায়গা; সব কিছুতেই তার স্মৃতি জড়ানো; আমার বুক ব্যথায় ভরে গেল। কেন এমন হল জানি না। কারণ এ এক সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি; আগে কখনও এ অভিজ্ঞতা আমার হয় নি; সবই কেমন রহস্যময়; কিছুই বুঝতে পারছি না।

যখন রাত নেমে এল, এ নির্জনতা আমি সহ্য করতে পারলাম না। তার নতুন তৈরি আশ্রয়ে চলে গেলাম; তার কাছে জানতে চাইলাম আমি কি দোষ করেছি, কি করলে তার প্রতিকার হবে এবং তার দয়া আমি আবার ফিরে পাব। কিন্তু সে বৃষ্টির মধ্যে আমাকে বের করে দিল। এই আমার প্রথম দুঃখ।

রবিবার। আবার ভাল লাগছে; এখন আমি সুখী। কিন্তু সে দিনগুলি ছিল দুঃখে ভারাক্রান্ত: পারলে সে দিনের কথা আমি ভাবিও না।

কিছু আপেল তাকে দিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সরাসরি ছুড়তে তো আমি শিখি নি, তাই পারলাম না; কিন্তু আমার শুভেচ্ছা তাকে খুসি করেছে। ফলগুলি নিষিদ্ধ; সে বলেছে, এতে আমার ক্ষতি হবে। কিন্তু তাকে খুসি করতে গিয়ে যদি আমার ক্ষতি হয়, সে ক্ষতিকে আমি ভয় করব কেন?

সোমবার। আজ সকালে তাকে আমার নাম বললাম; আশা করেছিলাম, এতে তার আগ্রহ বাড়বে। কিন্তু কিছুই হল না। আশ্চর্য! সে যদি আমাকে তার নাম বলত, আমার ভাল লাগত। আমি তো মনে করি, সে নাম আমার কানে বড় মধুর হয়ে বাজত।

সে খুব কম কথা বলে। হয় তো এর কারণ তার বুদ্ধি প্রখর নয়; আর সে সেটা জানে বলেই লুকিয়ে রাখতে চায়। তার এ মনোভাবের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়; কারণ বুদ্ধির প্রখরতাটা কিছু নয়, আসল যা মূল্যবান তার বাসা তো অন্তরে। তাকে বুঝিয়ে দিতে বড় ইচ্ছা করে যে, একটি সৎ প্রেমময় অন্তরই প্রকৃত ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যই যথেষ্ট; আর সে ঐশ্চর্য বিনা বুদ্ধিই তো দারিদ্র্য।

কথা কম বললেও তার শব্দ-ভাণ্ডার কিন্তু বেশ বড়। আজ সকালে সে একটা অদ্ভুত ভাল শব্দ ব্যবহার করেছে। শব্দটা যে ভাল তা সে নিজেও বুঝতে পেরেছিল, কারণ কথা প্রসঙ্গে পরে আরও দু'বার সে শব্দটা ব্যবহার করেছে। এটা আকস্মিক কোন শিল্পসৃষ্টি নয়, তবে এতে বোঝা যায় যে তার দেখবার মত চোখ আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অনুশীলনের দ্বারা এই বীজকে অংকুরিত করা যায়।

শব্দটা সে পেল কোথায়? আমি কখনও ব্যবহার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।

না, আমার নাম নিয়ে সে কোন আগ্রহ দেখায় নি। আমার হতাশাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি বোধ হয়। সেখান থেকে চলে গিয়ে নদী তীরের শেওলার উপর বসে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। মনে যখনই সঙ্গীর কামনা জাগে, যখনই দেখার মত কাউকে চাই, কথা বলার মত কাউকে চাই, তখনই আমি সেখানে গিয়ে বসি। জলাশয়ের মধ্যে যে মনোরম রং-এর সাদা মূর্তিটা রয়েছে সেটা হয় তো যথেষ্ট নয়, কিন্তু কিছু তো বটে, আর পরিপূর্ণ নির্জনতার চাইতে কিছু একটাও তো ভাল। আমি কথা বললেই সেও কথা বলে; আমি দুঃখিত হলে সেও দুঃখিত হয়; সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে সান্ত্বনা দেয়; বলে, "বেচারি বন্ধুহীনা মেয়েটি, হতাশ হয়ো না; আমি তোমার বন্ধু হব।" সেই তো আমার ভাল বন্ধু, আমার একমাত্র বন্ধু, আমার বোন।

প্রথম সে যখন আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল! আঃ, সে কথা আমি কোনদিন ভুলব না-কখনও না। আমার বুকের ভিতরটা যেন শিসের মত ভারী হয়ে গিয়েছিল! হতাশ হয়ে বলেছিলাম "আমার যা কিছু ছিল সবই তো তারও ছিল। আমার বুকটা ভেঙে ফেল; এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না!" দুই হাতে আমি মুখ ঢেকেছিলাম; আমার কোন সান্ত্বনা ছিল না। একটু পরে হাত সরিয়ে নিতেই দেখি, সে আবার এসেছে-সাদা, উজ্জ্বল, সুন্দর; তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম!

পরিপূর্ণ সুখ; সুখের স্বাদ আগেও পেয়েছি, কিন্তু এমনটি কখনও পাই নি; এ যেন এক উন্মাদনা। সেই আর কখনও তাকে সন্দেহ করি নি। কখনও সে চলে গেছে-হয় তো এক ঘণ্টা, হয় তো প্রায় সারাটা দিন, কিন্তু আমি অপেক্ষা করেছি, সন্দেহ করি নি। বলেছি, "সে খুব ব্যস্ত, অথবা কোথাও বেড়াতে গেছে, কিন্তু আবার আসবে।" সত্যি তাই, সে সর্বদাই ফিরে এসেছে। অন্ধকার রাতে সে আসে না, কারণ সে খুব ভীতু; কিন্তু চাঁদ থাকলেও সে আসে। আমি অন্ধকারকে ভয় করি না, কিন্তু সে তো আমার চাইতে ছোট; আমার পরে সে জন্মেছে। অনেক অনেকবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে; জীবন যখন আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে তখন সেই আমার সান্ত্বনা, আমার আশ্রয়।

মঙ্গলবার। সারাটা সকাল ঘরদোর পরিস্কার করলাম। ইচ্ছা করেই তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকলাম; মনে আশা, নিঃসঙ্গ বোধ করলেই সে আসবে। কিন্তু এল না।

দুপুরে কাজ বন্ধ করে অবসর বিনোদনের জন্য মৌমাছি ও প্রজাপতিদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, আর ফুলদের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম; এই সব সুন্দর প্রাণীরা আকাশ থেকে ঈশ্বরের হাসি ধরে এনে লুকিয়ে রাখে। তাদের কুড়িয়ে এনে মালা বানালাম; তাই দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে লাঞ্চ খেলাম-আবশ্য আপেলই খেলাম। তারপর ছায়ায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু সে এল না।

নাই বা এল। এলেও কিছু হত না, কারণ সে ফুল ভালবাসে না। বলে, যত সব বাজে; এমন কি ফুলদের আলাদা করে চিনতেও পারে না। সে মনে করে, এই না পারাটাই নাকি ভাল। সে আমাকে চায় না, ফুলদের চায় না, সায়ংকালের বিচিত্র রঙের আকাশকে চায় না-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য খুপড়ি তৈরি করা, শব্দ করে তরমুজ ভাঙা আর আপেল সাজানো ছাড়া আর কোন কিছু সে চায় কি?

একটা শুকনো লাঠিকে মাটিতে ফেলে একটা কিছু বানাবার উদ্দেশ্যে আর একটা লাঠি দিয়ে তার মধ্যে একটা গর্ত করতে চেষ্টা করলাম। একটু পরেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। গর্তের ভিতর থেকে একটা সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, নীল ধোঁয়া বেরুতে লাগল, আর আমিও সব ফেলে দে ছুট! ভাবলাম, নিশ্চয় একটা ভূত, আর কী ভয় যে পেলাম! ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ তাড়া করছে না; কাজেই একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম; ধীরে ধীরে হাত-পায়ের কাঁপুনি থেমে গেল; তখন সাবধানে পা টিপে টিপে চারদিকে ভাল করে দেখতে দেখতে ফিরে গেলাম। খুব কাছে গিয়ে একটা গোলাপ-ঝাড়ের ডালগুলো সরিয়ে উঁকি দিলাম, কিন্তু ভূতটা তখন চলে গেছে। কাছে গেলাম; লাঠির গর্তটার মধ্যে এক চিমটে গোলাপী গুঁড়ো। তার ভিতরে আঙুলটা ঢুকিয়ে দিতেই উঃ! বলে চেঁচিয়ে উঠে আঙুলটা টেনে নিলাম। তীব্র যন্ত্রণা। আঙুলটাকে মুখের মধ্যে পুরে দিলাম, আর তারপরে একবার এ-পায়ে একবার ও-পায়ে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করতে করতে একসময় কষ্টটা কমে গেল। কিন্তু খুব কৌতূহল হল; ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম।

এই গোলাপী গুঁড়োটা কি জানবার খুব কৌতূহল হল। হঠাৎ এর নামটা মনে পড়ে গেল, যদিও আগে কখনও তা শুনি নি। এই তো অগ্নি! এ বিষয়ে আমি এত নিশ্চিত যে পৃথিবীতে আর কোন জিনিস সম্পর্কে কেউ এতটা নিশ্চিত হতে পারে না। কাজেই নির্দ্বিধায় আমি এটার নাম দিলাম-অগ্নি।

এমন একটা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি যা আগে ছিল না। পৃথিবীর ব্যাখ্যাতীত সম্পদের তালিকায় আমি একটা নতুন জিনিস যোগ করেছি; সেটা উপলব্ধি করে নিজের কাছে নিজেই গর্ব বোধ করলাম; ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করে এ কথা বলি, তার চোখে নিজেকে বড় করে তুলি, -কিন্তু কি ভেবে তা করলাম না। এ সব নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। সে হয় তো জিজ্ঞাসা করবে, এটা কি কাজে লাগবে, তখন আমি কি জবাব দেব? কারণ এটা তো কোন কাজের জিনিস নয়, এট শুধু সুন্দর-শুধুই সুন্দর-

সুতরাং আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, কিন্তু পেলাম না। এটা তো কোন কাজে লাগবে না; খুপড়ি বানাতে পারবে না, তরমুজগুলো ভাল করতে পারবে না, তাড়াতাড়ি ফসল পাকাতে পারবে না; এটা বেকার, বোকামি আর অহংকারের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়; সে এটাকে ঘৃণার জিনিস নয়। আমি বললাম, "হে অগ্নি, হে সূক্ষ্ম গোলাপী প্রাণী, আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ তুমি সুন্দর-আর সেই তো যথেষ্ট!" সেটাকে বুকে তুলে নিতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু নিলাম না। তখনই আমার মাথায় আর একটা সত্য ঝল্সে উঠল। এটা আগের সত্যটার এত কাছাকাছি যে আমার ভয় হল বুঝি বা ভাবের ঘরে চুরি করছি; সত্যটা হল "আগুনে যে পোড়ে সে আগুনকে এড়িয়ে চলে।"

কাজটা আবার করলাম; এবং অনেকটা আগুনের গুঁড়ো তৈরি করবার পরে সেগুলোকে এক মুঠো শুকনো ঘাসের মধ্যে ঢেলে নিলাম; মনের বাসনা, সেগুলোকে বাড়ি নিয়ে যাব এবং খেলা করবার জন্য নিজের কাছে রেখে দেব। কিন্তু বাতাস ছুটে এসে সেগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে আমার মুখেই ছুড়ে দিল; আর আমিও সব ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। পিছন ফিরে দেখলাম, নীল ভূতটা উপরে উঠে যাচ্ছে-মেঘের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওটার নাম মনে পড়ে গেল-ধোঁয়া!-যদিও, সত্যি বলছি, আগে কোন দিন আমি ধোঁয়ার কথা শুনি নি।

দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে হলুদ ও লাল কাঁপা-কাঁপা আলো বেরুতে লাগল, আর মুহূর্তের মধ্যে আমি সেগুলোর নাম দিলাম-অগ্নিশিখা-আর আমার নামটা সত্যি ঠিক হয়েছে, যদিও পৃথিবীতে এগুলোই প্রথম অগ্নিশিখা। তারা গাছের উপর উঠল, ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডুলির ভিতর থেকে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আনন্দের আতিশয্যে আমি হাততালি দিলাম, হাসতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম; জিনিসটা এতই নতুন ও বিচিত্র, এতই আশ্চর্য, এতই সুন্দর!

কোথা থেকে সে ছুটে এল; দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল; অনেকক্ষণ একটি কথাও বলল না। তারপর জানতে চাইল এটা কি। আঃ, এ রকম সরাসরি প্রশ্ন করাটা কি তার সাজে। অবশ্য জবাব আমাকে দিতেই হল; দিলামও। বললাম, এটা অগ্নি। আমি জানি অথচ সে জানে না, এতে যদি তার বিরক্তি বোধ হয় তো সে দোষ আমার নয়; তাকে বিরক্ত করতে তো আমি চাই নি। একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করল:

"এটা কেমন করে এল?"

আবার সেই সরাসরি প্রশ্ন; জবাবটাও সরাসরিই হল।

"আমি তৈরি করেছি।"

আগুনটা দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। পোড়া জায়গাটার পাশে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সে বলল:

"এগুলো কি?"

"অগ্নি-অঙ্গার।"

ভাল করে দেখবার জন্য একটা তুলে নিল, কিন্তু মনের ইচ্ছাটা বদলে আবার রেখে দিল। তারপর চলে গেল। কোন কিছুতেই তার আগ্রহ নেই।

কিন্তু আমার আগ্রহের অন্ত নেই। ধূসর, নরম, সূক্ষ্ম, সুন্দর ছাইগুলো পড়ে আছে-এক নজরেই তাদের আমি চিনতে পারলাম। জ্বলন্ত অঙ্গারও আমি চিনি। আমার আপেলগুলো পেয়ে গেলাম; সেগুলোকে আচড়ে বের করলাম; খুসি হলাম; আমার বয়স অল্প, ক্ষুধাও প্রখর। কিন্তু আমি হতাশ হলাম; আপেলগুলো সব পুড়ে, ফেটে, নষ্ট হয়ে গেছে। দেখে মনে হল নষ্ট হয়েছে, কিন্তু নষ্ট হয় নি; কাঁচা অবস্থার চাইতে অনেক ভাল হয়েছে। অগ্নি সুন্দর; মনে হল, একদিন সে অনেক কাজে লাগবে।

শুক্রবার। গত সোমবার রাতের বেলা এক মুহূর্তের জন্য তাকে আবার দেখেছিলাম; কিন্তু শুধুই এক মুহূর্তের জন্য। আশা করেছিলাম, বাড়িঘর পরিস্কার করেছি বলে সে আমাকে প্রশংসা করবে; সত্যি ভাল মন নিয়েই আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সে সন্তুষ্ট হল না; মুখ ঘুরিয়ে আমাকে ফেলে চলে গেল। সে এতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিল অন্য কারণে: আবার তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম সে যেন প্রপাতের জলে না নামে। কারণ অগ্নি আমার কাছে একটা নতুন অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে-সম্পূর্ণ নতুন, ভালবাসা, দুঃখ এবং অন্য .যে সব অনুভূতির কথা আমি আগেই জেনেছি তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভয়। সে কি নৃশংস!-এটা আবিস্কার না করাই ছিল ভাল। ভয় জীবনকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়, সুখকে নষ্ট করে, সারা শরীরকে থর্ থর্ করে কাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু তাকে বোঝাতে পারলাম না, কারণ ভয় কাকে বলে তা তো সে জানে না, আর জানে না বলেই আমাকে সে বুঝতে পারল না।

আদমের দিন-পঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি

হয় তো আমার মনে রাখা উচিত যে তার বয়স অল্প, নেহাৎই বালিকা, আর সেই মতই তার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। সে অত্যন্ত আগ্রহশীল, কৌতূহলী ও তৎপর; জগৎটা তার কাছে একটা কুহক, একটা বিস্ময়, রহস্য, আনন্দ; একটা নতুন ফুল দেখলে আনন্দে সে বাক্যহারা হয়ে যায়; সে ফলটাকে আদর করে, যত্ন করে, ঘ্রাণ শোঁকে, তার সঙ্গে কথা বলে, একটা প্রিয় নাম ধরে ডাকে। আর রং দেখলেই সে পাগল হয়ে যায়: বাদামী পাহাড়, হলুদ বালি, ধূসর শেওলা, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ; ভোরের মুক্তো, পাহাড়ের মাথায় রক্তিম আভা, সূর্যাস্তের সময় রক্তিম সমুদ্রের বুকে ভাসমান সোনালি দ্বীপ, মেঘের বুকে পাল তুলে দেওয়া পাণ্ডুর চাঁদ, মহাশূন্যে ঝিকিমিকি তারাদের মণিমানিক্য-আমি তো এসবের কোন বাস্তবের উপকারিতা দেখি না, কিন্তু তাদের মধ্যে যে রং ও বিরাটত্ব আছে তাই তার কাছে যথেষ্ট; তাদের নিয়েই সে সব ভুলে থাকে। সে যদি এক সঙ্গে কয়েক মিনিট শান্ত হয়ে চুপচাপ থাকে তাহলে সেটা একটা দৃশ্য বটে! সে অবস্থায় তাকে দেখলে সত্যি আমি খুশি হতাম; সত্যি হতাম, কারণ এখন আমি বুঝতে পারছি যে সত্যি সে সুন্দরী-ক্ষিপ্রগতি, ক্ষীণতনু, ফিটফাট, সুগঠনা, চপলা, মনোরমা; একদা যখন সে তার মর্মরশুভ্র রৌদ্রস্নাত দেহ নিয়ে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, মাথাটা ঈষৎ পিছনে হেলিয়ে দুটি হাত সূর্যকে আড়াল করে আকাশে উড়ে যাওয়া একটা পাখিকে দেখছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে সুন্দরী।

সোমবার মধ্যাহ্ন। এই গ্রহে যদি এমন কিছু থেকে থাকে যাতে তার আগ্রহ নেই তাহলে সে বস্তুর নাম আমার তালিকায় নেই। অনেক জন্তু আছে যাদের ব্যাপারে আমি উদাসীন, কিন্তু সে নয়। তার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই তার প্রিয়; সে ভাবে যেসব কিছুই সম্পদ; যা কিছু নতুন তাই স্বাগত।

প্রকাণ্ড ব্রন্টোসরাস্টা যখন পা ফেলে ফেলে তাঁবুতে ঢুকল, সে তো ভাবল একটা পেয়ে গেলাম, আর আমি ভাবলাম, এ কী বিপদ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের এটা একটা ভাল উদাহরণ। সে চাইল ওটাকে পোষ মানাতে, আর আমি চাইলাম বাসাটা ওকে দিয়ে নিজেই কোথাও চলে যাই। তার বিশ্বাস, ভাল ব্যবহারের দ্বারা পোষ মানিয়ে ওকে পোষা প্রাণীতে পরিণত করা যাবে; আমি বললাম, একুশ ফুট লম্বা একটা প্রাণীকে বাড়িতে রাখা কোন কাজের কথা নয়, কারণ ওটার মন যতই ভাল হোক, যতই আমাদের ক্ষতি করবার ইচ্ছা ওর না থাকুক, তবু ও তো আমাদের বাড়িটার উপর বসতে গিয়েই সেটাকে ভেঙে ফেলতে পারে; চোখ দেখলেই তো বোঝা যায় ওটা বড়ই অন্যমনস্ক।

তবু ঐ দৈত্যটাকে সে রাখবেই, কিছুতেই ওটাকে ছাড়বে না। সে ভাবল, ওকে নিয়ে আমরা একটা দুগ্ধ-কেন্দ্র খুলতে পারি, আর আমাকেই দুধ দুইতে বলল; কিন্তু আমি তাতে রাজী নই; কাজটা খুবই বিপজ্জনক হতেও পারে। তাছাড়া, ওটা স্ত্রী-জাতীয় প্রাণী নয়, আর আমাদেরও কোন মই-টই নেই। তখন তার ইচ্ছা হল, ওটাতে চড়বে, চড়ে নানান দৃশ্য দেখবে। ত্রিশ বা চল্লিশ ফুট লেজটা মাটিতে পড়ে ছিল একটা ভূপাতিত গাছে মত; সে ভাবল ওটা বেয়েই সে জন্তুটার পিঠে চড়বে, কিন্তু সে ভুল করেছিল; খাড়া জায়গাটায় উঠতেই সে পা হড়কে নীচে পড়ে গেল; আমি না থাকলে বেশ আঘাত পেত।

সে কি এখন সন্তুষ্ট? না। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সে তুষ্ট থাকতে পারে না। পরীক্ষা না করে সে কোন কিছু গ্রহণ করে না। আমি মানি যে এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী; এটা আমাকে আকৃষ্টও করে; তার প্রভাব আমার উপরেও পড়েছে; মনে হয়, আর কিছু দিন তার সঙ্গে থাকলে আমিও ঐ পথ ধরব। আরে, এই বিরাটকায় প্রাণীটিকে নিয়ে তার আরও একটা পরিকল্পনা আছে: সে ভাবছে, ওটাকে যদি পোষ মানাতে পারি, বশে আনতে পারি, তাহলে ওটাকে নদীর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সেতু হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। দেখা গেল, ইতিমধ্যেই সেটা অনেকটা বশে এসেছে, -অন্তর তার বেলায়-এবং তার পরিকল্পনা মত কাজ করতে চেষ্টাও সে করল, কিন্তু ফল হল না: যতবার তাকে নদীর মাঝখানে জায়গা মত রেখে সে ফিরে আসে, ততবারই সেটা একটা পোষা পর্বতের মত তার পিছন পিছন চলে আসতে লাগল। অন্য সব পোষা প্রাণীরাও তো এই রকমই করে থাকে।

শুক্রবার। মঙ্গলবার-বুধবার-বৃহস্পতিবার-এবং আজ; তার দেখা পাই নি। একা একা থাকার পক্ষে সময়টা বড়ই দীর্ঘ; তবু, অবাঞ্ছিত হয়ে তার কাছে যাওয়ার চাইতে একা থাকাই ভাল।

আমারও তো সঙ্গী চাই-সঙ্গী সকলেই চায় বলে আমি মনে করি-তাই আমি অন্য জন্তুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম। তারা খুবই ভাল; মেজাজ ভাল, চাল-চলন বিনম্র; কখনও বিরূপ হয় না, কখনও মনে করে না যে আমি অনধিকার প্রবেশ করছি, তারা হেসে লেজ নাড়ে, অবশ্য যদি লেজ থাকে, আর যখনই বলা যায় তখনই কোথাও বেড়াতে বা অভিযানে সঙ্গী হতে রাজী হয়। আমার মনে হয়, তারা খুবই ভদ্র। এতটা কাল আমরা তো ভালভাবেই দিন গুজরান করেছি, কখনও তো নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় নি। নিঃসঙ্গ! না, কখনও ছিলাম না।

সব সময়ই তারা দল বেঁধে চারদিকে ঘুরত-কখনও চারবা পাঁচ একর জুড়ে-সংখ্যায় অগুনতি; একটা পাহাড়ের উপর উঠে চারদিক তাকালেই দেখা যাবে সূর্যের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে, ঝিকমিক করছে কত রং আর কত ডোরা-কাটা দাগ; মনে হবে বুঝি একটা হ্রদ;কিন্তু আসলে তা নয়। তারপর আসে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, আর তাদের চঞ্চল পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ; তাদের বিচিত্র বর্ণের পালকের উপর যখন সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়ে, তখন সে কী রংয়ের বাহার! চোখ যেন আপনি বুজে আসে।

আমরা অনেক দেশ ঘুরেছি; পৃথিবীর অনেক কিছু আমি দেখেছি; প্রায় সবটাই দেখেছি বলা যায়; কাজেই আমিই প্রথম পর্যটক, আর একমাত্র পর্যটক। আমরা দু'জন যখন চলতে থাকি, সে এক আশ্চর্য দৃশ্য-সে রকমটি আর কোথাও নেই। আরামের জন্য আমি হয় বাঘের পিঠে, নয় তো চিতার পিঠে চড়ে বসি, কারণ তাদের পিঠটা নরম আর গোল, বসে বেশ আরাম হয়; তাছাড়া জন্তুগুলো বেস পোষা; কিন্তু অনেক দূরের পথ যেতে, বা দৃশ্যাবলী দেখতে আমি চড়ি হাতির পিঠে। হাতি আমাকে শুঁড় দিয়ে তুলে নেয়; যখন তাঁবু খাটাবার সময় হয়, সে বসে পড়ে আর আমি পিছন দিক দিয়ে নেমে পড়ি।

পাখি আর জন্তুরা খুব বন্ধু তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাটি নেই। তারা সকলেই কথা বলে, আমার সঙ্গেও কথা বলে, তাদের ভাষা বিদেশী, আমি তার এক বিন্দুও বুঝতে পারি না; কিন্তু আমি যখন কথা বলি তখন তারা কিন্তু বুঝতে পারে, বিশেষ করে কুকুর ও হাতি। আমার ভারি লজ্জা করে। এতেই বোঝা যায়, তারা আমার চাইতে বুদ্ধিমান, সুতরাং আমার চাইতে উঁচু শ্রেণীর জীব। এতে আমি বিরক্তি বোধ করি, কারণ আমি নিজেই প্রধান পরীক্ষার বিষয়বস্তু হতে চাই।

আমি অনেক কিছু শিখেছি; এখন শিক্ষিত হয়েছি, যদিও প্রথম ছিলাম না। প্রথম ছিলাম অশিক্ষিত। ....পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে আমি জেনেছি যে কাঠ, শুকনো পাতা ও পালক এবং আরও অনেক জিনিস জলে ভাসে; সুতরাং সে সব কিছুকে মিলিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে একদিন পাহাড়ও জলে ভাসবে; কিন্তু আজ শুধু সে কথা জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ এখনও পর্যন্ত সেটাকে প্রমাণ করবার উপায় নেই। কিন্তু উপায় একটা বার করবই-সেদিন এই উত্তেজনাটা চলে যাবে। এতে আমার খুব মন খারাপ হয়; কারণ একে একে আমি যখন সব জেনে ফেলব তখন আর কোন উত্তেজনা থাকবে না; কিন্তু আমি যে উত্তেজনাই ভালবাসি! এ কথা ভাবতে গিয়ে সেদিন রাতে আমার ঘুমই হল না।

কেন আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম না; কিন্তু এখন আমার মনে হয়, এই আশ্চর্য জগতের গোপন রহস্যকে খুঁজে বের করা এবং মনের আনন্দে এ সব কিছুর স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই আমার সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে করি, এখনও অনেক কিছু জানবার আছে, আর তাড়াহুড়া না করে ধীরেসুস্থে কাজ করলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাবে। একটা পালককে উড়িয়ে দাও, বাতাসে ভাসতে ভাসতে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু একটা ঢেলাকে ছুড়ে দাও, সেটা উড়ে যাবে না। প্রতিবারই সেটা নেমে আসবে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, সব সময়ই তাই হয়। অবাক হয়ে ভাবি, কেন এ রকম হয়? আসলে সেটা নেমে আসে না নিশ্চয়ই, কিন্তু সে রকম দেখায়ই বা কেন? মনে হয়, এটা এক ধরনের দৃষ্টি-বিভ্রম। মানে দুটোর একটা। ঠিক কোন্‌টা আমি জানি না। পালকটাও হতে পারে, আবার ঢেলাটাও হতে পারে; কোনটাই আমি প্রমাণ করতে পারি না; যে কোন একটাকে ফাঁকি বলে ধরে নিতেই হবে।

লক্ষ্য করে দেখেছি, তারারা বেশী দিন টেকে না। অনেক ভাল ভাল তারাকে গলে গিয়ে আকাশ থেকে পড়ে যেতে দেখেছি। একটা যখন গলতে পারে, তখন সবগুলোও গলতে পারে; আবার সবগুলো যখন গলতে পারে, তখন সবগুলো একই রাতেও গলতে পারে। সে দুঃখের দিন আসেই-আমি জানি। তাই তো প্রতিরাতে যতক্ষণ জেগে থাকতে পারি আমি বসে বসে তারাদের দিকেই চেয়ে থাকি। ঐ ঝিকিমিকি আকাশকে আমি আমার মনের উপর এঁকে রাখব, যাতে একদিন তারা যখন থাকবে না তখন কল্পনায় ঐ অগণিত তারাদের কালো আকাশের বুকে ফিরিয়ে আনতে পারি, আবার তাদের ঝিকমিক করাতে পারি, এবং আমার চোখের জলে অস্পষ্ট করে তাদের দ্বিগুণ করে তুলতে পারি।

পতনের পরে

যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন উদ্যানটাকে স্বপ্ন বলে মনে হয়। উদ্যানটা ছিল সুন্দর, অতুলনীয়ভাবে সুন্দর, আকর্ষণীয়ভাবে সুন্দর; কিন্তু আজ সে হারিয়ে গেছে; আর কোন দিন তাকে দেখতে পাব না।

উদ্যান হারিয়ে গেছে, কিন্তু আমি তাকে ফিরে পেয়েছি, আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট। সে আমাকে সাধ্যমত ভালবাসে; আমার অনুভূতিপ্রবণ সত্তা দিয়ে আমিও তাকে ভালবাসি; আমি মনে করি, আমার যৌবন, আর আমার স্ত্রী-প্রকৃতির পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তাকে ভালবাসি, কোন জবাব দিতে পারি না, আর জবাব দেবার কোন দায়ও বোধ করি না; কাজেই আমার মনে হয়, অন্য সরীসৃপ ও জন্তুদের মত এ ভালবাসা যুক্তি ও সংখ্যাতত্ত্বের ফসল নয়। আমি তো মনে করি, তাই হওয়া উচিত। কতক পাখিকে ভালবাসি তাদের গানের জন্য, কিন্তু আদমকে তার গানের জন্য ভালবাসি না-না, মোটেই তা নয়; সে যত গান গায়, তত আমার কাছে সেটা অসহ্য ঠেকে। তবু আমি তাকে গান গাইতে বলি, কারণ তার সব কিছু মিলিয়েই আমি তাকে ভালবাসতে চাই। আমি জানি সে চাওয়া সফল হবে, কারণ আগে তার গান আমি সইতে পারতাম না, কিন্তু এখন পারি। এতে দুধ টকে যায়, কিন্তু তা হোক; সে রকম দুধও আমার সয়ে যাবে।

তার উজ্জ্বল বুদ্ধির জন্যও আমি তাকে ভালবাসি না-না, মোটেই তা নয়। উজ্জ্বল বুদ্ধির জন্য তো তাকে দোষী করা যায় না; ঈশ্বর তাকে যে রকম সৃষ্টি করেছেন সে তাই হয়েছে। আমি জানি, তারও একটা সৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। যথাসময়ে সেটা আরও বাড়বে, যদিও হঠাৎই বাড়বে না; তাছাড়া, তাড়াহুড়ার বা কি আছে, সে আজ যা আছে সেটাই তো যথেষ্ট ভাল।

তার উদার বিবেচনাশীল ও সূক্ষ্ম আচরণের জন্যই যে তাকে ভালবাসি তাও নয়। এ সব ব্যাপারে তার ত্রুটি আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে বেশ ভাল, আর ক্রমেই উন্নতি করছে।

তার পরিশ্রমী স্বভাবের জন্যও তাকে ভালবাসি না, -না, তাও নয়। আমি জানি, সে শক্তি তার মধ্যে আছে; কেন যে সেটা সে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে আমি জানি না। সেটাই তো আমার একমাত্র দুঃখ। অন্যথায় এখন সে আমার কাছে বেশ খোলামেলা। এই একটিমাত্র বস্তু ছাড়া আর কিছুই সে লুকিয়ে রাখে না। আমার কাছেও গোপন করবার মত তার কিছু থাকতে পারে এ চিন্তাই আমাকে কষ্ট দেয়; অনেক সময় আমার ঘুম নষ্ট করে; এ চিন্তাকে আমি মন থেকে সরিয়ে দেব; যে সুখ আমার মনের দুই কূল ছাপিয়ে চলেছে তাকে বিঘ্নিত হতে দেব না।

তার শিক্ষার জন্যও তাকে ভালবাসি না-না, মোটেই তা নয়। সে স্বয়ং-শিক্ষিত, এবং সত্যি অনেক কিছু জানে, কিন্তু সেটা কোন কারণই নয়।

তার শৌর্যের জন্যও যে তাকে ভালবাসি তাও নয়-না, মোটেই নয়। সে আমার প্রতি বিরূপ হয়েছিল, কিন্তু সে জন্য তাকে দোষ দেই না; এটাকে পুরুষ জাতির বেশিষ্ট্য বলেই মনে করি, আর সে তো নিজেকে নিজে পুরুষ বানায় নি। অবশ্য আমি তার প্রতি বিরূপ হতাম না, তার আগে আমার মৃত্যু হত; কিন্তু এটাও আমার স্ত্রী জাতির বৈশিষ্ট্য, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, কারণ আমি তো আমাকে স্ত্রী বানাই নি।

তাহলে আমি তাকে ভালবাসি কেন? আমি মনে করি, তার একমাত্র কারণ সে পুরুষ।

আসলে সে খুব ভাল মানুষ, আর সেজন্য তাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু তা না হলেও তাকে আমি ভালবাসতাম। সে যদি আমাকে মারধোর করে, গালাগালি করে, তাহলেও তাকে আমি ভালবাসব। আমি ঠিক জানি। আমি মনে করি, এটা নারী-পুরুষের ব্যাপার।

সে শক্তিমান ও সুদর্শন। সেজন্য তাকে ভালবাসি, তার প্রশংসা করি, তার জন্য গর্ববোধ করি, কিন্তু এ সব গুণ না থাকলেও আমি তাকে ভালবাসতাম। সে যদি সাদাসিধে হত, তাকে ভালবাসতাম; সে যদি ভগ্নস্বাস্থ্য হত, তাকে ভালবাসতাম; আমি তার কাজ করে দিতাম, তার উপর সর্দারী করতাম, তার হয়ে প্রার্থনা করতাম, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার শয্যার পাশে বসে তাকে দেখতাম।

হ্যাঁ, আমি মনে করি, আমি যে তাকে ভালবাসি তার একমাত্র কারণ সে আমার এবং সে পুরুষ। আর কোন কারণ আছে বলে তো মনে হয় না। কাজেই প্রথম যা বলেছিলাম আবার সেই কথাই বলি: এ ধরনের ভালবাসা যুক্তি ও সংখ্যাতত্ত্বের ফসল নয়। এটা জন্মে-কোথা থেকে তা কেউ জানে না-আর এর কোন ব্যাখ্যাও হয় না। তার কোন প্রয়োজনও নেই।

চল্লিশ বছর পরে

এ জীবন থেকে আমরা যেন একসঙ্গে বিদায় নিতে পারি, এটাই আমার প্রার্থনা, আমার কামনা-এ কামনা কোন দিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না, শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি প্রেমময়ী পত্নীর বুকে বেঁচে থাকবে; আর আমার নামেই হবে এর নামকরণ।

কিন্তু যদি একজনকে আগে যেতেই হয় তাহলে সে যেন আমি হই, এটাই আমার প্রার্থনা; কারণ সে বলবান, আমি দুর্বল, আমার কাছে সে যতটা প্রয়োজনীয়, তার কাছে আমি ততটা প্রয়োজনীয় নই-তাকে ছেড়ে আমার জীবন জীবনই নয়; সে জীবন আমি কেমন করে সহ্য করব? এ প্রার্থনাও শাশ্বত; নারী জাতি যতদিন থাকবে, ততদিন এ প্রার্থনার বিলোপ ঘটবে না। আমিই প্রথম স্ত্রী; আর শেষ স্ত্রীর কণ্ঠেও আমার এই কথাই ধ্বনিত হবে।

ইভ-এর সমাধিতে

আদম: যেখানে যেখানে সে ছিল, সেখানেই ছিল ইডেন।

১৮৯৩, ১৯০৫

কালিফোর্নিয়াবাসীর কাহিনী

The Californian's Tale

পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি স্বর্ণ-সন্ধানে বেরিয়েছিলাম স্টেনিস্‌লস্ আঞ্চলে। গাঁইতি, কড়াই ও শিঙা সঙ্গে নিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াই; এখানে-ওখানে টুপি-ভর্তি নোংরা ধূলোবালি ধুই, প্রতিবারই আশা করি একটা দাঁও মারব, কিন্তু কখনই তা হয় না। জায়গাটা চমৎকার,-গাছপালা ভর্তি, সুরভিত, রুচিকর; বহু বছর আগে এক সময় এখানে লোকবসতি ছিল, কিন্তু এখন সে লোকজনরা উধাও হয়ে গেছে; এ মনোরম স্বর্গভূমি আজ একান্ত নির্জন! মাটির উপরে খননের কাজ চলার সময়ই তারা চলে গিয়েছিল। একটা জায়গায় একসময় ছিল জমজমাট ছোট শহর,-ব্যাংক ছিল, খবরের কাগজ ছিল, অগ্নিনির্বাপক কোম্পানি ছিল, একজন মেয়র ছিল, অল্ডারম্যান ছিল; কিন্তু আজ জায়গাটা দূর-বিস্তার মরকত-বর্ণের ঘাসে-ঢাকা একটা প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়; একসময় যে এখানে মানুষের বাস ছিল তার চিহ্নমাত্রও নেই। টাট্‌ল্‌টাউন পর্যন্ত এই একই অবস্থা। আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে ধূলোভর্তি রাস্তার দু'পাশে কিছু দূরে দূরে এখনও চোখে পড়ে ছোট ছোট আরামদায়ক সুন্দর ঘর-বাড়ি; ইতস্তত গোলাপ ফুল ছিটনো দ্রাক্ষালতার জালে বাড়িগুলো এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো যে দরজা-জানালাগুলো চোখেই পড়ে না-তা থেকেই বোঝা যায় যে পরাজিত ও হতাশ পরিবারগুলো বাড়িঘর বিক্রি করতে না পেরে অনেক বছর হল সব ছেড়েছুড়েই চলে গেছে। আধ ঘণ্টা পর পরই যে নির্জন কাঠের বাড়িগুলি চোখে পড়ে সেগুলো সোনার খনির কাজ চলবার একেবারে প্রথম সময়কার; ঐ সব বাড়িঘর যারা তৈরি করেছিল তাদেরও আগে যে সব স্বর্ণ-সন্ধানী এখানে এসেছিল এই কাঠের বাড়িগুলো তারাই বানিয়েছিল। দু'একটা কাঠের বাড়িতে এখনও অধিবাসীই সর্ব প্রথম এখানে এসে বাড়িটি তৈরি করেছিল; আপনি আরও ধরে নিতে পারেন যে-এক সময় প্রচুর বিত্তবান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার সুযোগ সে পেয়েছিল, কিন্তু ফিরে যায় নি; তারপর অর্থবিত্ত সব হারিয়ে মনের দুঃখে দেশের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের কাছে মৃতবৎ হয়ে থাকাই স্থির করেছে। সেকালে কালিফোর্নিয়ার চারপাশে এরকম অনেক জীয়ন্তে মরা মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল-ভাগ্যের হাতে মারখাওয়া কতকগুলি অসহায় মানুষ; চল্লিশেই বুড়িয়ে গেছে; মনের সব গোপন চিন্তার মূল কথাই এখন শুধু অনুতাপ করে আশা-অনুতাপ ব্যর্থ জীবনের জন্য, আর আশা এই সংগ্রাম থেকে উত্তরণের জন্য।

নির্জন প্রান্তর। ঘাস ও গাছাপালায় ঢাকা সেই শান্ত বিস্তারের মধ্যে শুধু কীট-পতঙ্গের ঘুম পাড়ানিয়া গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই; কোন মানুষ বা পশুও চোখে পড়ে না; মনটাকে সতেজ রাখবার বা জীবনকে সুখী রাখবার মত কোন কিছুই নেই। আর তাই শেষ পর্যন্ত অপরাহ্নের গোড়ার দিকে যখন একটি মনুষ্যমূর্তি দৃষ্টিগোচর হল তখন মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। লোকটির বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ; যে ধরনের গোলাপে-ঢাকা আরামদায়ক ছোট বাড়ির কথা আগেই বলেছি তেমনই একটা বাড়ির ফটকে সে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য এ লোকটিকে দেখে সর্বহারা বলে মনে হয় না, মনে হয়, এর জীবনে রস আছে, একে আদর করবার, সেবাযত্ন করবার লোক আছে; সামনেকার উঠোনটার চেহারাও তাই বলে; প্রচুর ফুলে-ফুলে বাগানটা যেন হাসছে। সে আমন্ত্রণ করে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল, সব রকম আরামের ব্যবস্থা করে দিল-গ্রামাঞ্চলের এটাই রীতি।

অনেক সপ্তাহ ধরে প্রতি দিন প্রতি রাত্রি কাটিয়েছি খনির লোকদের ঘরে-তার মানেই সেই নোংরা মেঝে, অগোছালো বিছানা, টিনের কাপপ্লেট, নোনা শূকর-মাংস, শুঁটি ও কালো কফি, আর ঘরের অলংকরণ বলতে কাঠের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া প্রাচ্যদেশীয় সচিত্র সংবাদপত্র থেকে কেটে নেওয়া যুদ্ধের ছবি। তাই আজ এ রকম একটা জায়গা দেখে মন আনন্দে ভরে উঠল। সে সবই ছিল কঠিন, নিরানন্দ, মরুভূমিসদৃশ, কিন্তু এখানে এমন কিছু আছে যা শ্রান্ত চোখকে শান্তি দেয়, দীর্ঘ ক্ষুধার্তকে দেয় পুষ্টি। একটা মোটা কার্পেট যে এত নয়নলোভন হতে পারে, দেয়াল-কাগজ আর বাঁধানো ছবি, উজ্জ্বল রঙের পর্দা আর আলোর ঢাকনা, উইণ্ডসোর চেয়ার, বার্নিশ-করা তাক, তার উপর সাজানো সামুদ্রিক ঝিনুক, বই ও চীনামাটির পাত্র, এক কথায় একটি নারীর হাতে ঘর-সংসার যে মনকে এমনভাবে ভরে দিতে পারে, সে কথা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। আমার মনের এই উল্লাস আমার মুখেও ফুটে উঠেছিল; তাই লোকটি তা দেখতে পেল আর দেখে খুসিই হল।

ভাব-গদগদ স্বরে সে বলল, "এ সবই আমার স্ত্রীর হাতে করা; প্রতিটি কাজই সে নিজে করেছে।" একটা ছবির ফ্রেমের উপরকার জাপানী নরম কাপড়ের ঝালরটা একটু বেঁকে গিয়েছিল। বেশ যত্ন করে লোকটি ঝালরটাকে ঠিক করে দিল, পিছিয়ে এসে বারকয়েক সেটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার ঠিক করে তবে শান্ত হল। বলল: "আমার স্ত্রীও এই রকম করে। কি যে অভাব আছে বোঝা যায় না, অথচ একটা অভাব যে আছে তা বোঝা যায় এবং সেটা ঠিক করা হলে তখন বোঝা যায় অভাবটা কি ছিল। এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। মা যেমন ছেলের চুল আঁচড়ে দেবার পরে একটু ঠিকঠাক করে দেয়, এও অনেকটা সেই রকম।"

হাত-মুখ ধোবার জন্য সে আমাকে একটা শোবার ঘরে নিয়ে গেল। অনেক বছর এত সুন্দর শোবার ঘর আমি দেখি নি: সাদা বিছানার চাদর, সাদা বালিশ, কার্পেট-ঢাকা মেঝে, কাগজ-আঁটা দেয়াল, ছবি, ড্রেসিং-টেবিল, আয়না, পিন-কুশন ও সাজের জিনিসপত্র; এক কোণে মুখ ধোবার জায়গা; তাতে আসল চিনে মাটির গামলা ও কুজো, চীনা মাটির পাত্রে সাবান, তাকের উপর এক ডজনের বেশী তোয়ালে-তোয়ালেগুলো এত পরিষ্কার ও সাদা যে হাত দিতে সংকোচ হয়। মনের ভাব আবারও আমার মুখে ফুটে উঠল, আর সেও আত্মতুষ্টির সঙ্গে বলে উঠল:

"এ সবই তার কাজ; নিজেই করেছে প্রতিটি কাজ। এখানে এমন কিছু নেই যাতে তার হাতের ছোঁয়া না লেগেছে। আপনি হয় তো ভাবছেন-কিন্তু আমি বড়ই বকবক করছি।"

হাত ধুতে ধুতে আমি যখন ঘরের চারদিকের সব কিছু দেখছিলাম, নতুন জায়গায় এলে সবাই তাই করে থাকে, তখন আমার মনে হল সে যেন চাইছে যে এ ঘরের কোন একটা জিনিস যেন আমি নিজে থেকেই আবিষ্কার করতে পারি। চোখের আকারে-ইঙ্গিতে সে আমাকে জিনিসটার একটা আভাষ দিতেও চেষ্টা করছিল। বারকয়েক এদিক ওদিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার দৃষ্টি গিয়ে ঠিক জায়গাটিতে পড়ল। খুসিতে হেসে উঠে দুই হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল:

"ঠিক ধরেছেন! ঐটেই বটে! আমি জানতাম আপনি পারবেন। তার ছবি।"

দেয়ালের এক কোণে রাখা কালো আখরোট কাঠের একটা ছোট ব্র্যাকেট, আর সেখানেই রয়েছে সেই জিনিসটি যা আমি আগে লক্ষ্য করি নি-তামার উপর মিনে-করা একটা ছবি। একখানি মিষ্টি মেয়েলি মুখ; এত সুন্দর যে মনে হল এরকম মুখ আগে কখনও দেখি নি। আমার মুখের সবিস্ময় প্রশংসাটুকু যেন সে আকণ্ঠ পান করে তৃপ্ত হল।

বলল, "উনিশে তার বিগত জন্ম দিন গেছে, আর সেই দিনই আমাদের বিয়ে হয়েছিল। যখন তাকে দেখবেন-একটু পরেই দেখতে পাবেন!"

"তিনি কোথায়? কখন আসবেন?"

"এখন এখানে নেই। আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে গেছে। এখান থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে তাঁরা থাকেন। আজ দু'সপ্তাহ হল সে গেছে।"

"তিনি কবে ফিরবেন বলে আশা করছেন?"

"আজ বুধবার। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ সে ফিরবে-হয় তো ন'টা হবে।"

আমি নিরাশার বেদনা অনুভব করলাম।

কিছুটা অনুতাপের সুরেই বললাম, "দুঃখের কথা, তখন আমাকে চলে যেতে হবে।"

"চলে যাবেন? না, না,-যাবেন কেন? যাবেন না। তাহলে সেও খুব হতাশ হবে।"

সে হতাশ হবে-সেই সুন্দর মানুষটি! কথাগুলি যদি সেই নারী নিজের মুখে বলত তাহলেও এর চাইতে মনোরম হত না। তাকে চোখে দেখবার একটু গভীর, উগ্র কামনা অনুভব করতে লাগলাম-সে কামনা এতই সকাতর ও সনির্বন্ধ যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। নিজেকে বললাম: "মনের শান্তির জন্যই অবিলম্বে এখান থেকে চলে যাব।"

"কি জানেন, লোকজন এখানে এসে থাকুক, সেটা সে খুব পছন্দ করে-বিশেষ করে যারা বেশ জানে-শোনে, কথা বলতে পারে-এই আপনার মত। এতে তার খুব আনন্দ; কারণ সেও জানে-শোনে-প্রায় সব কিছুই জানে, কথা বলতে পারে একেবারে পাখির মত-আর পুথিপত্র যা পড়ে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। যাবেন না; মাত্র ক'টা তো দিন; নইলে সে বড়ই হতাশ হবে।"

কথাগুলি শুনলাম, কিন্তু খেয়াল করলাম না; নিজের চিন্তায় ও দ্বন্দ্বে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। সে বাইরে গেল; তাও খেয়াল করিনি। ইতিমধ্যে একটা ছবির এলবাম হাতে নিয়ে ফিরে এসে সেটা আমার সামনে খুলে ধরল। বলল:

"এই নিন, এবার তার মুখের সামনে বলুন যে তাকে দেখবার জন্য আপনি থাকতে পারতেন, কিন্তু থাকবেন না।"

দ্বিতীয়বার চোখ ফেলতেই আমার সংকল্প ভেঙে গেল। ঝুঁকি নিয়েই আমি থেকে যাব। সে রাতে আমরা শান্তিতে পাইপ টানলাম, নানা বিষয়ে-বিশেষ করে তার বিষয়ে-অনেক রাত অবধি কথা বললাম; সত্যি, অনেক দিন পরে বড় সুখে সময়টা কাটল। বৃহস্পতিবার এল এবং বেশ আরামের মধ্যেই চলে গেল। সন্ধ্যার দিকে একজন বড়সড় খনির লোক মাইল তিনেক দূর থেকে এসে হাজির হল-সেই ধূসর চুল, ভাগ্যবিতাড়িত অগ্রপথিকদের একজন-আমাদের সাদর অভিবাদন জানাল এবং গম্ভীর, বিচক্ষণ ভাষায় কথা বলল:

"ছোট ম্যাডামের খবর জানবার জন্যই নেমে পড়লাম। কখন আসছে? কোন সংবাদ পেয়েছ কি?"

"হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি। পড়ে শোনাব নাকি টম?"

"তোমার আপত্তি না থাকলে শুনতেই তো চাই হেনরি।"

থলে থেকে একটা চিঠি বের করে বলল, কিছু কিছু কথা বাদ দিয়ে সে পড়তে চায়; তারপরই চিঠিটা পড়তে লাগল; একখানি নিরুচ্ছ্বাস ভালবাসার চিঠি, সুন্দর ভাষায় লেখা; পুনশ্চ অংশে টম, জো, চার্লি ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশীদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ ও তাদের কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

পড়া শেষ করে টমের দিকে তাকিয়েই সে বলে উঠল:

"আহা, আবার তাই করছ! হাত সরাও, তোমার চোখ দেখতে দাও। যখনই তার চিঠি পড়ি তখনই তুমি এই কাণ্ড কর। চিঠি লিখে সব তাকে জানিয়ে দেব।"

"না, না, তা করো না হেনরি। তুমি তো বোঝ, আমি বুড়ো হয়েছি, সামান্য হতাশায়ই আমার কান্না পায়। ভেবছিলাম, এখানে এলে তাকেই দেখতে পাব; তার বদলে এসেছে শুধু একটা চিঠি।"

"আরে, এটা আবার তোমার মাথায় কে ঢোকাল? সকলেই তো জানে, শনিবারের আগে সে আসছে না।"

"শনিবার! তাই তো! আমিও তো জানতাম। আজকাল আমার কী যে হয়েছে ভাবলে অবাক লাগে। সত্যি তো, কথাটা তো আমিও জানতাম। ঠিক আছে, আমি তাহলে যাচ্ছি। সে এলে আবার এসে হাজির হব হে!"

শুক্রবার বিকালে মাইলখানেক দূরের বাড়ি থেকে আর একজন পাকা চুল বুড়ো এসে বলল, হেনরি যদি মনে করে যে মহিলাটি পথশ্রমে খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়বে না, তাহলে শনিবার রাতে ছেলেরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে চায়।

ক্লান্ত! সে হবে ক্লান্ত! শোন কথা! আরে জো, তুমি তো জান, তোমাদের খুসি করতে সে ছ'সপ্তাহ বসে কাটাতে পারে!"

চিঠি এসেছে শুনে সেও চিঠিটা শুনতে চাইল, আর তাতে তার সম্পর্কে ভাল ভাল কথা থাকায় বুড়ো লোকটি একেবারেই ভেঙে পড়ল; বলল, সে তো একটা বুড়ো হাবড়া, কাজেই চিঠিতে শুধু তার নামটা থাকলেই তার এই অবস্থা হত। "হায় প্রভু, সে না থাকলে এত খারাপ লাগে!" সে বলল।

শনিবার বিকেল হতেই আমি বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলাম। সেটা লক্ষ্য করে বিস্মিত চোখে হেনরি বলল:

"আপনি কি ভাবছেন সে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে?"

ধরা পড়ে একটু বিব্রত বোধ করলাম; কিন্তু হেসে বললাম, কোন রকম প্রত্যাশায় থাকলে ও রকম করাটা আমার অভ্যাস। কিন্তু এতে সে খুব তুষ্ট হল না; তখন থেকেই তার মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম। চারবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে এমন জায়গায় গেল যেখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়; সেখানে দাঁড়িয়ে চোখের উপরে হাত রেখে তাকিয়ে দেখল। বারকয়েক বলল:

"আমার চিন্তা হচ্ছে; খুবই চিন্তা হচ্ছে। আমি জানি, ন'টার আগে তার আসার কথা নয়, তবু কে যেন বলছে যে একটা কিছু ঘটেছে। আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না কি?"

তার এই ছেলেমানুষী কথা শুনে আমারই লজ্জা করতে লাগল; শেষ পর্যন্ত ঐ একই প্রশ্ন যখন সে আরও একবার করে বসল, তখন আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম, কিছুটা নিষ্ঠুরভাবেই তার কথার জবাব দিলাম। সে কুঁকড়ে মাথা নীচু করল; আমার কথায় সে এতই আহত ও অপমানিত বোধ করল যে অকারণে নিষ্ঠুর কথাগুলি বলার জন্য আমারই কষ্ট হতে লাগল। যাই হোক, সন্ধ্যার দিকে আর এক বুড়ো চার্লি এসে যখন আসর জমিয়ে বসল, মহিলাটিকে স্বাগত জানাবার উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বলতে লাগল, তখন আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম। চার্লি একটার পর একটা মজার কথা বলে বন্ধুর মন থেকে সব দুশ্চিন্তা ও আশংকা দূর করে দিল।

"তার একটা কিছু ঘটেছে? আরে হেনরি, এটা স্রেফ বাজে কথা। তার কিছুই ঘটতে পারে না; সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। চিঠিতে কি লেখা আছে? লেখা আছে, সে ভাল আছে, তাই নয় কি? লেখা আছে, ন'টা নাগাদ সে এখানে পৌঁছবে, তাই নয় কি? তাকে কি কখনও কথার খেলাপ করতে দেখেছে? তা দেখ নি। কাজেই মন খারাপ করো না; সে এসে পড়বে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তোমার জন্ম যেমন সত্য, এটাও তেমনই সত্য। এখন এস, একটু সাজানো-গোছানো যাক-হাতে তো বেশী সময় নেই।"

অচিরেই টম ও জো-ও এসে পড়ল। সকলে মিলে বাড়িটাকে ফুল দিয়ে সাজাতে লাগল ন'টা নাগাদ তিন বুড়ো বলল, তারা তো বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিয়েই এসেছে, কাজেই এখনই বাজনা শুরু করা যেতে পারে; এর পরেই তো ছেলেমেয়েরা এসে পড়বে হৈ-হুল্লোড় করতে। একটা বেহালা, একটা ব্যাঞ্জো ও একটা ক্লারিওনেট-বাজনার মধ্যে এই তিনটি। তিন মূর্তি পাশাপাশি বসে নাচের হাল্কা সুর বাজাতে বুট দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল।

ন'টা বাজতে চলল। রাস্তার দিকে চোখ রেখে হেনরি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মানসিক যন্ত্রণায় শরীরটা দুলছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কামনা করে বারকয়েক তাকে মদ খাওয়ানো হয়েছে। এবার টম চেঁচিয়ে বলল:

"সকলে উটে দাঁড়াও! আর এক গ্লাস করে চলুক। সে এল বলে!"

জো গ্লাসগুলি এগিয়ে দিল। অবশিষ্ট দুটোর একটার জন্য আমি হাত বাড়ালাম, কিন্তু জো চাপা গলায় গর্জে উঠল:

"ওটা ছেড়ে দিন! অপরটা নিন।"

তাই করলাম। সকলের শেষে দেওয়া হল হেনরিকে। পানীয় গলা দিয়ে নামবার আগেই ঘড়িটা বেজে উঠল। শেষ পর্যন্ত শুনে তার মুখটা ক্রমেই কালো হয়ে উঠল; বলল:

"শোন হে, ভয়ে আমার অস্থির লাগছে। আমাকে ধর-আমি শুয়ে পড়ব।"

সকলে ধরাধরি করে তাকে সোফায় নিয়ে গেল। চুপচাপ শুয়ে থেকে সে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল। একসময়ে ঘুমের মধ্যেই বলে উঠল: "ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলাম যেন? তারা কি এসেছে?"

এক বুড়ো তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "জিমি প্যারিশ এসে জানিয়ে গেল, পথে তাদের দেরী হয়েছে; তবে তারা বড় রাস্তা ধরে আসছে। মাদামের ঘোড়াটা আবার খোঁড়া; তবু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।"

"আঃ, ভাগ্য ভাল যে কিছু ঘটে নি।"

কথাগুলো বলার সাথে সাথেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। লোকজনরা তার পোশাক খুলে ফেলে তাকে তার ঘরের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর দরজাটা বন্ধকরে ফিরে এল। তারপরই তারা চলে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল। আমি বললাম: "দয়া করে আপনারা যাবেন না। মহিলাটি আমাকে চিনতে পারবেন না; আমি তো নবাগত।"

তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। জো বলল:

"সে? বেচারি, উনিশ বছর হল সে মারা গেছে!"

"মার গেছেন?"

"তার চাইতেও শোচনীয়। বিয়ের ছ' মাস পরে সে আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে গিয়েছিল; শনিবার সন্ধ্যায় ফিরবার পথে এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে ইণ্ডিয়ানরা তাকে পাকড়াও করে; সেই থেকে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।"

"আর তার ফলেই তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে?"

"এক ঘণ্টা আগেও খারাপ ছিল না। কিন্তু বছরের এই সময়টা যখনই ঘুরে আসে তখনই অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। তখনই তার ফিরবার তিন দিন আগে থেকেই আমরা এখানে আসতে শুরু করি, তাকে উৎসাহ দেই, স্ত্রীর কাছে থেকে কোন চিঠি এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করি, এবং শনিবার এলেই আমরা সকলে এসে হাজির হই, বাড়িটাকে ফুল দিয়ে সাজাই, এবং একটা নাচের আসরের সব ব্যবস্থা করে ফেলি। উনিশ বছর ধরে প্রতি বছরই আমরা এই করে আসছি। প্রথম শনিবারে মেয়েদের বাদ দিয়েই আমরা ছিলাম সাতাশ জন; আজ তিন জনে এসে ঠেকেছি; মেয়েরা সকলেই চলে গেছে। একটা ওষুধ খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, নইলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে; তারপর আবার এক বছরের জন্য সে সুস্থ হয়ে ওঠে-মনে করে শেষের তিন-চারটে দিন ছাড়া সে তার কাছেই আছে; তারপরেই সে তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, পুরনো চিঠিটা বের করে এবং আমরা এসে তাকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে বলি। হায় প্রভু, বড় ভাল মেয়ে ছিল!"

১৮৯৩

এস্কুইমাউ কুমারীর উপকথা

The Esquimau Maiden's Romance

"হ্যাঁ মিঃ টোয়েন, আমার জীবনের সব কথাই আপনাকে বলব, কারণ আপনি যে আমাকে ভালবাসেন, আমার কথা জানতে চান এটা আপনার দয়া।"

তার নিস্পাপ চোখের প্রসন্ন দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলে নরম গলায় মেয়েটি কথাগুলি বলল।

একটা ছোট হাড়ের ছুরি দিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে গাল থেকে তিমি মাছের চর্বি চেঁছে তুলছিল, আর সেগুলোকে তার লোমের আস্তিনের মধ্যে রেখে দিচ্ছিল। তার চোখ দুটি ছিল মেরু-জ্যোতির দিকে নিবদ্ধ মেরু-জ্যোতির উজ্জ্বল শিখাগুলি আকাশ থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়েছে নির্জন বরফ-ঢাকা প্রান্তরের বুকে, আর নানা বর্ণে রাঙিয়ে তুলেছে ভাসমান বরফস্তূপের শিখরদেশ; প্রায় দুঃসহ ও ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যে ভরা সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এতক্ষণে সে-দিবাস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে মেয়েটি তার সাধারণ জীবনের ইতিহাস আমাকে শোনাবার জন্য প্রস্তুত হল।

সে বরফের স্তূপটাকে আমরা সোফার মত ব্যবহার করেছি সেটার উপর সে আরাম করে বসল। আমিও শুনবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

মেয়েটি সুন্দরী। এস্কুইমাউদের দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা বলছি। অন্যরা হয় তো তাকে কিছুটা মোটা-সোটা ভাববে। তার বয়স ঠিক কুড়ি বছর; তার জাতির মধ্যে তাকেই সব চাইতে মনোহারিনী মেয়ে বলে মনে করা হয়। এখন এই খোলা জায়গাতে বেখাপ্পা ভারী লোমের কোট, ট্রাউজার, বট ও মস্ত বড় একটা টুপি পরা সত্ত্বেও তার মুখটা সত্যি সুন্দর। যে সমস্ত অতিথিকে তার বাবার খুপরি-ঘরে আসা-যাওয়া করতে দেখলাম তাদের মধ্যে কাউকেই তো তার সমকক্ষ বলা যায় না। তাই বলে সে কিন্তু বখে যায় নি। সে মিষ্টি, সরল, আন্তরিক; সে যে সুন্দরী সে কথা জানলেও তার আচার-আচরণে সেটা বাইরে প্রকাশ পায় না।

আজ এক সপ্তাহ ধরে সে আমার নিত্যসঙ্গী; তাকে যত দেখছি ততই ভাল লাগছে। মেরু অঞ্চলের পক্ষে প্রায় বিরল সুরুচিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই তাকে আদরে ও যত্নে মানুষ করা হয়েছে, কারণ তার বাবা তাকে তাদের জাতির একজন গুরুত্বপূর্ণ ও এস্কুইমাউ সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় লোক। বরফ-ঢাকা বিরাট প্রান্তরে কুকুর-টানা স্লেজ গাড়িতে চেপে লাস্কা-র (মেয়েটির নাম) সঙ্গে আমি অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি; তার সঙ্গ সব সময়ই সুখকর ও তার কথাবার্তা মনের মত লেগেছে। তার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছি, কিন্তু তার বিপজ্জনক নৌকোতে চড়ি নি: বরফের উপর দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছি, আর তার মারাত্মক রকমের স্থিরলক্ষ্য বর্শার আঘাতে শিকারকে আঘাত করতে দেখেছি। তার সঙ্গে সিলমাছ ধরতেও গিয়েছি। একবার সে যখন ভালুক শিকারে গিয়েছিল তখন অনেকটা পথ তার সঙ্গে গিয়েছিলাম, কারণ মনে মনে আমি ভালুককে বড় ভয় করি।

যাই হোক, এতক্ষণে সে তার গল্প বলার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সে যা বলল তার হল:

"অন্য সব উপজাতিদের মতই আমাদের উপজাতির লোকরাও জমাট সমুদ্রের উপর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতেই অভ্যস্ত; কিন্তু দু'বছর আগে এই ঘুরে বেড়ানো আমার বাবার আর ভাল লাগল না; তাই জমাট বরফের চাঁই দিয়ে সে এই বন-বাড়িটা তৈরি করল-তাকিয়ে দেখুন, বাড়িটা সাত ফুট উঁচু এবং অন্য যে কোন বাড়ি থেকে তিন চার গুণ লম্বা-তাকিয়ে দেখুন, বাড়িটা সাত ফুট উঁচু এবং অন্য যে কোন বাড়ি থেকে তিন চার গুণ লম্বা-সেই থেকে আমরা এখানেই আছি। এই বাড়িটার জন্য তার খুব গর্ব আর সেটা খবুই সঙ্গত, কারণ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে সাধারণ বাড়ি অপেক্ষা এ বাড়িটা অনেক বেশী সুন্দর ও সম্পূর্ণ। যদি খেয়াল না করে থাকেন তো অবশ্য করবেন, কারণ এ বাড়িতে আপনি এমন সব বিলাসব্যবস্থা দেখতে পাবেন যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাড়িটার ওই প্রান্তে ভোজনের সময় অতিথি ও বাড়ির লোকদের বসবার জন্য যে উঁচু বেদীটা করা হয়েছে, যাকে আপনি বলেন 'বৈঠকখানা' সেটা এত বড় যে এ রকমটা আপনি আর কোন বাড়িতে দেখেন নি-তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ লাস্কা; সত্যি ঘরটা মস্ত বড়; যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে ভাল বাড়িতেও এ রকমটা দেখা যায় না।" এ কথা স্বীকার করায় তার চোখ দুটি গর্বে ও আনন্দে চকমক করে উঠল। সেটা লক্ষ্য করেই একটা ইঙ্গিত আমি পেয়ে গেলাম।

সে বলতে লাগল, "আমিও ভেবেছিলাম, এটা দেখে আপনি অবাক হবেন। আর একটা জিনিস: ঘরে খুব পুরু করে লোমওয়ালা চামড়া বিছানো-সিল, সামুদ্রিক ভোঁদড়, রূপোলি-ধূসর শেয়াল, ভালুক বেজী-সব রকম চামড়া প্রচুর পরিমাণে বিছানো; আর আপনারা যাকে 'বিছানা' বলেন দেওয়াল বরাবর পাতা সেই সব বরফের ঘুমোবার বেঞ্চিগুলোতেও ঐ সব লোম বা চামড়া পুরু করে পাতা। আপনাদের বাড়ির বেদী ও ঘুমোবার বেঞ্চি কি এর চাইতে ভালভাবে সাজানো থাকে?"

"না লাস্কা, তা থাকেন না।" এ কথা শুনে সে খুসি হল। তার রুচিবান বাবার হেপাজতে কতগুলো চামড়া আছে সেই কথাই সে শুধু ভাবছিল, তার দামের কথা সে মোটেই ভাবে নি। আমি বলতে পারতাম যে আমাদের দেশে ঐ ধরনের লোমশ চামড়ার অনেক দাম, কিন্তু সে কথা সে বুঝতে পারত না, কারণ ওরা এসব জিনিসকে মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে দেখে না। আমি তাকে বলতে পারতাম, সে পোশাক সে পরেছে, অথবা তার চার পাশের অতি সাধারণ মানুষরাও প্রাত্যহিক জীবনে যে পোশাক পরে, তার দাম বারো শ' থেকে পনেরো শ' ডলার; বলতে পারতাম, আমাদের দেশে এ রকম কোন লোককে আমি চিনি না যে বারো শ' ডলার দামের পোশাক পরে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু সে কথাও সে বুঝতে পারত না; কাজেই আমি কোন কথাই বললাম না। সেই আবার কথা শুরু করল:

"তারপর ধরুন হাত-মুখ ধোবার ময়লা জলের টব। আমাদের বৈঠকখানায় আছে দুটো টব, আর সারা বাড়িতে আছে আরও দুটো। বৈঠকখানায় দুটো কদাচিৎ দেখা যায়। আপনাদের দেশে কি দুটো থাকে?"

টবগুলোর কথা মনে পড়তেই আমার গলা আটকে এল। সে অবস্থা সামলে নিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বললাম, "দেখা লাস্কা, দেশের নিন্দা করাটা লজ্জার কথা; তোমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলছি; তাই বলে সেটাকে আর বাড়িও না। তবে এ কথা ঠিক জেনো যে নিউ ইয়র্ক শহরের সব চাইতে ধনীলোকের বসবার ঘরেও দুটো টব থাকে না।"

নির্দোষ আনন্দে সে হাততালি দিয়ে উঠল; বলল, "ওহো, এটা নিশ্চয় আপনার মনের কথা নয়; হতেই পারে না।"

"কিন্তু আমি সত্য কথাই বলছি সোনা। এই তো ভাণ্ডারবিল্ট আছেন। ভাণ্ডারবিল্ট সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ধনবান লোক। অথচ তাঁর বসবার ঘরেও দুটো টব থাকে না। তা কেন, সেখানে একটাও নেই। এ কথা যদি সত্য না হয় তাহলে যেন আমার মরণ হয়।"

তার সুন্দর চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বরে একটু ভয়ের ছোঁয়াচ লাগিয়ে সে বলল:

"কী আশ্চর্য-কী অবিশ্বাস্য-ঠিক বোঝাই যায় না। লোকটি কি কৃপণ?"

"না-তাও নয়। খরচের জন্য তিনি চিন্তাই করেন না, তবে-কি জান-এটা কিছুটা টাকার গরম বলে মনে হতে পারে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই; তিনি সরল সাদাসিধে মানুষ, জাঁকজমক দেখানোটা পছন্দ করেন না।"

লাস্কা বলল, "তা-বিনয় খুবই ভাল জিনিস; তবে বাড়াবাড়ি ভাল নয়; তা ছাড়া ঘরটা কেমন দেখাবে সেটাও তো ভাবতে হবে।"

"তা, ঘরটা অবশ্যই ফাঁকা-ফাঁকা ও অসম্পূর্ণ মনে হবে, কিন্তু-"

"আমারও তাই মনে হয়! এ রকমটা কখনও শুনি নি। অন্য সব দিক থেকে দেখলে বাড়িটা কি বেশ সুন্দর?"

"হ্যাঁ, খুবই সুন্দর।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটা মোমবাতি দাঁতে কাটতে কাটতে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসে রইল; মনে হল ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বুঝতে চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত মাথাটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

"দেখুন, আমার মনে হয় এক ধরনের বিনয় আছে যেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে সেটাই লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একটা লোক যখন তার বৈঠকখানায় দুটো টব রাখতে পারে তখন যদি সে একটাও না রাখে, তাহলে সেটা তার সত্যিকারের বিনয়ের প্রকাশও হতে পারে, কিন্তু তার চাইতে একশ'গুণ বেশী সম্ভাবনা হল সে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে। আমার বিচারে আপনার মিঃ ভাণ্ডারবিল্ট ভালই জানেন তিনি এর কোন্‌টা চাইছেন।"

তার ধারণাটা সংশোধন করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল হল না। সে আবার বলল:

"আপনাদের ধনী লোকদের কি আমাদের মত চওড়া বরফের চাঁই দিয়ে তৈরি এমন সুন্দর শোবার বেঞ্চি আছে?"

"দেখ, বেশ ভাল ভাল বিছানাই তাদের আছে, তবে সেগুলো বরফের চাঁই দিয়ে বানানো নয়।"

"সেটাই তো জানতে চাই! বরফ দিয়ে তৈরি নয় কেন?"

অসুবিধার কথাগুলি বললাম। বরফের দামেরও উল্লেখ করলাম। শুনে সে চেঁচিয়ে উঠল:

"বলেন কি? আপনারা বরফ কেনেন?"

"নিশ্চয় সোনা।"

নির্দোষ হাসিতে ফেটে পড়ে সে বলল:

"এ রকম অর্থহীন কথা আগে কখনও শুনি নি! আমাদের এখানে তো প্রচুর বরফ-বরফের কোন দামই নেই। যতদূর চোখ যায় মাইলের পর মাইল শুধু বরফ আর বরফ। এই সবটা বরফের বিনিময়ে একটা মাছের ফুসফুস দিতেও তো আমি রাজী নই।"

"তার কারণ মফস্বলের সরল মানুষ তোমরা বরফের মূল্য বোঝ না। মধ্য গ্রীষ্মের নিউ উয়র্ক-এ যদি এ বরফ তোমার হাতে থাকে তো তা দিয়ে তুমি বাজারের সব তিমি মাছ কিনে নিতে পার।"

সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল:

"সত্যি বলছেন?"

"সম্পূর্ণ সত্যি। দিব্যি করে বলতে পারি।"

সে খুব ভাবনায় পড়ে গেল। একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল:

"আহা, সেখানে গিয়ে যদি থাকতে পারতাম!"

আমি বললাম, "কিন্তু সেখানে থাকলে তো তুমি তিমির মাংস খেতে চাইতে না।"

"কি বললেন?"

"সত্যি তারা কেউ খায় না।"

"কেন খায় না?"

"মানে-তা-তা ঠিক জানি না। হয় তো কোন সংস্কার। হ্যাঁ, তাই-শুধুই সংস্কার। হয় তা কোন এক সময় কোন না কোন কারণে কেউ এটা খেত না, আর তুমি তো জান এ রকম একটা খেয়াল একবার চালু হলে সেটা আর কোন দিন বন্ধ হল না।"

মেয়েটি চিন্তিতভাবে বলল, "এটা ঠিক-সম্পূর্ণ ঠিক কথা। এখানে যেমন আমাদের সংস্কার আছে সাবানের বিরুদ্ধে।"

সত্যি সত্যিই কথাটা সে মন থেকে বলছে কিনা বুঝবার জন্য তার দিকে তাকালাম। না, আন্তরিকভাবেই সে কথাটা বলেছে। একটু ইতস্তত করে বেশ সাবধানে বললাম:

"মাফ কর। সত্যি কি সাবান সম্পর্কে তোমার কোন সংস্কার আছে? মানে কোন দিন ছিল কি?"

"হ্যাঁ-কিন্তু সেটা গোড়ায়; কেউ এটা খেত না।"

"ওঃ-বুঝেছি। আগে ঠিক ধরতে পারি নি।"

সে বলতে লাগল:

"সংস্কার আর কি। প্রথম যখন বিদেশীদের কাছ থেকে এখানে সাবান এল, কেউ তা পছন্দ করত না; কিন্তু ক্রমে সেটাই যখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল, তখন সকলেই পছন্দ করতে লাগল; আর এখন তো ক্ষমতায় কুলোলেই লোকে সেটা রাখে। আপনার বুঝি খুব পছন্দ?"

"দারুণ। বিশেষ করে এখানে ওটা না পেলে তো আমি মরে যেতাম। তুমি পছন্দ কর?"

"আমি তো ওর জন্য পাগল! আপনি মোমবাতি পছন্দ করেন?"

"ওটাকে তো অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। তোমার খুব পছন্দ বুঝি ?"

তার চোখে দুটো নেচে উঠল। জোর গলায় বলে উঠল:

"আঃ! বলবেন না! মোমবাতি!-আর সাবান!-"

"আর মাছের নাড়িভুড়ি!-"

"আর ট্রেনের তেল!-"

"আর গলা বরফ!-"

"আর তিমির তেল!-"

"আর পচা মাংস! মৌমাছির মোম! আলকাতরা! আর তার্পিন! আর ঝোলাগুড়! আর-"

"বলবেন না-বলবেন না-খুসিতে আমি মরে যাব!-"

"তাহলে একটা বরফের বালতিতে এ সব কিছু ভরে নাও, প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন কর, তারপর পাল তুলে দাও!"

কিন্তু এত বড় একটা আদর্শ ভোজের স্বপ্ন মেয়েটি সহ্য করতে পারল না, মূর্ছা গেল। আহা বেচারি। মুখে বরফ ঘসে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। ধীরে ধীরে তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। ক্রমে ক্রমে আবার তার কাহিনী শুরু করল:

"যা হোক, এই সুন্দর বাড়িটাতে আমার বাস করতে লাগলাম। আমি কিন্তু সুখী হলাম না। তার কারণ হল: ভালবাসার জন্যই আমার জন্ম; ভালবাসা ছাড়া আমি সত্যিকারের সুখ পাই না। আমি চাই, আমার জন্যই কেউ আমাকে ভালবাসুক। আমি চাইলাম একটি প্রাণের দেবতা, চাইলাম সেই দেবতার দেবী হয়ে থাকতে; পারস্পরিক পূজা ছাড়া আমার মন খুসি হবে না। প্রেমিক ছিল প্রচুর-আসলে অতিমাত্রায় প্রচুর-কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল; আগে হোক পরে হোক, সে ত্রুটি আমি ধরে ফেলতাম-কেউ সেটা চেপে রাখতে পারে নি-তারা আমাকে চাইত না, চাইত আমার সম্পত্তি।"

"তোমার সম্পত্তি?"

"হ্যাঁ, এই জাতির মধ্যে, এমন কি এই অঞ্চলের যে কোন জাতির মধ্যেই আমার বাবা সব চাইতে ধনী লোক।"

তার বাবার সম্পত্তিটা কি ভেবে অবাক হলাম। এই বাড়িটা হতে পারে না-কারণ এ রকম আর একটা বাড়ি তো যে কেউ বানাতে পারে। এটা লোমের চামড়া হতে পারে না-এখানে তার কোন মূল্যই নেই। স্লেজ, কুকুর, হারপুন, নৌকো, হাড়ের বড়শি ও সুচ-না, এ সবও সম্পত্তি নয়। তাহলে কি সেই বস্তু যা এই লোকটিকে এত ধনী করেছে, আর যার টানে এই প্রেমিকের দল এ বাড়িতে এসে ভিড় জমিয়েছে? শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, কথাটা জিজ্ঞাসা করি। তাই করলাম। মেয়েটি ভয়ানক খুসি হয়ে উঠল। আমার আরও কাছে ঘেঁসে সে বলল:

"ভাবুন তো তার কত সম্পত্তি আছে-পারবেন না!"

অনেক ভেবেচিন্তেও আমি যখন কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না, তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে সে বলল:

"বাইশটি মাছ-মারা বড়শি-হাড়ের নয়, বিদেশী-খাঁটি লোহার তৈরি!"

তারপরই সে নাটকীয়ভাবে পিছনে সরে গিয়ে তার কথার ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগল। সে যাতে হতাশ না হয় সে জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করলাম।

বিবর্ণ মুখে বলে উঠলাম:

"মহান স্কট! বল কি!"

"ঠিক আপনি যেমন সত্যি মিঃ টোয়েন, এ কথাও তেমনই সত্যি!"

"লাস্কা, তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ-এটা তোমার আসল কথা নয়।"

সে ভয় পেল। বিচলিত বোধ করল। বলল:

"মিঃ টোয়েন, এর প্রতিটি কথা সত্য-প্রতিটি কথা। বিশ্বাস করুন-বিশ্বাস করলেন তো? বলুন না, বিশ্বাস করেছেন!"

"আমি-মানে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছি-করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি এত হঠাৎ কথাটা বলেছে। এ রকম কথা এভাবে হঠাৎ বলা উচিত নয়। তাতে-"

"ওহো, আমি দুঃখিত! ভেবেছিলাম-"

"তা তো ঠিকই। তুমি তো ছেলেমানুষ, অত কথা বুঝতে পার নি। তাছাড়া, এর ফলাফল কি হতে পারে তাও তুমি আগে থেকে বুঝতে পার নি।"

"না, না, সত্যি, আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"দেখ লাস্কা, তুমি যদি প্রথমে বলতে পাঁচটা কি ছ'টা বড়শি, আর তারপর ধীরে ধীরে-"

"বুঝেছি, বুঝেছি-তারপর ধীরে ধীরে একটা, দুটো, তিনটে করে যোগ করতাম, আর তার পরে-আসলে কথাটা আমি ভাবিই নি।"

"কিছু মনে করো না মেয়ে, ঠিক আছে-এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি-একটু পরেই এ ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু একটি অপ্রস্তুত ও দুর্বল মানুষের ঘাড়ে হঠাৎ একেবারে বাইশটার বোঝা-"

"আহা, সত্যি অপরাধ হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন-বলুন ক্ষমা করেছেন। বলুন!"

তার কাছ থেকে অনেক অনুনয়-বিনয়, অনেক অনুরোধ-উপরোধ আদায় করে তবে তাকে ক্ষমা করলাম, আর সেও খুসি হয়ে আবার

তার কাহিনী বলতে শুরু করল। কথা প্রসঙ্গেই বুঝতে পারলাম, তাদের পারিবারিক সম্পদের মধ্যে আরও একটা বস্তু আছে-কোন রকমের একটা মণি-মুক্তোই হবে হয় তা; কিন্তু পাছে আবার আমি মূর্ছা-টুর্ছা যাই সেই ভয়ে বলি-বলি করেও সে কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম, তাকে বোঝাতে লাগলাম যে এবার তৈরিই আছি, তাই এবার আর বড় রকমের ধাক্কা খাব না। তখন সে স্বীকার করল যে সেই মূল্যবান বস্তুটি তার সঙ্গেই আছে, এবং আমার মুখের দিকে সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে বুকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা দোমড়ানো চৌকো পেতলের চাক্তি বের করে আমাকে দেখাল। তাই না দেখে আমি মূর্ছিত হবার ভান করে তার শরীরের উপর ঢলে পড়লাম; এতে সে যুগপৎ খুসিও হল, আবার ভয়ও পেল। মূর্ছা ভেঙে আমি একটু সুস্থ হলে সে জানতে চাইল, জিনিসটা সম্পর্কে আমার কি ধারণা।

"এটার বিষয়ে আমার কি ধারণা? আমি তো মনে করি, আজ পর্যন্ত যত জিনিস আমি দেখেছি এটাই তার মধ্যে সব চাইতে সুন্দর।"

"সত্যি নাকি? আপনার কথা শুনে কী ভাল যে লাগছে! এটা তো একটা পরম আদরের বস্তু, তাই নয় কি?"

"তা তো বটেই। আমি হলে বিষুবরেখার বদলেও এটা চাইতাম।"

সে বলল, "আমি জানতাম এটা আপনার ভাল লাগবে। সত্যি, জিনিসটা কী সুন্দর। এ অঞ্চলে এ রকম জিনিস আর একটাও নেই। সুদূর মেরু সাগর থেকে অনেক পথ পেরিয়ে লোকে এটা দেখতে এসেছে। আপনি আর কখনও এ রকম জিনিস দেখেছেন?"

বললাম, না, এই প্রথম দেখলাম। এই ডাহা মিথ্যে কথাটা বলতে আমার খুব কষ্ট হল, কারণ এ জিনিস আমি লাখ লাখ দেখেছি; তার এই মূল্যবান মানিকটি "নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল রেল"-এর মাল চিহ্নিত করার একটা পিতলের চাক্তি মাত্র।

মুখে বললাম, "কী আশ্চর্য! একাকী, কোন রক্ষী সঙ্গে নেই, একটা কুকুর পর্যন্ত না, আর তুমি এই জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ?"

"স্-স্, চেঁচাবেন না," সে বলল। "এটা যে আমার সঙ্গে আছে তা কেউ জানে না। সকলে মনে করে, বাবার রত্ন-ভাণ্ডারেই এটা আছে। সাধারণত সেখানেই তো থাকবার কথা।"

"রত্ন-ভাণ্ডারটা কোথায়?"

প্রশ্নটা বড়ই বোকার মত করে ফেলেছি। তাকে দেখে কিছুটা বিচলিত, কিছুটা সন্দিগ্ধ মনে হল। কিন্তু আমি বললাম:

"আরে না, আমাকে ভয় করো না। আমাদের দেশে সাত কোটি মানুষের বাস, তবু-আমার কথা বিশ্বাস করো-তাদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না যে অগণিত সংখ্যক বড়শির ব্যাপারেও আমাকে বিশ্বাস না করে।"

এই কথায় আশ্বস্ত হয়ে সে আমাকে বাড়ির রত্ন-ভাণ্ডারের কথা বলে দিল। বড়শিগুলো সেখানেই রাখা আছে। তখন আমিও তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম।

"আহা, লাস্কা, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী!-এই সুন্দর বাড়ি, এই সুদৃশ্য মানিক, ঐ মূল্যবান সম্পদ, এমন সুন্দর শোভন বরফ, প্রচুর ভাসমান বরফ-স্তূপ, সীমাহীন অনুর্বর প্রান্তর, কত ভালুক ও সিন্ধুঘোটক, কত স্বাধীনতা ও মুক্তি, সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি, না চাইতেই সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান তোমার অপেক্ষায়; যুবতী, ধনবতী, সুন্দরী, সকলের বাঞ্ছিতা, সকলের আকাঙ্ক্ষিতা, সকলের ঈর্ষার পাত্রী; তোমার কোন প্রয়োজন অপূর্ণ নেই, কোন বাসনা অতৃপ্ত নেই, এমন কিছু নেই যা তুমি কিন্তু আর কারও সম্পর্কেই যথার্থভাবে এই কথাগুলি বলা চলে না। আর তুমি-তুমিই যে এ সব কথার উপযুক্ত পাত্রী লাস্কা-তা আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি।"

আমার কথা শুনে তার গর্বের শেষ নেই, সুখের অবধি নেই। বার বার সে আমাকে শেষের কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলতে লাগল:

"তবু, সবটাই রৌদ্রোজ্জ্বল দিন নয়-মেঘের ছায়াও আছে। সম্পত্তির বোঝা আমাকে চেপে ধরেছে। অনেক সময়ই মনে হয়েছে, এর চাইতে বুঝি গরীব হওয়াই ভাল ছিল-অন্তত এত অত্যধিক ধনী কোন মতেই নয়। প্রতিবেশী উপজাতীয় লোকেরা যেতে যেতে হাঁ করে

আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে; মাঝে মাঝে সসম্ভ্রমে বলে, 'দেখ-ঐ যে সে-লাখপতির মেয়ে!' আবার কখনও সখেদে বলে, 'সে বড়শির মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর আমার-আমার একটাও নেই!' এ সব দেখলে, এ সব কথা শুনলে বড় খারাপ লাগে। আমার শিশু কালে আমরা গরীব ছিলাম, তখন আমরা ইচ্ছা হলে দরজা খুলে রেখেও শুতে পারতাম, কিন্তু এখন-এখন আমাদের একজন রাতের পাহারাওলা রাখতে হয়েছে। সেকালে আমার বাবা সকালে প্রতিই সদয় ও ভদ্র ছিল; কিন্তু এখন সে গম্ভীর হয়েছে, উদ্ধত হয়েছে; সকলের সঙ্গে মেলামেশাও করতে পারে না। একসময় পরিবারই ছিল তার একমাত্র চিন্তা, কিন্তু দুঃখের কথা না বলাই ভাল। আগেই তো বলেছি, আমার জন্যই কেউ আমাকে ভালবাসুক এই ছিল আমার স্বপ্ন।"

"অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হবার লগ্ন এল। একদা একটি অপরিচিত লোক এল তার নাম কালুলা। আমার নাম বলতেই সে বলল, সে আমাকে ভালবাসে। কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে আমার অন্তর লাফিয়ে উঠল, কারণ প্রথম দর্শনেই তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, এই মুহূর্তের চাইতে অধিকতর সুখী হতে সে চায় না। বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক দূরে চলে গেলাম, দু'জনে দু'জনের কথা বললাম আর শুনলাম, আর মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম! অবশেষে শান্ত হয়ে কথা থামিয়ে খেতে বসলাম। তার সঙ্গে ছিল সাবান আর মোমবাতি, আমার সঙ্গে ছিল বরফ। ক্ষিধেও খুব পেয়েছিল। এমন ভাল খাবার আর কখনও খাই নি।"

"সে যে উপজাতির মানুষ তাদের বাস উত্তর দিকে অনেক দূরে। যখন শুনলাম যে আমার বাবার নাম কখনও শোনে নি তখন আমার খুব ফূর্তি হল। আমি বলতে চাই, সে তখন একজন লাখপতির কথা শুনেছে, কিন্তু তার নামটা শোনে নি-কাজেই বুঝতেই তো পারছেন-আমিই যে বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সে কথা সে তখনও জানত না। নিশ্চয় জানবেন, আমিও তাকে সে কথা জানাবই না। শেষ পর্যন্ত একজন আমার জন্যই আমাকে ভালবেসেছে, আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তখন আমি যে কত সুখী-সে আপনি ভাবতেও পারবেন না!

"ইতিমধ্যে রাতের খাবারের সময় হয়ে গেল। তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই সে অবাক হয়ে গেল; চেঁচিয়ে বলল:

"কী চমৎকার! ওটাই কি তোমার বাবার বাড়ি?"

"তার কথার সেই সুর, তার চোখের সেই সপ্রশংস দৃষ্টি আমাকে ব্যথিত করল, কিন্তু সে ভাব শীঘ্রই দূর হয়ে গেল, কারণ আমি তো তাকে বড়ই ভালবেসেছিলাম, আর সে ছিল কত সুন্দর আর উদার। আমার পরিবারের কাকীমারা, কাকারা, ভাই-বোনেরা সকলেই তাকে নিয়ে খুব খুসি হল, অনেক অতিথিকে ডাকা হল, তারপর দরজা বন্ধ করে সব আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল; সব কিছু যখন বেশ গরম আর আরামদায়ক হয়ে উঠল তখন আমার বাকদান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটা সুন্দর ভোজের আয়োজন করা হল।

"ভোজ-পর্ব সমাধা হতেই অহংকার আমার বাবাকে পেয়ে বসল; কালুলা হঠাৎ কী সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চলেছে সে কথা তাকে বোঝাবার জন্য বাবা তার সব সম্পত্তি কালুলাকে দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না-বিশেষ করে এই গরীব মানুষটির বিস্ময়টুকু বাবা উপভোগ করতে চাইল। আমি চেঁচিয়ে বাধা দিতে পারতাম,-কিন্তু বাবাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। তাই কোন কথা না বলে বসে বসে যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলাম।

"সকলের চোখের সামনেই বাবা সোজা সেই গুপ্তস্থানে ঢুকে গেল এবং বড়শিগুলো বের করে এনে এমনভাবে আমার মাথার উপর দিয়ে ছুড়ে দিল যে সেগুলো মঞ্চের উপরে আমার প্রেমিকের হাঁটুর কাছে ছড়িয়ে পড়ে চক্‌চক্ করতে লাগল।

"এটা ঠিক যে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে সে গরীব বেচারির দম বন্ধ হবার উপক্রম। বোকার মত বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সে শুধু ভাবতে লাগল, একটি মানুষের এত অবিশ্বাস্য রকমের সম্পদ কী করে থাকতে পারে। তার পরেই উজ্জ্বল চোখ তুলে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'ও হো, তাহলে আপনিই সেই বিখ্যাত লাখপতি!'

"আমার বাবা ও অন্য সকলেই খুসিতে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু জিনিসগুলো যেন নেহাৎই খোলামকুচি এমনই অযত্নের সঙ্গে

বাবা যখন তার সম্পত্তিগুলো কুড়িয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিল তখন বেচারি কালুলার অবাক হওয়াটা একটা দেখবার মত দৃশ্যই বটে। সে বলল:

'এও কি সম্ভব যে না গুনেই আপনি এ রকম বস্তু তুলে রাখলেন?'

"আমার বাবা সগর্ব অট্টহাসি হেসে বলল:

'বটেই তো, দু'একটা বড়শিই যখন তোমার চোখে এত বড় মনে হচ্ছে তাতেই বোঝা যায় তুমি কোন দিন ধনী ছিলে না।

"কালুলা বিমূঢ়ভাবে মাথা নীচু করে বলল: 'সত্যি বলেছেন স্যার, ঐ সব বহুমূল্য বস্তুর একটা আঁকড়ির মত দামী জিনিসও কোন দিন আমার ছিল না, আর আজ পর্যন্ত এমন কোন লোককেও আমি দেখি নি যার ধন-দৌলত এক বেশী যে সেগুলো গুণবার প্রয়োজন সে বোধ করে না, কারণ আজ পর্যন্ত সব চাইতে ধনীলোক যাকে আমি দেখেছি তার সম্পত্তি বলতে শুধু তিনটি বড়শি।'

"আমার নির্বোধ বাবা পুনরায় উল্লসিত আনন্দে ফেটে পড়ল; এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন বড়শিগুলো গোণার বা সেগুলোর উপর কড়া নজর রাখার অভ্যাস তার নেই। আসলে তার সব ভাবটাই লোক দেখানো। আর বড়শিগুলো গোণার ব্যাপার? আসলে বাবা তো প্রতিদিনই একবার করে গোণে।

"আমার প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছিল ভোরে; তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম ঠিক যখন অন্ধকার হয়-হয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল ভোজের উৎসবে; অবশেষে অতিথিরা একে একে চলে গেল, আর আমরা বাকিরা দেয়াল বরাবর পাতা ঘুমোবার বেঞ্চিগুলোতে যার যার মত শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে সকলেই স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল। শুধু আমি ছাড়া। সুখে ও উত্তেজনায় আমার ঘুম এল না। অনেক-অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরে দেখতে পেলাম, একটা আবছা মূর্তি আমার পাশ দিয়ে গিয়ে বাড়িটার একেবারে শেষ প্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সে যে কে, পুরুষ বা নারী, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মূর্তিটি, অথবা অন্য কোন মূর্তিও হতে পারে, আমার পাশ দিয়েই উল্টো দিকে চলে গেল। ভাবলাম, এ সবের অর্থ কি, কিন্তু ভেবে কোন ফল হল না; ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

"কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না; কিন্তু হঠাৎ পুরোপুরি ঘুম ভাঙতেই শুনলাম আমার বাবা তারস্বরে বলছে: 'মহান তুষার-দেবতার দিব্যি, একটা বড়শি চুরি গেছে।" কে যেন বলে দিল, এটাই আমার দুঃখের সূচনা, আর আমার শিরায়-শিরায় রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। এই অমঙ্গলের পূর্বাভাষ দৃঢ়তর হল যখন বাবা চীৎকার করে বলল, 'যে যেখানে আছ জাগো, অপরিচিতকে পাকড়াও কর!' তারপরই চারদিকে শুরু হয়ে গেল চীৎকার, হৈ-হল্লা, আর অভিশাপ। অন্ধকারের মধ্যে নানা আবছা মূর্তির ছুটাছুটি। প্রিয়তমকে সাহায্য করতে ছুটে গেলাম, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত মোচড়ানো ছাড়া আর কি আমি করতে পারি?-একটা মানুষের দেয়াল তখন তাকে আমার কাছ থেকে বেড়া দিয়ে আটকে রেখেছে? তার হাত-পা শক্ত করে বাঁধছে। ভালভাবে বাঁধা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা আমাকে তার কাছে যেতে দেবে না। বেচারির অপমানিত দেহের উপর আছড়ে পড়লাম; তার বুকের উপর পড়ে আমার সব কান্নাকে উজাড় করে দিলাম। ওদিকে বাবা ও পরিবারের জন্য সকলে আমার নিন্দা করতে লাগল। আর তাকে বার বার ভয় দেখাতে লাগল ও লজ্জাজনক ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। শান্ত মর্যাদার সঙ্গে সব কিছু সে সহ্য করল; তাতেই সে আমার কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠল; তার জন্য তারই সঙ্গে নির্যাতন ভোগ করতে আমার সুখের ও গর্বের আর সীমা রইল না। বাবা হুকুম দিল, এখনই প্রধানদের সভা ডাকা হোক যাতে তারা আমার কালুলার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করতে পারে।

আমি বললাম, "সে কি? হারানো বড়শির জন্য তালাসী না করেই বিচার হবে?"

"হারানো বড়শি!" সকলে বিদ্রুপের স্বরে হেসে উঠল; আমার বাবা ঠাট্টা করে আরও বলল, "সকলে সরে এস; ভাল করে তাকিয়ে দেখ-মেয়ে আমার হারানো বড়শি খুঁজতে যাচ্ছে; আরে, খুঁজে যে পাবেই তাতে আর সন্দেহ কি!" সকলে আবার হেসে উঠল।

"আমি বিচলিত হলাম না-আমার মনে কোন রকম ভয় ছিল না। বললাম, 'এখন তোমরা হাস, তোমাদেরই হাসার পালা। কিন্তু আমাদের পালাও আসছে। অপেক্ষা কর, দেখতে পাবে।'

"একটা মশাল হাতে নিলাম। ভেবেছিলাম, এক মুহূর্তের মধ্যেই জিনিসটা পেয়ে যাব; তাই এক ভরসা নিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম যে উপস্থিত সকলে খুব গম্ভীর হয়ে গেল; হয় তো তারাও ভাবতে লাগল যে বড় বেশী তাড়াতাড়ি তারা সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু, হায়রে হায়! -সে খোঁজের কী তিক্ত অভিজ্ঞতা! আঙুলে দশ থেকে বারো গুণতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ সকলেই একেবারে চুপচাপ; তারপর থেকেই আমি যেন ডুবে যেতে লাগলাম; চারদিকে ঠাট্টার রোল উঠল; সে ঠাট্টা উচ্চ থেকে উচ্চতর, নিশ্চিত থেকে নিশ্চিততর হতে লাগল; এবং শেষ পর্যন্ত আমি যখন খোঁজ করা ছেড়ে দিলাম, তখন সকলে নিষ্ঠুর হাসির দমকে বারবার ফেটে পড়তে লাগল।

"আমার তখনকার সেই যন্ত্রণার কথা কেউ কোন দিন জানবে না। কিন্তু প্রেমই ছিল আমার ভরসা ও শক্তি; কালুলার পাশে দিয়ে আমার যোগ্যস্থানে দাঁড়ালাম; তার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললাম:

'তুমি নির্দোষ প্রাণাধিক-আমি তো জানি; কিন্তু আমার সান্ত্বনার জন্য নিজের মুখে সে কথা আমাকে বল; তাহলেই ভাগ্যে যা আছে সব আমি সইতে পারব।'

সে জবাব দিল:

'এই মুহূর্তে আমি মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি, সেটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে আমি নির্দোষ। হে আহত হৃদয়, তাই জেনে তুমি সান্ত্বনা লাভ কর, শান্ত হও। তুমি আমার নাকের নিঃশ্বাস, জীবনের জীবন!'

"এবার তাহলে প্রধানরা আসুক!"-আমি কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বরফের উপর মচ-মচ শব্দ শোনা গেল, আর পর মুহূর্তেই দরজায় দেখা দিল অবনতদেহ একসারি মূর্তি-প্রবীণের দল।"

"আমার বাবা আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল এবং রাতের সব ঘটনা বিবৃত করল। সে আরও বলল, পাহারাওলা দরজার বাইরেই ছিল, আর বাড়ির ভিতর পরিবারের লোকরা ও অপরিচিত লোকটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। 'পরিবারের লোকরা কি তাদের নিজের সম্পত্তি চুরি করবে?'"

"বাবা থামল। প্রবীণরা কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইল। শেষ পর্যন্ত একের পর এক প্রতিবেশীকে বলল, 'অপরিচিত লোকটির উপরেই তো সন্দেহটা পড়ে'।-কথাগুলি আমার কানে বড়ই কষ্টদায়ক শোনাল। তখন আমার বাবা বসল। হায়, দুর্ভাগিনী আমি! সেই মুহূর্তে আমার প্রিয়তমের নির্দোষিতা আমি প্রমাণ করতে পারতাম, কিন্তু আমি তা জানতাম না!"

বিচার-সভার প্রধান জিজ্ঞাসা করল:

'বন্দীর পক্ষ সমর্থন করবার মত কেউ কি এখানে আছে?'

"আমি দাঁড়িয়ে বললাম:

'কেন সে ঐ বড়শিটা, বা অন্য যে কোন বড়শি, বা সবগুলো বড়শি চুরি করবে?' একদিন পরেই তো সে সব কিছুর মালিক হত!'

"দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। চারদিককার অনেক মানুষের নিঃশ্বাসের বাষ্প যেন কুয়াসার মত আমাকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে একের পর এক প্রবীণরা বারকয়েক ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এই মেয়েটির কথার মধ্যেও যুক্তি আছে।' আঃ, আমার বুকটা যেন ভরে উঠল!-কী স্পষ্ট অথচ মূল্যবান কথা। আমি বসে পড়লাম।

"বিচার-সভার প্রধান বলল, 'যদি কারও কিছু বলার থাকে, এই বেলা বলুন; পরে যেন গোলমাল করবেন না।'

"আমার বাবা উঠে বলল:

'রাতের অন্ধকারে একটি মূর্তি আমার পাশ দিয়ে রত্ন-ভাণ্ডারের দিকে গিয়েছিল ও একটু পরেই ফিরে এসেছিল। আমি মনে করি, সে

এই অপরিচিত।'

"ওঃ, আমার তখন মূর্ছা যাবার মত অবস্থা! আমি ভেবেছিলাম, এ গোপনে কথা শুধু আমিই জানতাম। মহান তুষার-দেবতাও আমার মনের এ কথা টেনে বের করতে পারত না।

"বিচার-সভার প্রধান কঠোর স্বরে বেচারি কালুলাকে বলল:

"কথা বল!"

"কালুলা প্রথমে ইতস্তত করে পরে বলল:

'সে আমি। সুন্দর বড়শিগুলোর চিন্তায় আমর ঘুম আসছিল না। আমি সেখানে গেলাম, মনকে শান্ত করে নির্দোষ আনন্দে তাকে ভরে তুলতে সেগুলোকে চুমো খেলাম, আদর করলাম, এবং তারপর যথাস্থানে রেখে দিলাম। সেই সময় একটা পড়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমি একটাও চুরি করি নি।'

"ওঃ, এই পরিস্থিতিতে এ রকম স্বীকৃতি যে মারাত্মক! সকলেই ভয়ংকর চুপচাপ। আমি জানতাম, নিজমুখে সে নিজের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করেছে; সব শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি মুখের উপর যেন এই কথাগুলিই স্পষ্টাক্ষরে ফুটে উঠেছে: 'এই তো স্বীকারোক্তি!-নগন্য, পঙ্গু ও অশক্ত।'

"দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে গম্ভীর কথাগুলো কানে এল; আসবে তা তো জানতামই; প্রতিটি শব্দ যেন ছুরির মত আমার বুকের মধ্যে কেটে বসে গেল:

'বিচার-সভার এই হুকুম যে অপরাধীকে জলে ফেলে বিচার করা হোক।'

"হায়, মানুষ এই জলে ফেলে বিচারের প্রথা আমাদের দেশে চালু করেছিল তার মাথায় অভিশাপ নেমে আসুক! কেউ জানে না কোথায় সেই সুদূর দেশ যেখান থেকে যুগ যুগ আগে এ প্রথা এদেশে এসেছিল। তার আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী এবং অন্য কোন অনিশ্চিত বিচার-ব্যবস্থার আশ্রয় নিত, আর তার ফলে কখনও কখনও কিছু কিছু নির্দোষ মানুষ প্রাণে বেঁচেও যেত; কিন্তু এই জলে ডুবিয়ে বিচারের প্রথা আমাদের মত অশিক্ষিত বর্বরদের চাইতে বিজ্ঞতর কোন মানুষের মাথা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় যে নির্দোষ তার নির্দোষিতা নিঃসন্দেহে তর্কাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়, কারণ তারা জলে ডুবে যায়, আর যারা দোষী তাদের দোষও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, কারণ তারা জলে ডোবে না। আমার বুকের ভিতরটা ভেঙে যাচ্ছিল; আমি বললাম, 'সে তো নির্দোষ, সে তো ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে যাবে, আর আমি তাকে কোনদিন দেখতে পাব না।'

"তারপর থেকে কখনও তার সঙ্গ ছাড়লাম না। তার বাহুলগ্না হয়েই মূল্যবান সময়টুকু কাটিয়ে দিলাম। সেও ভালবাসার অশ্রুজলে আমাকে স্নান করিয়ে দিল। আঃ, সে যে কী দুঃখ, আর সে যে কী সুখ! অবশেষে সকলে আমার কাছে থেকে তাকে ছিনিয়ে নিল; আমি কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিছু নিলাম; দেখলাম, তারা তাকে সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল-দুই হাতে আমি মুখ ঢাকলাম। যন্ত্রণা? ওঃ, ও কথাটার গভীর হতে গভীরতম অর্থ আমি জানি!

"পরমুহূর্তে লোকজনরা সব হিংস্র আনন্দে চীৎকার করে উঠল। চমকে আমি চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। ওঃ, কী তিক্ত দৃশ্য-সে সাঁতার কাটছে!

"সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় পাথরে পরিণত হল-বরফ হয়ে গেল। বললাম, 'সে তাহলে দোষী; সে আমাকে মিথ্যা বলেছে!'

"ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

"সকলে তাকে দূর সমুদ্রে নিয়ে উত্তাল সমুদ্রের বুকে দক্ষিণমুখে ধাবমান একটি ভাসমান বরফ-স্তূপের উপর ছেড়ে দিয়ে এল। তারপর আমার পরিবারের লোকরা বাড়ি ফিরল। বাবা আমাকে বলল:

'তোমার চোর তোমার প্রতি তার মৃত্যুকালীন বাণীতে বলে গেছে: "তাকে বলবেন আমি নির্দোষ; যত দিন, যত ঘণ্টা, যত মিনিট ধরে আমি না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করব আমি তাকে ভালবাসব, তার কথা চিন্তা করব, আর যে দিনটিতে তার সুন্দর মুখখানি আমি দেখেছিলাম সেই দিনটিকে আশীর্বাদ করব।" কথাগুলি ভারী সুন্দর, এমন কী কাব্যময়!'

"আমি বললাম, 'সে নোংরা-তার কথা আর কখনও শুনতে চাই না।' হায়, ভাবুন তো-সে তো সত্যি নির্দোষ ছিল!"

"ন'টি মাস-ন'টি একঘেয়ে বিষণ্ণ মাস-পার হয়ে গেল। অবশেষে এল সেই 'মহান বাৎসরিক বলিদান দিবস' যখন আমাদের জাতির সব কুমারী মেয়েরা ভাল করে মুখ ধোয়, চুল আঁচড়ায়। প্রথমবার চিরুনী চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল সেই নরঘাতী বড়শী-এতগুলো মাস ধরে সেটা আমার চুলের মধ্যেই বাসা বেঁধে ছিল। আমার অনুতপ্ত বাবার কোলের মধ্যেই আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। আর্তকণ্ঠে বাবা বলে উঠল, "তাকে আমরা খুন করেছি; আর কোন দিন আমি হাসব না!" বাবা তার কথা রেখেছিল। শুনুন: সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি মাসে আমি চুলে চিরুনী চালাই। কিন্তু হায়, আজ আর তাতে কি লাভ!"

বেচারি ছোট মেয়েটির ছোট কাহিনী এখানেই শেষ হল-আর আমরা জানলাম, যেহেতু নিউ ইয়র্ক শহরের এক কোটি ডলার এবং মেরু অঞ্চলের সীমান্তের বাইশটি বড়শির আর্থিক প্রভুত্ব সমপর্যায়ের, তখন আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে যে মানুষ ইচ্ছা করলে দশ সেণ্ট দামের কতকগুলি বড়শি কিনে সে দেশে পাড়ি জমাতে পারে অথচ নিউ ইয়র্কেই থেকে যায়, সে তো মূর্খ।

১৮৯৩

সে কি জীবিত না মৃত?

Is He Living or Is He Dead?

১৮৯২ সালের মার্চ মাসটা আমি রিভিয়েরা-র মেন্টোন-এ কাটাচ্ছিলাম। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী মন্টি কার্লো এবং নাইস-এ সর্বাসাধারণের জন্য যে সব সুখ-সুবিধা আছে, ব্যক্তিগতভাবে সেই সব সুখ-সুবিধা অবসর যাপনের এই জায়গাটাতেও পাওয়া যায়। তার অর্থ, এখানে আছে প্রচুর রোদ, স্বাস্থ্যপ্রদ হাওয়া, আর উজ্জ্বল নীল সমুদ্র; অথচ মানুষের হৈ-হট্টগোল ও নানা রকম পোশাকের পারিপাট্য এখানে চোখে পড়ে না। মেন্টোন শান্ত, সরল বিশ্রামস্থল; ধনী ও জাঁকজমকবিলাসীরা সেখানে যায় না। আমি বলতে চাই, ধনী লোকরা সাধারণতই সেখানে যায় না। মাঝে সাঝে এক আধজন ধনী মানুষ এসে পড়ে। সম্প্রতি সেই রকম একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। কিছুটা গোপন রাখবার জন্য তাকে আমি স্মিথ বলে ডাকবল।

একদিন হোটেল দ্য আংলে-র দ্বিতীয় প্রাতরাশের সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল:

"জলদি! যে লোকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে লক্ষ্য করুন। তার সব বিবরণ টুকে নিন।"

"কেন?"

"লোকটি কে জানেন?"

"হ্যাঁ। আপনি আসবার আগে থেকেই তিনি এখানে আছেন। লোকে বলে, তিনি লায়ন্স থেকে আগত একজন বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত, খুব ধনী রেশমীবস্ত্র প্রস্তুতকারক। আমার ধারণা, লোকটি এই পৃথিবীতে একাবের একা, কারণ সব সময়ই তাকে বিষণ্ণ ও স্বপ্নদর্শী বলে মনে হয়, আর কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। তার নাম থিয়োফিল ম্যাগ্নান।"

ভেবেছিলাম, এবার স্মিথ খুলে বলবে মঁসিয়ে ম্যাগনান-এর প্রতি তার এই অতি-আগ্রহের কারণ কি; কিন্তু তার পরিবর্তে সে যেন একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল এবং কয়েক মিনিটের জন্য আমার কাছ থেকে এবং বাকি পৃথিবীর কাছ থেকেও হারিয়ে গেল। মাঝে মাঝে চিন্তার সুবিধা হবে বলে চকচকে সাদা চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগল, আর এদিকে প্রাতরাশ ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে লাগল। অবশেষে বলল:

"না, একেবারেই হারিয়ে গেছে; কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

"কি মনে করতে পারছেন না?"

"হান্স এণ্ডারসন-এর একটি ছোট্ট সুন্দর গল্প। কিন্তু একেবারেই ভুলে মেরে দিয়েছি। কিছুটা অংশ এই রকম: একটি শিশুর ছিল খাঁচার বন্দী একটা পাখি। পাখিটাকে সে ভালবাসে, কিন্তু কিছু না ভেবেচিন্তেই তাকে অবহেলা করে। পাখিটা গান গায়, কিন্তু কেউ তা শোনে না। কেউ সেদিকে মন দেয় না; যথাসময়ে পাখিটা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়, তার গান বিষণ্ণ ও দুর্বল হতে হতে একসময় থেমে যায়-পাখিটা মারা যায়। শিশুটি আসে, দুঃখে তার মন কাতর হয়; তারপর চোখের জলে শোক করতে করতে সে তার সঙ্গীদের ডেকে এনে যথাযোগ্য জাঁকজমক ও দুঃখের সঙ্গে পাখিটাকে কবর দেয়। বেচারিরা জানতেও পারে না যে জীবিত কালে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে ও আয়েসে-আরামে রাখতে চেষ্টা না করে কবিদের না খাইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তারপর তাদের সৎকারে ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজে যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করবার এই অপকর্মটি শুধু শিশুরাই যে করে তা নয়। এখন-"

কিন্তু এইখানে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। সেদিন সন্ধ্যা দশটা নাগাদ স্মিথের সঙ্গে দেখা হতেই সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল একসঙ্গে ধুমধাম ও গরম স্কচ-হুইস্কি খাবে বলে। ঘরটা খুব আরামদায়ক। ভাল চেয়ার, উজ্জ্বল বাতি, ভাল অলিভ কাঠের খোলা আগুন। তার উপর সোনায় সোহাগার মত বাইরে ভেসে আসছে সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গগর্জন। দ্বিতীয় দফা স্কচ ও অনেক রকম অলস গুল্তানির পরে স্মিথ বলল:

"এতক্ষণে আমরা দু'জনই প্রস্তুত-আমি একটি আশ্চর্য ইতিহাস বলতে, আর আপনি সে ইতিহাস শুনতে। অনেক বছর ধরে কথাটা গোপন রয়েছে-আমার ও অপর তিনজনের গোপন কথা; এবার আমি সে গোপনতা ভাঙতে চলেছি। আপনি বেশ আরাম পাচ্ছেন তো?"

"সম্পূর্ণ। বলে যান।"

সে যা বলে গেল এই তার মর্মার্থ:

অনেক বছর আগে আমি ছিলাম একজন তরুণ শিল্পী-খুবই তরুণ-এখানে কিছু ছবি আঁকি, ওখানে কিছু ছবি আঁকি, এই ভাবে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে আরও দু'জন ফরাসী তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল; তারাও আমার মত ঐ একই কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা ছিলাম যেমন সুখী তেমনই গরীব, অথবা যেমন গরীব তেমনই সুখী-যেমন ইচ্ছা কথাটাকে সাজিয়ে নিতে পারেন। ক্লদ্ ফেরে ও কার্ল বুলাঁজার-এই হল ছেলে দুটির নাম; বড়ই ভাল ছেলে দুটি; দারিদ্রকে দেখে মনের সুখে হাসতে পারে; সুখে-দুঃখে একই মনোভাব বজায় রাখতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ব্রেতোঁ গ্রামে পৌঁছে আমরা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেলাম, আর সেখানেই আমাদেরই মত গরীব আর একটি শিল্পী আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ক'জনকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাল-ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-

"কী! বিখ্যাত ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ?"

"বিখ্যাত? তখন সে আমাদের চাইতে বেশী বিখ্যাত ছিল না। এমন কি নিজের গ্রামেও তার কোন খ্যাতি ছিল না। সে এতই গরীব ছিল যে শালগম ছাড়া আর কিছুই আমাদের খাওয়াতে পারত না; এমন কি মাঝে মাঝে শালগমেরও অভাব ঘটত। আমরা চারজন হলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু অত্যুৎসাহী বন্ধু অত্যাগসহন বন্ধু। একসঙ্গে সাধ্যমত ছবি আঁকতে লাগলাম; ছবি স্তূপের পর স্তূপ জমতে লাগল; কিন্তু কদাচিৎ তার একখানা হাতছাড়া হত। একসঙ্গে বেশ কাটছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দশা একেবারে চরমে উঠত।

দুই বৎসরাধিক কাল এইভাবে চলল। অবশেষে একদিন ক্লদ্ বলল:

"দেখ ভাইরা, এতদিনে আমরা শেষ প্রান্তে পৌঁচেছি। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?-একেবারে শেষ প্রান্তে। সকলেই আঘাত করতে উদ্যত-আমাদের বিরুদ্ধে সকলে একজোট হয়েছে। সারা গ্রাম ঘুরে এসেছি; যা বললাম তাই ঠিক। পাই-পয়সা পর্যন্ত সব ধার মিটিয়ে দিলে তারা আমাদের আর এক সেন্টিমও ধার দেবে না।"

আমরা বড়ই ঘাবড়ে গেলাম। প্রত্যেকের মুখই হতাশায় সাদা হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আমাদের অবস্থা বড়ই সঙ্কটপূর্ণ। অনেকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। অবশেষে মিলেৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল:

"আমার তো মাথায় কিছুই আসছে না-কিচ্ছু না। তোমরা কিছু বাত্‌লাও বাছাধনরা।"

কোন সাড়া নেই; অবশ্য বিষণ্ণ নীরবতাকে যদি সাড়া বলা যায় তো আলাদা কথা। কার্ল উঠে দাঁড়াল; কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করল; তারপর বলল:

"বড়ই লজ্জার কথা! এই ক্যানভাসগুলোর দিকে তাকাও, স্তূপের পর স্তূপ এমন সব ভাল ছবি যা ইওরোপের যে কেউ এঁকে থাকে-তা সে যেই হোক না কেন। হ্যাঁ, ভ্রমণরত অনেক অপরিচিত লোকই এ কথা বলেছে-অথবা এ ধরনের কথাই বলেছে।"

"কিন্তু একটা ছবিও কেউ কেনে নি।" মিলেৎ বলল।

"তা না কিনুক, এ কথা তারা বলেছে; আর কথাটাও সত্যি। ঐ যে তোমার 'দেবদূত', ওটার দিকে তাকাও। কেউ কি বলবে যে-"

"আঃ, কার্ল-আমার ঐ 'দেবদূত'-এর দাম উঠেছিল মাত্র পাঁচ ফ্রাঁ।"

"কখন?"

"কে দিতে চেয়েছিল?"

"সে কোথায়?"

"সেটা নাও নি কেন?"

"থাম-সকলে এক সঙ্গে কথা বলো না। ভেবেছিলাম সে আরও বেশী দেবে-আমার নিশ্চিত বিশ্বাসটা হয়েছিল-তাই আমি চেয়েছিলাম।"

"আচ্ছা-আর তারপর?"

"সে বলল আবার আসবে।"

"বজ্র ও বিদ্যুৎ! কেন ফ্রাঁসোয়া-"

"আহা, আমি জানি-আমি জানি। ওটা ভুল হয়েছিল। আর আমিও তখন বোকা ছিলাম। বাপুরা, আমি তো ভাল বুঝেই কাজটা করেছিলাম। সে কথা তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে; আর আমি-"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমরাও তা জানি; তোমার মনটা তো ভালই। কিন্তু দেখ, আবার যেন বোকামি করো না।"

"আমি? এখন যদি কেউ এসে ওটার জন্য একটা বাঁধাকপিও দিতে চায়-তখন দেখো।"

"একটা বাঁধাকপি! আঃ, ও নাম করো না-আমার জিভে জল আসছে। আরও ছোটখাট জিনিসের কথা বল।"

কার্ল বলল, "বাছারা, এই ছবিগুলোর কি গুণের কমতি আছে? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"না।"

"এগুলো কি খুব উঁচুদরের ছবি নয়? এ প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"হ্যাঁ।"

"এতই বড় ও উঁচুদরের জিনিস যে, কোন বিখ্যাত লোকের নাম এদের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলে প্রচণ্ড দামে এগুলি বিক্রি হয়ে যাবে। তাই নয় কি?"

"নিশ্চয়ই তাই। কেউ এতে সন্দেহ করবে না।"

"কিন্তু-আমি ঠাট্টা করছি না-সত্যি তাই নয় কি?"

"সে কি, নিশ্চয় তাই-আমরাও ঠাট্টা করছি না। কিন্তু তাতে কি হল? তাতে আমাদের কি আসে-যায়?"

"আসে-যায় কমরেডগণ-এই সব ছবির সঙ্গে আমরা একটি বিখ্যাত নাম জুড়ে দেব।"

আমাদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কার্ল-এর দিকে তাকাল। এটা আবার কি রকমের ধাঁধা? একটা বিখ্যাত নাম ধার পাওয়া যাবে কোথায়? আর সেটা ধার করবেই বা কে?

কার্ল বসে পড়ে বলল:

"এবার আমি একটা খুব গুরুতর প্রস্তাব করতে যাচ্ছি। আমি মনে করি, ভিক্ষাবৃত্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচবার এটাই একমাত্র উপায়; আমি বিশ্বাস করি, এটাই তার নিশ্চিত উপায়। মানবেতিহাসের বহুসংখ্যক দীর্ঘপ্রতিষ্ঠিত ঘটনার উপরেই আমার এই মতামত প্রতিষ্ঠিত। আমি বিশ্বাস করি, এই পরিকল্পনা আমাদের সকলকেই ধনী করে তুলবে।"

"ধনী! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!"

"না, মাথা খারাপ হয় নি।"

"হ্যাঁ, হয়েছে-তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কাকে তুমি ধনী বল?"

"প্রতিটি ছবির দাম এক লাখ ফ্রাঁ।"

"সত্যি ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি জানতাম।"

"হ্যাঁ, তাই হয়েছে। কার্ল, এত দুঃখ-কষ্ট তুমি সইতে পারছ না, আর-"

"কার্ল, একটা বড়ি খেয়ে সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়।"

"আগে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নাও-তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, আর তার পরে-"

"না, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ওর পায়ে; আমি লক্ষ্য করেছি-বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওর মাথার গোলমাল চলছে।"

অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে মিলেৎ বলে উঠল, "চুপ কর! বাছাকে তার বক্তব্য বলতে দাও। বলহে বাপু, তোমার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বল কার্ল। ব্যাপারটা কি?"

"আচ্ছা, তাহলে প্রথমেই ভূমিকাস্বরূপ বলি, মানুষের ইতিহাসের একটা সত্যকে তোমরা লক্ষ্য কর: অনেক মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিকর্মই তার অনাহারে মৃত্যু ঘটবার আগে কখনও স্বীকৃতি লাভ করে নি। এটা এত বার বার ঘটেছে যে এর উপর ভিত্তি করে আমি একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। নিয়মটা হল: আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করব-আমাদের একজনকে অবশ্যই মরতে হবে।"

কথাগুলি এতই শান্ত ও অপ্রত্যাশিতভাবে বলা হল যে আমরা প্রায় লাফিয়ে উঠতে ভুলে গেলাম। তারপর শুরু হল সমস্বরে নানা রকম উপদেশ বর্ষণ-ডাক্তারী উপদেশ-কার্লের মাথার ব্যামোকে সারাতে হবে। কিন্তু কার্ল সেই হৈ-চৈ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য-ধরে অপেক্ষা করে তারপর আবার পরিকল্পনার কথা পাড়ল:

"হ্যাঁ, অন্য সবাইকে এবং নিজেকে বাঁচাতে আমাদের একজনকে মরতে হবেই। এ নিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করা হবে। যার নাম উঠবে সেই হবে বিখ্যাত শিল্পী, আর আমরা সকলে হব ধনী। চুপ কর, এখন চুপ কর-আমি যা বলছি, সব জেনে শুনেই বলছি। এটা হচ্ছে আমার কথা। যাকে মরতে হবে আগামী তিন মাস ধরে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ছবি এঁকে যাবে, যতদূর সম্ভব ছবির পুঁজি বাড়াবে-শুধু ছবিই নয়, না! রেখা চিত্র, স্টাডি, স্টাডির, প্রত্যেকটির উপর ডজনখানেক ব্রাশের টান-সেগুলো অবশ্যই অর্থহীন হবে, কিন্তু ছবিতে স্বাক্ষরিত তার নামের একটা বৈশিষ্ট্য তাতে থাকবে; দিনে পঞ্চাশটা আঁকতে হবে, প্রত্যেকটাতেই সহজবোধ্য কিছু বৈশিষ্ট্য বা রীতি-প্রদ্ধতির প্রকাশ থাকবে-তোমরা তো জান সে সবেরই তো আসল বিক্রি-কোন মহান শিল্পীর মৃত্যুর পরে সেগুলিই তো অবিশ্বাস্য রকমের মোটা দামে বিক্রি হয়ে পৃথিবীর সব যাদুঘরে সংগৃহীত হয়ে থাকে। সে রকম টন-টন শিল্প-কর্ম আমাদের হাতে মজুত থাকবে! ইতিমধ্যে আমরা বাকি ক'জন মুমূর্ষুকে সেবা করেত, প্যারিসে ও অন্য জায়গায় ছবির ক্রেতাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার কাজে ব্যস্ত থাকব-বুঝতেই তো পারছ, আসন্ন ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়া আর কি; তারপর সব কিছু ঠিক ঠিক মত ব্যবস্থা হয়ে গেলেই মৃত্যুর খবরটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেব এবং ঘটা করে একটা শোকযাত্রার আয়োজন করব। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তো?"

"ন-না; অন্তত সবটা-"

"সবটা বুঝতে পার নি, এই তো? আসলে কেউই মারা যাচ্ছে না; শুধু নাম পাল্টে উধাও হয়ে যাবে; একটা নকল শবাধারকে আমরা কবর দেব, তার জন্য কাঁদব, আর সমস্ত জগৎ আমাদের সহায় হবে। আর আমি-"

তাকে কথা শেষ করতেও দেওয়া হল না। সকলেই সমর্থনসূচক উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়ল; লাফিয়ে উঠে ঘরময় নেচে-কুঁদে একে অপেরের গলা জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। ঘন্টার পর ঘন্টা এই মহান পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কথা বললাম;এমন কি ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্যন্ত ভুলে গেলাম। শেষ পর্যন্ত সব কিছুরই সন্তোষজনক ব্যবস্থ হয়ে যাবার পরে ভাগ্য পরীক্ষা করা হল এবং তাতে মিলেৎ নির্বাচিত হল-অর্থাৎ তথাকথিত মৃত্যুর জন্য নির্বাচিত হল।

পরদিন খুব সকালে প্রাতরাশ সেরেই আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম-অবশ্যই পায়ে হেঁটে। প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেৎ-এর ডজনখানেক ছবি-উদ্দেশ্য সেগুলির বিক্রয় ব্যবস্থা করা। কার্ল-এর লক্ষ্য প্যারিস-আসন্ন মহাদিবস উপলক্ষে মিলেৎ-এর খ্যাতিকে গড়ে তোলার কাজ সে শুরু করবে সেখানে। ক্লদ ও আমি আলাদাভাবে ফ্রান্সের দূর দূর অঞ্চলকে বেছে নিলাম।

কত সহজে ও আরামে আমরা কাজ শুরু করতে পেরেছিলাম সে কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। কাজ শুরু করবার আগে দু'দিন একটানা হাঁটলাম। তারপর একটা বড় শহরের উপকণ্ঠস্থ একটা ভিলার স্কেচ করতে শুরু করলাম-কারণ দোতলার বারান্দায় বাড়ির মালিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। ব্যাপারটা দেখতে মালিক নেমে এল-আমি জানতাম সে আসবে। তার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য আমি দ্রুত কাজ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তার মুখ থেকে প্রশংসার বাণী বেরিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে একান্ত উৎসাহের সঙ্গে সে জানাল যে আমি একজন মহৎ শিল্পী!

ব্রাশটা রেখে দিয়ে ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মিলেৎ-এর আঁকা একখানা ছবি বের করে এক কোণে লেখা নামটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সগর্বে বললাম:

"এ স্বাক্ষরটা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন? দেখুন, তার কাছেই আমার শিক্ষা-দীক্ষা! কাজেই নিজের কাজটা তো আমার ভালভাবেই জানা উচিত।"

লোকটি অপরাধীর মত বিব্রত মুখে তাকিয়ে চুপ করে রইল। আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম:

"আপনি ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-এর স্বাক্ষর চেনেন না-এ কথা নিশ্চয়ই বলবেন না!"

স্বাক্ষরটা সে সত্যি চিনতে না। কিন্তু এমন সকৃতজ্ঞ লোক বুঝি আর হয় না। সে বলে উঠল:

"না, না! আরে, এটা অবশ্যই মিলেৎ-এর স্বাক্ষর। জানি না এতক্ষণ কোন্ কথা ভাবছিলাম। এ স্বাক্ষর তো অবশ্যই আমার চেনা।"

তারপরেই সে ছবিটা কিনতে চাইল; কিন্তু আমি বললাম, ধনী না হলেও অতটা গরীব আমি নই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আটশ' ফ্রাঁ দামে ছবিটা তাকে দিয়ে দিলাম।

"আটশ'!"

হ্যাঁ। মিলেৎ হয় তো একটা শূকরমাংসের চপের বদলেই ওটা বেচে দিত। হ্যাঁ, ঐ ছোট ছবিটার জন্য আমি পেলাম আটশ' ফ্রাঁ। আহা, আজ যদি আশি হাজার দিয়েও ছবিটা ফেরৎ পেতাম। কিন্তু সে দিন চলে গেছে, লোকটির বাড়ির একটা সুন্দর ছবি এঁকে দশ ফ্রাঁ দামে সেটা তাকে দিতে চাইলাম, কিন্তু যেহেতু আমি এত বড় একজন গুরুর ছাত্র সেজন্য অত অল্প দামে সে ওটা নিতে রাজী হল না; ফলে ওটার জন্য পেলাম একশ' ফ্রাঁ। সঙ্গে সঙ্গে আটশ' ফ্রাঁ মিলেৎ-কে পাঠিয়ে দিয়ে পরদিন আবার যাত্রাশুরু করলাম।

কিন্তু এবার আর পায়ে হেঁটে নয়-না। গাড়িতে চেপে। সেই থেকে গাড়ি চেপেই চলাফেরা করি। প্রতিদিন একখানি মাত্র ছবি বিক্রি করি; কখনও দু'খানা বিক্রির চেষ্টাও করি না। ক্রেতাকে সব সময়ই বলি:

"ফ্রাসোয়া মিলেৎ-এর ছবি বিক্রি করাই তো আমার পক্ষে বোকামি, কারণ লোকটি আর তিন মাসও বাঁচবে না, এবং সে মারা যাবার পরে এ ছবি তো টাকা দিলেও আর মিলবে না।"

এই ছোট ঘটনাকে যতদূর সম্ভব প্রচার করে বেড়াতে লাগলাম এবং এই ভাবে সেই পরম লগ্নের জন্য জগদ্বাসীকে প্রস্তুত করে তুললাম।

ছবিগুলো বিক্রি করবার সব কৃতিত্বই আমার-কারণ এই ফন্দিটা আমিই বের করেছি। শেষের যে রাতে আমরা অভিযানের পরিকল্পনা করিছিলাম সেই সময়েই এই প্রস্তাবটা আমি সকলের সামনে রাখি এবং আমরা তিনজনই একমত হই যে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবার আগে এই ব্যবস্থাটাকে ভাল রকম পরীক্ষা করে দেখা হবে। কিন্তু তিন জনের বেলায়ই ফন্দিটা খুব কাজে লাগল। আমাকে পায়ে হাঁটতে হয়েছে মাত্র দু'দিন; ক্লদও হেঁটেছে মাত্র দু'দিন-বাড়ির এত কাছে মিলেৎকে খ্যাতিমান করে তোলার ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মনেই যথেষ্ট ভয় ছিল; কিন্তু কার্ল হেঁটেছিল মাত্র অর্ধেক দিন-একটা বিবেকহীন রাস্কেল-আর তার পর থেকেই সে চলাফেরা করেছে ডিউকের মত।

মাঝে মাঝেই কোন গ্রাম্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত; তার সহায়তায় কাগজে একটা সংবাদও ছাপার ব্যবস্থা হয়ে যেত; সে সংবাদে একজন নতুন শিল্পীকে আবিষ্কারের কথা থাকত না, থাকত ফ্রাঁসোয়া মিলেৎ-এর সর্বজনপরিচিতির ঘোষণা; কোন সংবাদেই তার কোন প্রশংসার কথা লেখা হত না, লেখা হত এই "শিল্পগুরু"র স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাত্র একটি কথা-কখনও আশার কথা, কখনও নৈরাশ্যের, কিন্তু সব সময়ই তার সঙ্গে মেশানো থাকত চরম অবস্থার জন্য আতংকের কথা।

সংবাদপত্রের সেই সব অনুচ্ছেদগুলিকে দাগ দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিতাম মিলেৎ-এর ছবি যারা আমাদের কাছ থেকে কিনেছে তাদের ঠিকানায়।

কার্ল অচিরেই প্যারিস উপস্থিত হয়ে বেশ ভাল হাতে কাজ গুছিয়ে ফেলল। সংবাদদাতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে মিলেৎ-এর স্বাস্থ্যের সংবাদ ইংলণ্ডে, সারা ইওরোপে, আমেরিকায়, পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা করে ফেলল।

কাজের শুরু থেকে ছয় সপ্তাহের শেষে আমরা তিনজন প্যারিসে মিলিত হয়ে কাজে বিরতি টানলাম এবং মিলেৎ-এর কাছে নতুন করে ছবি পাঠানো বন্ধ করবার নির্দেশ দিলাম। বাজার বেশ চড়েছে; একেবারে সরগরম অবস্থা; তাই ভাবলাম, আর অপেক্ষা না করে অবিলম্বে মোক্ষম আঘাত হানা দরকার। তাই মিলেৎকে লিখে দেওয়া হল, সে যেন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকিয়ে হাড়সর্বস্ব হয়ে যায়, কারণ আমরা চাই সে যেন দশ দিনের মধ্যেই মারা যেতে পারে।

তারপর টাকাকড়ি গুণে দেখলাম, তিনজনে মিলে আশিখানা ছোট ছবি ও স্টাডি বিক্রি করেছি এবং তার জন্য পেয়েছি উনসত্তর হাজার ফ্রাঁ। সর্বশেষ ছবিখানি বিক্রি করেছে কার্ল। এবং মোক্ষম দাঁও মেরেছে। "দেবদূত" ছবিটা সে বেচেছে বাইশ শ' ফ্রাঁ দামে।

মিলেৎ-এর বাজার-দর তখন কতখানি উঠেছে!-অবশ্য তখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে এমন একটা দিন আসছে যখন ঐ ছবিটা পাবার জন্য সারা ফ্রান্সে লড়াই লেগে যাবে এবং কোন অপরিচিত লোক লঞ্চাশ হাজার নগদ দিয়ে ওটা কিনে নেবে।

কাজ-কর্ম গুটিয়ে ফেলবার আগে সেদিন রাতে আমরা শ্যাম্পেন সহযোগে নৈশভোজন সমাধা করলাম। পরদিন ক্লদ ও আমি জিনিসপত্র বেঁধেছেদে শেষের ক'টা দিন মিলেৎ-এর সেবাশুশ্রূষা করার জন্য চলে গেলাম। অহেতুক কৌতূহলী লোকজনদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে প্যারিসে কার্ল-এর কাছে দৈনিক বুলেটিন পাঠাতে লাগলাম, যাতে বিভিন্ন মহাদেশের সংবাদপত্রের মারফৎ অপেক্ষমান পৃথিবীর কাছে সংবাদটা পৌঁছে দেওয়া যায়। অবশেষে এল শেষের সেই দুঃখের দিনটা;

সৎকার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য কার্লও যথাসময়ে এসে হাজির হল।

"সেই বিরাট সৎকার-অনুষ্ঠানের কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। পৃথিবী জুড়ে সে কী হৈ-চৈ না পড়ে গিয়েছিল! দুই পৃথিবীর সব বড় বড় লোক এসে তাদের শোক নিবেদন করেছিল। আমরা চার অত্যাগসহন বন্ধুই শবাধার বয়ে নিয়ে গেলাম; অন্য কাউকে হাত লাগাতে দিলাম না। সেটা তো করতেই হবে, কারণ শবাধারের ভিতরে একটা মোমের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কাজেই অন্য যে কোন

শবাধারবাহকই এত কম ওজনের শবাধার দেখলে সন্দেহ প্রকাশ করে বসত। হ্যাঁ, সেই পুরনো চারজন-যারা একদা দুঃখের দিনে স্বেচ্ছায় একসঙ্গ সে দুঃখকে ভাগ করে ভোগ করেছিল, আর আজ যে দুঃখের দিনে স্বেচ্ছায় একসঙ্গে সে দুঃখকে ভাগ করে ভোগ করেছিল, আর আজ যে দুঃখ চিরদিনের মত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে-সেই পুরনো চারজনই শবাধারটা বহন-"

"কোন্ চারজন?"

"আমরা চারজন-কারণ মিলেৎ নিজের শবাধার বহন করেছিল। বুঝতেই পারছেন, সে ছিল ছদ্মবেশে-একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের পরিচয়ে।"

"আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য হলেও সত্য। আচ্ছা, তারপর থেকেই ছবির দাম কী ভাবে বাড়তে লাগল সে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। আর টাকা? অত টাকা নিয়ে কি করব তাই ভেবে পেতাম না। আজ প্যারিসে এক ভদ্রলোকের নিজেরই আছে সত্তরখানা মিলেট-এর আঁকা ছবি। সে আমাদের দিয়েছিল কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ। আর যে ছ'টি সপ্তাহ আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলমা তখন মিলেৎ ঘরে বসে যে ঝুড়ি-ঝুড়ি স্কেচ ও স্টাডি করেছিল, আজকাল আমরা সেগুলোকে কি দামে যে বিক্রি করি-অবশ্য যখনই কোন একটা আমরা হাতছাড়া করতে রাজী হই-সে কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।"

"এক আশ্চর্য ইতিহাস-একেবারেই আশ্চর্য!"

"হ্যাঁ-তা বলতে পারেন।"

"আর মিলেৎ-এর কি হল?"

"কথাটা গোপন রাখতে পারবেন তো?"

"তা পারব।"

"আজ খাবার ঘরে যে লোকটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তার কথা মনে আছে? সেই হল ফ্রাঁসোয়া মিলেত।"

"মহান-"

"স্কট! হ্যাঁ। এই একটি ক্ষেত্রে জনসাধারণ একটি প্রতিভাকে না খেয়ে মরতে দেয় নি, আর যে পুরস্কার ছিল তার প্রাপ্য তাই দিয়ে ভরিয়েছে অন্যের পকেট। অন্ততঃ এই গায়ক পাখিটির বেলায় তার মধুর সঙ্গীতে কান না দিয়ে পরে এক বিরাট সৎকার-অনুষ্ঠানে জাঁকজমক করে তার দাম দেওয়া হয় নি। আর সে ব্যবস্থাটা আমরাই করেছিলাম।"

১৮৯৩

দশ লক্ষ পাউণ্ডের ব্যাংক নোট

The £1,000,000 Bank-Note

আমার যখন সাতাশ বছর বয়স তখন আমি জনৈক খনির দালালের করণিক ছিলাম। স্টক লেন-দেনের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবেও আমাদের নাম ছিল। জগতে তখন আমি একা; নিজের বুদ্ধি আর সুনাম ছাড়া নির্ভর করবার মত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই পথ ধরেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম।

শনিবার বিকেলটা ছিল সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে; সাধারণত ঐ সময়টা আমি উপসাগরে একটা ছোট পাল-তোলা নৌকাতেই কাটাতাম। একদিন সাহস করে কিছুটা বেশী দূর যেতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলাম। ক্রমে রাত হল; প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি; এমন সময় লণ্ডনগামী একটা দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ আমাকে তুলে নিল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দীর্ঘ সে যাত্রা; আমার জাহাজ-ভাড়া হিসাবে তারা আমাকে দিয়ে সাধারণ নাবিকরে কাজ করিয়ে নিল। লণ্ডনে যখন জাহাজ থেকে নামলাম তখন আমার পোশাক নোংরা ও শতচ্ছিন্ন, আর পকেটে ছিল একটি মাত্র ডলার। সে টাকায় চব্বিশ ঘন্টা খাওয়া-থাকা চলল। পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা অনাহারে ও অনাশ্রয়ে কাটল।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় পোর্টল্যাণ্ড প্লেস ধরে পথ চলছিলা, এমন সময় দাসীর হাত ধরে যেতে যেতে একটি শিশু মাত্র এক কামড় খাওয়া একটি মিষ্টি বড় ন্যাসপাতি জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম; সেই নোংরা বস্তুটির দিকে আমার উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। মুখে জল এল, পেট খাই-খাই করতে লাগল, সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি ওটাকে নিতে চাইলাম। কিন্তু যতবার ওটাকে নেবার চেষ্টা করি ততবারই কোন না কোন পথচারীর চোখ আমার উপর এসে পড়ে, আর আমিও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কতার ভান করি। এই একই ঘটনা বারবার ঘটতে লাগল, আর আমিও ন্যাসপাতিটা নিতে পারলাম না। ক্রমে এক সময় আমার পিছনের বাড়ির একটা জানালার পর্দা উঠে গেল, আর সেখান থেকে একটি ভদ্রলোক বলে উঠলছ:

"দয়া করে ভিতরে আসুন।"

ঝকঝকে উর্দিপরা খানসামা দরজা খুলে দিয়ে আমাকে একটা সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গেল। দুটি বয়স্ক ভদ্রলোক সেখানে বসে ছিল। চাকরকে পাঠিয়ে দিয়ে তারা আমাকে বসতে বলল। এইমাত্র তাদের প্রাতরাশ শেষ হয়েছে; ভুক্তাবশিষ্ট ভোজ্যগুলি আমাকে প্রায় অভিভূত করে ভেলল। এ সব খাবার দেখে মাথা ঠিক রাখা আমার পক্ষে তখন খুবই শক্ত; কিন্তু যেহেতু তারা আমাকে সেগুলি চেখে দেখতে বলল না, তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলাম।

আসলে ব্যাপার হচ্ছে একটু আগেই সেখানে এমন কিছু ঘটছিল যার কথা তখন আমি কিছুই জানতাম না; জানলাম বেশ কিছুদিন পরে; সেই কথাই এবার আপনাদের বলব। দু'দিন আগে এই দুটি বয়স্ক প্রবীণ ভাইয়ের মধ্যে কোন একটা বিষয় নিয়ে বেশ গরম-গরম তর্ক হয়েছিল এবং সব বিতর্ক মিটিয়ে নেবার বৃটিশ প্রথা অনুসারেই তারা একটা বাজী ধরে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে একমত হয়।

আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে, এক সময় ব্যাংক অব ইংলণ্ড দশ লক্ষ পাউণ্ডের দু'খানা নোট বের করেছিল। অন্য একটি দেশের সঙ্গে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট লেনে-দেনের বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যই নোট দু'খানি বের করা হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক তার একখানি নোট ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু অপরখানি তখনও ব্যাংকের সিন্দুকেই ছিল। এখন, কথায় কথায় দুই ভাইয়ের মাথায় হঠাৎ এই অদ্ভুত চিন্তাটা ঢুকল যে, যদি কোন সম্পূর্ণ সৎ ও বুদ্ধিমান নবাগত লোক ঘটনাচক্রে নির্বান্ধব অবস্থায় লণ্ডনে এসে হাজির হয় এবং ঐ দশ লক্ষ পাউণ্ডের নোটখানি ছাড়া আর কোন টাকা তার কাছে না থাকে এবং নোটখানা কি ভাবে তার কাছে এল তারও কোন কারণ দর্শাতে সে না পারে তাহলে তার কপালে কি ঘটতে পারে। ভাই 'ক' বলল, সে না খেয়ে মারা যাবে। ভাই 'খ' বলল, না, তা হবে না। ভাই 'ক' বলল লোকটি ঐ নোটখানা কোন ব্যাংকে বা অন্য কোথাও দেখাতে পারবে না, কারণ তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এইভাবে তর্ক হতে হতে এক সময় ভাই 'খ' বলল, বিশ হাজার পাউণ্ড বাজী রেখে সে বলেছে যে ঐ দশ লক্ষের দৌলতে লোকটি ত্রিশ দিন বেঁচে থাকবে এবং জেলখানার বাইরেও থাকবে। ভাই 'ক' রাজী হল। ভাই 'খ' ব্যাংকে চলে গেল এবং নোটখানা কিনে ফেলল। একজন ইংরেজের মতই কাজ বটে। তারপর তার একজন করণিককে দিয়ে গোল গোল হস্তাক্ষরে একখানি চিঠি লেখাল। সেই থেকে দুই ভাই সারা দিন জানালায় বসে আছে,-এমন একটি লোককে খুঁজছে যাকে এটা দেওয়া যায়।

তারা অনেক লোককে যেতে দেখল যাদের মুখে সততার ছাপ আছে, কিন্তু তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয়; আবার অনেকে বুদ্ধিমান হলেও যথেষ্ট সৎ নয়। অনেকের আবার দুটো গুণ থাকলেও তারা যথেষ্ট গরীব নয়, বা গরীব হলেও নবাগত লোক নয়। কোন না কোন একটা ত্রুটি বেরিয়েই পড়ছিল, এমন সময় আমি হাজির হলাম। সব কিছুই তাদের মনোমত হল এবং দু'জনের সম্মতিক্রমেই আমি নির্বাচিত হলাম। আর তাই কি জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে সেটা জানবার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারা আমার সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করে অচিরেই আমার সব কথা জেনে নিল। শেষ পর্যন্ত তারা জানাল যে, আমাকে দিয়ে তাদের কাজ চলবে। খুবই খুসি হয়ে জানতে চাইলাম, কাজটা কি। তখন একজন আমার হাতে একটা খাম দিয়ে বলল, ওর মধ্যেই সব কথা লেখা আছে। খামটা খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে বলল, না; আমি যেন খামটা নিয়ে আমার বাসায় চলে যাই এবং যত্ন সহকারে সব কথা পড়ি ও কোন তাড়াহুড়া না করি। বিচলিত বোধ করে বিষয়টা নিয়ে আর একটু আলোচনা করতে চাইলাম, কিন্তু তারা তাতে রাজী হল না। অগত্যা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আমাকে এ রকম একটা কঠোর ঠাট্টার বিষয়বস্তু করে তোলায় মনে খুব আঘাত পেলাম; অপমানিতও বোধ করলাম; কিন্তু অর্থবান ও শক্তিমান মানুষদের আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত করার মত অবস্থা আমার নয় বলে বাধ্য হয়ে সব কিছু সয়ে গেলাম।

এবার হয় তো জগতের সকলের চোখের সামনেই ন্যাসপাতিটা তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলতাম, কিন্তু ততক্ষণে সেটাও উধাও হয়ে গেছে; একটা দুর্ভাগ্যজনক প্যাঁচে পড়ে এটাও হারালাম; এ কথা ভেবে ঐ দুটি লোক সম্পর্কে আমার মনোভাব আরও কঠোর হয়ে উঠল। ঐ বাড়িটা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া মাত্রই খামটা খুলে দেখলাম তার মধ্যে টাকা রয়েছে! আপনাদের বলছি, সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটি সম্পর্কে আমার মনের ভাব বদলে গেল। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে নোট ও টাকা-পয়সা ভেস্টের পকেটে ঢুকিয়ে একটা সস্তার খাবার দোকানে ঢুকে পড়লাম। আঃ, কী খাওয়াই খেলাম! তারপর খামের ভিতর থেকে সব কিছু বের করে নোটের ভাঁজ খুলে এক নজর দেখেই আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার! ওরে বাবা! আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল।

নোটটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রায় এক মিনিট স্থানুর মত বসে ছিলাম; তারপর আমার সম্বিত ফিরে এল। তারপরেই প্রথম চোখে পড়ল দোকানের মালিককে। চোখ দুটো নোটের উপর রেখে সেও যেন পাথর হয়ে গেছে। সমস্ত দেহ-মন দিয়ে সে যেন প্রার্থনা করছে, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল সে যেন হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। মুহূর্তের মধ্যেই আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। নোটটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নির্বিকারভাবে বললাম:

"দয়া করে এটা ভাঙিয়ে দিন!"

তখন তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। নোটটাকে সে কিছুতেই ছুঁল না; বরং ওটা ভাঙিয়ে দিতে না পারার জন্য হাজারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। সে বারবার নোটটাকে দেখতে চাইল, দেখে দেখে যেন তার আশা মিটছে না; কিন্তু নোটটাতে কিছুতেই হাত লাগাল না, যেন বস্তুটি এতই পবিত্র যে সাধারণ মানুষের মাটির হাত দিয়ে ওটাকে ছোঁয়া উচিত নয়। আমি বললাম:

"আপনার অসুবিধার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমিও নাচার। দয়া করে এটা ভাঙিয়ে দিন; আমার কাছে আর কিছু নেই।"

কিন্তু সে বলল, তাতে কি; এই সামান্য বিলের টাকা পরে যে কোন সময় পেলেই তার চলবে। আমি বললাম, বেশকিছুদিনের মধ্যে আমার হয় তো আর এ অঞ্চলে আসা হবে না; কিন্তু সে বলল, তার জন্য কি; সে ততদিন অপেক্ষা করতে পারবে; তাছাড়া, আমার যা কিছু দরকার, যখন দরকার আমি নিতে পারি, আর হিসাবটাও আমার যতদিন খুসি বাকি রাখতে পারি। সে আরও বলল, পোশাকের ব্যাপারে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে বেড়াতে ভালবাসি বলে যে আমার মত একজন ধনী ভদ্রলোককে বিশ্বাস করতে পারবে না এমন লোক সে নয়। সেই সময় আরও একজন খদ্দের ঘরে ঢুকতেই সে আমাকে ইঙ্গিতে ঐ শয়তানটার দৃষ্টির আড়ালে যেতে বলল এবং আমাকে নমস্কার করতে করতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি সেখান থেকে সোজা গিয়ে হাজির হলাম সেই দুই ভাইয়ের বাড়িতে; পুলিশের হাতে পড়বার আগেই তাদের ভুলটা শুধরে দেওয়াই ভাল। আমার কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল; আসলে বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম, যদিও এ ব্যাপারে আমার কোন দোষই ছিল না; কিন্তু মানুষকে তো আমি ভাল করেই চিনি; তারা যখন দেখবে যে এক পাউণ্ডের নোট মনে করে একখানা দশ লাখ পাউণ্ডের নোট তারা একটা ভবঘুরে লোককে দিয়ে ফেলেছে, তখন নিজেদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে দোষ না দিয়ে তারা প্রচণ্ড রেগে যাবে সেই লোকটার উপর। বাড়িটার কাছে গিয়ে কিন্তু আমার উত্তেজনা অনেকটা হ্রাস পেল, কারণ সেখানে তখন সকলেই চুপচাপ; তাতেই বুঝতে পারলাম যে ভুলটা তখনও ধরা পড়ে নি। ঘণ্টা বাজালাম। সেই চাকরটাই এল। আমি ভদ্রলোক দু'জনের খোঁজ করলাম।



"তাঁরা চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন? কোথায় গেছেন?"

"বেড়াতে।"

"কোথায়?"

"মনে হয়, ইওরোপীয় মহাদেশে।"

"মহাদেশে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কোন্ পথে-মানে কোন্ রুটে?"

"তা বলতে পারব না স্যার।"

"তারা কখন ফিরবেন?"

"বলেছেন তো মাসখানেকের মধ্যে।"

"এক মাস! এ যে সাংঘাতিক কথা! কি করে তাদের সঙ্গে একবার কথা বলা যায় বলতে পার? ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।"

"আমি তো কিছুই বলতে পারব না। তাঁরা যে কোথায় গেছেন সে বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই।"

"তাহলে তাদের পরিবারের কারও সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

"পরিবারের সকলে আগেই চলে গেছেন: মাসখানেক হয়ে গেল-মনে হয় মিশর ও ভারতবর্ষেই গেছেন।"

"দেখ বাপু, একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। তারা হয় তো রাতের আগেই ফিরে আসবেন। তখন তাদের বলে দিও, আমি এসেছিলাম, এবং ভুলটা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝেই আসব। তারা যেন কোন রকম ভয় না করেন।"

"তারা এলে বলব, তবে আসবেন বলে মনে হয় না। তারা বলেই গেছেন যে, এক ঘন্টার মধ্যেই আপনি এখানে এসে তাদের খোঁজ করবেন, আর তখন আমাকে বলতে হবে যে সব ঠিক আছে; যথাসময়েই তারা এখানে ফিরে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।"

কাজেই তাদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। কী যে গোলক ধাঁধায় পড়লাম! মাথা খারাপ হবার জোগাড়! "যথাসময়ে" তারা এখানে আসবেন। তার অর্থ কি? ওহো, চিঠিটা থেকে হয় তো কিছু জানা যাবে। চিঠির কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বের করে পড়লাম। চিঠিতে এই রকম লেখা ছিল:

মুখ দেখলেই বোঝা যায় তুমি বুদ্ধিমান ও সৎ লোক। আমাদের ধারণা, তুমি গরীব ও নবাগত। এই সঙ্গে কিছু টাকা দিলাম। ত্রিশ দিনের জন্য বিনা সুদে এটা তোমাকে ধার দেওয়া হল। ঐ সময়ের পরে এই বাড়িতে এসে দেখা করো। তোমাকে নিয়ে একটা বাজী ধরেছি। আমি যদি জিতি, তাহলে আমার সাধ্যায়ত্ত যে কোন একটা কাজ তুমি পাবে-যে কোন কাজ বলতে, যে কাজ তুমি জান এবং ভালভাবে করবার যোগ্যতা রাখ।

কোন স্বাক্ষর নেই, ঠিকানা নেই, তারিখ নেই।

এ তো দেখছি আরও গাড্ডায় পড়লাম। কী খেলা চলছে তার কিছুই জানি না; আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা, না কি আমার প্রতি করুণা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলাম। কি করা উচিত তাও ভাবলাম।

ঘন্টাখানেক চিন্তা-ভাবনার পরে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলাম।

হয় তো লোক দুটি আমার ভাল করতে চাইছে, হয় তো মন্দ করতে চাইছে; সেটা বুঝবার কোন উপায় নেই-অতএব সে কথা থাক। তাদের মাথায় একটা কোন খেলা, একটা মতলব, একটা পরীক্ষার ধান্দা চলছে; সেটা যে কি তাও বুঝবার কোন উপায় নেই-অতএব সেটাও থাক। আমাকে নিয়ে একটা বাজী ধরা হয়েছে; সেটা যে কি তাও জানবার উপায় নেই-অতএব সে কথাও থাক। অনিশ্চয়তার ব্যাপারগুলির এখানেই ইতি; বাকি অংশটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই পড়ছে এবং সেটাকে নিশ্চিতভাবে অনুমান করাও চলে। যদি ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এ গিয়ে এই বিলটা দেখিয়ে মালিকের নামে জমা দিতে চেষ্টা করি, তাহলে ব্যাংক সে কাজটা করবে, কারণ সেই মালিককে আমি না চিনলেও ব্যাংক চেনে; কিন্তু তারা জানতে চাইবে বিলটা আমার হাতে কেমন করে এল; তখন আমি যদি সত্য কথা বলি তাহলে স্বাভাবতই তারা আমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে আর মিথ্যা বললেও আমার জেল অনিবার্য। আবার যদি বিলটা কোথাও ভাঙাতে চেষ্টা করি, বা এটাকে রেখে টাকা ধার করি, তাহলেও ঐ একই ফল হবে। কাজেই আমি চাই বা না চাই, লোক দুটি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই বিরাট বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতেই হবে। বিলটা আমার পক্ষে একেবারেই অকেজো, এক মুঠো ছাইয়ের মতই অকেজো; তবু এটাকে সযত্নে রেখে দিতে হবে এবং ভিক্ষা করে জীবন চালিয়েও এটার উপর সতর্ক নজর রেখে চলতে হবে। এটা কাউকে দেওয়াও চলবে না; যদি সে চেষ্টা করি, তাহলেও কোন সৎ নাগরিক বা কোন গুণ্ডা-ডাকাত, কেউই এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইবে না। এ ব্যাপারে দুই ভাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিলটা যদি হারিয়ে ফেলি বা পুড়িয়ে ফেলি, তাহলেও তারা নিরাপদ, কারণ তারা ব্যাংককে বলে টাকা দেওয়া বন্ধকরতে পারবে; কিন্তু ইতিমধ্যে পুরো একটা মাস বিনা বেতনে, বিনা লাভে আমাকে সব কষ্ট সহ্য করে চলতে হবে-যতদিন না সেই অজানা বাজীটা জিততে আমি সাহায্য করতে পারি এবং তার ফলে প্রতিশ্রুত চাকরিটা পেয়ে যাই। চাকরিটা তো অবশ্যই পেতে চাই; তাদের মত লোকের হাতে তো ভাল চাকরিই থাকবার কথা।

চাকরি না পেয়েই অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। মনের আশা ক্রমেই উঁচুতে উঠতে লাগল। মাইনেটা বেশ মোটা হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক মাসের মধ্যেই তো চাকরিটা পেয়ে যাচ্ছি; তার পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অচিরেই মন-মেজাজ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে আবার রাস্তায় বের হতে শুরু করেছি। একটা দর্জির দোকান দেখতে পেয়ে ভারী ইচ্ছা হল এই ছেঁড়া পোশাক ছেড়ে আবার ভদ্রলোকের মত পোশাক পরি। কিন্তু টাকা আছে কি? না, দশ লাখ পাউণ্ড ছাড়া আমার কিছুই নেই। কাজেই নিজেকে জোর করে ঠেলে নিয়ে চললাম। শীঘ্রই আবার ফিরে এলাম। লোভ আমাকে নির্মমভাবে তাড়া করতে লাগল। এই প্রচণ্ড আত্ম-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছ'বার দোকানটাকে এ-পার ও-পার করলাম। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। দিতেই হল। জানতে চাইলাম, তাদের হাতে কোন বে-মাপের স্যুট আছে কি না। যাকে কথাগুলি বললাম সে আর একটি লোকের দিকে ঘাড়টা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিল না। তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আর একজনের দিকে ঘাড়টা হেলিয়ে দিল, মুখে কিছু বলল না। তার কাছে যেতেই সে বলল:

"একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি।"

তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর সে আমাকে একটা পিছনের ঘরে নিয়ে গেল এবং এক বোঝা দামী স্যুট বের করে সব চাইতে খারাপটা আমার জন্য বেছে দিল। গায়ে দিলাম। মাপমত হল না, দেখতেও ভাল লাগল না, তবে জিনিসটা নতুন বলেই আমার মনকে টানল; তাই কোন রকম আপত্তি না করে বরং একটু সংকোচের সঙ্গেই বললাম:

"দামটার জন্য আপনারা যদি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেন তাহলে বড় ভাল হয়। আমার কাছে খুচরো টাকা নেই।"

মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের ভঙ্গী ফুটিয়ে লোকটি বলল:

"ওঃ, নেই বুঝি? অবশ্য থাকবে যে সে আশাও আমি করি নি। আপনার মত ভদ্রলোকদের কাছে তো মোটা টাকাই থাকার কথা।"

বিরক্ত গলায় জবাব দিলাম, "দেখুন বন্ধু পরনের পোশাক দেখেই একজন অপরিচিত লোকের বিচার করতে নেই। এই স্যুটটার দাম আমি অবশ্যই দিতে পারি; শুধু একটা বড় নোট ভাঙানোর অসুবিধায় আপনাকে ফেলতে চাইছিলাম না।"

ভঙ্গীটাকে ঈষৎ বদলালেও আগেকার মতই সে বলল:

"আপনাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না; আর তিরস্কারের কথাই যদি তুললেন তো বলি, যে মাপের নোট আপনার সঙ্গে আছে সেটা ভাঙিয়ে দিতে আমরা পারব কি না সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা আপনার কাজ নয়। আসলে আপনার নোটটা আমরা ভাঙিয়ে দিতে পারব।"

নোটটা তার হাতে দিয়ে বললাম:

"ওঃ, খুব ভাল কথা; আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

পুকুরে একটা ইট ফেললে যে রকম চারদিকে একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে তেমনি বিস্ফোরিত হাসি ফুটিয়ে লোকটি নোটটা হাতে নিল; কিন্তু নোটখানির উপর নজর পড়তেই সে হাসি জমাট বেঁধে হলুদ বর্ণ ধারণ করল; মনে হল বুঝি ভিসুভিয়াসের মুখ থেকে উদগারিত লাভা সেখানে জমাট বেঁধে আছে। একটা হাসিকে এ ভাবে সহসা থেমে যেতে আমি কখনও দেখি নি। বিলটা হাতে নিয়ে লোকটি দাঁড়িয়েই ছিল; ব্যাপার কি জানবার জন্য এগিয়ে এসে মালিক বলল:

"আরে, ব্যাপার কি? গোলমালটা কিসের? কি চাই?"

আমি বললাম: "গোলমাল কিছু নেই। আমি নোটের ভাঙানির জন্য অপেক্ষা করছি।"

"বেশ তো; ভাঙানিটা দিয়ে দাও টড, ভাঙানিটা দিয়ে দাও।"

টড পাল্টা জবাব দিল: "ভাঙানিটা দিয়ে দাও! কথাটা বলা খুবই সহজ স্যার; নিজে একবার হিলটা দেখুন।"

মালিক বিলটা একবার দেখে নিয়েই একটানা একটা শিস দিয়ে উঠল, আর তার পরেই বাতিল স্যুটের বস্তাটার উপর লাফিয়ে পড়ে একটার পর একটা স্যুট টেনে ছুড়ে ফেলে দিতে দিতে নিজের মনেই উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল:

"একজন অসাধারণ লাখপতি লোককে কেউ এমন অখাদ্য স্যুট বেচে! টড একটা মুখ্খু-জন্ম-মুখ্খু। ওর রকম-সকমই এই রকম। কোন লাখপতি খদ্দের এলেই তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বে; আর তার কারণও আছে-ও যেন একজন লাখপতি আর একটা বাউণ্ডুলের তফাৎই বোঝে না-কোন দিন না। আমি দেখছি স্যার। দয়া করে পরনের পোশাকগুলো খুলে ফেলুন, আগুনে ফেলে দিন। এই সার্ট আর স্যুটটা আপনাকে পরাবার অনুমতি দিন; ঠিক এই জিনিসই তো চাই, ঠিক এই জিনিস-সাদাসিধে, দামী, গুরুগম্ভীর, অভিজাত; একজন বিদেশী রাজপুত্রের জন্য তৈরি করা হয়েছিল-আপনি হয় তো তাকে চিনবেন স্যার, হ্যালিফ্যাক্স-এর মহামহিম হস্‌পোদার, এটা আমাদের কাছে রেখে একটা শোক-জ্ঞপক স্যুট নিয়ে গেলেন, কারণ তার মায়ের মৃত্যু তখন আসন্ন-অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান নি। কিন্তু-বাঃ, বেশ মানিয়েছে; ট্রাউজারটাও চমৎকার মাপমত হয়েছে; এবার ওয়েস্টকোট; আহা, এবারও চমৎকার! এবার কোট-হায় প্রভু! একবার তাকিয়েই দেখুন! একেবারে ঠিকঠাক! সারা জীবনে এমন মপমত পোশাক আমি কখনও দেখি নি।"

আমি সন্তোষ প্রকাশ করলাম।

"ঠিক বলেছেন স্যার, ঠিক বলেছেন; আপাতত এতেই চলে যাবে। তারপর দেখুন না আপনার মাপতম আমরা কী জিনিস বানিয়ে দিই। এস হে টড, খাতা-কলম নিয়ে এস। লেখ-পায়ের ঝুল ৩২ "-" ইত্যাদি। আমাকে একটা কথাও বলার সুযোগ না দিয়ে সে অনবরত আমার মাপ নিতে লাগল আর ড্রেস-স্যুট, মর্নিং-স্যুট, শার্ল ও আরও সব কিছুর অর্ডার নিখে নিতে লাগল। এক সময়ে সুযোগ পেয়ে আমি বললাম:

"কিন্তু মশায়, আপনি যদি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা না করেন, অথবা এই বিলটা ভাঙিয়ে না দেন, তাহলে তো এ সব অর্ডার আমি দিতে পারব না।"

"অনির্দিষ্টকাল! ওটা তো একটা কথাই নয় স্যার। বলুন অনন্তকাল-হ্যাঁ, এটাই লাগসই কথা। টড, এই অর্ডারগুলি তাড়াতাড়ি তৈরি করে অবিলম্বে ভদ্রলোকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। ছোটখাট খদ্দেরদের না হয় ক'দিন দেরী হবে। ভদ্রলোকের ঠিকানাটা লিখে নাও, আর-"

"আমি শিগ্‌গির বাড়ি বদলাবো। নিজেই এসে নতুন ঠিকানাটা দিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। একটা মিনিট-চলুন স্যার। আপনাকে বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসি। আচ্ছা-শুভদিন স্যার, শুভদিন।"

এরপর কি যে ঘটতে পারে সে তো বুঝতেই পারছেন? আমার যা কিছু দরকার তাই কিনতে লাগলাম আর ভাঙানি চাইতে লাগলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় আরাম ও বিলাসের সব রকম সামগ্রী আমার হাতে এসে গেল, আর হ্যানোভার স্কোয়ার-এর একটা ব্যয়বহুল হোটেলে আমি বাসা বাঁধলাম। রাতের খাবারটা সেখানেই খাই, কিন্তু প্রাতরাশটা সারি হ্যারিস-এর সেই সাধারণ ভোজনালয়ে যেখানে দশ লাখ পাউণ্ডের নোট দেখিয়ে প্রথম খানা খেয়েছিলাম। আমার জন্য হ্যারিস-এরও বরাত ফিরে গেছে। চারদিকে জনরব রটে গেছে, যে আধ-পাগলা বিদেশী ভেস্টের পকেটে দশ লাখ পাউণ্ডের বিল নিয়ে ঘোরে সে হচ্ছে এই দোকানের আসল মুরুব্বি। বাস, তাতেই হয়ে গেল। যে হোটেল চালিয়ে হ্যারিস-এর কোনরকমে দিন গুজরান হচ্ছিল, সেই হোটেলই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছে, সকাল-সন্ধ্যা সেখানে লোকের ভীড় উপচে পড়ছে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে আমাকে টাকাও ধার দিচ্ছে; না করলে শোনে না; কাজেই পথের ফকির হয়েও আমার হাতে অঢেল টাকা; খরচ করতে লাগলাম যথেষ্ট বড়লোকদেরই মত। জানি, একদিন এ তাসের ঘর ভেঙে পড়বে, কিন্তু একবার যখন জলে নেমেছি, তখন সাঁতার তো কাটতেই হবে, নইলে তো সলিল-সমাধি অনিবার্য। রাতের অন্ধকারে এই বিপদের দিকটাই সামনে এসে দাঁড়ায়, ভ্রূকুটি করে, ভয় দেখায়; আমি আর্তনাদ করি, ছটফট করি, চোখে ঘুম আসে না। কিন্তু দিনের আলোয় এই দুঃখের দিনটা মিলিয়ে যায়, বেশ চালের উপর হেঁটে বেড়াই, সুখের নেশায় মেতে উঠি।

আর এটাই তো স্বাভাবিক। পৃথিবীর এই বৃহৎ শহরের আমি একটি অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছি, আর তাতেই আমার মাথা ঘুরে গেছে-একটুখানি নয়,অনেকখানি। ইংরেজী, স্কচ, বা আইরিশ ভাষায় এমন একখানি খবরের কাগজও আপনি পাবেন না যাতে "ভেস্ট-পকেটে লাখ পাউণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো" এই লোকটির কথা এবং তার সর্বশেষ কার্যকলাপের কথার একাধিক উল্লেখ নেই। প্রথম প্রথম আমার নামের উল্লেখ থাকত ব্যক্তিগত চুটকির কলমে; তারপর আমার স্থান হল নাইটদের উপরে, ক্রমে ব্যারনেটদের উপরে, ব্যারনদের উপরে-এমনি করে ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে আমার খ্যাতি বাড়তে বাড়তে একেবারে তুঙ্গে উঠে গেল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, এতদিন পর্যন্ত আমি যা পেয়েছি তা যশ নয়, তাকে বলা যেতে পারে অখ্যাতি। কিন্তু তারপরেই এল চরম পদক্ষেপ-অভিষেকও বলা যেতে পারে-যার ফলে আমার ভঙ্গুর অখ্যাতির সব মালিন্য মুহূর্তের মধ্যে ঘুচে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল যশের শাশ্বত সুবর্ণ দিপ্তী। "পঞ্চ"-এ আমার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হল! হ্যাঁ, এতদিনে আমি মানুষ হলাম; আমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এখন আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা চলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মিশে থাকে শ্রদ্ধা, কঠোরতা নয়; আমাকে দেখে লোকে হাসে স্মিত হাসি, অট্টহাসি নয়। সে দিন চলে গেছে। "পাঞ্চ"-এ আমাকে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন ছেঁড়া পোশাক পরে জনৈক গোমাংস-খাদকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি টাওয়ার অব লণ্ডন-এর দিকে ছুটে চলেছি। কল্পনা করুন তো, যে যুবকটি কোন খোঁজই এতদিন কেউ রাখত না, আজ হঠাৎ সে যে কথা বলে তাই সকলের মুখে মুখে ফেরে, যেখানে যায় সেখানেই শোনে একই চুপি-চুপি কথা, "ঐ যে তিনি যাচ্ছেন; ঐ তো তিনি!" সে যখন প্রাতরাশে বসে সকলে তার চারদিকে ভীড় করে দাঁড়ায়, যখন কোন অপেরা-বক্সে গিয়ে বসে তখনই হাজারটা অপেরা-গ্লাস তার মুখের উপর পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে-সারাটা দিনই আমি যেন গৌরবের সাগরে ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

কি জানেন, পুরনো ছেঁড়া স্যুটটা তখনও রেখে দিয়েছি; মাঝে মাঝে সেটা পড়ে বের হই এবং মজা করবার জন্যই টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে প্রথমে অপমানিত হই এবং তারপরেই দশ লাখপাউণ্ডের বিলটা বিক্রেতার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলি। কিন্তু এ খেলা বেশীদিন চালাতে পারলাম না। সচিত্র পত্র-পত্রিকাগুলোর দৌতলে পোশাকটা এতই পরিচিত হয়ে উঠল যে সেটা পরে বাইরে গেলেই ভীড় জমে যেত এবং কোন কিছু কিনতে গেলেই দোকানী সব কিছুই ধারে দেবার জন্য এমনভাবে উঠে পড়ে লাগত যে নোটটা বের করবার ফুরসুতই পেতাম না।

যশ লাভের দশম দিবসে জাতীয় পতাকার প্রতি কর্তব্যের খাতিরে মার্কিন মন্ত্রীমহোদয়কে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেলাম। যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গেই সে আমাকে গ্রহণ করল, আমার কর্তব্যপরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করল এবং সেদিনকার ভোজসভায় যোগ

দেবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। দু'জনে নানা কথা হল। কথাপ্রসঙ্গে জানলাম মন্ত্রী ও আমার বাবা বাল্যকালে সহপাঠী ছিল, পরে ইয়েল-এও এক সঙ্গে পড়েছে, এবং বাবার মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাই সে আমাকে অনুরোধ করল, সময় পেলেই যেন আমি তার বাড়িতে যাই ও কিছু সময় কাটাই; আমিও সানন্দেই রাজী হলাম।

বস্তুত, শুধু রাজী নয়, এতে আমি খুসিও হলাম। এই খেলাঘর যখন ভাঙবে তখন হয় তো এই মন্ত্রী আমাকে সমূহ বিনষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে; সেটা কি ভাবে সম্ভব হবে তা আমি জানি না; তবে যা হোক একটা পন্থা সেই বের করতে পারবে। লণ্ডনে আসার পরেই তার সঙ্গে দেখা হলে হয় তো মনের সব কথাই খোলাখুলি তাকে বলতাম, কিন্তু এত বিলম্বে তাকে সব কথা বলবার সাহস আমার হল না; এখন যে আমি গভীর জলে পড়ে গিয়েছি; এখন আর কোন নবপরিচিতকে আত্মপরিচয় দেওয়া চলে না। অবশ্য জল যত গভীরই হোক, এখনও একেবারে অথৈ জলে পড়ি নি, কারণ ধার-কর্জ যতই যা করে থাকি, আমি আমার সাধ্যের মধ্যেই চলতে চেষ্টা করছি-তার অর্থ আমার মাইনের মধ্যেই। অবশ্য আমার মাইনে কত হবে তা আমি জানি না, তবে ধনী ভদ্রলোকের সামর্থ্য ও আমার উপযুক্ততার কথা বিবেচনা করে একটা ধারণা তো করতেই পারি। আমার ধারণা মতে মাইনে হবে বছরে ছ' শ' থেকে হাজার; অর্থাৎ প্রথম বছর ছ' শ', এবং যোগ্যতার প্রমাণের ভিত্তিতে বছর বছর বাড়তে বাড়তে সেটা উর্ধ সীমায় গিয়ে পৌঁছবে। সেদিক থেকে দেখতে হলে আমার বর্তমান ঋণের পরিমাণ প্রথম বছরের মাইনের সম পরিমাণ। সকলে আমাকে টাকা ধার দিতে চেষ্টা করছে, আমিই নানা ছুতোনাতায় তাদের এড়িয়ে চলেছি। আমার ঋণের পরিমাণ শ' পাউণ্ড নগদ ধার, আর তিন শ' পাউণ্ড থাকা-খাওয়া ও কেনাকাটার ব্যয়। কাজেই বাহুল্য খরচ বাঁচিয়ে সাবধান মত চললে দু'বছরের মাইনেতেই আমি সব বিলি ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। এই ভাবে একটি মাস শেষ হয়ে যাবে, আমার ভাবী মনিব ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসবে, আবার আমি সুদিনের মুখ দেখতে পাব।

চোদ্দ জনের একটি মনোরম ভোজ-সভা। শোরডিচ-এর ডিউক ও ডাচেস এবং তাদের কন্যা লেডি আন-গ্রেস-ইলিনর-সেলেস্টি-ইত্যাদি-ইত্যাদি-দ্য-বোহান, নিউ গোট-এর আর্ল ও কাউন্টেস, ভাইকাউণ্ট চীপসাইড, লর্ড ও লেডি ব্ল্যাথারস্কাইট, কিছু উপাধিবিহীন নারী-পুরুষ, মন্ত্রী ও তার স্ত্রী এবং কন্যা, ও সেই কন্যার বাইশ বছরের ইংরেজ বান্ধবী পোর্শিয়া ল্যাংহাম। দু' মিনিটের মধ্যেই আমি সেই বান্ধবীটির প্রেমে পড়ে গেলাম। আর বিনা চশমাতেই দেখতে পেলাম যে সেও আমার প্রেমে পড়ে গেল। সেখানে আরও একজন অতিথি ছিল, একজন মার্কিন-কিন্তু আমি গল্পের সুতোটা হারিয়ে ফেলছি। ক্ষুধা বাড়াবার জন্য সকলেই যখ বসবার ঘরে অপেক্ষা করছে এবং বিলম্বে আগতদের ঠাণ্ডা চোখে দেখছে, এমন সময় চাকর এসে ঘোষণা করল:

"মিঃ লয়েড হেস্টিংস।"

আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা-বিনিময় সাঙ্গ হওয়া মাত্রই হেস্টিংস আমাকে দেখতে পেয়ে সোজা এগিয়ে এসে সাদরে হাতটা বাড়িয়ে দিল; তারপর কর-মর্দন করতে গিয়ে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বিব্রত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

"ক্ষমা করবেন স্যার, মনে হচ্ছে যেন আপনাকে আনি চিনি।"

"সে কি অবশ্যই চেনেন।"

"না। আপনি-আপনিই কি-"

"ভেস্ট-পকেট ওয়ালা দানব তো? আমিই সেই লোক। ওই ডাক-নামে আমাকে ডাকতে ভয় পাবেন না; আমি ওতে অভ্যস্ত।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আশ্চর্য ব্যাপার। একবার কি দু'বার ঐ ডাক-নামটার সঙ্গে তোমার নামটা জুড়ে দিতে আমি শুনেছি, কিন্তু তুমিই যে ঐ নামের সঙ্গে যুক্ত হেনরি অ্যাডাম্স্ তাতো আমি ভাবতেই পারি নি। আরে, ছ' মাসও তো হয় নি তুমি ফ্রিস্কো-তে ব্লেক হপ্কিন্স-এর দোকানে মাসমাইনের করণিকের চাকরি করতে, আর একটা বাড়তি ভাতার জন্য রাত জেগে কাগজপত্র মেলাবার কাজে আমাকে সাহায্য করতে। সেখান থেকে একেবারে খোদ লণ্ডনে আবির্ভাব, প্রকাণ্ড লাখপতি, ও বিরাট খ্যাতি! আরে, একে আরব্য রজনীর কাহিনি ছাড়া আর কি বলা যায়! আরে বাবা, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না; একটুখানি সময় দাও; মাথার মধ্যে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।"

"আসল ব্যাপার কি জান লয়েড, তোমার অবস্থা আমার চাইতে বেশী খারাপ কিছু নয়। আমি নিজেও কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আরে বাবা, এ যে অবাক কাণ্ড, নয় কি? এই তো সেদিনকার কথা, তিন মাসও হয় নি, দু'জন একসঙ্গে গিয়েছিলাম খনি-মজুরদের রেস্টুরাণ্টে -"

"না; 'হোয়াট চীয়ার'-এ।"

"ঠিক, 'হোয়াট চীয়ার'ই বটে। হ্যাঁ, সকাল দুটোর সময় সেখানে গিয়েছিলাম, আর টানা ছ'ঘণ্টা কঠোর খাটনির পর একটা করে চপ ও এক কাপ কফি। তখনই তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সঙ্গে লণ্ডনে আসতে; বলেছিলাম যে ছুটির ব্যবস্থা আমিই করে দেব, আর আমার কাজকর্ম ভাল চললে যাতায়াতের খরচ ছাড়াও বাড়তি কিছু দেব; কিন্তু তুমি কিছুতেই রাজী হও নি। অথচ সেই তুমি আজ তো এখানে এসেছ। কী অবাক ব্যাপার বল তো! এখানে তুমি কেমন করে এলে, আর এই অবিশ্বাস্য রকমের খ্যাতিই বা অর্জন করলে কেমন করে?"

"ওঃ, সেটা নেহাৎই একটা আকস্মিক ঘটনা। সে এক লম্বা কাহিনী-একটা রোমান্সও বলতে পার। সবই তোমাকে বলব, কিন্তু এখন নয়।"

"কখন?"

"এই মাসের শেষে।"

"তার তো এখনও পক্ষকালের বেশী বাকি। আমার কৌতূহলের উপর বড় বেশী চাপ পড়বে। ওটাকে এক সপ্তাহ কর।"

"তা পারব না। কেন যে পারব না সেটা তুমি ক্রমে জানতে পারবে। কিন্তু তোমার ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?"

এক নিঃশ্বাসে তার ফূর্তির আমেজ উধাও হয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলল: 'পয়গম্বরের মতই তুমি কথা বলেছিলে। আসল পয়গম্বর। আমার না আসাই উচিত ছিল। সে বিষয়ে কোন কথা বলতেও মন চায় না।"

"কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে। এখান থেকে বেরিয়ে আজ রাতটা তুমি আমার সঙ্গে খাবে, আমার কাছে থাকবে। তার পর সব কথা বলবে।"

"তুমি বলছ? সত্যি বলছ?" তার চোখ জলে ভরে এল।

"হ্যাঁ; সব কথা আমি শুনতে চাই, প্রতিটি শব্দ।"

"তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এখানে এসে যে হাল হয়েছে তারপরেও কোন মানুষ যদি আমাকে সহানুভূতি দেখায়, কারও কণ্ঠস্বর, কারও চোখের দৃষ্টি যদি আমার দিকে, আমার অবস্থার দিকে আসে-হা ভগবান! তার জন্য আমি যে তোমার পায়েও পড়তে পারি!

সে সজোরে আমার হাতটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল, নৈশ ভোজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল-কিন্তু নৈশ ভোজ হল না। না; যা স্বাভাবিক তাই ঘটল, ইংরেজ প্রথামত যা ঘটবার কথা তাই ঘটল-কে আগে যাবে, কে আগে বসবে সে প্রশ্নের মীমাংসা হল না, ফরে ভোজও হল না। ইংরেজরা সব সময়ই নৈশ ভোজে যাবার আগে নৈশাহার সেরে নেয়, কারণ ঐ ঝুঁকিটার কথা তারা জানে; কিন্তু নবাগত লোককে তো কেউ সাবধান করে দেয় না, তাই সে ধীর পায়ে সেই ফাঁদে পা বাড়ায়। অবশ্য আজ কারোরই কোন অসুবিধা হয় নি, একমাত্র হেস্টিংস ছাড়া আমরা আর কেউই নতুন নই বলে নৈশাহার সেরেই এসেছিলাম, আর মন্ত্রীমহোদয়ও নিমন্ত্রণ জানাবার সময়ই হেস্টিংসকে বলে দিয়েছিল যে ইংরেজ প্রথামত নৈশাহারের কোন ব্যবস্থাই থাকবে না। প্রত্যেকেই একটি করে মহিলাকে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বিতর্ক দেখা দিল। শোরডিচ-এর ডিউক দাবী করল, সেই সকলের আগে যাবে এবং টেবিলের প্রধান আসনটি দখল করবে, কারণ পদমর্যাদায় সে একজন মন্ত্রীর চাইতে বড় যেহেতু মন্ত্রী প্রতিনিধিত্ব করছে মাত্র একটি জাতির, আর সে একজন রাজার প্রতিনিধি; কিন্তু তার কথা না মেনে আমিও আমার দাবী পেশ করলাম, কারণ সংবাদপত্রের কলমে

আমার নাম সকলের উপরের দিকেই ছাপা হত। অনেক কথা-কাটাকাটি হল, কিন্তু অগ্রাধিকার-সমস্যার কোন সমাধানই হল না। সুতরাং সকলে মিলে আবার দল বেঁধে বসবার ঘরে ফিরে আসা হল এবং এক প্লেট করে সার্ডিন মাছ ও স্ট্রবেরির 'লাঞ্চ' দিয়েই ভোজনপর্ব সমাধা করা হল।

আমাদের সময় কিন্তু বেশ ভালই কাটল; মিস্ ল্যাংহাম ও আমার সময়। আমি বললাম, আমি তাকে ভালবাসি; শুনে তার মুখটা লাল হতে হতে তার চুলটাই লাল হয়ে উঠল, আর সেও বলল, সে আমাকে ভালবাসে। আহা, এমন সন্ধ্যা আর ফিরে আসবে না!...তাকে সব কথা খুলে বললাম; ওই দশ লাখ পাউণ্ডের নোটখানা ছাড়া আমার যে আর কিছুই নেই, আর সে নোটের মালিকও যে আমি নই-সে কথাও তাকে বললাম। শুনে সে শুধু হাসতে লাগল।...

আমি বললাম, "প্রিয়া পোর্শিয়া, ঐ দুটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে যেদিন আমাকে দাঁড়াতে হবে, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো?"

একটু সরে গিয়ে সে বলল, "ন্-না; আমি সঙ্গে গেলে তুমি হয়তো মনে জোর পেতে। কিন্তু-সেটা কি উচিত হবে, তোমার কি মনে হয়?"

"না, তা বোধ হয় হবে না; বরং আমার তো আশংকা, সেটা অনুচিতই হবে। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ, ঐ দিনটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে-"

"তাহলে তো উচিত হোক আর অনুচিত হোক আমাকে যেতেই হবে," একটা উদার উৎসাহের সঙ্গে সে কথাগুলি বলল। "ওঃ, তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি যে কত খুসি হতাম!"

"সাহায্যের কথা কি বলছি প্রিয়া? তুমি সব করতে পারবে। তুমি এত সুন্দরী, এত মনোরমা, এতই আকর্ষণীয়া, যে তুমি পাশে থাকলে সে বুড়োদের ঘাড় ভেঙে আমি আমার মাইনের অংকটা অনেক বাড়িয়ে নিতে পারব।"

"ওরে দুষ্টু খোসামুদে! তুমি যা বললে তার মধ্যে এক ফোঁটা সত্যি নেই; তবু তোমার সঙ্গে আমি যাব। হয় তো এ থেকেই তোমার শিক্ষা হয়ে যাবে যে সব মানুষই তোমার চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখে না।"

আমার সন্দেহ কি দূর হয়েছিল? আমার আত্মবিশ্বাস কি ফিরে পেয়েছিলাম? এই ঘটনা থেকেই সেটা বুঝে নাও: মনে মনে প্রথম বছরেই আমার মাইনেটাকে বারো শ'তে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে বলি নি: পরে অবাক করে দেব বলে।

বাড়ি ফিরবার সারাটা পথ অনিশ্চয়তার মধ্যেই কেটে গেল। হেস্টিংস কত কথা বলল তার একটা শব্দও আমার কানে ঢুকল না। দু'জনে যখন আমার ঘরে ঢুকলাম তখন তার মুখে আমার নানাবিধ আরাম ও বিলাস উপকরণের প্রশংসা শুনে তবে আমার সম্বিৎ ফিরে এল।

"এখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ ভরে দেখতে দাও। হয়রে! এ যে প্রাসাদ-একেবারে রাজপ্রাসাদ! একটা মানুষ যা চায় সবই তো এখানে আছে-আরামদায়ক আগুন আর রাতের খাবার। হেনরি, এ সব দেখে তুমি যে কত বড় ধনী তাই শুধু বুঝছি না, হাড়ে হাড়ে, মর্মে-মর্মে বুঝতে পারছি আমি কত গরীব,-কত শোচনীয়। কত পর্যুদস্ত, বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত!"

চুলোয় যাক! এই কথাগুলি শুনে আমার বুকের ভিতরটা শির-শির করে উঠল। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে বুঝতে পারলাম যে আমার পায়ের নীচে মাত্র আধ ইঞ্চি পুরু শক্ত আস্তরণ, আর তার নীচেই আগ্নেয়গিরির মুখ। আমি জানতাম না এতদিন ধরে শুধু স্বপ্নই দেখেছি; কিন্তু আজ-আজ আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা, পৃথিবীর কোথাও নিজের বলতে আমার একটা সেন্ট পর্যন্ত নেই, একটি সুন্দরী মেয়ের সুখ ও দুঃখ আমার হাতে, অথচ যে মাইনে হয় তো কোন দিন আমি পাব না তার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই আমার সামনে নেই। ওঃ, ওঃ, ওঃ, আমার সর্বনাশ হয়েছে। সে সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার নেই! কেউ অদ্ধার করতে পারবে না!"

"হেনরি, তোমার প্রতিদিনের উপার্জন থেকে অন্যমনস্কভাবে যেটুকু ঝড়তি-পড়তি ফেলে দেবে-"

"ওঃ, আমার প্রতিদিনের উপার্জন! এই নাও, গরম স্কচ! মনকে চাঙ্গা করে তোল। অথবা, না-তুমি ক্ষুধার্ত; এখানে বসে পড়, আর-"

"আমার জন্য এক কামড়ও নয়; ও পাট শেষ হয়ে গেছে। আজকাল আর খেতে পারি না। কিন্তু মাতাল না হওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি মদ খাব। এস!"

"পিপের পর পিপ আমিও তোমার সঙ্গে আছি! ঠিক আছে? তাহলে শুরু হোক। লয়েড, তাহলে টানতে টানতেই তোমার গল্পটা বলে যাও।"

"গল্পটা বলব? আবার?"

"আবার? আবার মানে?"

"মানে, একই গল্প কি তুমি আবার শুনতে চাও?"

"অবার শুনতে চাই? তুমি যে অবাক করলে। থাম, ও বস্তু আর গলায় ঢেল না। আর দরকার নেই।"

"দেখ হেনরি; তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। এখানে আসবার পথেই কি পুরো গল্পটা তোকামে বলি নি?"

"তুমি বলেছ?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"কিন্তু দিব্যি করে বলছি, তার একটা কথাও আমি শুনি নি।"

"হেনরি, তাহলে তো ব্যাপার গুরুতর। আমি ভয় পাচ্ছি। মন্ত্রীর বাড়িতে তুমি কি নিয়ে মেতে ছিলে?"

তখনই সব কিছু মনে পড়ে গেল। পুরুষ মানুষের মত সবই স্বীকার করলাম।

"এই পৃথিবীর প্রিয়তমা কন্যাকে আমি করেছিলাম-বন্দিনী!"

তখনই সে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরল। ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমার হাতটা ব্যথা করে দিল; আর তিন মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে যে গল্প সে আমাকে বলেছিল সেটা শুনতে পাই নি বলে সে মোটেই আমাকে দোষারোপ করল না। শান্ত, সুবোধ বালকটির মত বসে পড়ে সমস্ত গল্পটা আর একবার বলল। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই: একটা বড় সুযোগের আশায়ই সে ইংলণ্ডে এসেছিল; "গুল্ড অ্যাণ্ড কারী এক্সটেনশন"-এর মালপত্র বিক্রির দায়িত্ব নিয়েই সে এসেছিল; কথা ছিল, দশ লাখ ডলারের বেশী যত সে বিক্রি করতে পারবে তার সবটাই তার প্রাপ্য হবে। এখানে এসে সে কঠোর পরিশ্রম করেছে, সব রকম সুযোগের সদ্ব্যাহার করেছে, সৎভাবে যত রকম চেষ্টা করা যায় তার কিছুই বাকি রাখে নি, প্রায় সব টাকা খরচ করে ফেলেছে, একজন পুঁজিবাদীরও মন গলাতে পারে নি, এবং এই মাসের শেষেই তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এক কথায়, সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তার পর হঠাৎলাফিয়ে উঠে সে চীৎকার করে বলে উঠল:

"হেনরি, তুমি আমাকে বাঁচাতে পার! তুমিই পার, এই পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই পার। তুমি কি তা করবে? করবে না কি?"

"কি করতে হবে বল। খুলে বল না হে।"

"চুক্তির প্রয়োজনীয় দশ লাখ ও ফিরে যাবার খরচটা তুমি আমাকে দাও! না, না, আপত্তি করো না!"

আমার বুকের মধ্যেও একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যেন প্রায় বলতেই যাচ্ছিলাম, "লয়েড, আমি নিজেও তো ফকির-একেবারে কপর্দকহীন, ঋণগ্রস্ত।" কিন্তু হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরলাম, নিজেকে পুঁজিবাদীর মত

নিরাসক্ত ঠাণ্ডা করে তুললাম। তারপর সংযত ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে বললাম:

"আমি তোমাকে বাঁচাব লয়েড -"

"তাহলেই আমি বেঁচে গেছি! ঈশ্বর তোমাকে চিরদিন করুণা করুন। আমি যদি কোন দিন-"

"আমাকে শেষ করতে দাও লয়েড। আমি তোমাকে বাঁচাব, কিন্তু ও পথে নয়; কারণ যে কঠোর পরিশ্রম তুমি করেছ, যে ঝুঁকি তুমি নিয়েছ, তার পরে ও কাজ করলে তোমার প্রতিও সুবিচার করা হবে না। খনির শেয়ার কেনার দরকার আমার নেই; ও কাজ ছাড়াই লণ্ডনের মত ব্যবসায়িক শহরে আমার মূলধন খাটাবার অনেক সুযোগ আমি পাব; সব সময় সেই কাজই আমি করে চলেছি; কিন্তু এবার শোন তোমার জন্য কি করব। খনির ব্যাপার সবই আমি জানি; এর প্রচুর মুনাফার কথাও আমি জানি; কেউ চাইলে দিব্যি করে সে কথা বলতেও পারি। যথেচ্ছভাবে আমার নাম ব্যবহার করে এক পক্ষ কালের মধ্যেই তুমি নগদ ত্রিশ লাখের শেয়ার বিক্রি করবে এবং সেটা আমরা দু'জন সমান অংশে ভাগ করে নেব।"

আমার কথা শুনে উন্মাদ আনন্দে সে এমন ভাবে নাচতে শুরু করে দিল যে আমি যদি জোর করে ধরে তাকে বেঁধে না ফেলতাম তাহলে সব আসবাবপত্রকে ভেঙে সে জ্বালানিতে পরিণত করত এবং ঘরের অন্য সব জিনিস ভেঙ্গে একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে ফেলত।

সেখানেই শুয়ে পড়ে পরিপূর্ণ সুখে সে বলতে লাগল:

"আমি তোমার নামটা ব্যবহার করতে পারব! তোমার নাম-ব্যাপারটা ভেবে দেখ! আরে বাবা, লণ্ডনের সব ধনীরা তো দল বেঁধে ছুটে আসবে; শেয়ারের জন্য তারা লড়াই শুরু করে দেবে! আমি মানুষ হয়ে গেলাম, চিরদিনের মত মানুষ হয়ে গেলাম; যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাকে কোন দিন ভুলব না!"

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডন শহরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল! আমাকে কিছুই করতে হল না; দিনের পর দিন শুধু ঘরে বসে বসে দর্শনার্থীদের লবলাম:

"হ্যাঁ; আমার নাম উল্লেখ করতে আমিই তাকে বলেছি। লেকটিকে আমি চিনি, আর খনিটাও আমার জানা। তার চরিত্র নিন্দার অতীত, এবং সে যে অর্থ চাইছে খনিটার দাম তার চাইতে অনেক বেশী।"

ইতিমধ্যে আমার প্রতিটি সন্ধ্যাই মন্ত্রীর ভবনে পোর্শিয়ার সঙ্গে কাটতে লাগল। খনি সম্পর্কে কিছুই তাকে বলি নি; মনের বাসনা, একদিন তাকে হঠাৎ খবরটা দিয়ে চমকে দেব। আমার মাইনের কথা নিয়েই আলোচনা করতাম; মাইনে ও ভালবাসা ছাড়া আর কোন কথা আমাদের ছিল না; কখনও ভালবাসার কথা, কখনও মাইনের কথা, আবার কখনও বা ভালবাসা ও মাইনের কথা একসঙ্গে। আমাদের এই ছোটখাট প্রেমের ব্যাপারে মন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যা যে আগ্রহ দেখাতে লাগল, আমাদের প্রেমের ব্যাপারে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে এবং মন্ত্রী যাতে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ও সন্দেহের উর্ধ্বে থাকে সে জন্য দিনের পর দিন তারা সে সব ছিল-চতুরির আশ্রয় নিতে লাগল-আহা, সত্যি, তাদের ভালবাসার তুলনা হয় না!

শেষ পর্যন্ত মাসটা সেদিন শেষ হল, সেদিন লণ্ডন অ্যাণ্ড কাউণ্টি ব্যাংক-এ আমার নামে দশ লাখ ডলার জমা পড়ল, এবং হেস্টিংসেরও একটা সুরাহা হয়ে গেল। যথাসাধ্য ভালভাবে সাজসজ্জা করে গাড়িতে চেপে পোর্টল্যাণ্ড প্লেস-এ গেলাম, বাড়ির অবস্থা দেখেই বুঝতে পারলাম আমার পাখিরা নীড়ে ফিরে এসেছে, মন্ত্রীর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই আমার সোনাকে পেয়ে গেলাম এবং যথাশক্তি মাইনে সম্পর্কে কথা বলতে বলতে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। সে এতই উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে যে তার সৌন্দর্য যেন সহ্যের সীমা ছাড়ীয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম:

"প্রিয়, যে ভাবে তুমি তাকাচ্ছ তাতে তো বছরে তিন হাজারের একটি পেনিও কম মাইনের কথা বললে মহা অপরাধ হবে।"

"হেনরি, হেনরি, তুমি কি আমাদের সর্বনাশ করবে!"

"ভয় পেয়ো না। ঐ চাউনিটা ঠিক রেখো। আর আমার উপর ভরসা রেখো। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এইভাবে সারাটা পথ আমি তাকে সাহস দিতে লাগলাম, আর সে আমাকে বার বার বোঝাতে লাগল:

"দেখ, দয়া করে একটা কথা স্মরণ রেখো, অনেক বেশী মাইনে চাইলে হয় তো সবটাই ফস্কে যেতে পারে; তখন কিন্তু জীবিকা অর্জনের আর কোন পথই আমাদের হাতে থাকবে না, বুঝলে?"

সেই একই চাকর আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল; ভিতরে সেই দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপস্থিত। অবশ্য এই আশ্চর্য জীবটিকে আমার সঙ্গে দেখে তারাও অবাক হয়ে গেল। কিন্তু আমি বললাম:

"সব ঠিক আছে মসাইরা; ইনিই আমার ভবিষ্যতের ভরসা ও সঙ্গিনী।"

তাদের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিলাম, আর তাদের দু'জনকেও নাম ধরেই সম্বোধন করলাম। তাতে তারা মোটেই অবাক হল না; তারা জানত, ডিরেক্টরীটা দেখেই ওটা আমি জেনে নিতে পেরেছি। তারা আমাদের বসতে বলল, আমার সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করল এবং মেয়েটির সংকোচ কাটিয়ে তুলতেও সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। তখন আমি বললাম:

"ভদ্রমহোদয়গণ, প্রতিবেদন পেশ করতে আমি প্রস্তুত।"

আমার লোকটি বলল, "শুনে আমরা খুসি হলাম। কারণ আমার ভাই আবেল ও আমি যে বাজী ধরেছি এবার তার মীমাংসা করতে পারব। তুমি যদি আমাকে জিতিয়ে দিয়ে থাক, তাহলে আমার সাধ্যায়ত্ত যে কোন চাকরি তুমি পাবে। দশ লাখ পাউণ্ডের নোটটা কি সঙ্গে আছে?"

"এই যে স্যার", নোটটা তার হাতে দিলাম।

"আমি জিতেছি!" চীৎকার করে সে আবেল-এর পিঠে একটা চড় মারল। "এবার কি বলতে চাও ভায়া?"

"আমি বলতে চাই, ইনি বেঁচে আছেন। আর আমি বিশ হাজার পাউণ্ড হেরেছি। না দেখলে এ কথা আমি বিশ্বাস করতাম না।"

আমি বললাম, "আমার আরও কিছু বলবার আছে, আর সে কাহিনী বেশ লম্বা। আমার ইচ্ছা, শীঘ্রই আর একদিন এসে আমার এই সারা মাসের ইতিহাস আপনাদের শুনিয়ে যাব। আমি বলছি, সে ইতিহাস শোনবার মতই। ইতিমধ্যে, এটার দিকে একবার তাকান।"

"সে কি গো? বিশ লাখ পাউণ্ড জমার সার্টিফিকেট। এটাও কি তোমার?"

"আমার। আপনি যে সামান্য ধারটা আমাকে দিয়েছিলেন তাকেই কাজে লাগিয়ে ত্রিশ দিনে এটা আমি উপার্জন করেছি। আর কাজে লাগানো মানে আর কিছুই না, শুধু টুকিটাকি জিনিস কিনেছি আর বিলটা ভাঙিয়ে দিতে বলেছি।"

"বল কি, এ যে অবাক কাণ্ড! এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার গো!"

"কোন চিন্তা নেই, আমি প্রমাণ করে দেব। বিনা প্রমাণে আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।"

এবার পোর্শিয়ার অবাক হবার পালা। দুই চোখ বড় বড় করে সে বলল:

"হেনরি, এটা কি সত্যি তোমার টাকা? আমাকে তুমি মিথ্যা বলেছ?"

"সত্যি তাই প্রিয়া। কিন্তু আমি জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।"

ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলল:

"অতটা নিশ্চিন্ত হয়ো না। তুমি কী দুষ্টু যে আমাকে এ ভাবে ধোঁকা দিয়েছ।"

"আহা ও নিয়ে মাথা ঘামিও না সোনা ও নিয়ে মাথা ঘামিও না; তুমি তো জান, ওটা একটা ঠাট্টা মাত্র। এস, আমরা যাই।"

"আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটা চাকরির কথাও তো আছে। আমি তোমাকে চাকরিটা দিতে চাই", দেখুন, আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু সত্যি আমার চাকরির দরকার নেই।"

"কিন্তু তুমি খুব ভাল একটা চাকরি পেতে পার।"

"সর্বান্তঃকরণে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; কিন্তু সে চাকরিটাও আমি চাই না।"

"হেনরি তোমার জন্য আমার লজ্জা হচ্ছে। তোমার হয়ে আমি কি কাজটা করতে পারি?"

"নিশ্চয় পার। শুধু অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলেই হল। তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পার।"

পোর্শিয়া আমার লোকটির দিকে এগিয়ে গেল, তার কোলে চড়ে বসল, দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ঠিক মুখের উপর চুমো খেল। তখন দুই বৃদ্ধ হো-হো করে হেসে উঠল, আর আমি তা হতবাক, ভয়ার্তও বলতে পারেন। পোর্শিয়া বলল: "বাবা, ও বলছে ওর নেবার মত চাকরি আপনার হাতে নেই; এতে আমি যে কত বড় আঘাত-"

"প্রিয়া, ইনি তোমার বাবা?"

"হ্যাঁ, আমার সৎ-বাবা, আমার বড় আদরের বাবা। এখন বুঝতে পারছ, মন্ত্রীর বাড়িতে সেদিন এদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা না জেনে তুমি যখন আমার বাবার ও আবেল কাকার পরিকল্পনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছিলে তখন আমি কেন হেসেছিলাম?"

অবশ্য আর বোকামি না করে আমি সরাসরিই আসল কথাটা তুললাম।

"আপনি আমার অতি প্রিয় গুরুজন, তাই আগে যা বলেছি সে কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি চাই এমন একটা পদ যা আপনার হাতে অবশ্যই আছে।"

"বল।"

"জামাতা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা! কিন্তু তুমি তো জান, এ পদে এর আগে তুমি কখনও কাজ কর নি, চুক্তির শর্ত পূরণ করতে এ ব্যাপারে কোন সুপারিশ-পত্র তো তুমি দাখিল করতে পারবে না; অতএব-"

"পরীক্ষা করে দেখুন-আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, ত্রিশ বা চল্লিশ বছরেরে জন্য আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন, তারপর যদি-"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে; এ তো অতি সামান্য প্রার্থনা; ওকে সঙ্গী করে নাও।"

আমরা কি সুখী? অভিধানের অসংক্ষিপ্ত সংস্করণেও এত শব্দ নেই যা দিয়ে এ কথার বর্ণনা দেওয়া যায়। আর দু'এক দিন পরে ঐ ব্যাংক-নোট নিয়ে আমার অভিযান ও তার পরিণতির কথা যখন সারা লণ্ডন জানতে পেল, তখন কি লণ্ডনবাসীরা খুসি হয়েছিল? হ্যাঁ।

পোর্শিয়ার বাবা সেই বন্ধুর মত বিলটা নিয়ে ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এ গেল ও সেটা ভাঙিয়ে আনল। ব্যাংক তখন সেই বিলটাকে বাতিল করে দিয়ে সেটা আবার তাকেই উপহার দিল, আর বাবাও আমাদের বিয়ের উপহার স্বরূপ সেটা আমাদের দান করল। সেই থেকে সেই বিলটা ফ্রেমে বাঁধা হয়ে আমাদের বাড়ির সব চাইতে পবিত্র স্থানটিতে অবস্থান করছে। কারণ এটার জন্যই তো আমার পোর্শিয়াকে আমি পেয়েছি। এটা না পেলে তো আমি লণ্ডনেই থাকতাম না, মন্ত্রীর বাড়িতে যেতাম না, এবং ওকেও কখনও দেখতেই পেতাম না।

তাই তো সব সময়ই আমি বলি, "হ্যাঁ, এটা দশ লাখ পাউণ্ডের নোট, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন; কিন্তু সারা জীবনে এটা দিয়ে মাত্র একটি বস্তুই কেনা হয়েছে, আর তাও কেনা হয়েছে সে বস্তুটির মাত্র এক-দশমাংশ মূল্য দিয়ে।"

১৮৯৩

মৃত্যু-চাক্তি*

The Death Disk

[*কার্লাইল-এর "লেটার্স অ্যাণ্ড স্পীচেস অব অলিভার ক্রমওয়েল" গ্রন্থে বর্ণিত একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা গল্পের মূল ভিত্তি। -মার্ক টোয়েন]

অলিভার ক্রমওয়েল-এর সময়কার কথা। কমনওয়েলথ্ বাহিনীতে তার সমমর্যাদাসম্পন্ন অফিসারদের মধ্যে কর্ণেল মেফেয়ার ছিল সর্বকনিষ্ঠ। তার বয়স তখন ত্রিশ বছর। বয়সে তরুণ হলেও সে ছিল অভিজ্ঞ সৈনিক; দেহ রোদে-পোড়া ও যুদ্ধ-জর্জর; তার সামরিক জীবন শুরু হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে; অনেক যুদ্ধ সে করেছে; রণক্ষেত্রে শৌর্যের পরিচয় দিয়ে ধাপে ধাপে সামরিক চাকরিতে পদোন্নতি লাভ করেছে, পেরেছে মানুষের প্রশংসা। কিন্তু এখন সে একটা গভীর গোলযোগে পড়েছে; তার সৌভাগ্য-সূর্যের উপর পড়েছে মেঘের ছায়া।

শীতের সন্ধ্যা। বাইরে ঝড় ও অন্ধকার; ভিতরে বিষন্ন নীরবতা; কর্ণেল ও তরুণী পত্নী তাদের দুঃখের কথা অনেক বলেছে, সান্ধ্যকালীন পাঠ শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে সন্ধ্যার প্রার্থনা; হাতে আর কোন কাজ নেই; শুধু হাতে হাত ধরে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা, চিন্তা করা-আর অপেক্ষা করা। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে তাদের হত না; তারা সেটা জানে, সে কথা মনে হতেই তার স্ত্রী শিউরে উঠল।

তাদরে একটি শিশু-আবি, সাত বছর বয়স, তাদের চোখের মণি। রাত্রির বিদায়-চুম্বনের জন্য সে এখনই এসে হাজির হবে; তাই কর্ণেল বলল:

"চোখের জল মুছে ফেল; অন্তত ওকে বুঝতে দাও যে আমরা সুখী। যা ঘটতে চলেছে এখনকার মত আমাদেরও সেটা ভুলতে হবে।"

"তাই করব। আমার বুক ভেঙে যাবে, তবু বুকের মধ্যেই তাকে আটকে রাখব।"

"আর তিনি যা করেন ভালর জন্যই করেন, করুণাপরবশ হয়েই করেন-এই কথা মনে রেখেই আমাদের ভাগ্য-লিপিকে আমরা মেনে নেব, ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করব।

"আমরা বলব-তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হ্যাঁ, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে একথা আমি বলতে পারি-যদি অন্তর দিয়েও বলতে পারতাম। আহা, যদি পারতাম! এই যে হাতখানিকে আমি শেষ বারের মত চেপে ধরে চুমো খাব-"

"শ্স্!ও আসছে!"

রাতের পোশাক পরা কোঁকড়া চুল ছোট মানুষটি দরজায় ভেসে এসে এক দৌড়ে বাবার কাছে ছুটে গেল। বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে সাদরে চুমো খেল-এক, দুই, তিনবার।

"ও বাপি তুমি ও রকম ভাবে চুমো খেয়ো না; তুমি আমার সব চুল এলোমেলো করে দিলে!"

"ওঃ, আমি দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত; তুমি আমাকে ক্ষমা করলে তো সোনা?"

"অবশ্যই করলাম বাপি। কিন্তু তুমি কি দুঃখিত?-দুঃখের ভান করছ না তো? সত্যি-সত্যি দুঃখিত?"

"বেশ তো, সেটা তুমি নিজেই বিচার কর আবি", দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কান্নার ভান করল। নিজের সৃষ্টি এই দুঃখজনক দৃশ্য দেখে শিশুটি নিজেই কেঁদে ফেলল; বাবার হাত ধরে টানে টানতে বলল:

"না, না বাপি, তুমি কেঁদ না। আমি তোমাকে কাঁদতে বলি নি; আর কখনও বলবও না। দোহাই বাপি," টেনে আঙুলগুলো ফাঁক করবার

চেষ্টায় একবার বাবার চোখটা দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:"আরে, তুমি তো ভারী দুষ্টু বাপি, তুমি তো মোটেই কাঁদছ না! তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ! বেশ, আবি তার মায়ের কাছে চলল; আবিকে তুমি মোট্টে ভালবাস না।"

সে নেমে যেতে চাইলেও বাবা তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলল: "না, তুমি আমার কাছেই থাক সোনা; বাপি দুষ্টুমি করেছে, তা স্বীকার করছে, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছে-হল তো, এবার একটা চুমো দিয়ে তোমার চোখের জলের দাগটা মুছিয়ে দিতে দাও-আবি তার বাপিকে ক্ষমা করুক, আর শাস্তি হিসাবে আবি যা বলবে বাপি তাই করব; এই তো সব দাগ মুছে গেছে, এক গুছি চুলও এদিক-ওদিক হয় নি-এখন আবি যা হুকুম করবে-"

এই ভাবে মিটমাট হয়ে গেল; মুহূর্তের মধ্যে রোদ উঠল, ঝলমলিয়ে উঠল শিশুর মুখ; বাবার গালে হাত দিয়ে টোকা মারতে মারতে শাস্তির নাম করে সে বলল-"গল্প! একটা গল্প!"

ও কি!

বড়দের নিঃশ্বাস থেমে গেল। তারা কান পাতল। পায়ের শব্দ!বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে আবছা কানে আসছে। কাছে, আরও কাছে-জোরে, আরও জোরে-তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বড়রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল; বাবা বলল: "একটা গল্প, তাই না? মজার গল্প?"

"না বাপি; ভীষণ গল্প।"

বাপি মজার গল্পেই ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু আবিও তার দাবীতে অনড়-তাছাড়া, চুক্তিমতে সে যা হুকুম করবে তাই মানতে হবে। কর্নেল গোড়া সৈনিক, কথা যখন দিয়েছে তখন তা রাখতেই হবে। আবি বলল:

"বাপি, সব সময়ই মজার গল্প ভাল নয়। নার্স বলে, লোকের সব সময় মজার দিন হয় না। তা কি ঠিক বাপি? নার্স তো তাই বলে।"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তার চিন্তা আবার বিপদের দিকেই গেল। বাপি শান্ত গলায় বলল: "ঠিক কথা সোনা। বিপদ তো আসবেই। সেটা দুঃখজনক, কিন্তু সত্যি।"

"তাহলে তাই নিয়ে একটা গল্প বল বাপি-একটা ভীষণ গল্প। যা শুনে আমাদের শরীর কেঁপে উঠবে, মনে হবে বুঝি আমাদের নিয়েই গল্প। মামণি, তুমি আরও ঘন হয়ে বস, আবির একটা হাত ধর, যাতে গল্পটা যদি সত্যি সত্যি বেশী ভীষণ হয় তাহলে ঘন হয়ে বসার জন্য আমরা সকলেই সেটা সহ্য করতে পারব। বাপি, এবার তুমি শুরু করতে পার।"

"ঠিক আছে। এক সময়ে তিনজন কর্নেল ছিল-"

"আরে বাস্! কর্নেলদের তো আমি চিনি। খুব সোজা! তুমিই তো কর্নেল। কর্নেলদের পোশাকও চিনি। বলে যাও বাপি।"

"একটা যুদ্ধে তারা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বসল।"

বড় বড় কথাগুলি শিশুটির কানে বেশ ভালই শোনাল; বিস্ময়ে ও আগ্রহে চোখ তুলে তাকিয়ে সে বলল:

"ওটা কি খেতে খুব ভাল বাপি?"

বাপ-মা প্রায় হেসে ফেলল; বাবা বলল:

"না, ওটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস সোনা। তারা হুকুম অমান্য করেছিল।"

"ওটা কি-"

"না; ওটাও খাবার জিনিস নয়। একটা যুদ্ধে হারতে বসে তাদের উপর হুকুম হল, শত্রুপক্ষের একটা শক্ত ঘাঁটির উপর আক্রমণের

ভান করতে হবে যাতে কমনওয়েল্থ বাহিনী পশ্চাদপসরণের একটা সুযোগ পায়; কিন্তু অতি-উৎসাহবশে তারা হুকুমের চাইতে বেশী করে ফেলল, নকল আক্রমণকে তারা আসল করে তুলল এবং হঠাৎ আঘাত হেনে ঘাঁটিটা দখল করে যুদ্ধ জয় করে ফেলল। তাদের এই অবাধ্যতায় লর্ড জেনারেল খুব রেগে গেল, তাদের ভূয়সী প্রশংসা করল, এবং বিচারের জন্য তাদের লণ্ডনে পাঠিয়ে দিল।"

"ইনিই কি মহান সেনাপতি ক্রমওয়েল বাপি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তাকে দেখেছি বাপি! তিনি যখন সেজেগুজে তার বড় ঘোড়াটায় চড়ে সসৈন্যে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যান, তখন তাকে এমন-এমন-দেখ, তাকে ঠিক কেমন দেখায় আমি বলতে পারছি না, তবে দেখে মনে হয় তিনি মোটেই খুসি নন, আর সৈন্যরা তাকে ভয় করে; কিন্তু আমি তাকে ভয় করি না, কারণ তিনি আমার দিকে সে ভাবে তাকান নি।"

"আঃ, সোনার মুখে যেন খই ফুটছে! তারপর, কর্নেলরা বন্দী হয়ে লণ্ডনে এল; তাদের বিশ্বাস করে শেষ বারের মত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হল-"

ও কি!

তারা কান পাতল। আবার পায়ের শব্দ। আবার সে শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। মুখের বিবর্ণতা আড়াল করবার জন্য মা তার স্বামীর ঘাড়ে মাথাটা রাখল।

"আজ সকালেই তারা এসে পৌঁচেছে।"

শিশুটির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

"ও কি বাকি! এটা কি সত্যিকারের গল্প?"

"হ্যাঁ সোনা।"

"বাঃ, কী মজা! সেই তো ভাল। বলে যাও বাপি। ও কি মামণি, তুমি কাঁদছ?"

"আমার কথা ছেড়ে দাও-আমি ভাবছিলাম-ভাবছিলাম সেই অসহায় পরিবারগুলির কথা।"

"কিন্তু তুমি কেঁদ না মামণি; সব ঠিক হয়ে যাবে-তুমি দেখো; গল্পে সব সময়ই তাই হয়। বাপি, সেইখানটা বল তো, যেখানে তারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল; তাহলে মামণি আর কাঁদবে না। বলে যাও বাপি।"

"বাড়িতে পাঠাবার আগে তাদের 'টাওয়ার'-এ নিয়ে যাওয়া হল।"

"টাওয়ার' আমি চিনি! এখান থেকেই দেখা যায়। তুমি বলে যাও।"

"এ অবস্থায় যতটা পারি ভালভাবেই তো বলছি। 'টাওয়ার'-এ সামরিক আদালত একঘণ্টা ধরে তাদের বিচার করল, তাদের দোষী সাব্যস্ত করল, এবং গুলি করে হত্যার আদেশ দিল।"

"মেরে ফেলবে বাপি?"

"হ্যাঁ।"

"উঃ, কী দুষ্টু! মামণি, তুমি আবার কাঁদছ? কেঁদ না মামণি; দেখ না, এখনই গল্পের ভাল জায়গাটার চলে যাব। বাপি, মার জন্য একটু

তাড়াতাড়ি বল তো; তুমি মোটেই তাড়াতাড়ি গল্প বলতে পার না।"

"আমি জানি আমি পারি না; তার কারণ হয় তো এই যে গল্প বলতে বলতে থেমে গিয়ে আমি চিন্তা করতে বসে যাই।"

"কিন্তু তা করো না বাপি; সোজা বলে যাবে।"

"তাই হবে। কর্নেল তিনজন-"

"তাদের তুমি চেনো বাপি?"

"হ্যাঁ সোনা।"

"আহা, আমিও যদি চিনতাম! কর্নেলদের আমি ভালবাসি। তারা কি আমাকে চুমো খেতে দেবে? তোমার কি মনে হয়?"

জবাব দিতে গিয়ে কর্নেলের গলাটা একটু কেঁপে উঠল, "একজন নিশ্চয়ই দেবে সোনা! এই নাও-তার বদলে আমাকে চুমো দাও।"

"এই নাও বাপি-আর এই দুটো চুমো বাকি দু'জনের জন্য। আমার বিশ্বাস, তারাও আমার চুমো নেবে; আমি তাদের বলব, "আমার বাপিও একজন কর্নেল, আর খুব সাহসী; তোমরা যা করেছ সেও তাই করত; কাজেই অন্যরা যাই বলুক তোমরা যা করেছ সেটা অন্যায় হতে পারে না, আর সেজন্য তোমরা এতটুকু লজ্জিত হয়ো না। তাহলেই তারা আমাকে চুমো খেতে দেবে-দেবে না বাপি?"

"ঈশ্বর জানেন, নিশ্চয়ই দেবে মাগো!"

"মামণি! ওঃ, মামণি, ও রকম করে না। সুখের জায়গাটা এল বলে। বলে যাও বাপি।"

"তারপর, কেউ কেউ দুঃখিত হল-তারা সকলেই দুঃখিত হল; আমি সেই সামরিক আদালতের কথা বলছি; তারা লর্ড জেনারেলের কাছে গিয়ে বলল, তাদের কর্তব্য তারা করেছে, কিন্তু এখন তাদের প্রার্থনা যে দু'জনকে রেহাই দেওয়া হোক, আর শুধু তৃতীয় জনকে গুলি করা হোক। তারা ভাবল, সৈনিকদের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য একজনই যথেষ্ট। কিন্তু লর্ড জেনারেল অত্যন্ত কড়া মানুষ; এই বলে সে তাদের তিরস্কার করল যে তারা নিজেদের কর্তব্য পালন করে এখন তাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে তার সৈনিকের মর্যাদাকে কলংকিত করতে চাইছে। কিন্তু তারা জবাব দিল, তার মত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকলে এবং ক্ষমাপ্রদর্শনের মহৎ অধিকার তাদের হাতে থাকলে তারা নিজেরা যা করত তার বেশী কিছু তাকে করতে তারা বলছে না। কথাটা তার মনে লাগল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল; তার মুখের কিছুটা কঠোরতা যেন মিলিয়ে গেল। তাদের অপেক্ষা করতে বলে লর্ড জেনারেল তার নিভৃত কক্ষে চলে গেল প্রার্থনায় বসে ঈশ্বরের নির্দেশ লাভের আশায়। ফিরে এসে বলল: 'তাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করতে হবে। তাতেই ব্যাপারটার ফয়সালা হবে এবং তাদের মধ্যে দু'জন বেঁচে থাকবে।"

"তারা কি তা করেছিল বাপি, করেছিল? আর কে মরবে বলে স্থির হল-আহা, বেচারি!"

"না। তারা অস্বীকার করল।"

"ভাগ্য-পরীক্ষা করল না?"

"না।"

"কেন?"

"তারা বলল, মারাত্মক শুঁটিটা যে টেনে নেবে সে তো নিজের হাতে নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দেবে, আর যে নামেই ডাকা হোক সেটা তো আত্মহত্যা। তারা বলল, তারা খৃস্টান, আর বাইবল-এ মানুষকে আত্মনাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই কথা জানিয়ে দিয়ে তারা

বলল, তারা প্রস্তুত-আদালতের দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা হোক।"

"তার অর্থ কি বাপি?"

"তাদের-তাদের গুলি করা হবে।"

ও কি!

বাতাস? না। থপ্-থপ্-থপ্-খট্-খট্-খট্-আবার-

"দরজা খোল-লর্ড জেনারেলের নামে বলছি!"

"কী মজা বাপি, সৈন্যরা এসেছে! -সৈন্যদের আমি ভালবাসি। আমি তাদের দরজা খুলে দেব বাপি। আমি যাচ্ছি।"

লাফ দিয়ে নেমে সে ছুটে গিয়ে আনন্দে চীৎকার করে বলল: "ভিতরে এস! এস! বাপি, পদাতিক বাহিনীকে আমি চিনি!"

সৈন্যদল মার্চ করে ঢুকল, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল; ভাগ্যহীন কর্নেলও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সৌজন্য-বিনিময় করল; পাশে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী, অন্তরের বেদনায় অবনতমুখী, কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই; ছোট শিশুটি চোখ নাচিয়ে সব কিছু দেখছে।.....

বাবা, মা ও শিশুর দীর্ঘ আলিঙ্গন; তারপরই ধ্বনিত হল নির্দেশ: "চল টাওয়ার-আগে বাড়!" সামরিক পদক্ষেপে ও মর্যাদার সঙ্গে কর্নেল বাড়ি থেকে মার্চ করে বের হল; তার পিছনে পদাতিক বাহিনী; দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

"ওঃ মামণি, শেষটা কেমন ভাল হল! আমি তো বলেছি তাই হয়। সকলে টাওয়ার-এ গেল। তিনি তাদের দেখবেন! তিনি-"

"আমার কোলে এস; বেচারি কিছুই জানে না!"......

২

পরদিন সকালে শোকাহতা মা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না; ডাক্তার ও নার্সরা তাকে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে; আবিকে সে ঘরে থাকতে দেওয়া হয় নি; তাকে খেলা করতে বলা হয়েছে-মামণি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গরম জামা পরে শিশুটি বাইরে গিয়ে রাস্তায় খেলতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, এ রকম একটা অবস্থায় তার বাপিকে কিছু না জানিয়ে টাওয়ার-এ রেখে দেওয়া হয়েছে-এ কাজটা যেমন বিস্ময়কর তেমনই অন্যায়। এর প্রতিকার হওয়া দরকার; সে নিজেই তার চেষ্টা করবে।

এক ঘণ্টা পরে সামরিক আদালতে লর্ড জেনারেলের কাছে হাজির করা হল। টেবিলের উপর কনুই দুটো রেখে সে গম্ভীর মুখে খাড়া হয়ে বসে আছে; দেখেই বোঝা যায় কোন কিছু শুনতে উদ্‌গ্রীব। মুখপাত্রটি জানাল: 'আমরা তাদের পুনর্বিবেচনা করতে বলেছি; মিনতি করেছি; কিন্তু তারা অবিচল। ভাগ্য-পরীক্ষা তারা করবে না। তারা মরতে রাজী, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।"

প্রোটেক্টর-এর মুখে অন্ধকার নেমে এল, কিন্তু কিছু বলল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: "তাদের সকলের মরা হবে না; তাদের হয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করা হবে।" আদালতের মুখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "তাদের ডেকে পাঠাও। ও পাশের ঘরে নিয়ে যাও। পিছ-মোড়া করে হাত বেঁধে দেয়ালের দিকে মুখ করে তাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দাও। এ সব হয়ে গেলে আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।"

সকলে চলে গেলে সে বসে পড়ল। চাকরকে ডেকে হুকুম দিল: "বাইরে যাও; সর্ব প্রথম যে ছোট শিশুকে যেতে দেখবে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

লোকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরক্ষণেই ফিরে এল-সে আবিকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে; আবির জামায় বরফের গুঁড়ো লেগে আছে। মেয়েটি সোজা রাষ্ট্রে-প্রধানের কাছে চলে গেল। যে দুর্জয় মানুষটির নাম মাত্র শুনলেই পৃথিবীর সব বড় বড় মানুষ ও রাষ্ট্র থর্ থর্ করে কাঁপে, মেয়েটি তার কোলের উপর চড়ে বলল:

"আমি আপনাকে চিনি স্যার; আপনি তো লর্ড সেনাপতি; আমি আপনকে দেখেছি; আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন গিয়েছিলেন তখন দেখেছি। সকলেই ভয় পেয়েছিল; কিন্তু আমি ভয় পাই নি, আপনি তো চোখ রাঙিয়ে আমার দিকে তাকান নি; আপনার মনে পড়ে? আমার পরনে ছিল একটা লাল ফ্রক-সামনের দিকে নীল কাজ করা। আপনার মনে নেই?"

সে হাসি দেখে প্রোটেক্টর-এর মুখের গম্ভীর রেখাগুলি নরম হয়ে এল। কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে বলল:

"তাই বুঝি; দাঁড়াও, ভেবে দেখছি-আমি-"

"বাড়ির ঠিক সামনেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম-মানে আমাদের বাড়ির।"

"দেখ সোনা, আমার লজ্জিত হওয়া উচিত, কিন্তু কি জান-"

শিশুটি তিরস্কারের সুরে বাধা দিল।

"বুঝেছি, আপনার মনে নেই। কিন্তু আমি তো আপনাকে ভুলি নি।"

"দেখ, আমি লজ্জিত; কিন্তু তোমাকে আমি আর কোন দিন ভুলব না। কথা দিলাম। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না? চিরদিনের জন্য আমার বন্ধু হয়ে থাকবে না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় থাকব, যদিও আমি বুঝি না কি করে সেদিনের কথা আপনি ভুলে গিয়েছিলাম; আপনার নিশ্চয় খুব ভোলা মন; আমারও কখনও কখনও ও রকম হয়; যাহোক, আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম, কারণ আমার ধারণা আপনি ভাল হয়ে থাকতে চান, ভাল কাজ করতে চান; আমার ধারণা আপনি খুব দয়ালু-কিন্তু আপনি আমাকে আরও ভাল করে জড়িয়ে ধরুন, ঠিক আমার বাপির মত করে-বড্ডো ঠাণ্ডা লাগছে।"

"ছোট্ট নতুন বন্ধুটি আমার, তোমার মনের মত করেই তো তোমাকে জড়িয়ে ধরতে হবে, কারণ এখন থেকে তুমিই যে হবে আমার পুরনো বন্ধু৷ তোমাকে দেখে আমার ছোট্ট মেয়েটির কথা মনে পড়ছে।-এখন আর সে ছোটটি নেই-কিন্তু একদিন সে তোমার মতই মিষ্টি আর সুন্দরী ছিল। সেও তোমার মতই আমার কোলের মধ্যে শুয়ে থাকত; তোমার মতই সে আমার সব শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়ে আমার মনকে শান্তিতে ভরে দিত; আমরা ছিলাম কমরেড, সমান বয়সী, খেলার সাথী। সে যেন কত যুগ আগের কথা; সে সুখের আকাশ কোথায় মিলিয়ে গেছে; অথচ আজ তুমি আবার সেই আকাশকে ফিরিয়ে এনেছ;-সারা ইংলণ্ডের বোঝাটা তুমি ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, আর আমি পেয়েছি ছুটি; তাই তো তোমাকে জানাই এই ভারবাহী মানুষটার আশীর্বাদ!"

"আপনি কি তাকে খুব, খুব ভালবাসতেন?"

"সে হুকুম করত আর আমি তামিল করতাম-এর থেকেই বুঝে নাও!"

"আপনি খুব ভাল। আমাকে একবার চুমো খাবেন না?"

"নিশ্চয় খাব-আর সেটাকে সৌভাগ্য বলেই মনে করব। এই নাও-এটি তোমার জন্য; আরে এই নাও-এটি তার জন্য। তুমি এর জন্য অনুরোধ না করে হুকুমও করতে পারতে, কারণ তুমি তো তার হয়েই এসেছ। তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই পালন করব।"

এই পদোন্নতিতে মেয়েটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল-আর তখনই তার কানে কিসের যেন শব্দ ভেসে এল; অনেক মানুষের একসঙ্গে চলার শব্দ।

"সৈনিক! সৈনকি! লর্ড জেনারেল, আবি সৈনিকদের দেখতে চায়!"

"নিশ্চয় দেখবে; কিন্তু একটু অপেক্ষা কর; তোমাকে দিয়ে আমার একটা কাজ আছে।"

একজন অফিসার ঘরে ঢুকে নীচু হয়ে অভিবাদন করে বলল, "তারা এসেছে হুজুর।" আবার অভিবাদন করে সে চলে গেল।

জাতির প্রধান কর্তা সিল করবার মোমের তিনটি চাকতি আবির হাতে দিল-দুটো সাদা, আর একটা উজ্জল লাল-কারণ এই চাকতিটা যার ভাগ্যে পড়বে সেই কর্ণেলের জন্য বয়ে আনবে মৃত্যু।

"আঃ, কী সুন্দর লাল চাকতিটা! এগুলো কি আমার?"

"না, এগুলো অন্যদের জন্য। ওই পর্দার কোণাটা তুলে ধর, তার ওপারে একটা খোলা দরজা আছে; দরজাটা পার হলেই দেখতে পাবে তিনটি লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের পিঠ তোমার দিকে, আর প্রত্যেকেরই হাত পিছন দিকে এমনভাবে রাখা যে প্রত্যেকেরই একটা হাত বাটির মত খোলা। প্রত্যেকের খোলা হাতের মধ্যে একটি করে এই চাকতি রেখে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।"

আবি পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে প্রোটেক্টর একা। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে লাগল: "সংকটকালে এই শুভ চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে নিশ্চয় তাঁর কাছ থেকে যিনি শরণাপন্ন বিপন্ন মানুষের কাছে সর্বদাই উপস্থিত হন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। তিনি জানেন কার ভাগ্যে কি আছে, আর তাঁর ইচ্ছানুরূপ কাজ যাতে হয় সেজন্য তিনিই পাঠিয়েছেন এই নিস্পাপ দূতটিকে। অন্যের ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁর কখনও ভুল হয় না। আশ্চর্য তাঁর রীতি-পদ্ধতি; তাঁর পবিত্র নাম সার্থক হোক!"

পিছনের পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট পরীটি মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে জাগ্রত কৌতূহলের সঙ্গে সেই মৃত্যু-কক্ষের আসবাবপত্র এবং সৈনিক, অফিসার ও বন্দীদের কাঠ-কাঠ চেহারাগুলো দেখল; তার মুখখানি খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; নিজের মনেই বলল:"আরে, এদের একজন তো আমার বাপি! তার পিঠ আমি চিনি। সব চাইতে সুন্দরটা তো বাপিই পাবে!" খুসি পায়ে এগিয়ে গিয়ে তিনটি খোলা হাতের মধ্যে চাকতি তিনটি রেখে দিল; তারপর তার বাবার বগলের নীচ দিয়ে উঁকি মেরে হাসি-ভরা মুখটা তুলে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

"বাপি! বাপি! তাকিয়ে দেখ তুমি কি পেয়েছ। ওটা আমিই তোমাকে দিয়েছি।" মারাত্মক উপহারের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে নতজানু হয়ে বসে ভালবাসা ও করুণায় বিদ্ধ হয়ে তার ছোট্ট নিস্পাপ হত্যাকারিণীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। সৈনিক, অফিসার ও মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদ্বয় এই প্রচণ্ড শোকাবহ ঘটনার সামনে মুহূর্তের জন্য নিশ্চল জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইল; পরক্ষণেই এই করুণ দৃশ্য তাদের অন্তরকে আঘাত করল, তাদের চোখ জলে ভরে এল, কোন রকম লজ্জাবোধ না করে তারা কাঁদতে লাগল। কয়েক মিনিটের জন্য ঘরের মধ্যে নেমে এল গভীর ও সশ্রদ্ধ নীরবতা; তারপর রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি অনিচ্ছুক পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে বন্দীর কাঁধে হাত রেখে শান্তভাবে বলল:

"আমি দুঃখিত স্যার, কিন্তু এটা কর্তব্যের নির্দেশ।"

শিশুটি বলল, "কর্তব্যের কি নির্দেশ?"

"একে নিয়ে যেতে হবে। আমি দুঃখিত।"

"নিয়ে যাবেন? কোথায়?"

"নিয়ে যাব-যাব-ঈশ্বর আমার সহায় হোন!-নিয়ে যাব দুর্গের অন্য এক অংশে।"

"না, তা পারবেন না। আমার মামণি অসুস্থ, আমি বাপিকে বাড়িতে নিয়ে যাব।"

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বাবার পিঠে চেপে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।"এবার আবি প্রস্তুত-চলে এস বাপি।"

"হায় মাগো, আমি তো যেতে পারব না: ওদের সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে।"

লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে মেয়েটি সবিস্ময়ে চারদিকে তাকাল। তারপর এক দৌড়ে অফিসারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে বিক্ষুব্ধ গলায় বলল:

"আপনাকে তো বলেছি আমার মামণি অসুস্থ; সে কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। ওকে ছেড়ে দিন-ছেড়ে দিতেই হবে।"

"হায় অবুঝ বালিকা, ছেড়ে দিতে পারলে আমিও খুসি হতাম। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাকে যেতেই হবে। অ্যাটেনশন, রক্ষীগণ! সারিতে দাঁড়াও! ....বন্দুক তোল!"

.....বিদ্যুৎচমকের মত আবি সেখানে থেকে চলে গেল। মুহূর্তকাল পরে লর্ড প্রোটেক্টরের হাত ধরে টানতে টানতে ফিরে এল। এই আশ্চর্য দৃশ্য থেকে উপস্থিত সকলে টান-টান হয়ে দাঁড়াল, অফিসাররা অভিবাদন করল, সৈনিকরা অস্ত্র নামাল।

"ওদের থামতে বলুন স্যার! আমার মামণি অসুস্থ, বাপিকে তার চাই, সে কথা ওদের বলেছি, কিন্তু ওরা আমার কথায় না দিয়ে বাপিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

লর্ড জেনারেল বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তোমার বাপি? ওই লোকটি তোমার বাপি?"

"নিশ্চয়, ওইতো আমার বাপি। আমি তাকে এত ভালবাসি, আর এমন সুন্দর লাল চাকতিটা দেব অন্য একজনকে? কিছুতেই না।"

প্রোটেক্টর-এর মুখে বেদনার ছায়া নামল। সে বলল:

"আঃ, ঈশ্বর আমার সহায় হোন! শয়তানের প্ররোচনায় মানুষের পক্ষে যা নিষ্ঠুরতম কাজ তাই আমি করেছি-কিন্তু এখন তো কোন উপায় নেই, উপায় নেই! আমি এখন কি করি!"

রুক্ষ মুখের উপর একটা নরম আলো নেমে এল; লর্ড জেনারেল সেই ক্ষুদে শক্তিময়ীর মাথায় হাত রেখে বলল:"কোন কিছু না ভেবে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি সেটাই আমাকে রক্ষা করেছে; সে জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর তাঁরই অনুপ্রেরণায় সেই ভুলে-যাওয়া প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, হে অতুলনীয়া শিশু, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। অফিসার, এই বালিকার হুকুম তামিল করুন-আমার মুখের কথাই সে বলেছে। বন্দীকে ক্ষমা করা হল; তাকে মুক্ত করে দিন!"

১৯০১

দুটি ছোট গল্প

Two Little Tales

প্রথম গল্প: ডিরেক্টর-জেনারেল-এর জন্য সংবাদ-বহনকারী লোকটি

কিছুদিন আগে ১৯০০-র দ্বিতীয় মাসে জনৈক বন্ধু একদা বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে লণ্ডনে এসেছিল। আমাদের দু'জনেরই তখন সেই বয়স যখন মানুষ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জীবনের আনন্দের পরিবর্তে ক্ষোভ ও বিরক্তির কথা বলেই সময় কাটিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে বন্ধুটি সরকারী সমর দপ্তরের নিন্দা শুরু করল। মনে হল, তার একটি বন্ধু এমন একটা জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল যেটা দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদের খুব কাজে লাগতে পারে। জিনিসটা হাল্কা, খুব সস্তা, আর টেকসই বুট জুতো; সেটা বর্ষায়ও শুকনো থাকবে, শক্ত থাকবে, আর আকারও ঠিক থাকবে। আবিষ্কর্তার ইচ্ছা, জিনিসটার প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়ুক, কিন্তু তাকে তো কেউ চেনে না, আর শুধু একটা চিঠি ছেড়ে দিলে তাতে বড় বড় কর্মচারীদের ঘুম ভাঙবে না। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এতেক বোঝা যায় সে একটি গাধা-আমাদের অন্য সকলের মতই। বলে যাও।"

"কিন্তু তুমি ও কথা বললে কেন? লোকটি তো খাঁটি কথাই বলেছে।"

"লোকটি মিথ্যে কথা বলেছে। বলে যাও।"

"আমি প্রমাণ করে দেব যে সে-"

"ও রকম কিছুই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। আমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে। আমার সঙ্গে তর্ক করো না:ওটা অসম্মানকর ও দূষণীয়। বলে যাও।"

"ঠিক আছে। কিন্তু তুমিও অচিরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আমাকে তো সকলেই চেনে, কিন্তু আমিও জুতোর চমড়া বিভাগের জিরেক্টর-জেনারেলের কাছে তার খবরটা পৌঁছে দিতে পারলাম না।"

"এটাও আর একটা মিথ্যে। দয়া করে বলে যাও।"

"কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর, সত্যি আমি পারি নি।"

"তা তো বটেই। সে তো আমি জানতামই। তোমার বলারই দরকার ছিল না।"

"তাহলে এর মধ্যে মিথ্যেটা কোথায়?"

"লোকটির ব্যাপারের প্রতি ডিরেক্টর-জেনারেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার নি-তোমার এই কথাটাই মিথ্যে। এই জন্য মিথ্যে যে সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে তুমি পারতে।"

"আমি তো বলছি আমি পারি নি। তিন মাস চেষ্টা করেও পারি নি।"

"নিশ্চয়। অবশ্য। তুমি না বললেও সেটা আমি জানতাম। তুমি যদি আর একটু বুদ্ধিমানের মত এগোতে তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতে। অন্য লোকরাও তাই পারত।

"আমি তো বুদ্ধিমানের মতই চেষ্টা করেছিলাম।"

"না, তা করো নি।"

"তুমি কি করে জানলে? সে সব ব্যাপারের তুমি কতটুকু জান?"

"কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি যে বুদ্ধিমানের মত কাজ কর নি সেটা আমি নিশ্চিত করেই জানি।"

"তা কি করে জানবে? আমি কি পদ্ধতিতে কাজ করেছি তাই তো তুমি জান না?"

"ফলাফল দেখেই বুঝতে পারি। ফলই তো আসল প্রমাণ। তুমি কাজটা করতে গিয়েছিলে পাগলের মত। আমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধি-"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু কি ভাবে আমি কাজটা করেছিলাম সেটা বলবে কি? সেটা পাগলামি কি না আগে সেটাই মীমাংসা করা যাক।"

"না; সেটার মীমাংসা আগেই হয়ে গেছে।ত যখন একান্তই নিজের বোকামিটা মেলে ধরতে চাইছ, তখন বলে যাও। আমার বয়স হয়েছে-"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। ভাল করে বসে জুতোর চামড়া বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেলকে বেশ ভদ্রগোছের একটা চিঠি লিখলাম যাতে-"

"তাকে তুমি ব্যক্তিগতভাবে চেন কি?"

"না।"

"তাহলেই তো আমাকে এক পয়েন্ট দিলে। তুমি তো কাজটা শুরুই করেছিলে পাগলের মত। বলে যাও।"

"সেই চিঠিতে আবিষ্কারের গুরুত্ব ও অল্প খরচের কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে প্রস্তাব করেছিলাম-"

"তার ওখানে গিয়ে দেখা করবে? নিশ্চয় সেই প্রস্তাবই করেছিলে। তোমায় বিরুদ্ধে দুই পয়েন্ট হল। আমি বয়স-"

"তিন দিনেও কোন জবাব এল না।"

"তাতো আসবেই না। বলে যাও।"

"আমি কষ্ট করে চিঠি লিখেছি বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে পাঠাল তিন লাইনের এক সংক্ষিপ্ত চিঠি। তাতে-"

"আর কিছুই ছিল না।"

"আর কিছুই ছিল না। আরও বিস্তারিতভাবে তাকে চিঠি লিখলাম-"

"তিন পয়েন্ট -"

"কিন্তু কোন জবাব পেলাম না। এক সপ্তাহ শেষে আবার চিঠি লিখলাম; এবার একটু কড়া সুরেই চিঠিটার জবাবও চাইলাম।"

"চার। বলে যাও?"

"জবাব এল; আগের চিঠিটা পাওয়া যায় নি বলে তার একটা অনুলিপি চাওয়া হয়েছিল। ডাক-ঘরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, চিঠিটা যথারীতিই পৌঁচেছিল; তবু সে কথা না জানিয়ে একটা অনুলিপি পাঠিয়ে দিলাম। দুই সপ্তাহ চলে গেল, কোন রকম উচ্চবাচ্য নেই। ইতিমধ্যে আমার মাথাও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং ভদ্রগোছের চিঠি লিখবার মত মানসিক অবস্থা ফিরে পেলাম। তখন আর একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে পরদিন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, আর তার আগে যদি কোন ঠিকানা পাই তাহলে ধরে নেব যে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।"

"পাঁচ পয়েণ্ট।"

"ঠিক বারোটায় পৌঁছে গেলাম। পাশের ঘরে একটা চেয়ার দিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হল। দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অপমানে ও ক্রোধে সেখান থেকে চলে এলাম। মনটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম। আবার একটা চিঠি লিখে পরদিন দুপুরে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করলাম।

"ছ' পয়েণ্ট।"

"সম্মতি জানিয়ে চিঠির জবাব এল। যথাসময়ে সেখানে গেলাম, আড়াইটে পর্যন্ত একটা চেয়ারে বসে কাটালাম। তারপর চলে এলাম; চিরদিনের মত জুতো থেকে সে জায়গার ধুলো ঝেড়ে ফেললাম। অভদ্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা এবং সেনাবাহিনীর স্বার্থের প্রতি উদাসীনতার দিক থেকে দেখলে আমার মতে সমর দপ্তরের জুতোর চামড়া বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল একটি -"

"শান্ত হও! আমার অনেক বয়স হয়েছে; বুদ্ধিশুদ্ধিও যথেষ্ট আছে; আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান এমন অনেক লোককেই আমি দেখেছি; এই রকম একটা সহজ, সরল ব্যাপারকে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে দেখবার মত বুদ্ধিটুকুও তাদের নেই। তোমাকে দেখে তাই আমার অবাক লাগছে না; তোমার মত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক আমি নিজে দেখেছি। অকারণেই তুমি তিনটি মাস নষ্ট করেছ; আবিষ্কর্তাটি নষ্ট করেছে তিনটি মাস; সৈনিকরা নষ্ট করেছে তিনটি মাস-মোট ন' মাস। এবার তোমাকে একটা ছোট গল্প পড়ে শোনাব। গল্পটা আমি গতকাল রাতে লিখেছি। তারপর কাল দুপুরে তুমি ডিরেক্টর-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে তোমার কাজের কথা পাশ করে নিও।"

"চমৎকার! তুমি কি তাকে চেন?"

"না; কিন্তু গল্পটা শোন।"

দ্বিতীয় গল্প: একটি চিমনি-ঝাড়ুদার কেমন করে সম্রাটকে কথা শুনিয়েছিল

গ্রীষ্ম কাল। যাদের গায়ে জোর আছে প্রচণ্ড গরমে তারাও কাৎ; যারা দুর্বল তাদের তো ভেঙে-পড়া মর-মর অবস্থা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সৈনিকদের বড় রোগ আমাশয়ের মহামারীতে সেনাদলে মড়ক লেগেছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছে; তাদের ওষুধ ও বিজ্ঞানের একদিন যে ক্ষমতা ছিল-কোন কালেই খুব বেশী ছিল না-আজ আর তা নেই; আর নতুন করে আশা করবারও কিছু নেই।

সম্রাট বিব্রত হয়ে পড়ল। সব চাইতে খ্যাতনামা ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য সে তাদের ডেকে পাঠাল। সম্রাট তাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করল; সৈনিকদের মৃত্যুর জন্য তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইল; জানতে চাইল, তারা সত্যি সত্যি চিকিৎসার কিছু জানে কিনা; তারা কি ডাক্তার, না খুনী। তখন প্রধান খুনী-দেশের সব চাইতে প্রধান ও সৌম্যদর্শন ডাক্তার জবাব দিল:

"মহামান্য সম্রাট, আমাদের যা সাধ্য তা করেছি, অবশ্য কার্যক্ষেত্রে তার ফল কিছুই হয় নি। কোন ওষুধ আর কোন ডাক্তারই ও রোগ সারাতে পারবে না; প্রকৃতি ও ভাল স্বাস্থ্যই এর একমাত্র প্রতিকার। কোন ডাক্তার বা ওষুধে কিছু হবে না-কথাটা আমি আবার বলছি এবং বেশ জোর দিয়েই বলছি। ডাক্তার বা ওষুধ কখনও কখনও কিছুটা সাহায্য করলেও, সাধারণত তারা ক্ষতি করে থাকে।"

সম্রাট ছিল খুব রোগী; আর খুব গালাগালি করত। অত্যন্ত অশ্লীল সব আজে বাজে গালাগালি দিয়ে সে ডাক্তারদের তাড়িয়ে দিল।

একদিনের মধ্যেই সেই মারাত্মক রোগ তাকেও ধরল। মুখে-মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশ আতংকে কাহিল হয়ে পড়ল।

সকলের মুখেই ঐ মারাত্মক রোগের কথা। সকলেরই মন খারাপ। সকলেরই মনে নিরাশা। সম্রাটেরও মন খারাপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল: "ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আবার সেই খুনীদেরই ডেকে পাঠাও। এ বিপদ দূর হোক।"

তারা এল। সম্রাট নাড়ি দেখল, জিভ দেখল, ওষুধের দোকান উজাড় করে ঢেলে দিল এবং সেখানে বসে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল-কারণ তারা কাজের বিনিময়ে টাকা পেত না; তারা ছিল বছর-মাইনের লোক।

২

টমির বয়স ষোল। চটপটে ছেলেটি। কিন্তু সমাজের উঁচু স্তরের লোক নয়। তার পদমর্যাদা অতি সামান্য, আর চাকরিটাও নগণ্য। আসলে তার কাজই ছিল সব চাইতে নীচু স্তরের। তার বাবা আস্তাকুড় পরিষ্কার করত আর একটা রাতের ময়লবাহী গাড়ি চালাত। বাবার পরেই ছিল টমির স্থান। টমির প্রাণের বন্ধু ছিল চিমনি-ঝাড়ুদার জিমি। চোদ্দ বছরের একহারা ছোটখাট ছেলেটি; সৎ ও পরিশ্রমী; মনটাও ভাল; এই বিপজ্জনক নোংরা কাজ করেই শয্যাশায়ী মায়ের ভরণ-পোষণ করে।

সম্রাট অসুস্থ হবার মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যা ন'টা নাগাদ এই দুটি ছেলের দেখা হয়ে গেল। টমি বেরিয়েছিল তার রাতের কাজ সারতে; কাজেই রবিবারেরর ভাল পোশাকের পরিবর্তে তার পরনে ছিল মজুরের নোংরা পোশাক; তা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। জিমি সারা দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল; সারা অঙ্গ কালি মাখা; কাঁধের উপর ঝুল ঝাড়বার বুরুশ, কোমরে ঝুল বোঝাই করে রাখবার থলে; একমাত্র দুটো উজ্জ্বল চোখে ছাড়া সারা মুখের আর কিছুই চোখে পড়ে না।

পথের পাশের পাথরের উপর বসে দু'জন কথা বলতে লাগল; বিষয় একটিই-জাতির বিপদ, সম্রাটের অসুখ। জিমির মাথায় মস্ত বড় পরিকল্পনা; সে কথা বলতে তার আর তার সইল না। সে বলল:

"টমি, আমি সম্রাটের রোগ সারিয়ে দিতে পারি। কেমন করে সারাতে হবে আমি জানি।"

টমি তো অবাক।

"সে কি! তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"কি বলছ বোকার মত? বড় বড় ডাক্তাররা পারল না।"

"তা কি হয়েছে; আমি পারি। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি তার রোগ সারিয়ে দিতে পারি।"

"কি যা তা বলছ?"

"যা সত্য তাই বলছি।"

জিমি এত গম্ভীরভাবে কথা বলল যে টমি ঘাবড়ে গিয়ে বলল:

"মনে হচ্ছে তুমি বেশ ভেবে চিন্তেই কথাটা বলেছ জিমি। তাই তো?"

"তোমাকে কথা দিচ্ছি।"

"ব্যাপারটা কি? কেমন করে রোগ সারাবে?"

"তাকে একটু রো পাকা তরমুজ খেতে বলব।"

কথাটা শুনে টমি যেন হঠাৎই একটা ধাক্কা খেল; কথাটার অবাস্তবতায় সে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু জিমি তাতে কষ্ট পাওয়ায় সে থেমে গেল। ঝুল-কালি সত্ত্বেও জিমির হাঁটুটা আদর করে টোকা দিতে দিতে বলল:

"আমার হাসি আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমাকে কষ্ট দিতে আমি চাই নি জিমি, এবং এ রকমটা আর কখনও করব না। কি জান, তোমার কথাটা খুবই উদ্ভট বলে মনে হয়েছিল, কারণ কোন সেনা-বারিকে যখনই আমাশয় দেখা দেয় তখনই ডাক্তাররা সেখানে একটা সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়-যে কেউ সেখানে তরমুজ নিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে চাবুক মারতে মারতে শুইয়ে ফেলা হবে।"

"আমি জানি-বোকারামের দল!" জিমি বলল; তার কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে চোখের জল ও রাগের ছোঁয়াচ। "তরমুজেরও অভাব নেই, আর তাই একটি সৈনিকেরও মরবার কথা নয়।"

"কিন্তু জিমি, এ ধারণাটা তোমার মাথায় এল কেমন করে?"

"এটা ধারণা নয়, এটা ঘটনা। সেই পাকা-চুল জুলু বুড়োকে তো তুমি চেন? দেখ, অনেক দিন থেকেই সে আমাদের অনেক বন্ধুকে সারিয়েছে; আমার মা নিজের চোখে দেখেছে; আমিও দেখেছি। মাত্র একটুকরো বা দু'টুকরো তরমুজ, বাস, রোগ নতুন হোক আর পুরনো হোক, তাতেই সারবে।"

"খুবই অদ্ভুত। কিন্তু জিমি, তাই যদি হয়, তা হলে তো সম্রাট কে কথাটা বলা উচিত।

নিশ্চয়; আমার মা লোকজনদের কথাটা বলেছেও যাতে তারা কথাটা রাজার কানে পৌঁছে দিতে পারে; কিন্তু বোকা-বোকা মজুর, তাই কাজটা কেমন করে করবে তাই জানে না।"

টমি ঘৃণার ভঙ্গীতে বলল, "তা তো বটেই; মাথা-মোটা লোকগুলো তা জানবে কেমন করে। আমি কথাটা রাজার কাছে পৌঁছে দেব।"

"তুমি? ব্যাটা রাতের গাড়িওয়ালা গন্ধগোকুল তুমি!" এবার জিমির হাসবার পালা। কিন্তু টমি পাল্টা জবাব দিল:

"হেসে নাও যত পার" কিন্তু আমি এ কাজ করবই।"

তার কথায় এমন নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল যে জিমি গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল:

"তুমি কি সম্রাটকে চেন?"

"আমি চিনি কি না? তুমি বলছ কি? অবশ্যই চিনি না।"

"তাহলে কাজটা করবে কেমন করে?"

"খুবই সহজ, সরল ব্যাপার। অনুমান কর তো। তুমি হলে কি করতে জিমি?"

"একটা চিঠি লিখে দিতাম। এক মুহূর্ত আগেও এ বিষয়ে আমি কখনও কিছু ভাবি নি। তবু বাজি রেখে বলতে পারি, সেই ভাবেই তুমিও কাজটা করবে।"

"আমিও বাজি ধরে বলছি, তা নয়। বল তো চিঠিটা পাঠাতে কেমন করে?"

"কেন? নিশ্চয় ডাকে।"

টমি ঠাট্টায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। তারপর বলল:

"দেখ, তোমার কি মনে হয় না যে রাজ্য শুদ্ধ প্রতিটি পাগলই এই কাজ করে চলেছে? তুমি কি বলতে চাও যে এ কথাটা তোমার কখনও মনে হয় নি।"

"তা-না," জিমি লজ্জিত হয়ে কথাটা বলল।

"যদি তোমার বয়স ও অভিজ্ঞতা এত কম না হত তাহলে হয় তো এ কথাটা তোমার মনে হত। আরে জিমি, একজন সাধারণ সেনাপতি, বা কবি, বা অভিনেতা, বা অল্প-বিস্তর খ্যাতিমান যে কেউ অসুস্থ হলেই রাজ্যের যত মাথা-খারাপ লোকগুলো তাকে হাতুড়ে তুক-তাকের খবর জানিয়ে চিঠি লিখে একেবারে স্তূপাকার করে ফেলে। আর তাহলে, সম্রাটের বেলায় ব্যাপারটা কি ঘটতে পারে ভাব

তো?"

"সে তো আরও শোচনীয় অবস্থাই হবে,"জিমি ভয়ে-ভয়ে বলল।

"ঠিক। আমারও তাই ধারণা। দেখ জিমি, প্রতিটি রাতে প্রাসাদের পিছনকার উঠোন থেকে আমাদরে ঐ ধরনের ছয় গাড়ি ভর্তি চিঠি তুলে নিয়ে বাইরে ফেলতে হয়। এক রাতেই তো ফেলেছি আশি হাজার চিঠি। তুমি কি মনে কর সে সব চিঠি কেউ পড়ে? ছুঃ! একটাও পড়ে না! তুমি যদি চিঠি লেখ, তোমার চিঠিরও ঐ দশাই হবে।কাজেই আমার বিশ্বাস, সে কাজ তুমি করবে না। কি বল?"

"না, "দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জিমি জবাব দিল।

"ঠিক আছে জিমি, ঠিক আছে। মন খারাপ করো না। কাজ হাসিল করবার অনেক রকম উপায় আছে। তার কাছে কথাটা আমিই পৌঁছে দেব।"

"আঃ, তা যদি করতে পার টমি, আমি তোমাকে চিরকাল ভালবাসব।"

"তোমাকে তো বলেছি, কাজটা আমি করবই। কোন চিন্তা করো না; আমার উপর ভরসা রাখ।"

"তা তো অবশ্যই রাখব টমি; তুমি কত কিছু জান। তুমি তো অন্য ছেলেদের মত নাও; তারা তো কিছু জানে না। কিভাবে কাজটা করবে বল তো টমি?"

টমি তো ভারী খুসি। একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে সে বলল:

"ওই যে ছেঁড়া পোশাক পরা লোকটা যে ঝুড়ি নিয়ে ঘোরে আর বেড়ালের মাংস ও পচা যকৃৎ বিক্রি করে নিজেকে কসাই বলে পরিচয় দেয় তাকে তো তুমি চেন? তাকে দিয়েই শুরু করব। তাকে কথাটা বলব।"

জিমি খুব হতাশ হল। মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল: "দেখ টমি, এ কথা বলাও লজ্জার ব্যাপার। তুমি তো জান, এটা আমার কতখানি অন্তরের কথা।"

তার পিঠে ভালবেসে হাত বুলিয়ে টমি বলল:

"বিচলিত হয়ো না জিমি। আমার কাজ আমি ভালই বুঝি। অচিরেই তুমিও দেখতে পাবে। ওই বদখৎ কসাই কথাটা বলবে সেই বুড়িকে যে গলির মোড়ে বাদাম বিক্রি করে-সে আবার কসাইটার প্রাণের বন্ধু তারপর আমার অনুরোধে বুড়ি কথাটা বলবে তার সেই বড়লোক মাসিকে যার একটা ফলের দোকান আছে দুটো ব্লক পরের মোড়টাতে; সে কথাটা বলবে তার বিশেষ বন্ধু পাখির দোকানের মালিককে; মালিক বলবে তার বন্ধু পুলিশ-সার্জেন্টকে; সার্জেন্ট বলবে তার ক্যাপ্টেনকে, ক্যাপ্টেন বলবে ম্যাজিস্ট্রেটকে, ম্যাজিস্ট্রেট বলবে তার শ্যালক জেলা-জজকে, জজ বলবে শেরিফকে, শেরিফ বলবে লর্ড মেয়রকে, লর্ড মেয়র বলবে পরিষদ সভাপতিকে, পরিষদ-সভাপতি বলবে-"

"জর্জের দিব্যি, এ যে এক আশ্চর্য পরিকল্পনা টমি! এটা তোমার মাথায়-"

"রিয়ার-অ্যাডমিরালকে, রিয়ার বলবে ভাইসকে, ভাইস বলবে ব্লু-অ্যাডমিরালকে, ব্লু বলবে রেডকে, রেড বলবে হোয়াইটকে, হোয়াইট বলবে নৌ-বিভাগের প্রথম লর্ডকে, প্রথম লর্ড বলবে পার্লামেন্টের স্পীকারকে, আর স্পীকার-"

"বুঝতে পেরেছি টমি; তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ!"

"বলবে শিকারী কুকুর-রক্ষককে, রক্ষক বলবে আস্তাবলের বড় সহিসকে, বড় সহিস বলবে প্রধান অশ্বপালককে, প্রধান অশ্বপালক বলবে প্রথম লর্ডকে, প্রথম লর্ড বলবে লর্ড দেওয়ানকে, লর্ড দেওয়ান বলবে গৃহ-কর্তাকে, গৃহ-কর্তা বলবে সেই পেয়ারের ছোকরা

চাকরটাকে যে পাখার বাতাস করে সম্রাটের গায়ের মাছি তাড়ায়, আর ছোকরা চাকরটা নতজানু হয়ে সম্রাটের কানে কানে কথাটা বলবে-বাস, কিস্তি মাৎ।

"উঠে দাঁড়িয়ে দু'বার তোমার জয়ধ্বনি করতে ইচ্ছে হচ্ছে টমি। কী অপূর্ব চিন্তাধারা। একনকি কেউ কখনও করে নি। এটা তোমার মাথায় এল কি করে?"

"বসে মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমাকে কিছু জ্ঞান দিচ্ছি-যতদিন বেঁচে থাকবে কথাটা ভুলো না। এখন বল তো কে তোমার সেই সব চাইতে প্রাণের বন্ধু যার কথা তুমি কখনও না রেখে পার না?"

"কেন, সে তো তুমি টমি। তুমি তো তা জান।"

"ধর, বিড়ালের মাংস-বিক্রেতা লোকটাকে কাছ থেকে তুমি একটা বড় রকমের সুবিধা আদায় করতে চাও। এখন, তুমি তো তাকে চেন না, কাজেই তুমি যদি তার কাছে গিয়ে কথাটা পাড়, সে তো তোমাকে হটিয়েই দেবে, কারণ সে লোকটাই ঐ রকম। কিন্তু তোমার পরেই সে আমার প্রাণের বন্ধু কাজেই আমার যে কোন উপকার করতে সে যেখানে খুসি ছুটতে গিয়ে পায়ের টেংরি খুলে ফেলতেও রাজী হবে। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি: কোন্‌টি বুদ্ধিমানের কাজ-তোমার এই তরমুজ-টোট্‌কার কথাটা বাদাম-বিক্রিওয়ালীর কাছে বলবার জন্যে তুমি নিজে কসাইটার কাছে যাবে, না কি আমাকে তার কাছে পাঠাবে?"

"নিশ্চয় আমার হয়ে কাজটা করে দিতে তোমাকেই পাঠাব। আরে টমি, এ কথাটা তো এমনিতে আমার মনেই আসত না। কী চমৎকার ধারণা!"

"একে বলে দর্শন, বুঝলে? খুব উঁচু দরের কথা-বড় কথা। একটি মাত্র নীতির উপর এটা প্রতিষ্ঠিত: পৃথিবীর ছোট-বড় প্রত্যেকেরই একজন বিশেষ বন্ধু থাকে-এমন বন্ধু যে বিরাগে নয়, অনুরাগ বশেই মনে-প্রাণে তার উপকার করতে ইচ্ছুক। আর তাই, তুমি যেখান থেকে খুসি শুরু কর না কেন, তুমি যার কানে ইচ্ছা তার কানেই তোমার কথা পৌঁছে দিতে পার-তুমি যত ছোটই হও, আর সে যত বড়ই হোক তাতে কিছু যায়-আসে না। আর ব্যাপারটা কত সরল: একজন প্রাণের বন্ধু খুঁজে নিতে পারলেই হল; তোমার কাজ সেখানেই শেষ। পরবর্তী বন্ধু সেই খুঁজে নেবে, আর সে খুঁজে নেবে তৃতীয় জনকে, আর এই ভাবে চলবে বন্ধুর পর বন্ধু, একটা শিকলের গাঁটের পর গাঁট; আর সেই শিকল বেয়ে তুমি উপরেও উঠতে পার, নীচেও নামতে পার-যত উঁচুতে তোমার খুসি। অথবা যত নীচে তোমার খুসি।"

"কী সুন্দর, টমি।"

"এ তো ক-খ-গ-ঘ-র মত সহজ, সরল; কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে এটা পরীক্ষা করতে দেখেছ কি? না; সকলেই মুখ্‌খু। বিনা পরিচিতিতে সে যায় একজন অপরিচিত লোকের কাছে, অথবা তাকে একটা চিঠি লেখে, বোঝ, সম্রাট আমাকে চেনে না, কিন্তু তাতে কি হল-কাল সে অবশ্যই তরমুজ খাবে। দেখে নিও। হাই-হাই-দাঁড়াও! ওই তো বিড়ালের মাংস বিক্রিওয়ালা। বিদায় জিমি; ওকে ধরতেই হবে।"

তাকে ধরলও। বলল:

"আমার একটা উপকার করবে কি বল?"

"করব কি না? সে কথা আবার বলতে হবে! আমি তো তোমারই লোক। মুখের কথাটি খসাও, আর দেখ যে আমি উড়ে চলেছি!"

"বাদামওয়ালীর কাছে গিয়ে বল, সব কাজ ফেলে রেখে আমার এই কথাটা সে তার প্রাণের বন্ধুকে বলুক এবং তাকে বলে দিক তার প্রাণের বন্ধুকে বলত।" কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে সে বলল, "এবার ছুটে যাও!"

পরমুহূর্ত থেকেই চিমনি-ঝাড়ুদারের কথটা বলতে মম্রাটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

৩

পরদিন মাঝ রাতে সম্রাটের রোগশয্যার পাশে বসে ডাক্তাররা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছিল। তাদের সমূহ বিপদ, কারণ সম্রাটের অবস্থা খুব খারাপ। এ সত্যকে তারা নিজেদের কাছেও আর লুকিয়ে রাখতে পারছিল না যে যতবার তারা সম্রাটের পেটে নতুন নতুন ওষুধের শিশি ঢালছে ততবারই তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। তাই তাদের খুম মন খারাপ। বেচারি সম্রাট শীর্ণ দেহে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে, পেয়ারের বাচ্চা চাকরটা পাখা চালিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে আর নিঃশব্দে কাঁদছে। হঠাৎ দরোয়ানের রেশমী পোশাকের খসখস শব্দ কানে যেতেই সে দেখল, লর্ড গৃহ-কর্তা দরজায় উঁকি মেরে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ইঙ্গিতে তাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি পা টিপে-টিপে সে তার প্রিয় ও পূজনীয় গৃহকর্তার কাছে গেল সে বলল:

"একমাত্র তুমিই তাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারবে বাবা। কাজটা তোমাকে অবশ্যই করতে হবে। এটা নিয়ে তাকে খাইয়ে দাও; তাহলেই সম্রাট বেঁচে যাবেন।"

"আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, এটা তাকে খাওয়াবই।"

তাজা, লাল তরমুজের দুটো ফালি মাত্র।

পরদিন সকালেই সর্বত্র সংবাদ রটে গেল যে সম্রাট আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং সব ক'টি ডাক্তারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। সারা দেশে খুসির জোয়ার বয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল আলোকসজ্জার তোড়জোড়।

প্রাতরাশের পরে সম্রাট বসে ভাবছিল। তার কৃতজ্ঞাতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত একটা পুরস্কার উপকারীকে দেবার কথাই সে ভাবছিল। মনে মনে বিষয়টা স্থির করে সে ছোকরা চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, সে নিজেই ওষুধটা আবিষ্কার করেছে কি না। ছেলেটি বলল-না-সে ওটা পেয়েছিল লর্ড গৃহকর্তার কাছ থেকে।

তাকে পাঠিয়ে দিয়ে সম্রাট আবার পুরস্কারের কথা ভাবতে লাগল। গৃহকর্তা একজন 'আর্ল'; সম্রাট তাকে 'ডিউক' পদে অভিষিক্ত করবে এবং বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্যের মালিকানাধীন প্রচুর ভূ-সম্পত্তি তাকেই দান করবে। তাই তাকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইল, সেই ওষুধটা আবিষ্কার করেছে কি না। কিন্তু গৃহকর্তাটি সৎ মানুষ, সে বলল, সে ওটা পেয়েছে বড় দেওয়ানের কাছ থেকে। তাকে পাঠিয়ে দিয়ে সম্রাট আরও বড় কিছু ভাবতে লাগল। দেওয়ান ছিল একজন ভাইকাউন্ট, তাকে সে 'আর্ল' বানাবে এবং প্রচুর উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু দেওয়ান তাকে বলল প্রথম লর্ডের কথা, কাজেই আবাব নতুন করে ভাবনা-চিন্তা। সম্রাট এবার একটা ছোটখাট পুরস্কারের কথা ভাবল। কিন্তু প্রথম লর্ড ব্যাপারটাকে আরও পিছিয়ে দিল এবং সম্রাটকেও নতুন করে ভাবতে হল আরও ছোট একটি যথাযোগ্য পুরস্কারের কথা।

অবশেষে একের পর এক একঘেয়ে অনুসন্ধান-পর্ব ভেঙে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার জন্য সম্রাট গোয়েন্দা বিভাগের মহাপ্রধানকে ডেকে পাঠাল এবং এই ওষুধ একেবারে গোড়ায় কার কাছ থেকে এসেছে সেটা খুঁজে বের করবার নির্দেশ দিল। আসল উপকারীকেই পুরস্কৃত করা চাই।

সন্ধ্যা ন'টায় গোয়েন্দা মহাপ্রধান আসল খবর এনে দিল। জিমি নামক চিমনি-ঝাড়ুদারকে সে খুঁজে বের করেছে। গভীর আবেগে সম্রাট বলল:

"সাহসী বালক আমার জীবন রক্ষা করেছে; সেজন্য তাকে অনুশোচনা করতে হবে না।"

নিজের একজোড়া বুট জুতো সম্রাট ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিল; তার যত জুতো ছিল তার মধ্যে এই জোড়াটাই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বুট জোড়া জিমির পায়ে অনেক বড় হল, কিন্তু বেশ মাপমত লাগল জুলু-র পায়। কাজেই সব কিছুই যেমনটি হওয়া উচিৎ তেমনটিই হল।

প্রথম গল্পের উপসংহার

"এবার-ব্যাপারটা ধরতে পেরেছ তো?"

"সে কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। আর তোমার কথামতই কাজ হবে। কালই কাজ হাসিল করব। ডিরেক্টর-জেনারেলের প্রাণের বন্ধুকে আমি ঘনিষ্ঠ ভাবেই চিনি। সে আমাকে একটা পরিচয়-পত্র দেবে; তাতে লেখা থাকবে, আমার বিষয়টা সরকারের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাতের কোন রকম পূর্ব-ব্যবস্থা না করেই সেই চিঠি নিয়ে আমি যাব, আমার কার্ডসহ চিঠিটা ভিতরে পাঠিয়ে দেব, আর আমাকে আধ মিনিটও অপেক্ষা করতে হবে না।"

"কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল; সরকার সেই বুট জুতোকে স্বীকৃতি দিল।

১৯০১

বিলম্বিত রুশ পাসপোর্ট

The Belated Russian Passport

একটি পতঙ্গ উড়লেই বসন্ত।-পুড্‌ন্‌হেড উইলসন'স্ ক্যালেণ্ডার

মধ্য-অপরাহ্ন কালে বার্লিন-এর ফ্রীড্‌রিখ্‌স্ট্রাস-এর একটি মস্ত বড় বিয়ার সেলুন। একশ'টা গোল-টেবিলকে ঘিরে বসে ভদ্রজনরা ধূমপান করছে, মদ খাচ্ছে; তৃষ্ণার্তদের কাছে ফেনায়িত মগ পৌঁছে দিতে সাদা পোশাক পরিহিত ওয়েটাররা এখানে সেখানে ছুটাছুটি করছে। প্রধান ফটকের কাছে একটা টেবিলে জুটেছে ডজনখানেক চটপটে তরুণ-মার্কিন ছাত্রের দল। একটা ইয়েল যুবক দেশভ্রমণের পথে জার্মান রাজধানীতে কয়েকটি দিন কাটিয়েছে। তাকে বিদায় জানাতেই এই পানোৎসবের আয়োজন।

একটা ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু প্যারিস, তোমার এই ভ্রমণকে মাঝপথে এ ভাবে ছেটে ছোট করছ কেন? তোমার মত একটা সুযোগ পেলে তো বর্তে যেতাম। বাড়ি ফিরে যেতে চাইছ কেন?"

আর একজন বলল, "সত্যি তো। ব্যাপারটা কি? দেখ, ব্যাপারটা একটা পাগলামির মত দেখাচ্ছে; তাই তোমার উচিত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে কি?"

প্যারিস-এর তরুণ তাজা মুখখানিতে একটা মেয়েলি আভা ছড়িয়ে পড়ল; একটু ইতস্তত করে সে স্বীকার করল যে গোলমালটা সেই রকমই।

বলল, "এর আগে কখনও বাড়ি থেকে বের হই নি। এক-একটা দিন যাচ্ছে আর ক্রমেই বড় একলা লাগছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটি বন্ধুকেও দেখতে পাচ্ছি না, এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা। নিজের মুখ রক্ষার জন্যই ভ্রমণটা শেষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের পেয়ে সে সাধ মিটে গেছে। ক'টা দিন যেন স্বর্গ-সুখে কেটেছে; সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বর মধ্যে আর আমি ফিরে যেতে পারব না। যদি কোন সঙ্গী থাকত-কিন্তু তোমরাও জান যে আমার কোন সঙ্গী নেই, কাজেই সে কথা বলে লাভ নেই। যখন ছোট ছিলাম সকলে আমাকে মিস্ ন্যান্সি বলে ডাকত; মনে হচ্ছে এখনও আমি তাই আছি-মেয়েলি, ভীরু, যাই বল। আমার মেয়ে হওয়াই উচিত ছিল! এ অবস্থা আমি সইতে পারছি না; বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।"

ছেলেরা ভাল করে বোঝাল; বলল যে জীবনে একটা মস্ত ভুল সে করেছে, একজন বলল যাবার আগে অন্তত পক্ষে সেন্ট পিতার্সবুর্গ দেখে যাওয়া তার উচিত।

প্যারিস অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল, "ও কথা বলো না! ওটাই ছিল আমার প্রিয় স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নকে আজ আমি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি। এ ব্যাপারে আর একটি কথাও আমাকে বলো না, কারণ আমার মনটা জলের মত তরল, কারও অনুরোধ আমি এড়াতে পারি না; আমি একা থাকতে পারি না; মনে হয় বুঝি মারা যাব।" বুক পকেটে একটা টোকা দিয়ে সে বলল, "পাছে মনের গতি বদলে যায় তাই এই সুরক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছি, প্যারিসের টিকিট ও শয়ন-যানের ব্যবস্থা করেছি, আজ রাতেই চলে যাব। এস, পান করা যাক- এই ভরা গ্লাস- এটা বাড়ির জন্য।"

বিদায় জানিয়ে সকলে চলে গেল। নিজের চিন্তা ও নিঃসঙ্গতা নিয়ে রয়ে গেল আলফ্রেড প্যারিস। কিন্তু মাত্র মুহূর্তের জন্য। শক্ত-সমর্থ, চটপটে, করিৎকর্মা একটি মাঝ-বয়েসী লোক পাশের টেবিল থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে প্যারিস-এর পাশে বসে পড়ল। ভাব-ভঙ্গীতে সামরিক শিক্ষার স্পষ্ট প্রকাশ। বসেই সে একান্ত আগ্রহে কথা বলতে শুরু করল। তার চোখ, মুখ, ব্যক্তিত্ব, ও সারা দেহ থেকে শক্তির প্রাচুর্য উপছে পড়েছে। ভিতরটা যেন বাষ্পে ভর্তি-দৌড়ের ঘোড়ার মত টগ্‌বগ্ ভাব-একটা শোঁ-শোঁ শব্দ যেন কান পাতলেই শোনা যাবে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাদরে প্যারিস-এর সঙ্গে করমর্দন করল; কঠোর আত্মবিশ্বাসের সুরে বলতে লাগল:

"কিন্তু না, এ কাজ করবেন না; সত্যি করবেন না; এর চাইতে বড় ভুল আর হয় না: পরবর্তী জীবনে অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। আমার কথা শুনুন; এ কাজ করবেন না-করবেন না!"

তার কথায় এমন একটা সহজ হৃদ্যতার সুর ছিল, ছিল এত খাঁটি সহানুভূতির আমেজ, যে যুবকটির মন সাড়া না দিয়ে পারল না। তার চোখ সজল হয়ে উঠল; অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যেন স্বীকার করে বসল যে কথাগুলি তাকে বিচলিত করেছে, কৃতজ্ঞ করেছে। এটা সতর্ক নবাগতের দৃষ্টি এড়াল না, সে খুসি হল, মুখের কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করেই সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল:

"না করবেন না, করলে ভুল করবেন। সব কথাই আমি শুনেছি-সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি-এত কাছে বসে ছিলাম যে না শুনে পারি নি। আপনি সত্যসত্যই সেন্ট পিতার্সবুর্গ দেখতে চান, তার একেবারে এত কাছে এসেও পড়েছেন, অথচ ভ্রমণ-সূচীকে ছেঁটে আপনাকে চলে যেতে হচ্ছে, এ কথা ভেবে দেখুন আমার খুব খারাপ লাগছে। আর একবার ভেবে দেখুন-আঃ, ভেবে দেখতে আপনাকে হবেই। আর এত কাছে-দু'পা এগোলেই দেখা হয়ে যাবে-তখন ভাবুন তো, স্মৃতির পাতায় কী অক্ষয় সঞ্চয়ই না হবে!"

কথাপ্রসঙ্গে সে রুশ রাজধানী ও তার বিস্ময়কর নানা দর্শনীয় জিনিসের একটা ছবি এঁকে ধরল, আলফ্রেড প্যারিস-এর মুখে জল এসে গেল; তার সদ্য জেগে ওঠা মন যেন আকাঙ্ক্ষায় চীৎকার করে উঠল। তখন-

"সেন্ট পিতার্সবুর্গ আপনাকে দেখতেই হবে-অবশ্যই দেখতে হবে। দেখে আনন্দ পাবেন-আনন্দ! আমি জানি, কারণ আমেরিকায় আমার জন্মস্থানটিকে আমি যত ভাল করে চিনি, এই জায়গাটাকেও আমি তেমনই ভাল করে চিনি। দশ বছর-দশ বছর ধরে এর সঙ্গে আমার পরিচয়। সেখানকার যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই বলে দেবে; সকলেই আমাকে চেনে-আমি মেজর জ্যাক্সন। কুকুরগুলো পর্যন্ত আমাকে চেনে। চলে যান; আপনাকে যেতেই হবে; সত্যি, যেতে হবে।"

আলফ্রেড প্যারিস আগ্রহে কাঁপছে। সে যাবে। জিহ্বায় উচ্চারিত না হলেও তার মুখই এ কথা বলে দিচ্ছে। তার পরই-আবার সেই কালো ছায়া নেমে এল-দুঃখের সঙ্গে সে বলে উঠল:

"না, না-কোন লাভ নেই; আমি যেতে পারব না। নিঃসঙ্গতায় আমি মরে যাব।"

মেজর অবাক হয়ে বলল: "নিঃসঙ্গতা! সে কি! আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি!"

একান্ত অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। খুব মনোরমও নয়। ঘটনায় গতি বড় বেশী দ্রুত। এটা কোন ফাঁদ নয় তো? অপরিচিত এই লোকটি কোন তাসের যাদুকর নয় তো? একটি ভ্রাম্যমান অপরিচিত ছেলের প্রতি এমন অযাচিত আগ্রহই বা কেন? তখনই মেজরের সরল, উজ্জ্বল মুখের দিকে চোখ পড়তেই যুবকটি লজ্জিত হল; তার মনে হল, লোকটির মনে কোন রকম আঘাত না দিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পেলে ভাল হয়। সে বলে উঠল:

"না, না, আপনি খুবই দয়ালু; তাই বলে আমার জন্যে এতখানি অসুবিধা তো আপনাকে ভোগ করতে দিতে পারি না-কিছুতেই পারি না।"

"অসুবিধা? মোটেই না বাবা; আজ রাতে ও আমি এমনিতেই এখান থেকে চলে যেতাম। ন'টার এক্সপ্রেস-এ আমি যাচ্ছি। একসঙ্গে যাওয়া যাবে। একমুহূর্তও আপনার নিঃসঙ্গ লাগবে না। তাহলে কথা দিন!"

এ অজুহাতও টিকল না। এখন কি করা যায়? প্যারিস হতাশ হয়ে পড়ল: সে বুঝল, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার মত কোন ফন্দি তার মাথা থেকে বেরুবে না। তবু সে আর একবার চেষ্টা করে দেখবে, করলও; নতুন অজুহাতটা বলে শেষ করবার আগেই তার মনে হল এটা একেবারে মোক্ষম, এর আর কোন জবাব নেই।

"কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, ভাগ্যই বিরূপ। তা হবে না। এগুলো দেখুন"-টিকিটগুলো বের করে সে টেবিলে রাখল। "আমাকে একটানা প্যারিসে যেতে হবে; এই সব টিকিট ও মালপত্রের কুপন তো সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এর জন্য বদলানো যাবে না, আর গেলেও অনেক টাকা লোকসান হবে; আর যদিও লোকসান দেবার মত টাকা এখন আমার কাছে আছে, কিন্তু নতুন করে টিকিট কাটবার পরে টাকায় টান পড়ে যাবে,-কারণ আমার কাছে নগদে এই মাত্রই আছে,"-একটা পাঁচশ' মার্ক-এর ব্যাংক-নোট সে টেবিলের উপর রাখল।

মুহূর্তের মধ্যে টিকিট ও কুপনগুলি নিয়ে মেজর উঠে দাঁড়াল; সোৎসাহে বলল:

"বেশ! ঠিক আছে। সবই নিরাপদে রইল। আমার খাতিরেই টিকিট ও মালপত্রের কুপন তারা পাল্টে দেবে; তারা আমাকে চেনে-প্রত্যেকেই চেনে। যেখানে আছেন সেখানেই বসে থাকুন; আমি এখনই আসছি।" তারপর ব্যাংক-নোটটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, কারণ নতুন টিকিটের জন্য হয় তো বাড়তি কিছু দিতে হতে পারে"-পরমুহূর্তেই সে যেন দরজা দিয়ে উড়ে চলে গেল।

২

আলফ্রেড প্যারিস কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বড়ই আকস্মিক ঘটনা। যেমন আকস্মিক, তেমনই দুঃসাহসিক, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। তার মুখটা হাঁ হয়ে ছিল, কিন্তু জিভ নড়ে নি; সে চেঁচিয়ে বলতে চেয়েছিল "ওকে থামাও," কিন্তু তার ফুসফুসটায় বাতাস ছিল না; সে তাড়া করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার পা দুটো কাঁপা ছাড়া আর কিছু করতে চাইল না; কাঁপতে কাঁপতে পা দুটো আধ-ভাঙা হয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। গলা শুকিয়ে গেল; হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিলতে লাগল; মাথাটা ঘুরতে লাগল। সে কি করবে সে জানে না। অবশ্য একটা কথা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল-তার উচিত আত্মস্থ হয়ে লোকটিকে ধরবার চেষ্টা করা। লোকটি অবশ্য টিকিটের টাকা ফেরৎ পাবে না, কিন্তু তাই বলে সে কি টিকিটগুলো ফেলে দেবে? না; সে নিশ্চয় রেল-স্টেশনে যাবে এবং অর্ধেক দামে টিকিটগুলো কাউকে বেচে দেবে; আর সে কাজটা আজই করবে, জার্মান শুল্ক বিভাগের ব্যবস্থা অনুসারে আগামীকাল টিকিটগুলোর কোন দাম থাকবে না। এই সব চিন্তা তাকে আশা দিল, শক্তি দিল; সে উঠে পা বাড়াল। কিন্তু দু' পা এগিয়েই হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়ল। তার ভয় হল যে তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে-কারণ শেষ দফা বীয়ারের খরচ তারই দেবার কথা এবং তার কাছে একটা পেনিও নেই। এখন সে তো বন্দীর সামিল-সে স্থান ত্যাগের চেষ্টা করলে কি যে ঘটতে পারত তা ঈশ্বরই জানেন। সে ভীত, আতংকিত, বিপর্যস্ত। সব কথা খুলে বলে কারও সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার মত যথেষ্ট মনের জোরও তার নেই।

এই চিন্তাই তাকে কষ্ট দিতে লাগল। এত বোকা সে হল কেমন করে? এমন একটা স্পষ্ট ধোঁকাবাজের কথা সে শুনল কিসের প্রভাবে? ঐ তো ওয়েটার আসছে! কাঁপতে কাঁপতে সে খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকল। ওয়েটার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। মনে হল ঘড়ির কাঁটা দুটো বুঝি থেমে আছে, তবু সেদিকে না তাকিয়ে সে থাকতে পারল না।

দশ মিনিট কেটে গেল। আবার ওয়েটার! আবার কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকা। ওয়েটার থামল-যেন এক সপ্তাহ-তারপর চলে গেল।

দুঃখে-ভরা আরও দশটা মিনিট-আবার ওয়েটার; এবার সে টেবিলটা মুছল; মনে হল যেন একটা মাস কেটে গেল; তারপর দু'মাস সে থেমে রইল; তারপর চলে গেল।

প্যারিস বুঝল, তার আর একটি দর্শন সে সইতে পারবে না; সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে; পালাতে হবে। কিন্তু ওয়েটারটি পাঁচ মিনিট ধরে আশে পাশে ঘুরতে লাগল-মনে হল যেন মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে; আর প্যারিসের হতাশ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে, ধীরে ধীরে বার্ধক্য তাকে জড়িয়ে ধরছে, তার চুলগুলি ক্রমে সাদা হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ওয়েটার একটু দূরে গেল-একটা টেবিলে থামল, একটা বিলের টাকা আদায় করল, আরও দূরে গেল, আর একটা বিলের টাকা নিল, আরও দূরে চলে গেল-প্যারিস-এর দুটি প্রার্থনারত চোখ সারাক্ষণ তার উপরেই নিবদ্ধ; তার বুক ধড়ফড় করছে, উদ্বেগে ও আশায় নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে।

বিলের টাকা নিতে ওয়েটার আবার এক জায়গায় থামল; প্যারিস আপন মনে বলল-এই সুযোগ, পরে আর হবে না! দরজার দিকে পা বাড়াল! এক পা-দু'পা-তিন-চার-প্রায় দরজার কাছে পৌঁছে গেছে-পাঁচ-পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে-তার পিছনে কি আর একটা দ্রুত পায়ের শব্দ?-ভাবতেই তার ভেতরটা ধড়াস করে উঠল-ছ'পা-সাত; এবারে সে বাইরে এসে গেছে!-আট-নয়, দশ-এগারো-বারো-কেউ কি পিছু নিয়েছে!-মোড়টা ঘুরেই সে দৌড়তে গেল-তার কাঁধে একটা ভারী হাত পড়ল; তার গোটা শরীর অসাড় হয়ে পড়ল।

আর কেউ নয়, মেজর। সে কোন প্রশ্ন করল না, অবাকও হল না। স্বাভাবিক হাসিখুসি মেজাজেই বলল:

"ঐ লোকগুলোই সব গোলমাল করল, আমাকে দেরী করিয়ে দিল; সেই জন্যই তো এত বিলম্ব ঘটল। টিকিট-ঘরে ছিল নতুন লোক; সে আমাকে চেনে না, আর নিয়মবিরুদ্ধ বলে টিকিট ও পাল্টে দিতে চাইল না; কাজেই অনেক খুঁজে পুরনো বন্ধুটিকে বের করলাম, সেই মহান মোগল-বুঝতেই তো পারছেন স্টেশন-মাস্টার-হাই-এই যে গাড়ি! গাড়ি!-গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড় প্যারি-কোচয়ান, রুশ কন্সাল-আপিস, ঘোড়া দুটোকে উড়িয়ে নিয়ে চল!-বুঝলে, সেই জন্যই এত দেরী হল। কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে; সব কিছু সোজা, সরল; তোমার মালপত্র নতুন করে ওজন করা হয়েছে, পরীক্ষা করা হয়েছে, টিকিট ও শয়ন-ব্যবস্থা পাল্টে নেওয়া হয়েছে, আর তার সব কাগজপত্রই আমার পকেটে মজুদ; ভাঙানিটাও আছে-তোমার হয়ে সেটা আমার কাছেই রেখে দিলাম। জল্‌দি চালাও কোচয়ান, জল্‌দি চালাও; ঘোড়াগুলো যেন ঘুমিয়ে না পড়ে।"

গাড়ি ছুটে চলেছে বীয়ার-হল থেকে দূর থেকে দূরে। অনেক চেষ্টা করেও প্যারিস একটা কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একটু ফাঁক পেয়ে বলল, সে এখনই ফিরে গিয়ে ছোটখাট বিলটা মিটিয়ে দিয়ে আসতে চায়।

মেজর শান্ত গলায় বলল, "ও নিয়ে মাথা ঘামিও না; ও ঠিক আছে, ওরা আমাকে চেনে, প্রত্যেকেই চেনে-পরে যখন বার্লিনে আসব তখন ও বিল মিটিয়ে দেব-জোরসে চালাও-হাতে আর মোটেই সময় নেই।"

যথাসময়ের একটু বিলম্বে তারা রুশ দূতাবাসে পৌঁছে গেল। তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকল। একজন করণিক ছাড়া আর কেউ নেই। মেজর ডেস্কের উপর নিজের কার্ডটা রেখে রুশ ভাষায় বলল, "একটু তাড়াতাড়ি যদি এই যুবকটির পাসপোর্টটাকে পিতার্সবুর্গ পর্যন্ত অনুমোদন করিয়ে দেন-"

"দেখুন স্যার, সে ক্ষমতা তো আমার হাতে নেই; কন্সালও এই মাত্র চলে গেলেন।"

"কোথায় গেছেন?"

"গ্রামাঞ্চলে; সেখানেই তিনি থাকেন।"

"ফিরতে-"

"সকালের আগে নয়।"

"হায় কপাল! বেশ, দেখুন, আমি মেজর জ্যাকসন-তিনি আমাকে চেনেন; সকলেই আমাকে চেনে। আপনিই পাসপোর্টটার ভিসা করে দিন; তাকে বলবেন, মেজর জ্যাকসন-এর কথায় করেছেন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু কাজটা মারাত্মক রকমের নিয়মবিরুদ্ধ; করণিক রাজী হল না। কথাটা শুনে তার তো মূর্ছা যাবার উপক্রম।

"আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করুন," মেজর বলল। "এই স্ট্যাম্প আর ফি-র টাকাটা রইল-সকালেই ভিসা করিয়ে এটাকে ডাকে পাঠিয়ে দেবেন।"

করণিক ইতস্তত করে বলল, "তিনি-তা, এটা হয় তো তিনি করবেন, কাজেই-"

"হয় তো? তিনি অবশ্য করবেন! তিনি আমাকে চেনেন-প্রত্যেকেই আমাকে চেনে।"

"ঠিক আছে," করণিক বলল। "আপনার কথা আমি তাকে বলব।" লোকটিকে বিচলিত মনে হল। ভীরু গলায় বলল, "কিন্তু-কিন্তু-সীমান্তে পৌঁছে আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। আর এত বেশী সময় কাটাবার মত কোন ব্যবস্থাও সেখানে নেই।"

"কে অপেক্ষা করবে? আমি অন্তত করছি না।"

করণিক হতবুদ্ধি। বলল, "আপনি নিশ্চয় চান স্যার যে এটা পিতার্সবুর্গে পাঠানো হয়!"

"কেন নয়?"

"কারণ সেক্ষেত্রে তো পাসপোর্টের মালিককে পঁচিশ মাইল দূরে সীমান্তে আটকে থাকতে হবে। সে অবস্থায় এতে তার কি লাভ হবে?"

"আটকে থাকতে হবে! কে বলল তাকে আটকে থাকতে হবে?"

"সে কি; আপনি নিশ্চয় জানেন যে সঙ্গে পাসপোর্ট না থাকলে তারা তাকে সীমান্তে আটকে দেবে।"

"তা তারা করবে না! বড় কর্তা আমাকে চেনেন-প্রত্যেকেই চেনে। এই যুবকের জন্য আমি দায়ী থাকব। আপনি এটাকে সোজা পাঠিয়ে দেবেন পিতার্সবুর্গ-এ-হোটেল দ্য ইউরোপ-এ মেজর জ্যাকসন-এর প্রযত্নে। কন্সালকে বলবেন, তিনি যেন দুশ্চিন্তা না করেন; সব ঝুঁকি আমি নিজে নিচ্ছি।"

করণিক ইতস্তত রে পুনরায় বলল: "স্মরণ রাখবেন স্যার, এই মুহূর্তে ঝুঁকিটা কিন্তু খুবই গুরুতর। নতুন বিধান চালু হয়েছে।"

"সেটা কি?"

"বিনা পাসপোর্টে রাশিয়ায় ঢুকলে দশ বছরের জন্য নির্বাসন।"

"চুলোয় যাক!" রুশ ভাষায় কুললো না বলে এ কথাটা সে ইংরাজিতে বলল। মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে আবার রুশ ভাষায় বলল: "ওঃ, ঠিক আছে-সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এর ছাপ মেরে ছেড়ে দেবেন। আমি খুঁজে নেব। সেখানে তারা সকলেই আমাকে চেনে-কর্তৃপক্ষের সকলে-প্রত্যেকে।"

দেখা গেল, মেজরের মত ভ্রমণ-সঙ্গী হয় না; তরুণ প্যারিস তো একেবারে মুগ্ধ। তার কথায় রোদের ঝিলিক আর রামধনুর ছোঁয়া; চারদিকটা একেবারে ঝলমল করে ওঠে; সব কিছুকেই সে হাসিখুসিতে ভরিয়ে রাখতে জানে; আর জানে কখন কি কাজ করতে হবে আর কেমন করে করতে হবে। ফলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বাড়ির জন্য মন-কেমন-করা নির্জন নিঃসঙ্গ ছেলেটির কাছে এই দীর্ঘ যাত্রা যেন একটা রূপকথার স্বপ্ন হয়ে দেখা দিল। অবশেষে সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে প্যারিস পাসপোর্টের কথাটা তুলল। কি যেন মনে হতেই বলল:

"আচ্ছা, দূতাবাস থেকে আমার পাসপোর্টটা নিয়ে আসা হয়েছে কিনা তা তো মনে পড়ছে না। নিশ্চয়ই এনেছেন, কি বলেন?"

"না ওটা ডাকে আসছে," মেজর অনায়াসে বলল।

"ডা-ডাকে আসছে!" ছেলেটি ঢোক গিলল, বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণকারীর রাশিয়াতে যে কী হাল হয় সে সম্পর্কে যত রকম ভয় ও বিপদের কথা সে আগে শুনেছে সে সব কথা মনে হতেই ভয়ে তার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। "ওঃ মেজর- হায়, এখন আমার কি হবে! এমন কাজ আপনি করলেন কেন?"

যুবকটির কাঁধে সান্ত্বনার হাত রেখে মেজর বলল:

"কিছু ভেব না বাবা, তিলমাত্র ভেব না। তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমার কোন ক্ষতি হতে আমি দেব না। সেখানকার বড় কর্তা আমাকে চেনে, তাকে সব বুঝিয়ে বলব, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে-দেখো। তুমি এতটুকু মন খারাপ করো না-সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আলফ্রেড ভয়ে কাঁপতে লাগল। ভিতরে-ভিতরে তার অস্বস্তির অন্ত নেই। তবু মেজরের সামনে সেটা প্রকাশ না করে বাইরে যথাসাধ্য হাসিখুসি ভাবই ফুটিয়ে চলতে লাগল।

সীমান্তে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে সে ভিড়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল, আর মেজর ভিড় ঠেলে "বড় কর্তাকে" সব কিছু বোঝাতে ভিতরে চলে গেল। আলফ্রেড দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, অনেকক্ষণ পরে মেজর এসে হাজির হল। "চুলোয় যাক সব! এ ইন্সপেক্টরটা একেবারে নতুন, আমি তাকে চিনিই না।"

এক গাদা ট্রাংকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আলফ্রেড হতাশভাবে বলে উঠল, "হায়, হায়, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল!" ধাক্কার চোটে সে হয় তো পড়েই যেত, মেজর তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল; তারপর একটা বাক্সের উপর বসিয়ে নিজের পাশে বসে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলল:

"মোটে কিছু ভেব না বাবা, একদম না; সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার উপর শুধু ভরসা রাখ। এই সাব-ইন্সপেক্টরটি হেরিং-মাছের মত দিন-কানা। এক নজর দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি শুধু আমার কথামত কাজ করবে। আমি গিয়ে আমার পাসপোর্টটা ঠিকঠাক করিয়ে নেব; তারপর ঐ গ্রীলের মধ্যে যেখানে চাষা-ভুষো লোকেরা মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐখানে গিয়ে থামব। তুমি আগে থেকেই সেখানে থাকবে; গ্রিলের দিকে পিঠ দিয়ে ফোকড়ের ভিতর দিয়ে আমার পাসপোর্টটা তোমাকে দিয়ে দেব আর তুমিও ভিড়ের পিছন পিছন এগিয়ে গিয়ে পাসপোর্টটা জমা দেবে। তারপর ভগবান ভরসা, আর ভরসা ঐ দিন-কানা হেরিং-মাছ। আসল ভরসা হেরিং-মাছ। ও ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তুমি মোটে ভয় পেয়ো না।"

"কিন্তু -কিন্তু, আপনার চেহারার ও অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে তো আমার কিছুই মিলবে না-"

"আহা, সব ঠিক হয়ে যাবে-একান্ন আর উনিশের তফাৎ তো-ও কানা ব্যাটা কিছুই ধরতে পারবে না-কোন চিন্তা করো না-সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দশ মিনিট পরে আলফ্রেড টলতে টলতে ট্রেনের দিকে এগিয়ে চলল, তখন তার ব্যবস্থা অতি কাহিল। অবশ্য হেরিং-মাছটাকে সে ঠিক মতই ধাপ্পা দিতে পেরেছে।

মেজর জাঁকিয়ে বলতে লাগল, "আমি তো আগেই বলেছিলাম। আমি জানতাম, ছোট শিশুর মত ঈশ্বরের উপর ভরসা করলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।"

তারপর সীমান্ত থেকে পিতার্সবুর্গ পর্যন্ত মেজর তার তরুণ সঙ্গীর জীবনকে এমনভাবে চাঙ্গা করে তুলল, তার রক্তচলাচল স্বভাবিক করে দিয়ে মনটা এমন জাঁকিয়ে তুলল যে তার জীবনে হাসি-খুসি আর আনন্দ আবার ফিরে এল। ফলে বেশ খুসির পাখ্না মেলেই সে শহরে ঢুকল, বেশ ডাঁটের সঙ্গেই হোটেলে ঢুকে নামটা লেখাল। কিন্তু তার ঘরের সংখ্যাটা না জানিয়ে করণিক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল এবং সময় কাটাতে লাগল। মেজর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে সহজভাবেই বলল:

"ও ঠিক আছে- আপনি আমাকে তো চেনেন-ওর ব্যবস্থা করে দিন; সব দায়িত্ব আমার।" করণিক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। মেজর বলল: "আরে, ঠিক আছে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ওটা এসে পড়বে-ডাকে আসছে। এই তো আমার পাসপোর্ট, ওটাও এসে পড়বে।"

করণিক ভদ্র, শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু কর্তব্যে অটল। ইংরাজিতে বলল:

"সত্যি কথা বলতে কি মেজর, আপনার কথামত কাজ করতে পারলে আমি খুসি হতাম, পারলে নিশ্চয়ই করতাম; কিন্তু কোন উপায় নেই। আমি তাকে চলে যেতে বলতে বাধ্য; আর এক মুহূর্তও তাকে এখানে থাকতে দিতে পারব না।"

প্যারিসের পা টলতে লাগল; মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বের হল; মেজর তাকে ধরে ফেলল; কাঁধের উপর হাত রেখে করণিককে মিনতি করে বলল:

"শুনুন, আপনি তো আমাকে চেনেন-সকলেই চেনে-একে একটা রাত থাকতে দিন; আমি কথা দিচ্ছি-"

করণিকটি মাথা নেড়ে বলল:

"কিন্তু মেজর, আপনি আমাকে বিপদে ফেলছেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বিপদে ফেলেছেন। আমি-আমি এ সব কাজ করতে ঘৃণা বোধ করি; কিন্তু আমাকে পুলিশ ডাকতেই হবে।"

"দাঁড়ান, ও সব করবেন না। চলে এস বাবা, কোন ভয় নেই- সব ঠিক হয়ে যাবে। হাই, এই যে, কোচয়ান! উঠে পড় প্যারিস। গোয়েন্দা পুলিশের জেনারেলের প্রাসাদে চল-জোরসে চালাও; ছুটিয়ে দাও; শাঁ-শাঁ করে ঘোড়া ছুটুক! এই তো ঠিক জায়গায় যাচ্ছি। কোন ভয় নেই। প্রিন্স বাস্‌ল্ফস্কি আমাকে চেনেন, খুব হৃদ্যতা আমার সঙ্গে; তিনি এখনই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

অতি দ্রুত গাড়ি হাঁকিয়ে তারা সেই আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে আটটা বাজে। শান্ত্রী জানাল, প্রিন্স এখন নৈশ ভোজে বসবেন, কাজেই কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

"কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন," কথাগুলি বলে মেজর গম্ভীরভাবে তার কার্ডটা এগিয়ে দিল। "আমার নাম মেজর জ্যাকসন। কার্ডটা ভিতরে পাঠিয়ে দাও; সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কার্ডটা ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হল; মেজর ও তার সঙ্গী বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের ডাক এল। জাঁকজমকপূর্ণ আপিস-ঘরে ঢুকে তারা প্রিন্সের মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রিন্সের পরনে ঝকমকে পোশাক, আর মুখে বজ্র-মেঘের ভ্রূকুটি। সব কথা জানিয়ে মেজর অনুমতি চাইল, পাসপোর্টটা না আসা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টার জন্য ছেলেটিকে থাকতে দেওয়া হোক।

নির্ভুল ইংরেজিতে প্রিন্স বলল, "ওঃ, অসম্ভব! আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, বিনা পাসপোর্টে ছেলেটিকে এদেশে নিয়ে আসবার মত পাগলামি আপনি করলেন কেমন করে। সত্যি, আমি অবাক হয়ে গেছি মেজর। জানেন, ছেলেটির দশ বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসন হবে; কোন উপায় নেই-আরে, ওকে ধরুন! ভাল করে ধরুন!" বেচারি প্যারিস আবারও মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল। "এই যে তাড়াতাড়ি এটা খাইয়ে দিন। এই যে-আর এক চুমুক; ব্র্যাণ্ডিই এর ওষুধ। কি বল হে ছোকরা? এবার তুমি সুস্থ বোধ করবে। সোফায় শুয়ে পড়। বেচারিকে এমন গাড্ডায় ফেলে দিয়ে আপনি খুবই বোকার মত কাজ করেছেন মেজর।" শক্ত হাতে ধরে যুবকটিকে শুইয়ে দিয়ে মাথার নীচে একটা কুশন দিয়ে মেজর তার কানে কানে বলল:

"যতটা পার অসুস্থতার ভাব দেখাও! অভিনয় যেন নিখুঁত হয়; দেখতে পাচ্ছ উনি বেশ বিচলিত হয়েছেন; কোথাও একটা নরম মন আছে; গোঙানির মত করে বল, 'ওঃ, মা, মাগো', তাহলেই ওকে কাত করতে পারবে।"

প্যারিস নিজে থেকেই কাজই বেশ ভালভাবেই করতে পারল। তা দেখে মেজর ফিস্‌ফিস্ করে বলল: "চমৎকার! আবার কর। বার্নহার্ডও এর চাইতে ভাল অভিনয় করতে পারত না।"

কিছুটা মেজরের কথার তোড়ে, আর কিছুটা ছেলেটার দুর্দশার ফলে, শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হল। প্রিন্স বলল: "আপনার কথাই মেনে নিলাম, যদিও উচিৎ শিক্ষাই আপনার প্রাপ্য ছিল। ঠিক চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম; তার মধ্যে যদি পাসপোর্ট না আসে তাহলে আমার কাছে আসবেন না। সাইবেরিয়ার হাত থেকে কোন ক্ষমা নেই।"

মেজর ও যুবকটি যখন পঞ্চমুখে তাকে ধন্যবাদ জানাতে ব্যস্ত, তখন প্রিন্স ঘন্টা বাজিয়ে দু'জন সৈন্যকে ডেকে আনল; নিজের ভাষায় তাদের হুকুম করল-এই দু'জন লোকের সঙ্গে যাও, চব্বিশ ঘন্টার জন্য ছেলেটির উপর নজর রাখ; তারপরেও যদি ছেলেটি পাসপোর্ট দেখাতে না পারে তাহলে তাকে সেন্ট পিটার ও সেন্ট পল কারাগারে পাঠিয়ে আমাকে জানিয়ে দিও।

হতভাগ্যরা রক্ষীসহ হোটেলে ফিরে গেল, তাদের চোখের সামনে বসে খাওয়া শেষ করল, তারপর প্যারিস-এর ঘরে গিয়ে বসল। প্যারিসকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে মেজর শুতে চলে গেল একটি সৈনিক ঘরে; তালা লাগিয়ে প্যারিস-এর সঙ্গে ভিতরেই রইল, আর অপর সৈনিক দরজার বাইরে সটান শুয়ে পড়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আলফ্রেড প্যারিস-এর চোখে ঘুম নেই। একটি গম্ভীর সৈনিকের সঙ্গে আর ঘরের নিঃশব্দ নীরবতার চাপে সঙ্গীহীন ছেলেটির জোর করে টেনে-আনা ফুর্তির ভাব ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল, তার সাহসের ফাঁপানো বেলুনটার গ্যাস বেরিয়ে যেতে ক্রমেই সেটা চুপসে যেতে লাগল, তার ছোট বুকখানা কিসমিসের মত শুকিয়ে কুঁকড়ে গেল। ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই সে শোক, দুঃখ, ভয় ও হতাশার

একেবারে অতলে তলিয়ে গেল। বিছানা? তার জন্য তো বিছানা নয়; যার মাথার উপর খড়গ ঝুলছে তার জন্য তো বিছানা নয়। ঘুম? ইহুদি সন্তানদের মত সে তো আগুনের মধ্যে ঘুমতে পারে না! তার কাজ শুধু মেঝেতে হেঁটে বেড়ানো। তাই করতে সে বাধ্য। সে দুঃখ করল, কাঁদল, প্রার্থনা করল।

অনেক দুঃখে শেষের সব বন্দোবস্ত সে করল; ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজেকে সাধ্যমত প্রস্তুত করল। চূড়ান্ত কাজ হিসাবে একটা চিঠি লিখল:

"মাগো, মা আমার,-এই বিসন্ন কথাগুলি যখন তোমার কাছে পৌঁছবে, তোমার হতভাগ্য আলফ্রেড তখন আর এখানে থাকবে না। না; অবস্থা আরও খারাপ; অনেক বেশী খারাপ। নিজের দোষে ও নির্বুদ্ধিতায় আমি একটা জুয়ারী অথবা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। লোকটা আসলে কি তা আমি জানি না; তবে সে যাই হোক আমি মরেছি। কখনও মনে হয় সে জুয়ারী; আবার অনেক সময়ই মনে হয় লোকটা পাগল; কারণ তার মনটা যে ভাল তা আমি জানি: যে বিপদের মুখে সে আমাকে ঠেলে দিয়েছে তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে সে কঠোর পরিশ্রম করছে।

"আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমিও সেই নামহারাদের একজন হয়ে যাব যারা চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়ে রাশিয়ার নির্জন বরফের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাবে সেই রহস্য, দুঃখ ও চির-বিস্মরণের দেশে যার নাম সাইবেরিয়া! ততদিন আমি বেঁচেও থাকব না; আমার বুক ভেঙে গেছে; আমি মরে যাব। আমার ছবিটা তাকে দিও; তাকে বলো, আমার স্মৃতিস্বরূপ ছবিটা সে যেন রেখে দেয়, আর এমনভাবে জীবনটা কাটায় যাতে যথাসময়ে সেই পরম জগতে সে আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে, যেখানে বিয়ের ব্যাপার নেই, বিরহ নেই, দুঃখ-কষ্ট নেই। আর্কি হেল-কে আমার হলুদ কুকুরটা দিয়ে দিও, আর অন্য কুকুরটা দিও হেনরি টেলরকে; আমার ব্লেজারটা দিও ছোট ভাই উইলকে, আর মাছ ধরবার সরঞ্জাম ও বাইবেলখানাও তাকেই দিও।

"আমার আর কোন আশা নেই। পালাতে পারব না; বন্দুক হাতে নিয়ে সৈনিকটি দাঁড়িয়ে আছে; মুহূর্তের জন্যও আমার থেকে চোখ সরায় না, শুধু চোখ পিট-পিট করে। তাকে ঘুষ দিতেও পারছি না; আমার টাকা পয়সা রয়েছে পাগলটার কাছে। আমার প্রত্যয়-পত্রটা রয়েছে ট্রাংকে; কখনও সেটা ফিরে পাব না-কখনও না।আমি জানি। হায়, আমার কি হবে! আমার জন্য প্রার্থনা করো মাগো, তোমার অসহায় আলফ্রেডের জন্য প্রার্থনা করো। কিন্তু তাও আমার কোন কাজে লাগবে না।"

৪

পরদিন খুব সকালে মেজর যখন আলফ্রেডকে প্রাতরাশে ডেকে পাঠাল তখন তার চেহারা একেবারে ঝড়ো কাকের মত। তারা রক্ষীদের খাওয়াল, সিগারেট ধরাল, মেজরের মুখে আবার খৈ ফুটতে লাগল, আর তারই জাদুর প্রভাবে ধীরে ধীরে আবার আলফ্রেড-এর মনে ভরসা ফিরে এলো, আবার সে আগের মতই হাসিখুসি হয়ে উঠল।

কিন্তু কিছুতেই সে ঘর থেকে বের হতে রাজী হল না। সাইবেরিয়ার ভূত তার কাঁধে চেপে বসেছে; কোন কিছু দেখার বাসনা তার নেই; রাস্তাঘাট, ছবির গ্যালারি, গির্জা-সব কিছু দেখার সময়ই দুই পাশে দুটি সৈনিক খাড়া থাকবে, জগৎসুদ্ধ লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখবে আর নানা মন্তব্য ছুড়ে মারবে-এ অপমান তার সহ্য হবে না। না, সে ঘরেই বসে থাকবে, তার বার্লিনের ডাক এবং স্বীয় নিয়তির জন্য অপেক্ষা করবে। সুতরাং সারাটা দিন মেজরও ঘরের মধ্যে তার পাশে বসেই কাটাল; একটি সৈনিক বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল, নিশ্চুপ, আর অপর সৈনিক বাইরে চেয়ারে বসে সারাক্ষণ ঢুলল; সারাটা দিন প্রধান সঙ্গীটি অভিযানের গল্প বলল, যুদ্ধের বর্ণনা শোনাল, বিস্ফোরক সব কাহিনী বানালো; অদম্য উৎসাহ ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণের সাহায্যে ভয়গ্রস্ত ছাত্রটিকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখল; তার নাড়িটা চালু রাখল। দীর্ঘ দিনটা শেষ হল, রক্ষীসহ দুই সঙ্গী নীচে মস্ত বড় খাবার ঘরে গিয়ে আসন নিল।

বেচারি আলফ্রেড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতীক্ষার শেষ হবে।" ঠিক সেই সময় দু'জন ইংরেজ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন বলল, "তাহলে আজ রাতে আর বার্লিন থেকে কোন চিঠি পাওয়া যাবে না।"

প্যারিস-এর নিঃশ্বাস বন্ধহবার উপক্রম। ইংরেজ দু'জন পাশের টেবিলেই বসল। অপর জন বলল:

"না, অবস্থা ঠিক ততটা খারাপ নয়।" প্যারিস-এর শ্বাসকষ্ট কমল। "পরে টেলিগ্রামে খবর এসেছে। দুর্ঘটনার ফলে ট্রেনটা আটকা

পড়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘন্টা তিনেক দেরিতে আজ রাতেই ট্রেনটা এখানে পৌঁছবে।"

এবার আর প্যারিস মাটিতে পড়ে গেল না, কারণ মেজর সময় মতই লাফ দিয়ে উঠে তাকে ধরে ফেলল। প্যারিসের পিঠ চাপড়ে তাকে চেয়ার থেক তুলে অভয় দিয়ে বলল:

"চলে এস বাবা, মন ভাল রাখ, সত্যি ভয় পাবার কিছু নেই। পথ আমার জানা আছে। পাসপোর্ট নিয়ে মাথা ঘামিও না; সাত দিন দেরী হয় তো হোক না, পাসপোর্ট ছাড়াই চলে যাবে।"

কোন কথাই প্যারিস-এর কানে গেল না; আশা এখন অতীত, বর্তমান শুধু সাইবেরিয়া। পা দুটো যেন শিসের মত ভারী। তাকে ধরে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেজর মার্কিন দূতাবাসে গেল; পথে তাকে আশ্বাস দিল, তার সুপারিশে মন্ত্রী তাকে একটা নতুন পাসপোর্ট দিতে মোটেই দ্বিধা করবে না।

সে বলল, "এ তাসটা সব সময়ই আমার হাতে আছে। মন্ত্রী আমাকে চেনে-ঘনিষ্ঠ ভাবেই চেনে-এক সময় 'কোল্ড হারবার'-এ আরও অনেক আহত সৈনিকের সঙ্গে সে ও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা পাশাপাশি শুয়ে কাটিয়েছি; মুখোমুখি দেখাসাক্ষাৎ খুব বেশী না হলেও সেই থেকে দু'জনের মধ্যে মনে-মনে অনেক দহরম-মহরম। মনে সাহস আনো সোনা, অবস্থা তো বেশ অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে! এই তো এসে পড়েছি, এবার সব দুর্ভাবনার অবসান! অবশ্য দুর্ভাবনার আর কি আছে!"

সর্বকালের সব চাইতে ধনী স্বাধীন ও শক্তিমান প্রজাতন্ত্রের প্রতীকচিহ্নটি দরজার গায়ে আঁকা: বৃত্তাকার পাইন কাঠের উপর পাখা মেলেছে ঈগল; তার মাথা ও গলা রয়েছে তারকাখচিত পশ্চাৎপটের উপরে, আর তার নখে ধরা রয়েছে সেকেলে রণসম্ভার; সে দৃশ্য দেখে আলফ্রেড-এর চোখে জল এল, দেশের জন্য গর্বে ভরে উঠল তার অন্তর, বুকের মধ্যে বেজে উঠল 'জয় কলাম্বিয়া' ধ্বনি, সব ভয় ও দুঃখ দূর হয়ে গেল; কারণ এখানে সে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত! পৃথিবীর কোন শক্তি এ ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে তার গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না।

খরচ বাঁচাবার জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিমান প্রজাতন্ত্রের ইওরোপীয় দূতাবাসের জন্য নেওয়া হয়েছে ন'তলায় দেড়খানা ঘর, দূতাবাসের সদস্যদের মধ্যে আছে একজন মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত যার মাইনে একজন ব্রেকম্যানের সমান, দূতাবাসের একজন সচিব যাকে দেশলাই বেচে ও বাসনপত্র মেরামত করে জীবিকানির্বাহ করতে হয়, একটি ভাড়াটে মেয়ে যাকে দোভাষীর কাজ ও অন্যান্য টুকটাক কাজ করতে হয়; আর আসবাবপত্রের মধ্যে আছে মার্কিন জাহাজের ছবি, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের একখানি প্রতিকৃত, একটা ডেস্ক, তিনটে চেয়ার, কেরোসিন-বাতি, একটা বিড়াল, একটা ঘড়ি, আর "আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস করি" লেখা একটা পিকদানি।

পথ প্রদর্শকের সঙ্গে দু'জন উপরে উঠে গেল। ডেস্কে বসে একজন লোক কি যেন লিখছিল। সে উঠে দাঁড়াল; বিড়ালটা লাফিয়ে নেমে ডেস্কের নীচে ঢুকে গেল; তাদের জায়গা করে দেবার জন্য ভাড়াটে মেয়েটি এক কোণে সরে গেল; সৈনিকরাও বন্দুক ঘাড়ে করে এক কোণে সরে গেল। আলফ্রেড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল; সুখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মেজর পদস্থ কর্মচারীটির সঙ্গে সাদরে কর-মর্দন করল, সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সব কথা বুঝিয়ে বলল, তারপর প্রয়োজনীয় পাসপোর্টের আবেদনটি জানাল।

অতিথিদের বসতে বলে কর্মচারীটি বলল: "দেখুন, আপনি তো জানেন, আমি এই দূতাবাসের সচিব মাত্র; স্বয়ং মন্ত্রী যখন রাশিয়াতে রয়েছেন তখন আমি পাসপোর্ট মঞ্জুর করতে চাই না। এতে অনেক দায়-দায়িত্ব।"

"ঠিক আছে, তাকে ডেকে পাঠান।"

সচিব হেসে বলল: "কথা বলা যত সহজ কাজটা তত সহজ নয়। ছুটি কাটাতে তিনি এখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"হায় স্কট!" মেজর সরবে বলে উঠল।

আলফ্রেড আর্তনাদ করে উঠল; তার মুখ থেকে সব রক্ত মুছে গেল; সে একেবারে ভেঙে পড়ল।সচিব অবাক হয়ে বলল:

"এতে 'হায় স্কট' বলার কি আছে মেজর? প্রিন্স আপনাদের চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। ঘড়ির দিকে তাকান; কোন অসুবিধা নেই; এখনও আধ ঘন্টা সময় আছে; ট্রেন আসার সময়ও হয়ে গেছে; পাসপোর্ট ঠিক সময়ে এসে যাবে।"

"আরে মশায়, খবর আছে, ট্রেনটা তিন ঘন্টা লেটে আসছে। প্রতি মিনিটে ছেলেটার জীবন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আর ত্রিশ মিনিট বাকি! আধ ঘন্টার মধ্যে সে তো মরার সামিল হয়ে মহাকালে মিশে যাবে! ঈশ্বরের দোহাই, পাসপোর্ট আমাদের চাই-ই!"

"আঃ, আমি জানি, আমি মারা যাব!" আর্তনাদ করে ছেলেটি ডেস্কের উপর দুই হাতে মুখ ঢাকল। সচিবের চেহারায় দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল, তার মুখের প্রশান্তি মিলিয়ে গেল, উত্তেজনায় মুখটা লাল হয়ে উঠল; উঁচু গলায় বলে উঠল: "অবস্থা যে কত সাংঘাতিক তাতো বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কি করতে পারি? কি পরামর্শই বা দেব?"

"ধুত্তোর ছাই! পাসপোর্টটা দিয়ে দিন না!"

"অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব! ওর সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না; তিন দিন আগে ওর নামও জানতেন না! এ জগতে ওকে সনাক্ত করবার মত কেউ নেই। ও গেছে-ওকে বাঁচাবার কোন পথ নেই!"

ছেলেটি আর্তনাদ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "প্রভু, প্রভু, এ পৃথিবীতে আলফ্রেড প্যারিস-এর আজই শেষ দিন!"

সচিবের আরও পরিবর্তন দেখা দিল। করুণা, বিরক্তি ও অসহায়তা প্রকাশ করতে করতে হঠাৎ সে থেমে গেল, তার হাবভাব শান্ত হল; একান্ত নির্বিকার গলায় জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি তোমার নাম?"

যুবকটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল-"হ্যাঁ।"

"তুমি কোথা থেকে আসছ?"

"ব্রীজপোর্ট।"

সচিব মাথা নাড়ল-আবার নাড়ল-নিজের মনেই কি যেন বলল। এক মুহূর্ত পরে:

"সেখানেই তোমার জন্ম?"

"না; নিউ হ্যাভেন-এ।"

"আ-হা।" সচিব মেজরের দিকে তাকাল। তারপর যা বলল তার চাইতে ইঙ্গিত করল বেশী। "সৈনিকদের যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে তো ওখানে ভদ্কা আছে।" মেজর লাফ দিয়ে উঠে গ্লাসে ভদ্কা ভর্তি করে সৈনিকদের দিল। তারাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। জেরার পালা চলতে লাগল।

"নিউ হ্যাভেন-এ কত দিন ছিলে?"

"তেরো বছর বয়স পর্যন্ত। ইয়েল-এ ভর্তি হবার জন্য দু'বছর আগে চলে এসেছি।"

"সেখানে যখন ছিলে, কোন্ রাস্তায় বাস করতে?"

"পার্কার স্ট্রীট।"

মেজর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সচিবের দিকে তাকাল। সচিব মাথা নাড়ল। মেজর আবার গ্লাসে ভদ্কা ঢালল।



"কত নম্বর?"

"কোন নম্বর ছিল না।"

বালকটি উঠে বসল। এমন সকরুণ দৃষ্টিতে সচিবের দিকে তাকাল যার অর্থ: "এমনিতেই তো আমার দুঃখের অন্ত নেই, তার উপর আবার এই সব বোকাবোকা প্রশ্ন করে আমাকে ভোগাচ্ছেন কেন?"

সেদিকে নজর না দিয়ে সচিব বলল, "বাড়িটা কি রকম ছিল?"

"ইটের-দোতলা বাড়ি।"

"একেবারে পথের উপরে?"

"না, সামনে ছোট উঠোন আছে।"

"লোহার বেড়া?"

"না, খুঁটির বেড়া।"

বিনা নির্দেশেই মেজর আবার ভদ্‌কা ঢালল-একেবারে ভর্তি করে। তার মুখের সজীবতা ফিরে এসেছে।

"দরজা দিয়ে ঢুকেই কি দেখতে পাওয়া যায়?"

"একটা সংকীর্ণ হল; তার শেষে একটা দরজা, আর আপনার ডান দিকে একটা দরজা।"

"আর কিছু?"

"টুপি রাখবার রেক।"

"ডান দিকের ঘরটা?"

"বসবার ঘর।"

"কার্পেট আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কি রকম কার্পেট?"

"সেকেলে ধরনের উইল্‌সন।"

"তাতে কোন ছবি?"

"হ্যাঁ ঘোড়ার পিঠে বাজপাখি-শিকারী।"

মেজর ঘড়িটার দিকে তাকাল-মাত্র ছ' মিনিট বাকি! গ্লাসে ভদ্‌কা ঢালতে ঢালতে সে একবার সচিবের দিকে, একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। তার চোখে জিজ্ঞাসা। সচিব ঘাড় নাড়ল। মেজর মুহূর্তের জন্য ঘড়িটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা আধ ঘন্টা পিছিয়ে

দিল। তারপর লোকগুলিকে ডবল গ্লাস ভদ্‌কা খাওয়াল।

"হল এবং হ্যাট-রেকের পরের ঘরটা কি?"

"খাবার ঘর।"

"স্টোভ আছে?"

"ঝাঁঝরি?"

"তোমার নিজের লোকেরাই কি বাড়িটার মালিক ছিল?"

"হ্যাঁ?"

"এখনও মালিক আছে?"

"না; ব্রীজপোর্ট-এ চলে যাবার সময়ে বেচে দিয়েছে।"

একটু থেমে সচিব বলল, "খেলার সঙ্গীদের মধ্যে তোমার কি কোন ডাক নাম ছিল?"

যুবকটির বিবর্ণ গালে একটু করে রং লাগছে; সে চোখ নামাল। একটু ইতস্তত করে দুঃখের সঙ্গে বলল, "তারা আমাকে মিস্ ন্যান্সি বলে ডাকত।"

কি যেন ভেবে নিয়ে সচিব আবার একটা প্রশ্ন খুঁজে বের করল।

"খাবার ঘরে কোন অলংকারপাত্র ছিল?"

"মানে-না।"

"না? কিছু ছিল না?"

"না।"

"মুস্কিল হল! এটা একটু অদ্ভুত নয় কি? ভেবে দেখ!"

যুবকটি ভাবতে বসল, আর সচিব উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে বিপন্ন বালকটি বিষণ্ণ চোখ তুলে মাথা নাড়ল।

"ভেবে দেখ-ভেবে দেখ!" গম্ভীর মুখে কথাগুলি বলে মেজর আবার গ্লাস ভর্তি করল।

সচিব বলল, "এবার বল তো, একটা ছবিও কি ছিল না?"

"নিশ্চয় ছিল। কিন্তু আপনি যে বললেন অলংকারপত্র।"

"আচ্ছা! ছবিটা সম্পর্কে তোমার বাবা কি বলতেন?"

আবার রং ফিরে এল। ছেলেটি নীরব।

"কথা বল," সচিব বলল।

"কথা বল," চেঁচিয়ে বলতে গিয়ে মেজর অনেকটা ভদ্কা গ্লাসের বাইরেই ঢেলে ফেলল।

ছেলেটি কোনরকমে বলল, "তিনি কি বলতেন সে-সে কথা আমি বলতে পারব না।"

সচিব বলল, "জলদি! জলদি কর! সময় নষ্ট করো না। নিজের বাড়ি আর মুক্তি, অথবা সাইবেরিয়া আর মৃত্যু-সব নির্ভর করছে তোমার জবাবের উপর।"

"ও, দয়া করুন! তিনি একজন ধর্মযাজক, আর-"

"তাতে কি হয়েছে; ওসব কথা থাক, নইলে-"

"তিনি বলতেন-সে রকম নারকীয়তম দুঃস্বপ্ন তিনি আর কখনও দেখেনি নি!"

"বেঁচে গেলে!" বলেই সচিব তার কলম ও একটা নতুন পাসপোর্ট হাতে নিল। "আমি তোমাকে সনাক্ত করছি; সে বাড়িতে আমি নিজে বাস করেছি, আর সে ছবিটাও আমার নিজের হাতে আঁকা!"

মেজর চেঁচিয়ে বলল, "আহা বাছা আমার, তুমি বেঁচে গেলে; আমার কোলে এস! এই শিল্পীটিকে সৃষ্ট করেছেন বলে আমরা চিরদিন ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব!-অবশ্য যদি সৃষ্টি করে থাকেন।"

১৯০২

একটি দো-নলা গোয়েন্দা গল্প

A Double-Barreled Detective Story

প্রথম দৃশ্য ভার্জিনিয়ার গ্রাম; কাল ১৮৮০। একটি সুদর্শন স্বল্প-উপায়ী যুবক এবং একটি ধনবতী যুবতীর বিয়ে হয়েছে-প্রথম দর্শনেই প্রেম ও তড়িঘড়ি বিয়ে; মেয়েটির বিপত্নীক পিতার ঘোরতর আপত্তি ছিল বিয়েতে।

বর জ্যাকব ফুলারের বয়স ছাব্বিশ বছর; একটি প্রাচীন কিন্তু নগণ্য পরিবারে তার জন্ম; রাজ জেমসের টাকার লোভে পরিবারটি বাধ্য হয়ে সেজ্‌মুর থেকে চলে এসেছিল। কনের বয়স উনিশ, দেখতে সুন্দরী। মেয়েটি যেমন রোম্যান্টিক তেমনই অভিজাত বংশ-গৌরবে গর্বিত, আবার স্বামীকে ভালও বাসে তীব্র অনুরাগে। ভালবাসার জন্য সে বাবার অসন্তোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তাঁর ভর্ৎসনা সহ্য করেছে, অবিচলিত আনুগত্যের সঙ্গে তাঁর সব সাবধান-বাণী মন দিয়ে শুনেছে, তাঁর আশীর্বাদ ছাড়াই বাড়ি থেকে চলে এসেছে, অন্তরের ভালবাসার গভীরতার এই সব প্রমাণ দিতে পেরে সুখী ও গর্বিত বোধ করেছে।

বিয়ের পরদিন সকালেই সে একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত পেল। তার সব রকম আদরকে উপেক্ষা করে স্বামী বলল:

"বস, তোমাকে কিছু কথা বলার আছে। আমি তোমাকে ভালবাসতাম। সেটা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিতে তোমার বাবাকে অনুরোধ করবার আগেকার কথা। তাঁর আপত্তি আমার দুঃখের কারণ নয়-সেটা আমি সইতে পারতাম। কিন্তু আমার সম্পর্কে তিনি তোমাকে যা বলেছেন-সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। না-তোমাকে কিছু বলতে হবে না; সে কথা আমি ভাল করেই জানি, খুব নির্ভরযোগ্য সূত্রেই আমি সে সব কথা জেনেছি। অন্য অনেক কথার মধ্যে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, আমার মুখেই আমার চরিত্র লেখা আছে; আমি বিশ্বাসঘাতক, কপটাচারী, ভীরু, করুণা বা সহানুভূতিহীন একটা পশু: 'সেজমুরের ছাপ' নাকি আছে আমার মুখে। আমার অবস্থায় পড়লে অন্য কোন লোক সোজা তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে কুকুরের মত গুলি করে মারত। আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম; মনস্থিরও করেছিলাম; পরে আরও ভাল একটা মতলব মাথায় এল: তাঁকে অপমান করব, তাঁর মন ভেঙে দেব; তিলে তিলে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব। কি করে তা করব? তোমার প্রতি ব্যবহারের দ্বারা, তুমি যে তাঁর প্রাণের পুতুলী! আমি তোমাকে বিয়ে করব; তারপর-ধৈর্য ধরে থাক! সব দেখতে পাবে।"

সেই মুহূর্ত থেকে তিন মাস ধরে দৈহিক পীড়ন ছাড়াও স্বামীটির পরিশ্রমী উদ্ভাবনী মন যত রকম অসম্মান ও নির্যাতন আবিষ্কার করতে পেরেছে তরুণী বধূটি সে সব সহ্য করেছে। তার প্রখর গর্ববোধই তাকে সাহায্য করেছে, সব কথা সে গোপন রেখে চলেছে। মাঝে মাঝেই স্বামী বলত, "বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলে দিচ্ছ না কেন?" তারপর নতুন নতুন নির্যাতনের উপায় বের করে আবার সেই একই কথা বলেছে। বধূটি বারবার একই জবাব দিয়েছে, "আমার মুখ থেকে তিনি কিছুই জানতে পারবেন না," আর তার পরেই যুবকটির বংশ নিয়ে বিদ্রূপ করেছে; বলেছে, সে তো দাস-বংশের আইনসম্মত দাসী, তাই সবই সে সহ্য করবে, মানবে, কিন্তু ওই পর্যন্তই তার বেশী নয়; ইচ্ছা করলে স্বামী তাকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু তাকে নোয়াতে পাবে না; সেজ্‌মুর-বংশের সাধ্যে তা কুলোবে না। তিন মাস পার হয়ে গেলে কালো মুখ করে স্বামী একদিন বলল, "সব রকম চেষ্টা করে দেখেছি, শুধু একটি বাদে"-তারপর জবাবের জন্য অপেক্ষা করে রইল। স্ত্রী বলল, "বেশ তো, সেটাই চেষ্টা করে দেখ," তার ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকা হয়ে গেল।

সেদিন মাঝ রাতে উঠে স্বামীটি পোশাক পরে স্ত্রীকে বলল:

"ওঠ, পোশাক পরে নাও!"

কোন কথা না বলে বধূটি আগের মতই তার কথামত কাজ করল। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে গিয়ে বড় রাস্তার পাশে একটা গাছের সঙ্গে স্ত্রীকে বেঁধে স্বামী তাকে চাবুক মারতে লাগল, আর বধূটিও চীৎকার করতে শুরু করল। সে তখন স্ত্রীর মুখটা বন্ধ করে দিয়ে গরুর চামড়ার চাবুক চালাতে লাগল তার মুখে আর লোভী শিকারী কুকুরগুলো লেলিয়ে দিল তার দিকে। কুকুরগুলো তার কাপড় টেনে খুলে ফেলল। তখন কুকুরগুলোকে ডেকে নিয়ে সে বলল:

"যাতায়াতের পথে সব লোক তোমাকে দেখতে পাবে। এখন থেকে প্রায় তিন ঘন্টা পরে এ পথে লোক চলাচল করবে, আর তারাই সংবাদটা ছড়িয়ে দেবে-শুনতে পাচ্ছ? বিদায়। এই আমার শেষ দাওয়াই।"

সে চলে গেল। বধূটি গোঙাতে গোঙাতে আপন মনেই বলল:

"আমার একটি সন্তান হবে-তারই সন্তান। ঈশ্বর করুন সে সন্তান যেন ছেলে হয়!"

যেমন হয়ে থাকে, এক সময় কৃষকরা তাকে মুক্ত করে দিল এবং সংবাদটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশ যুবকটিকে শাস্তি দিতে ছুটল, কিন্তু ততক্ষণে পাখি উড়ে গেছে। তরুণী বধূটি বাবার বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে রইল; বাবাও নিজেকে লুকিয়ে রাখল; কারও সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করত না। তার অহংকার চূর্ণ হয়েছে, বুক ভেঙে গেছে। দিনের পর দিন তার শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল; এমন কি মৃত্যু এসে যেদিন তাকে সব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিল সেদিন তার মেয়েও খুসি হয়েছিল।

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে মেয়েটি উধাও হয়ে গেল।

২

১৮৮৬-তে নিউ ইংলণ্ডের একটি গ্রামের একটা সাধারণ বাড়িতে একটি যুবতী নারী একটি বছর পাঁচেকের ছেলেকে নিয়ে বাস করছিল। নিজেই নিজের সব কাজ করত, কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করত না, বন্ধুবান্ধবী কেউ ছিল না। কসাই, রুটিওয়ালা ও আর যারা স্ত্রীলোকটির কাজ করে দিত তারাও গ্রামবাসীদের শুধু এইটুকুই বলতে পারত যে স্ত্রীলোকটির নাম স্টিলম্যান, আর ছেলেটিকে সে ডাকে আর্চি বলে। সে কোথা থেকে এসেছে তা কেউ জানে না, তবে তার কথাবার্তায় একটা দক্ষিণী টান আছে। মা ছাড়া ছেলেটির কোন খেলার সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, শিক্ষয়িত্রী নেই। সে কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া শেখাত, ফলাফল দেখে খুসিই ছিল-এমন কি কিছুটা গর্ববোধও করত। একদিন আর্চি বলল:

"মামণি, আমি কি অন্য ছেলেদের থেকে আলাদা?"

"না তো! কিন্তু কেন বল তো?"

"একটি মেয়ে এদিক দিয়ে যেতে যেতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ডাক-পিয়ন এসেছিল কি না; আমি বললাম হ্যাঁ; সে তখন বলল, কতক্ষণ আগে আমি তাকে দেখেছি; আমি বললাম, আমি তাকে মোটেই দেখি নি; তখন সে বলল, তাহলে আমি জানলাম কেমন করে ডাক-পিয়ন এসেছিল; আমি বললাম, আমি যে গলিতে তার চলার গন্ধ পেয়েছি: তখন সে বলল যে আমি একটা আকাট মুখখু, আর আমাকে মুখ ভেঙ্চে দিল। সে ও রকম করল কেন?"

যুবতীটি সাদা হয়ে গেল; নিজের মনে মনে বলল, "এটা জন্ম-লক্ষণ! রক্তলোভী শিকারী কুকুরের প্রকৃতি-দত্ত শক্তি এর মধ্যে আছে।" ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে এনে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, "ঈশ্বরই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন!" তার দুই চোখ ঝক্ঝক্ করে জ্বলতে লাগল, উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। নিজেকেই বলল: এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়েছে; অন্ধকারে ছেলেটি যে সব কাজ করত এতদিন সেটা আমার কাছে রহস্যময় ছিল, কিন্তু আজ সবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।"

তাকে ছোট চেয়ারটায় বসিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল:

"আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর সোনা; তারপর সব কথা বলব।"

নিজের ঘরে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিল থেকে কতকগুলি টুকিটাকি জিনিস নিয়ে সেগুলিকে লুকিয়ে রাখল: নখ-ঘসার উখোটাকে রাখল মেঝেতে বিছানার নীচে; এক জোড়া নখ-কাটার কাঁচি রাখল বুরোটার নীচে; একটা ছোট হাতির দাঁতের কাগজ-কাটা ছুরি রাখল কাপড়ের আলমারির তলায়। তারপর ফিরে গিয়ে বলল:

"এই যা! কয়েকটা জিনিস ফেলে এলাম যে! জিনিসগুলোর নাম উল্লেখ করে বলল, "যাও তো সোনা, ওগুলো নিয়ে এস।"

ছেলেটা ছুটে চলে গেল এবং একটু পরেই জিনিসগুলি নিয়ে ফিরে এল।

"কোন অসুবিধা হয়েছিল কি সোনা?"

"না মামণি; তুমি যেখানে যেখানে গিয়েছিলে আমিও সেখানে সেখানে গিয়েছি।"

ছেলেটির অনুপস্থিতিতে সে বুক-কেসের কাছে গেল, নীচের তাক থেকে খানকয় বই নিল, প্রত্যেকটি বই খুলে একটা পাতার উপর হাত বুলিয়ে পৃষ্ঠা-সংখ্যাটা মনে করে রাখল, এবং তার পর বইগুলোকে যথাস্থানে রেখে দিল। এক সময় বলল, "দেখ আর্চি, তুমি যখন এখান থেকে চলে গিয়েছিলে তখন আমি কিছু কাজ করেছি। সেটা কি কাজ আমাকে বলতে পার?"

ছেলেটি বুক-কেসের কাছে গেল, যে বইগুলোতে হাত দেওয়া হয়েছিল সেগুলো টেনে বের করল, আর বই খুলে ঠিক সেই পাতাগুলি বের করল।

মা তাকে কোলে নিয়ে বলল:

"এবার তোমার প্রশ্নের জবার দেব সোনা। আমি বুঝতে পেরেছি, একদিন থেকে তুমি অন্য ছেলেমেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি অন্ধকারে দেখতেও পাও, অন্য লোকে পারে না এমন গন্ধ শুঁকতে পার, একটা রক্তলোভী শিকারী কুকুরের শক্তি আছে তোমার মধ্যে। শক্তিটা মূল্যবান, থাকা ভাল, কিন্তু কথাটা তুমি গোপন রাখবে। লোকে টের পেয়ে গেলে তোমাকে বলবে আজগুবি ছেলে, অদ্ভুত ছেলে, অন্য ছেলেরা তোমাকে পছন্দ করবে না, তোমাকে আজে-বাজে নামে ডাকবে। অন্যের ঘৃণা বা ঈর্ষাকে এড়াতে হলে এ পৃথিবীতে তোমাকেও অন্য সকলের মতই হতে হবে। তোমার মধ্যে যে শক্তি জন্ম নিয়েছে সেটা ভাগ্যের কথা, আর সেজন্য আমি খুসি; কিন্তু মামণির জন্য কথাটা তুমি গোপন রাখবে; রাখবে তো?"

না বুঝে শুনেই ছেলেটি কথা দিল।

তারপর সারাটা দিন মায়ের মাথার ভিতরটা উত্তেজনায় কিলবিল করতে লাগল; কত মতলব, কত ফন্দি, কত পরিকল্পনা; সবই উদ্ভট, অস্বাভাবিক, ভয়ংকর। তথাপি তাতেই তার মুখটা জ্বলজ্বল করতে লাগল; একটা নারকীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসল; সে স্থির হয়ে বসতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না, পড়তে পারে না, সেলাই করতে পারে না; অনবরত চলে বেড়ানো ছাড়া কিছুতেই স্বস্তি নেই। ছেলের শক্তিকে সে বিশ রকমভাবে পরীক্ষা করে দেখল, আর সারাক্ষণই অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে বলতে লাগল: সে আমার বাবার বুকখানা ভেঙে দিয়েছিল, আর এতকাল ধরে দিন রাত আমি বৃথাই খুঁজে মরেছি, কেমন করে তার বুকটা ভেঙে দিতে পারব। আজ পথ খুঁজে পেয়েছি-পথ খুঁজে পেয়েছি।"

রাত হল। অস্থিরতার শয়তান তখনও তাকে ভর করে আছে। আরও পরীক্ষা সে করবে। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে সে বাড়ির নীচের তলা থেকে চিলে-কোঠা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর পিন, সুচ, অঙ্গুলিত্রাণ, সুতোর গুলি,-সব কিছু লুকিয়ে রাখল বালিশের নিচে, কার্পেটের নীচে, দেয়ালের খাঁজে, কয়লার পাত্রের নীচে; তারপর ছোট ছেলেটিকে অন্ধকারে পাঠিয়ে দিল সে সব খুঁজে বের করতে। খুঁজে সে বেরও করল; তাই দেখে মা যখন তার প্রশংসা করতে লাগল, আদর করতে লাগল, তখন সেও খুসি হল, গর্ববোধ করল।

সেই দিন থেকে স্ত্রীলোকটির জীবনের রূপই বদলে গেল। সে বলল, "ভবিষ্যৎ নিরাপদ-এখন আমি অপেক্ষা করতে পারি, আর সে প্রতীক্ষাকে উপভোগ করতে পারি। জীবনের সব রস বুঝি ফিরে এল। সে আবার গান গাইতে শুরু করল; ভাষা শেখা, ছবি আঁকা, প্রভৃতি কুমারী জীবনের সে সব সাধ-আহ্লাদা সে অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছিল সে সব কিছুতেই আবার নতুন করে হাত দিল। আবার সুখ ফিরে এল; ফিরে এল জীবনের স্বাদ। বছর পার হতে লাগল, ছেলেও বড় হতে লাগল, আর তাই দেখে সেও খুসি হয়ে উঠল।

অনেক বছর পার হয়ে গেল। আর্চি এখন সৌম্য, সুদর্শন, সুঠাম যুবক; খেলাধূলায় পারদর্শী, ভদ্র, মর্যাদাসম্পন্ন, রুচিবান; বয়সের তুলনায় কিছুটা বড় দেখায়। বয়স ষোল বছর। একদিন সন্ধ্যায় মা তাকে বলল, একটা গুরুতর কথা তাকে বলবার আছে; সে কথা শুনবার মত বয়স তার হয়েছে; বেশ কয়েক বছর ধরে সে ভয়ংকর পরিকল্পনাকে সে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে তাকে বাস্তবে রূপ দেবার মত বয়স ও চরিত্রের অধিকারীও সে হয়েছে। তখন সে খোলাখুলিভাবেই তার তিক্ত কাহিনী ছেলেকে শোনাল। কিছুক্ষণের জন্য ছেলেটি বিমূঢ়ের মত কাটাল। তারপর বলল:

"বুঝতে পেরেছি। আমরা দক্ষিণী; আমাদের রীতিতে ও প্রকৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের একটি মাত্র পথ আছে। আমি তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করব।"

"হত্যা করবে? না! মৃত্যু তো মুক্তি, মোক্ষলাভ; মৃত্যু তো তার প্রতি করুণা। তাকে আমি করব করুণা? তার মাথার একগাছি চুলেও তুমি হাত দিতে পারবে না।"

ছেলেটি নিজের চিন্তায়ই ডুবে গিয়েছিল; এবার বলল:

"তুমি আমার পৃথিবী; তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে বিধান, আমার সুখ। তুমি বলে দাও কি করতে হবে, আমি তাই করব।"

মায়ের চোখ দুটি খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বলল:

"তুমি যাও, তাকে খুঁজে বের কর। এগারো বছর ধরে সে কোথায় লুকিয়ে আছে আমি জানি; পাঁচ বছর ধরে তাকে খুঁজেছি, অনেক অর্থ ব্যয় করেছি, তবে তার সন্ধান পেয়েছি। কলোরাডোতে সে এখন আগ্নেয়শিলার খনির মালিক; প্রভূত বিত্তশালী। ডেন্‌ভার-এ থাকে। নাম জ্যাকব ফুলার। দেখ-সেই অবিস্মরণীয় রাতের পর এই প্রথম আমি এ কথা বলছি। ভেবে দেখ! ঐ নাম তোমারও হতে পারত। আমি তোমাকে দিয়েছি পরিচ্ছন্ন জীবন, তোমাকে রক্ষা করেছি সেই লজ্জার হাত থেকে। সেখান থেকে তাকে তুমি তাড়াবে; তার পিছনে ধাওয়া করে আবার তাড়াবে, আবার, আবার, আবার, অনবরত, প্রতিনিয়ত তাকে তাড়া করে ফিরবে; তার জীবনকে বিষময় করে তুলবে, রহস্যময় আতংকে ভরে তুলবে, শ্রান্তি ও দুর্দশার শেষ সীমায় ঠেলে দেবে; সে যেন মৃত্যুকে কামনা করে, যেন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়; তাকে এক চির-পথিক ইহুদিতে পরিণত করবে; জীবনে সে বিশ্রাম পাবে না, মনে শান্তি পাবে না, নিশ্চিত ঘুম আসবে না তার চোখে; ছায়ার মত তুমি তাকে অনুসরণ করবে, তার পিছনে লেগে থাকবে, তাকে নির্যাতন করবে, আর যে ভেবে সে আমার বাবার ও আমার বুক ভেঙে দিয়েছে সেই ভাবে তার বুকটাও ভেঙে দেবে।"

"তোমার কথামতই আমি কাজ করব মা।"

"আমি তা জানি বাবা। আয়োজন সমাপ্ত; সব কিছু প্রস্তুত। এই নাও প্রত্যয়-পত্র; ইচ্ছামত খরচ কর; টাকার অভাব নেই। কখনও কখনও তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হতে পারে; সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি; আরও অনেক রকম সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে।"
টাইপরাইটার-টেবিলের টানা থেকে কয়েক পাতা কাগজ বের করল। সব কটাতেই এই কথাগুলিই টাইপ করা হয়েছে:

১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার

যতদূর জানা গেছে, এমন একটা লোক এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে যাকে কোন পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রে খোঁজ করা হচ্ছে। ১৮৮০-র রাত্রিকালে সে তার তরুণী স্ত্রীকে বড় রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে গরুর চামড়ার চাবুক দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তার পোশাক ছিঁড়ে নেয়, তাকে উলঙ্গ করে রাখে। তরুণীটিকে সেইখানে রেখে সে দেশ থেকে পালিয়ে যায়। মেয়েটির রক্ত-সম্পর্কের কোন একজন সতেরো বছর ধরে তাকে খুঁজছে। ঠিকানা... ... ..., ডাকঘর। উক্ত সন্ধানকারীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কেউ যদি অপরাধীর ঠিকানা জানাতে পারে, তাহলে তাকে উপরোক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

"তুমি যখন তাকে খুঁজে পাবে, তার কিছু খোঁজ-খবরও জানতে পারবে, তখন আমরা রাত্রিবেলা গিয়ে তার বাড়িতে একটা প্ল্যাকার্ড মারব, এবং ডাক-ঘরে অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে আর একটা প্ল্যাকার্ড মেরে দেব। এই কথা নিয়ে সকলেই আলোচনা করবে। প্রথমে তাকে কয়েক দিন সময় দেবে যাতে তার জিনিসপত্রগুলি সে অল্প দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আমরা তাকে ধ্বংস করব, কিন্তু একটু একটু করে; একবারেই তাকে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেব না, কারণ তাতে তার মনে নৈরাশ্য দেখা দেবে, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে, হয় তো বা তার মৃত্যু ঘটবে।"

আর তিন-চারখানা টাইপ-করা কাগজ-একই প্রতিলিপি-টানা থেকে বের করে সে পড়তে লাগল:

জ্যাকব ফুলারকে:

সব কিছু মিটিয়ে ফেলবার জন্য তোমাকে......দিন সময় দিচ্ছি। ততদিন পর্যন্ত তোমাকে বিরক্ত করব না।......মাসের.....তারিখ......টা বাজলেই সেই সময় পার হয়ে যাবে। তখনই তোমাকে চলে যেতে হবে। উল্লেখিত সময়ের পরেও যদি তুমি সেখানে থাক, তাহলে সব দেয়ালে তোমার নামে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে দেব, তাতে থাকবে তোমার অপরাধের বিবরণ, তার ঘটনাস্থল ও তারিখ, এবং তোমার নামসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নাম। দৈহিক আঘাতের ভয় করো না, কোন অবস্থাতেই সে রকম আঘাত তোমাকে করা হবে না। একটি বৃদ্ধ মানুষকে তুমি কষ্ট দিয়েছ, তার জীবনটা নষ্ট করেছ, তাঁর বুক ভেঙে দিয়েছ। যে কষ্ট তিনি সয়েছেন, সেই কষ্ট তোমাকে সইতে হবে।

"তোমার নাম স্বাক্ষর করো না। সকলে ঘুম থেকে ওঠার আগে পুরস্কারের ঘোষণাটা জানবার আগেই তাকে এই প্ল্যাকার্ডটা পেতে হবে-নইলে তার মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।"

"আমার ভুল হবে না।"

"শুরুতে এই সব লেখা তোমার দরকার হবে-একবার হলেই যথেষ্ট। পরে যখন তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, তখন তাকে নতুন যে সব কাগজ ধরিয়ে দেবে তাতে শুধু লেখা থাকবে:

এখান থেকে চলে যাও। তোমার হাতে আছে......দিন।

সেই কথামতই সে চলবে। সেটা নিশ্চিত।"

৩

মাকে লেখা কয়েকটা চিঠির অংশবিশেষ:

ডেন্‌ভার, এপ্রিল ৩, ১৮৯৭

কয়েকদিন যাবৎ জ্যাকব ফুলার-এর সঙ্গে এক হোটেলেই আমি আছি। তার গন্ধ শুঁকে নিয়েছি; দশ ডিভিশন পদাতিক সৈন্যের ভিতর থেকেও তাকে আমি খুঁজে বের করতে পারব। অনেক সময়ই তার খুব কাছাকাছি গিয়েছি, তাকে কথা বলতে শুনেছি। সে একটা ভাল খনির মালিক; খনি থেকে তার উপার্জনও ভাল; কিন্তু সে ধনী নয়। খনির কাজ সে ভালভাবে শিখেছে-খনির মজুর হয়ে কাজ করেছে। লোকটা হাসিখুসি; তেতাল্লিশ বছর বয়স তাকে কাবু করতে পারে নি; তাকে দেখলে বয়স অনেক কম বলেই মনে হয়-ধরো ছত্রিশ বা সাঁইত্রিশ। আর বিয়ে করে নি, বিপত্নীক বলেই নিজের পরিচয় দেয়। সে ভালই আছে; সকলে পছন্দ করে, জনপ্রিয়, আর অনেক বন্ধুবান্ধবও আছে। এমন কি আমি নিজেও যেন তার প্রতি একটা টান অনুভব করছি-আমার মধ্যে যে পিতৃরক্ত আছে সে যেন কথা বলতে চাইছে। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন কত অন্ধ যুক্তিহীন আর খেয়ালী। আমার কাজ এখন কঠিন হয়ে উঠছে-বুঝতে পারছ তো?-ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করছ তো?-আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বুকের আগুন যেন অনেক ঠান্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি কাজ চালিয়েই যাব। কাজের সুখ কমে গেলেও কর্তব্য তো রয়েছে; আমি তাকে ছেড়ে দেব না।

যখনই ভাবি যে এত বড় জঘন্য অপরাধ করেছ একমাত্র সেই তার জন্য কোন কষ্ট ভোগ করে নি এখনই একটা তীব্র ক্ষোভ আমার মধ্যে জেগে ওঠে। স্পষ্টতই জীবনের শিক্ষা তার চরিত্রকে সংশোধন করেছে, আর সেই পরিবর্তনের ফলে আজ সে সুখী। অপরাধ করেছে সে অথচ সেই অব্যাহতি পেয়েছে সব যন্ত্রণার হাত থেকে; আর নির্দোষ হয়েও যন্ত্রণায় তুমি দগ্ধ হচ্ছ। কিন্তু তুমি আশ্বস্ত থাকো-তার পাপের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

সিল্‌ভার গুল্‌চ্‌, ১৯ মে

এপ্রিলের ৩ তারিখ মাঝরাতে ১নং কাগজটা ঝুলিয়ে দিয়েছি; এক ঘণ্টা পরে ২নং কাগজটা তার ঘরের দরজার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি; তাতে জানিয়ে দিয়েছি, ১৪ই রাত ১১-৫০ মিনিটে বা তার আগে তাকে ডেন্‌ভার ছেড়ে চলে যেতেহবে।

সংবাদপত্রের জনৈক প্রতিবেদক বিলম্বে আসা পাখির মত আমার একটা প্ল্যাকার্ড চুরি করে এবং সারা শহর খুঁজে আরও একটা পেয়ে সেটাও চুরি করে। এইভাবে খবরের কাগজের ভাষায় যাকে "স্কুপ" বলে তাই সে করে, অর্থাৎ একটা দামী সংবাদ বানিয়ে ফেলে, আর অন্য কোন কাগজ যাতে সেটা না পায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। এইভাবে তার কাগজ- শহরের এটাই বড় কাগজ-পরদিন সকালে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় খবরটা বড় বড় অক্ষরে ছেপেছে, আমাদের অভাগা লোকটি সম্পর্কে এক কমলব্যাপী অগ্নুদগার করেছে এবং আমাদের ঘোষণা করা এক হাজার ডলার পুরস্কার যে তার কাগজের হিসাবেই জমা পড়বে এই মন্তব্য করে শেষ করেছে! ব্যবসার খাতিরে কোন্ কাজ কি ভাবে করতে হয় এখানকার সংবাদপত্রগুলি সেটা ভালই জানে।

প্রাতরাশের সময় আমার নির্দিষ্ট আসনটিতে গিয়ে বসলাম-এই আসনটি আমি বেছে নিয়েছি কারণ এখান থেকে বাবা ফুলার-এর মুখটা ভাল দেখা যায় আর তার টেবিলে কোন কথা হলে তাও শোনা যায়। পঁচাত্তর থেকে একশ' জন লোক ছিল ঘরে; সকলের মুখেই ঐ এক আলোচনা; সকলেই আশা করছে যে, অনুসন্ধানকারী রাস্কেলটাকে খুঁজে পাবে এবং লোহার গরাদে, বা বুলেট, বা অন্য কিছুর সাহায্যে তার উপস্থিতির নোংরামির হাত থেকে শহরটাকে বাঁচাবে।

ফুরাল যখন ঢুকল তখন এক হাতে ভাঁজ করা ছিল শহর ছাড়বার নির্দেশটা, আর অন্য হাতে ছিল খবরের কাগজ; তাকে দেখে আমার বেশ কষ্ট হল। কোথায় গেল সেই হাসিখুসি ভাব; সে যেন বুড়িয়ে গেছে, ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। আর তারপরই-ভেবে দেখ কী সব কথা তার কানে আসতে লাগল! মামণি, তার নিজের বন্ধুরাই অজান্তে এমন সব ভাষায় তারই বর্ণনা দিতে লাগল যা একমাত্র শয়তানের নিজস্ব শব্দ-কোষেই পাওয়া যায়। তার চাইতেও বড় কথা, সেই সব বাণী তাকে হজম করতে হয়েছে। সে জন্য সকলকে প্রশংসাও করতে হয়েছে। সে প্রশংসা যে তার নিজের মুখে তেতো লেগেছে সেটা আমার চোখকে এড়ায় নি। আরও দেখলাম, তার ক্ষিধে পর্যন্ত চলে গেছে; শুধু নাড়াচাড়াই করল, কিছুই খেল না। শেষ পর্যন্ত একজন বলল:

"এটা খুবই সম্ভব যে আত্মীয়টি এই ঘরেই আছেন এবং সেই অখাদ্য বদমাশটা সম্পর্কে এই শহর কি ভাবছে তাও শুনছেন। আমি তো তাই আশা করছি।"

মাগো, ফুলার যে ভাবে কুঁকড়ে গেল এবং ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল, তা দেখলে সত্যি কষ্ট হয়। সে আর সইতে না পেরে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

কয়েক দিনের মধ্যেই সে প্রচার করে দিল, মেক্সিকোতে একটা খনি কিনেছে; তাই নিজে সেই সম্পত্তি দেখাশুনা করবার জন্য এখানকার সবকিছু বেচে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে চলে যাবে। খেলাটা সে ভালই খেলল; জানাল, দাম হিসাবে সে ৪০,০০০ পাউন্ড নেবে-চার ভাগের এক ভাগ নগদে এবং বাকিটা নিরাপদ নোটে; কিন্তু যেহেতু নতুন সম্পত্তিটা কিনতে অনেক টাকার দরকার তাই সবটা নগদে পেলে সে দামটা কমিয়ে দেবে। ৩০,০০০ পাউন্ডে সে বেচে দিল, তার তারপরে কি করল বল তো? সে দামটা চাইল 'গ্রীণব্যাক-এ' (প্রচলিত কাগজের নোট) আর নিলও তাই; বলল, মেক্সিকোর একজন নিউ-ইংল্যাণ্ডার, তার মাথায় গোবর ভর্তি, সোনা বা ড্রাফ্‌টের পরিবর্তে সে 'গ্রীণব্যাক'ই পছন্দ করে। লোকে ভাবল ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, কারণ নিউ ইয়র্কের উপর ড্রাফ্‌ট্ থাকলে সহজেই তাকে 'গ্রীণব্যাক'-এ পরিবর্তিত করা যায়। এ নিয়ে অনেক কথা হল, কিন্তু সে ঐ একদিনের জন্য; অর্থাৎ ডেন্‌ভার-এ একটা বিষয় নিয়ে যতক্ষণ আলোচনা চলে থাকে।

সারাক্ষণই আমি কড়া নজর রেখেছিলাম। বিক্রির ব্যাপারটা পাকা হয়ে দেনাপাওনা যেই মিটে গেল-সেটা ১১ই তারিখের কথা-অমনি আমি ফুলারের পিছনে লেগে রইলাম, মুহূর্তের জন্যও তাকে চোখের আড়াল করলাম না। সেই রাতেই-না, ১২ই তারিখ মাঝ রাতের কিছু পরে-তার পিছু নিয়ে তার ঘরটার সন্ধান করলাম; ঘরটা বাড়ির একই অংশে আমার ঘর থেকে চারটে দরজা পরে; তারপর আমার ঘরে ফিরে গেলাম, দিন-মজুরের ধুলো-মাখা ছদ্মবেশটা নিলাম, গায়ের রং কালো করে ফেললাম, এবং কিছু ভাঙানি-ভর্তি একটা ছোট থলে নিয়ে ঘরের দরজাটা হাট করে খুলে রেখে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে বসে রইলাম। কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল যে পাখি এখনই পাখা মেলবে। আধ ঘন্টা পরেই একটি বুড়ি একটা থলে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপার বুঝতে পেরে আমার থলে নিয়ে তার পিছু নিলাম, কারণ ঐ বুড়িটাই ফুলার। পাশের দরজা দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় পৌঁছে সে এমন একটা পথ ধরল যে পথে লোকজনের চলাচল খুবই কম। ঝিরঝির বৃষ্টি ও গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ পথ চলে সে একটা দুই-ঘোড়ার ছেকড়া গাড়িতে চেপে বসল। গাড়িটা অবশ্যই পূর্ব-ব্যবস্থা মত তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করেই ছিল। আমিও পিছনের পা-দানিতে চেপে বসলাম (বিনা নিমন্ত্রণে) এবং ছুটে এগিয়ে চললাম। দশ মাইল চলবার পরে ছেকড়া গাড়িটা পথের পাশে একটা স্টেশনে থামল। সেখানেই

গাড়িটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। ফুলার সামিয়ানার নীচে একটা ঠেলাগাড়িতে আশ্রয় নিল। আমি ভিতরে ঢুকে টিকিট-ঘরের খোঁজ করলাম। ফুলার টিকিট কিনল না, আমিও কিনলাম না। ইতিমধ্যে ট্রেন আসতেই সে একটা কামরায় উঠে পড়ল; আমিও অন্য দিক দিয়ে সেই একই কামরায় উঠে পাশ দিয়ে এসে তার পিছনেই একটা আসনে বসে পড়লাম। সে যখন কণ্ডাক্টরকে টাকা দিয়ে তার গন্তব্যস্থানের কথা জানাল, তখন আমি কয়েকটা আসন পিছনে সরে গিয়ে বসলাম এবং কণ্ডাক্টর এলে সেই একই জায়গার টিকিট কাটলাম। জায়গা প্রায় একশ' মাইল পশ্চিমে।

সেই থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আমাকে নাচিয়ে বেড়াতে লাগল। এখানে, সেখানে, যেখানে খুসি যাচ্ছে; তবে সব সময়ই গতিটা পশ্চিম দিকে-আর প্রথম দিনের পর থেকেই সে আর স্ত্রীলোক নেই। সেও আমার মতই একজন মজুর সেজেছে, আর মোটা নকল গোঁফ লাগিয়েছে। সাজ-পোশাক একেবারে খাঁটি, আর অভিনয়ও করে চলল পাকা, কারণ পয়সার বিনিময়ে এ কাজ সে একসময় করেছে। নিকটতম বন্ধুও তখন তাকে দেখলে চিনতে পারত না। অবশেষে সে এখানে-মন্টানার এই অজ্ঞাত ছোট পাহাড়ী শিবিরে এসে আস্তানা গেড়েছে। একটা ছোট ঘর নিয়েছে; সারা দিন খনির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়; লোকজনকে এড়িয়ে চলে। আমি থাকি খনি-মজুরদের একটা বোর্ডিং-হাউসে; ভয়াবহ জায়গা; তক্তপোষ, খাবার, নোংরা-সবই সাংঘাতিক।

চার সপ্তাহ হল আমরা এখানে আছি; এর মধ্যে মাত্র একদিন তাকে দেখেছি; কিন্তু প্রতি রাতেই আমি তার পিছু নেই এবং ঘাপটি মেরে থাকি; যেই সে এখানে একটা ঘর নিল অমনি আমি পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা শহরে গিয়ে টেলিগ্রাম করে ডেন্‌ভার হোটেলকে জানিয়ে দিলাম যে আমি চেয়ে না পাঠানো পর্যন্ত আমার মালপত্র যেন সেখানেই রেখে দেওয়া হয়। শুধু সামরিক পোশাকটা পাল্টানো ছাড়া এখানে আর কিছু আমার দরকার নেই, আর সে পোশাক আমি সঙ্গেই এনেছি।

সিলভার গুল্‌চ্‌, ১২ জুন

মনে হচ্ছে ডেন্‌ভার-এর ঘটনার সংবাদ এখানে পৌঁছয় নি। শিবিরের অধিকাংশ লোককে আমি চিনি; তারা কেউই সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে নি; অন্তত আমি তো শুনি নি। এ অবস্থায় ফুলার নিজেকে খুবই নিরাপদ মনে করছে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে পাহাড়ের মধ্যে একটা একটেরে জায়গায় একটা খনির খোঁজ সে পেয়েছে, আর সেখানেই দিন রাত কাজ করে চলেছে। কিন্তু কী পরিবর্তন তার হয়েছে! কখনও হাসে না, নিজের মনেই চলাফেরা করে, কারও সঙ্গে মেশে না-অথচ দু'মাস আগেও সে লোকজন কত ভালবাসত, কত ফূর্তিতে ছিল। সম্প্রতি কয়েক দিনই তাকে পথ দিয়ে যেতে দেখেছি- কেমন যেন ঝুঁকে পড়েছে, সর্বদাই সঙ্গীহীন, চলনে সেই সজীবতা নেই, দেখলে দুঃখ হয়। নিজের পরিচয় দেয় ডেভিড উইল্‌সন বলে।

আমরা কোন রকম বিরক্ত না করলে সে এখানেই থাকবে বলে মনে হচ্ছে। যেহেতু তুমি বারবার বলছ, তাই আমি আবার তাকে এখান থেকে তাড়াব; কিন্তু এখন সে যতটা অসুখী আছে তার চাইতে খারাপ আর কি হবে বুঝতে পারছি না। এবার ডেন্‌ভার-এ ফিরে যাব। কিছুদিন আরাম করব। ভাল খাবার, ভাল বিছানা ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যে কিছুদিন কাটিয়ে সব জিনিসপত্র নিয়ে এখানে ফিরে আসব এবং তখন বেচারি উইলসন বাপিকে তল্লাশি গুটোবার নির্দেশ জারী করব।

ডেন্‌ভার, ১৯ জন

এখানে সকলেই তার অভাব বোধ করছে। সকলেই আশা করছে, মেক্সিকোতে সে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে; এ কথা শুধু মুখেই বলছে না, অন্তর দিয়ে বিশ্বাসও করছে। স্বীকার করছি, এখানে আমি বড় বেশী দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তাহলে এটুকু ক্ষমা করতে। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কি বলবে, আর তুমি যা বলবে তাও ঠিক: আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, আর মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়তাম তোমার জ্বলন্ত স্মৃতির দাহ-

আগামী কাল রাতের ট্রেনেই আমি ফেরে যাব।

ডেন্‌ভার, ২০ জন

মা, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা একটা ভুল লোককে তাড়া করে ফিরছি। সারারাত ঘুমুতে পারি নি। এখন এই ভোরে সকালের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি-সময় যেন আর কাটতে চাইছে না, মোটেই কাটতে চাইছে না!

এই জ্যাকব ফুলার আসল দোষীর জ্ঞাতি ভাই। আমরা কী বোকা যে এ কথাটা একবারও আমাদের মে হয় নি যে ঐ শয়তানী কাণ্ডকারখানার পরে দোষী লোকটা কখনও স্বনামে পরিচয় দিতে পারে না। এই ডেন্‌ভার ফুলার অপর ফুলার অপেক্ষা বয়সে চার বছরের ছোট; অল্প বয়সে বিপত্নীক অবস্থায় সে এখানে এসছিল' ৭৯-তে; তখন তার বয়স একুশ, আর সেটা তোমার বিয়ের এক বছর আগেকার কথা; এ কথা প্রমাণ করবার মত তথ্য ও দলিলও অসংখ্য। এখানে আসার দিন থেকে তাকে চেনে এ রকম অনেক বন্ধুর সঙ্গে গত রাতে আমি কথা বলেছি। আমি কিছু বলি নি, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তাকে আবার এই শহরে ফিরিয়ে আনব, এবং খনির ব্যাপারে তার যা ক্ষতি হয়েছে সেটাও পূরণ করে দেব; এই উপলক্ষে একটা ভোজসভা হবে, একটা মশাল-শোভাযাত্রা হবে, আর সে সব খরচই বহন করব আমি। তুমি কি একে "বাজে বক্‌বকানি" বলতে চাও? তুমি তো ভালই জান যে আমি এখনও ছেলেমানুষ; সেটাই তো আমার সুবিধা। ভাল কথা, আর আমি ছেলেমানুষ থাকব না।

সিল্‌ভার গুল্‌চ্‌ ৩ জুলাই

মা, সে চলে গেছে! উধাও হয়ে গেছে; কোন চিহ্ন রেখে যায় নি। আমি যখন এলাম তখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সেই থেকে আজই আমি প্রথম বিছানা ছেড়ে উঠেছি। আমি যদি ছেলেমানুষ না হতাম তাহলেই ভাল হত, কারণ তাহলে আঘাতটা আমি আরও ভালভাবে সইতে পারতাম। সকলেই বলছে, সে পশ্চিমে গেছে। একটা মাল-গাড়িতে চেপে আজ রাতেই যাত্রা করব- দু' তিন ঘণ্টা চলবার পরেই একটা ট্রেন পেয়ে যাব। কোথায় যাব জানি না, কিন্তু আমাকে যেতে হবেই; চুপচাপা থাকা মানেই তো যন্ত্রণা।

অবশ্যই ছদ্মবেশ ধরে নতুন নাম নিয়ে সে নিজেকে মুছে ফেলেছে। তার অর্থই তাকে খুঁজতে আমাকে হয় তো সারা পৃথিবী চষে বেড়াতে হবে। সত্যিই তাই ঘটবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ মা? আমাকেই হতে হবে যাযাবর ইহুদী। ভাগ্যের কি পরিহাস! আমরা তো চেয়েছিলাম অপর কারও ভাগ্যে সেটা ঘটুক।

অসুবিধার কথাগুলিও ভাব! কারও নামে যে বিজ্ঞাপন দেব তারও উপায় নেই। আর যদি কোন উপায়ও থাকে, তাতে তার ভয় পাবার কোন কারণ ঘটবে না। আমি তো কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না; ভাবতে ভাবতে আমার মাথাই গুলিয়ে গেছে। "যে ভদ্রলোক সম্প্রতি মেক্সিকোতে একটা খনি কিনেছেন এবং ডেন্‌ভারে একটা খনি বিক্রি করেছেন তিনি যদি তার ঠিকানাটা পাঠান, (কাকে পাঠাবে মা!) তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারব যে সবটাই ভুল হয়ে গেছে; তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে এবং একটা বিশেষ ব্যাপারে তার যা ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ করে দেওয়া হবে।" বুঝতে পারছ তো? সে তো এটাকে ফাঁদ বলেই মনে করবে। যে কোন লোকই মনে করত। আবার আমি যদি লিখি, "এখন জানা গেছে যে তাকে নয়, আমরা খোঁজ করছি অন্য লোকের-একদা যার ঐ নামটাই ছিল, কিন্তু যথেষ্ট কারণবশত পরবর্তীকালে তিনি ঐ নাম ত্যাগ করেছেন"-তাতেও সাড়া মিলবে? কিন্তু ডেন্‌ভার-এর লোকজন তখন জেগে উঠবে, বলবে "ওহো!" আর সেই সন্দেহজনক 'গ্রীণব্যাক'-এর কথা তাদের মনে পড়ে যাবে; তারা বলবে, "সে যদি আসল লোকই না হবে তাহলে পালিয়ে গেল কেন?-এটা তো সরল কথা।" আণি যদি তাকে খুঁজে না পাই, তাহলে যেখানেই থাকুক সেখানেই তার সর্বনাশ হবে-অথচ এখন সে সেখানে নিষ্কলুষ অবস্থায় আছে। তোমার মাথা তো আমার চাইতে পরিষ্কার। আমাকে সাহায্য কর।

একটি সূত্র আমার হাতে আছে, মাত্র একটি। তার হাতের লেখা আমি চিনি। হোটেল-রেজিস্টারে সে যদি তার নতুন ছদ্মনামটা লেখে, আর হাতের লেখা লুকোবার জন্য খুব কারিকুরি না করে, তাহলে কখনও যদি সেই হাতের লেখা দেখতে পাই তো আমার খুব কাজে লাগবে।

সান ফ্রান্সিস্কো, ২৮ জুন, ১৮৯৮

কলোরাডো থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্র তন্ন তন্ন করে তাকে যে আমি কত খুঁজেছি তা তো তুমি ইতিমধ্যেই জেনেছ; একবার যে তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিলাম তাও জেনেছে। দেখ, আরও একবার অল্পের জন্য সে ফস্‌কে গেছে। সেটা ঘটেছে এখানে, গতকাল। রাস্তায় তাকে দেখতে পেয়ে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু সেখানেই মস্ত বড় ভুল হল; একটা কুকুরও এ ভুল করত না। কিন্তু আমি তো আধা কুকুর, আর উত্তেজিত হলেই আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। সে বাড়িটাতে সে দশ দিন ছিল; কিন্তু আমি তো জানি যে গত ছ' আট মাস ধরে সে কোন জায়গায় বেশী দিন থাকে না, সব সময় চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়ায়। তার মনের অবস্থা তো আমি বুঝি। ন' মাস আগে একবার যখন তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিলাম তখন তার নাম ছিল "জেমস ওয়াকার"; সেই নামটাই সে এখনও ব্যবহার করে। "সিল্‌ভার গুল্‌চ্‌" থেকে পালাবার সময়ও ঐ নামটাই সে নিয়েছিল। সাদাসিধে

মানুষ, ভাল নামের ধার ধারে না। কিছুটা ছদ্মবেশ ধরলেও হাত দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। সরল মানুষ, ছল-চাতুরির ধার ধারে না।

সকলে বলল, সে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে; ঠিকানা রেখে যায় নি; কোথায় যাচ্ছে তাও বলে যায় নি; ঠিকানা চাওয়াতে বেশ ভয় পেয়েছিল; একটা সস্তা দামের থলে ছাড়া আর কোন মালপত্র সঙ্গে ছিল না; সেটা কাঁধে করে পায়ে হেঁটেই চলে গেছে-"একটা কঞ্জুষ বুড়ো মানুষ, চলে যাওয়ায় কারও কোন ক্ষতি হয় নি।" "বুড়ো"! হয় তো এখন তাই সেজেছে। কথাটা কানে গেল কি গেল না, সেই মুহূর্তে তার পিছু নিলাম, ছুটতে ছুটতে জাহাজঘাটায় পৌঁছে গেলাম। মাগো, যে স্টীমারে সে পাড়ি দিল তার ধোঁয়া তখন সবে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। গোড়াতেই যদি ঠিক পথে যেতে পারতাম তাহলে আধ ঘণ্টা সময় বেঁচে যেত। তাহলেই একটা দ্রুতগামী নৌকো ধরে ঐ স্টীমারটাকে ধরবার একটা সুযোগ পেতাম। স্টীমারটা মেলবোর্ণ যাচ্ছিল।

হোপ ক্যানন, ক্যালিফোর্নিয়া, ৩ অক্টোবর, ১৯০০

তুমি নিশ্চয় অভিযোগ করতে পার। "বছরে একখানি চিঠি" খুবই অপ্রচুর; আমি স্বীকার করছি; পরাজয় ছাড়া লিখবার মত কিছুই যখন থাকে না তখন কি লিখবে? এ অবস্থা অসহ্য; মনকে ভেঙে দেয়।

আমি তোমাকে লিখেছিলাম-মনে হচ্ছে যেন কত যুগ আগে-যে মেলবোর্ণে অল্পের জন্য তাকে ধরতে পারি নি; তারপর থেকে মাসের পর মাস সারা অস্ট্রেলেসিয়া তার পিছনে ঘুরেছি।

হ্যাঁ, তারপর তার সন্ধানে ভারতবর্ষে গেলাম; বোম্বাইতে প্রায় দেখাও পেয়েছিলাম; সর্বত্র তাকে খুঁজেছি-বরোদা, রাওয়ালপিণ্ডি, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, কানপুর, এলাহাবাদ, কলকাতা, মাদ্রাজ-সর্বত্র; সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, অনেক ধুলো পেরিয়ে, অনেক ঘাম ঝরিয়ে-সব সময় তার পিছনে লেগে ছিলাম, কখনও খুব কাছাকাছিও গিয়েছি, কিন্তু কোন সময়ই তাকে ধরতে পারি নি। সেখান থেকে গেলাম সিংহলে, আর সেখান থেকে-সে কথা থাক; ক্রমে ক্রমে সবই তোমাকে লিখে জানাব।

তাকে তাড়া করে আবার স্বদেশে ক্যালিফোর্নিয়াতে নিয়ে এলাম; সেখান থেকে মেক্সিকো, এবং আবারও ক্যালিফোর্নিয়া। সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র তাকে তাড়া কে ফিরছি গত ১লা জানুয়ারি থেকে এক মাস আগে পর্যন্ত। আমি প্রায় নিশ্চিত যেসে হোপ ক্যানন-এর কাছাকাছিই আছে; এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে তার খোঁজ পেয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই সে হারিয়ে গেল; মনে হয়, কেউ তাকে মাল-গাড়িতে তুলে নিয়েছিল।

হারানো পথ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে এখন আমি বিশ্রাম করছি। মা, ক্লান্তিতে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি, মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে; অনেক সময়ই সব আশা ছেড়ে দেবার মত অবস্থা হয়েছে; কিন্তু এই ছোট খনি-শিবিরের লোকগুলি বড় ভাল; অনেকদিন পরে তাদের কাছে এসে বড় ভাল লাগছে; তাদের হাসিখুসি জীবনযাত্রা মানুষকে তাজা করে তোলে, তার দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দেয়। এক মাস হল এখানে এসেছি। "স্যামি" হিলেয়ার নামের একটি যুবকের সঙ্গে এক ঘরে আছি। তার বয়স প্রায় পঁচিশ বছর; আমার মতই মায়ের একমাত্র ছেলে; মাকে খুব ভালবাসে আর প্রতি সপ্তাহে মাকে চিঠি লেখে-অনেকটা আমার মতই। ছেলেটি ভীরু স্বভাবের, আর বুদ্ধিশুদ্ধির ব্যাপারে-দেখ, নদীতে আগুন ধরিয়ে দেবার মত ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করা যায় না; কিন্তু সে যাই হোক, সকলে তাকে পছন্দ করে, খুব ভাল ছেলে, তার সঙ্গে কথা বললে, বন্ধুত্ব করলে মন খুসি থাকে, আনন্দে ভরে ওঠে। মনে হয় এ রকম বন্ধু যদি "জেমস ওয়াকার"-এর থাকত। তারও বন্ধুবান্ধব ছিল; সেও সকলের সঙ্গে মিশতে ভালবাসত। প্রথম যখন তাকে দেখেছিলাম সেই সময়কার ছবি মনে পড়ে। কী দুঃখের কথা! সে ছবি মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। আর সেই সময়ই আমি কিনা কোমর বেঁধে লেগেছিলাম তাকে নিয়ে বেড়াতে!

হিলেয়ার-এর মনটা আমার চাইতে ভাল, আমাদের সমাজের যে কোন লোকের চাইতে ভাল, কারণ শিবিরের কদাচারী মানুষ ফ্লিণ্ট বাকনার-এর সেই একমাত্র বন্ধু শুধু তার সঙ্গেই ফ্লিণ্ট কথাবার্তা বলে। সে বলে, ফিণ্ট-এর ইতিহাস সে জানে; অনেক দুঃখ-কষ্টেই তার এই অবস্থা হয়েছে, আর তাই তার প্রতি যথাসম্ভব উদার ব্যবহার করাই সকলের উচিত। ফ্লিণ্ট বাকনার সম্পর্কে যে সব কথা আমি শুনেছি তাতে এটুকু বুঝেছি যে খুব উদার হৃদয়ের লোক না হলে তার মন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না। আমি তো মনে করি, অনেক কষ্ট করে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে একটি কথা বললেই তুমি স্যামির চরিত্র সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে

পারবে। কথা প্রসঙ্গে সে বলেছিল: "ফ্লিণ্ট আমার আত্মীয়, তার সব দুঃখের কথাই সে আমাকে বলে-মাঝে মাঝে বুকের বোঝাটা হাল্কা করে, নইলে হয় তো বুকটা ফেটেই যেত। তার মত অসুখী লোক হয় না; মনের দুঃখ দিয়েই তার জীবনটা গড়া-যত বুড়ো তাকে দেখায় আসলে ততটা বয়স্ক সে নয়। অনেক অনেক বছর আগেই সে তার মনের সুখ শান্তি সব হারিয়েছে! সৌভাগ্য কাকে বলে তা সে জানে না-কোনদিন তার দেখা পায় নি; এই পৃথিবী তার কাছে এতই দুঃসহ হয়ে উঠেছে যে প্রায়ই সে বলে, যদি অন্য কোন নরকেও তার স্থান হত তো সেও ছিল ভাল।"

৪

কোন খাঁটি ভদ্রলোকই মহিলাদের উপস্থিতিতে নগ্নসত্যকে প্রকাশ করে না। প্রথম অক্টোবরের একটি ঝরঝরে সুগন্ধি সকাল। লিলাক ও সোঁদাল গাছের মাথায় ঝলমল করছে ফুলের রাশি; সে সব পাখীহীন বন্য প্রাণী গাছের মাথায় বাসা বেঁধে থাকে, দয়ালু প্রকৃতি যেন তাদের জন্য রূপকথার সেতু তৈরি করে রেখেছে। ঢালু বনভূমিতে বন-ঝাউ ও ডালিম ফুলের লাল-হলুদ রঙের বাহার ছড়িয়ে আছে দূর-দূরান্তে; বাতাস ভরে উঠেছে অসংখ্য স্বল্পস্থায়ী ফুলের তীব্র সুরভিতে; বহুদূর ফাঁকা আকাশে একটি নিঃসঙ্গ "ইসোফেগাস" নিশ্চল পাখায় ভর দিয়ে ঘুমিয়ে আছে; সর্বত্র বিরাজ করছে একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা, গাম্ভীর্য ও স্বর্গীয় প্রশান্তি।

"রিপাব্লিকনে" পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু:

আপনার জনৈক নাগরিক "ইসোফেগাস" সম্পর্কে আমাকে একটি প্রশ্ন করেছেন; আপনার মারফৎ তাকে আমারে জবাবটা জানাতে চাই। আশা করছি, এই জবাব যথেষ্ট প্রচার লাভ করবে এবং কিছু কলমবাজীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে; কিন্তু ইতিমধ্যেই একাধিকবার এই একই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি এবং তার ফলে যতটা অবসর আমার দরকার তা পাচ্ছি না।

সম্প্রতি আমি একটি ছোট গল্প প্রকাশ করেছি, আর তাতেই "ইসোফেগাস" কথাটা ব্যবহার করেছি, আপনাকে বলি, এটা নিয়ে কিছু লোক মাথা ঘামাবে সেটা আমি জানতাম-আসলে সেটাই ছিল আমার অভিপ্রায়-কিন্তু তার ফসল সে পরিমাণ জমে উঠেছে এতটা আমি বুঝতে পারি নি। "ইসোফেগাস" সম্পর্কে দোষী নির্দোষ সকলেই এককাট্টা হয়েছে, অথচ আমি ভেবেছিলাম কিছু গোবেচারী লোকই এটা নিয়ে মাথা ঘামাবে ও আমাকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানতে চাইবে; তাতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটবে না; কিন্তু জ্ঞানী-গুণী-বিদ্যজ্জনেরাও যে এ ব্যাপারে আমার সাহায্যপ্রার্থী হবেন ততটা আমি আশা করি নি। যাহোক, কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, কাজেই এ বিষয়ে আমার বক্তব্য পেশ করে সম্ভব হলে এই খোঁজ-খবরের স্রোত বন্ধকরার সময় এসে গেছে, কারণ চিঠি লেখাটা আমার কাছে আরামদায়ক কাজ নয়, আর এ ব্যাপারে যতটা মজা পাব বলে আমি আশা করেছিলাম তাও পাচ্ছি না। আপনি যাতে পরিস্থিতিটা অনুধাবন করতে পারেন সেজন্য সংশ্লিষ্ট খোঁজ-খবরের দুটি নমুনা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমটি এসেছে ফিলিপিন্স্-এর জনৈক শিক্ষকের কাছ থেকে:

সান্টা ক্রুজ, ইলোকস, সুর, পি. আই.
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২

প্রিয় মহাশয়,-"দো-নলা গোয়েন্দা গল্প" শীর্ষক আপনার সাম্প্রতিক গল্পটি এই মাত্র পড়লাম, আর পড়ে খুব ভাল লাগল। হার্পার্সা ম্যাগাজিন-এর জানুয়ারি সংখ্যার চতুর্থ খণ্ড ২৬৪ পৃষ্ঠায় এই অনুচ্ছেদটি রয়েছে: "বহুদূর ফাঁকা আকাশে একটি নিঃসঙ্গ ইসোফেগাস নিশ্চল পাখার ভর দিয়ে ঘুমিয়ে আছে; সর্বত্র বিরাজ করছে একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা, গাম্ভীর্য ও স্বর্গীয় প্রশান্তি।" এখন, একটি শব্দের অর্থ আমি বুঝতে পারছি না-শব্দটি 'ইসোফেগাস'। আমার হাতের কাছে রয়েছে "স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারী," কিন্তু তা থেকেও অর্থটা বোধগম্য হচ্ছে না। রচনার ঐ অংশটিকে আমি খুবই হৃদয়গ্রাহ ও সুন্দর বলে মনে করি, তাই আপনি যদি সময় করে অর্থটা পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলেন তাহলে সুখী হব। আপনার কাছে ব্যাপারটা অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু লুজন-এর উত্তর অঞ্চলে থেকে আমার অসুবিধাটার কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন।

আপনার একান্ত বশংবদ

লক্ষ্য করেছেন কি? ঐ একটি শব্দ ছাড়া অন্য কিছুতেই কোন অসুবিধা নেই। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, পাঠককে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে অনুচ্ছেদটি রচিত হয়েছিল, সেটা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, রচনাটি পাঠ করে যেন সকলে যুক্তিযুক্ত

বলে মনে করে; এখন দেখা যাচ্ছে তা করেছে; আমার ইচ্ছা ছিল রচনাটি আবেগময় ও হৃদয়গ্রাহী হোক; আপনি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই শিক্ষকমহাশয়টির হৃদয়ে নাড়া লেগেছে। হায়, ঐ একটি বিশ্বাসঘাতক শব্দ যদি আমি বাদ দিতাম, তাহলে তো বাজী মাৎ হয়ে যেত! এই অনুচ্ছেদটি তেলের মত প্রতিটি পাঠকের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত, কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকত না।

অপর নমুনাটি এসেছে নিউ ইংলণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের কাছ থেকে। তার মধ্যে একটি খারাপ শব্দ আছে (কথাটা আমি চেপে রাখতে পারলাম না), কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মশিক্ষা বিভাগের লোক নন তাই তাতে কোন ক্ষতি নেই:

প্রিয় মিঃ ক্লিমেন্স, বহুদূর ফাঁকা আকাশে একটি নিঃসঙ্গ ইসোফেগাস নিশ্চল পাখায় ভর দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

সাময়িক পত্রিকা পড়বার মত যথেষ্ট সময় আমি পাই না। অত্যন্ত বিলম্বে হলেও আপনার "দো-নলা গোয়েন্দা গল্প"টি এই মাত্র পড়ে শেষ করেছি এবং যথেষ্ট আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করেছি।

কিন্তু ঐ ইসোফেগাস বস্তুটা কি? আমার নিজেরও ঐ বস্তুটা আছে, কিন্তু সেটি তো শূন্যে বা অন্য কোথাও কখনও ঘুমোয় না। কথা নিয়েই আমার কাজ, আর তাই ইসোফগাস কথাটা শোনা মাত্রই আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। কিন্তু আমার একজন বন্ধু বলল, এ কথাটার অর্থ যদি আমি উদ্ধার করতে না পারি তাহলে "আমি শাশ্বত অনন্তকাল ধরে অভিশপ্ত হয়ে থাকব।" শব্দটা কি একটা পরিহাস, না কি আমিই একটি মহামূর্খ?

শুধু আপনাকে বলছি, ঐ লোকটিকে বোকা বানিয়েছি বলে আমার লজ্জাই হয়েছিল। তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, এটা একটা ঠাট্টা-আর এখন আমার স্প্রিংফিল্ড-প্রশ্নকর্তাকেও সেই একই কথা জানাচ্ছি। তাকে আরও লিখেছি, তিনি যেন সযত্নে সমস্ত অনুচ্ছেদটাই পড়েন; তাহলেই দেখতে পাবেন যে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অর্থও কোথাও নেই। স্প্রিংফিল্ড-এর প্রশ্নকর্তাকেও আমার ঐ একই জবাব।

এই আমার স্বীকারোক্তি। আমি দুঃখিত-কিছুটা। এ রকম আর কখনও করব না-আপাতত আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না; ইসোফেগাসকে একটু বিশ্রাম করতে দিন-সেই পুরনো নিশ্চল পাখায় ভর দিয়ে।

-মার্ক টোয়েন
নিউ ইয়র্ক সিটি, ১০ এপ্রিল, ১৯০২

[সম্পাদকীয়]

হার্পার্স ম্যাগাজিন-এর গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "দো-নলা গোয়েন্দা গল্প" নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি গোয়েন্দা উপন্যাসের হাস্যকর প্রহসনের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, অতি নাটকীয় সব অনুচ্ছেদের মধ্যে আসল কথাটাকে এমন নিপুণতার সঙ্গে আড়াল করে রাখা হয়েছে যে সেটা ধরাই পড়ে না। কিন্তু ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রথম ঘটনার পরেও সেই ভ্রান্তিটা থাকা উচিত নয়। আর যে অনুচ্ছেদে মিঃ ক্লিমেন্স-এর গল্পের সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলবার দক্ষতা এবং পাঠকের উদাসীনতা আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটি হল:

"প্রথম অক্টোবরের একটি ঝরঝরে সুগন্ধি সকাল। লিলাক ও সোঁদাল গাছের মাথায় ঝলমল করছে ফুলের রাশি; যে সব পাখাহীন বন্য প্রাণী গাছের মাথায় বাসা বেঁধে থাকে দয়ালু প্রকৃতি যেন তাদের জ্য একটি রূপকথার সেতু তৈরি করে রেখেছে। ঢালু বনভূমিতে বন-ঝাউ ও ডালিম ফুলের লাল-হলুদ রঙের বাহার ছড়িয়ে আছে দূরদূরান্তে; বাতাস ভরে উঠেছে অসংখ্য স্বল্পস্থায়ী ফুলের তীব্র সুরভিতে; বহুদূর ফাঁকা আকাশে একটি নিঃসঙ্গ 'ইসোফেগাস' নিশ্চল পাখায় ভর দিয়ে ঘুমিয়ে আছে; সর্বত্র বিরাজ করছে একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা, গাম্ভীর্য ও স্বর্গীয় প্রশান্তি।"

মার্ক টোয়েনের পরিহাসের এই সাফল্য দেখে মনে পড়ছে তার গুহায় অবস্থিত শিলীভূত মানুষের গল্পটার কথা; কী সূক্ষ্ম বিবরণ; প্রথমে দিয়েছেন পরিবেশের একটি একটি চিত্র, তার নির্জনতা ইত্যাদি; তারপর দিয়েছেন তার বিরাট দেহের বিবরণ,-প্রসঙ্গক্রমে

উল্লেখ করেছেন যে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি তার নাকের একটা পাশকে ছুঁয়ে আছে; তারপর ডান হাতের আঙুলগুলি বরাভয় মুদ্রায় প্রসারিত হয়ে আছে; এবং পুরো মূর্তিটা একটা আশ্চর্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত-এই কথার বর্ণনা করে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন যে বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলটি ডান হাতের কনিষ্ঠাকে স্পর্শ করে আছে-ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এতই দক্ষতার সঙ্গে কথাগুলি লেখা হয়েছিল যে অনেক বছর পর অতীতের বিখ্যাত পত্রিকা "গ্যালাক্সি"তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মার্ক সেই লোকটির ইতিহাস লিখতে গিয়ে জানিয়ে দিলেন যে ঐ গল্পের পরিহাসটা আজও পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি; এমন কি, আমাদের যতদূর মনে পড়ে-সেই আশ্চর্য পুরনো পরিহাসের ঘটনাস্থলস্বরূপ "নেভাদা" পত্রিকার সম্পাদ হিসাবে যে স্থানটিকে নির্দেশ করেছিল অনেক লোক সত্যি সত্যি সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে মূর্তিটির খোঁজ করেছিলেন। একথাও নিশ্চত যে মার্ক টোয়েন-এর লাফানো ব্যাঙের চাইতে বেশী "পাইট" মাল থাকে।

কাল-অক্টোবর, ১৯০০: স্থান হোপ ক্যানন-এর এস্‌মেরাল্ডা অঞ্চলের একটি রূপোর খনির শিবির। স্থানটা নির্জন, উঁচু ও প্রত্যন্তবর্তী; খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে; অধিবাসীদের ধারণা জায়গাটা ধাতব সম্পদে সমৃদ্ধ-দু' এক বছর খনন-কার্য চালালেই সেটা সঠিকভাবে বোঝা যাবে। অধিবাসীদের মধ্যে আছে প্রায় দু' শ' খনি-কর্মী, একটি শ্বেতাঙ্গিনী ও তার শিশু, কিছু চীনা ধোপা, পাঁচটি আদিম অধিবাসিনী, আর খরগোসের চামড়ার পোশাক, ছেঁড়া টুপি ও টিনের চাকতির নেকলেস পরা ডজন খানেক যাযাবর আদিম মার্কিন ফুলবাবু। এখনও কোন কারখানা গড়ে ওঠে নি; গির্জা এবং সংবাদপত্রও নেই। মাত্র দু' বছর হল শিবির পড়েছে; বড় কোন কাজ এখনও হয় নি; তাই পৃথিবীর লোক জায়গাটার নাম-ধাম জানে না।

গিরি-নালার দুই দিকে তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর উঠে গেছে; নিচের ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুঁড়েঘরগুলির উপর সূর্যের স্নেহস্পর্শ পড়ে সারা দিনে মাত্র একটিবার-সূর্য যখন থাকে মধ্যগগনে দিবা দ্বিপ্রহরে। গ্রামটি মাইল দুই লম্বা, বাড়িগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। সরাইখানাটাই একমাত্র কাঠামোওয়ালা বাড়ি-প্রকৃতপক্ষে শুধু সেটাকেই বাড়ি বলা চলে। গ্রামের ঠিক মাঝখানে বাড়িটা অবস্থিত-গ্রামের লোকদের সন্ধ্যাবেলার আড্ডাখানা। সকলে সেখানে মদ খায়, 'সেভেন-আপ' ও 'ডোমিনো' খেলে; বিলিয়ার্ড খেলাও চলে, কারণ জোড়াতালি দেওয়া একটা টেবিল ও কয়েকটা লাঠিও আছে; আর আছে গোটাকয় ফাঁটা বল; সশব্দে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায়, একেবারে বসে পড়ে; যে লোক এক দানে ছ' পয়েন্ট করতে পারে তাকে সরাইওলার পয়সায় মদ দেওয়া হয়।

ফ্লিল্ট বাক্‌নার-এর ঘরটা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের একেবারে শেষে অবস্থিত; তার সম্ভাবিত রূপোর খনিটা আছে উত্তর দিকের শেষ বাড়িটা ছাড়িয়ে আরও কিছু দূরে। লোকটি খিটখিটে, অসামাজিক, নির্বান্ধব। যারাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করেছে তারাই হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। তার অতীত ইতিহাস কেউ জানে না। কেউ মনে করে, স্যামি হিলেয়ার সেটা জানে, কেউ বলে-না। হিলেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলে সেও বলে, না, সে কিছু জানে না। ফ্লিণ্ট-এর সঙ্গে একটি ষোল সতেরো বছর বয়সের ভীরু ইংরেজ ছেলে ছিল। তার সঙ্গে সে প্রকাশ্য ও গোপনে খুব খারাপ ব্যবহার করত। সেই ছেলেটার কাছেও খোঁজ করা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। ফেট্‌লক জোন্স-ছেলেটির নাম-বলেছে, খনির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতেই ফ্লণ্ট তাকে সঙ্গে নিয়েছিল। আর তারও আমেরিকায় ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব কিছু না থাকায় বাক্‌নার-এর সঙ্গে থাকা এবং মাংস-মটরশুঁটির পেট-ভাতায় তার ঠেঙানি সহ্য করাটাকেই সে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে। একটুকু ছাড়া আর কিছুই সে বলতে পারে না।

এক মাস হল ফেট্‌লক এই দাসত্ব করে চলেছে। বাইরে সে যতই চুপচাপ থাকুক না কেন মনিবের এই অপমান ও লাঞ্ছনা তার মনের মধ্যে ক্রমেই তুষের আগুনের মত জ্বলতে শুরু করেছে। যারা চুপচাপ থাকে, আঘাতের যন্ত্রণা তাদেরই বেশী করে বেঁধে; যারা একটু বেশী সাহসী, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে তারা পাল্টা কাথা বলে বা আঘাতে ফেটে পড়ে মনে জ্বালা অনেকটা মেটাতে পারে। কিছু হৃদয়বান লোক ফেট্‌লককে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছে, বাক্‌নার-এর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেয়েছে; কিন্তু ছোকরা সে কথা ভাবতেই ভয়ে আঁতকে উঠেছে; বলছে, তা সে পারবে না। প্যাট রিলে তাকে বলেছিল:

"বদমাশটাকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে চলে এস। কোন ভয় নেই, আমি ওকে দেখে নেব।"

ছেলেটি চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, এ ঝুঁকি সে নিতে পারবে না; ফ্লণ্ট কোনদিন তাকে রাত-বিরেতে একলা পেলে তখন-"ওঃ, মিঃ রিলে, সে কথা ভাবলেও আমার ভয় করে।"

অন্যরা বলল, "পালিয়ে চলে এস; আমরা আছি; রাতের বেলা পাঁচিল ডিঙিয়ে সমুদ্রতীরে চলে এস।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি; সে

বলেছে, ফ্লিণ্ট তাকে খুঁজে বের করবেই, আর তারপরে চলবে আরও নির্যাতন।

এ ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারত না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছেলেটার দুঃখ-দর্দশা বেড়েই চলল। মনে হয়, ছেলেটা তার বাড়তি সময়টা কি ভাবে কাটায় সেটা জানতে পারলে লোকজনরা ব্যাপারটা বুঝতে পারত। ফিণ্ট-এর ঘরের কাছেই একটা বাইরের ঘরে ছেলেটা ঘুমোয়। রাত হলেই সেখানে ঢুকে ছেলেটাকে তার আঘাত ও ঘায়ের পরিচর্যা করে আর একটা সমস্যা নিয়েই সর্বদা মাথা ঘমায়-কেমন করে ফ্লিণ্ট বাক্নারকে খুন করবে কিন্তু ধরা পড়বে না। সেটাই তার জীবনের একমাত্র আনন্দ; চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ সময়টুকুর জন্যই সে সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে এবং মনের সুখে কাটায়।

বিষের কথা ভেবেছিল। না-তাতে হবে না; বিষ কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কে সংগ্রহ করেছিল সেটা তদন্তে ধরা পড়ে যাবে। একবার ভাবল, গভীর রাতে ফ্লণ্ট যখন বাড়ি ফেরে তখন কোন নির্জন জায়গায় পিছন থেকে তাকে গুলি করবে। না-কাছাকাছি কোন লোক থাকতে পারে, আর তার ফলে সে ধরা পড়ে যেতে পারে। ঘুমের মধ্যে ছুরি মারার কথাও ভেবেছে। না-ঘাতটা জোরদার না হতেও পারে, আর সেক্ষেত্রে ফ্লিণ্টই তাকে ধরে ফেলবে। কার্য উদ্ধারের একশ'উপায়ের কথা সে ভেবেছে-কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হয়নি; কারণ তলে তলে যত গোপনেই সে কাজ করুক না কেন, ধরা পড়বার একটা ঝুঁকি, একটা সম্ভাবনা সব সময়ই থেকে যাচ্ছে। কাজেই ওসবের কোন পথেই সে যাবে না।

তবে তার খুব ধৈর্য ছিল, অসীম ধৈর্য। নিজেকে বলত, তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। ফ্লিণ্ট-এর লাশ না ফেলে সে তার কাছ থেকে যাবে না; তাড়াহুড়ার কিছু নেই-পথ একটা পেয়ে যাবেই। পথ নিশ্চয়ই আছে; যতদিন সেটা খুঁজে না পাবে ততদিন এই লজ্জা, যন্ত্রণা ও দুঃখ-সব সে সহ্য করবে। হ্যাঁ, এমন একটা উপায় নিশ্চয় আছে যাতে খুনীর চিহ্নমাত্র থাকবে না-থাকবে না তুচ্ছতম কোন সূত্র-তাড়াহুড়ার কিছু নেই-একদিন না একদিন পথের হদিস সে পাবেই, আর সেইদিন-ওঃ, সেই দিনই সে বুঝতে পারবে বেঁচে থাকার কী আনন্দ! ইতিমধ্যে আপ্রাণ চেষ্টায় সে তার ভীরুতার খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলবে; আর তাই এখন থেকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তার মুখ থেকে একটাও প্রতিহিংসা বা আক্রমণাত্মক কথা কেউ কখনও শুনতে পাবে না।

পূর্বের উল্লেখিত অক্টোবরের সকাল বেলায় দু'দিন আগে ফ্লণ্ট কিছু জিনিস কিনেছিল; সে আর ফেট্লক মিলে সেগুলো ফ্লণ্ট-এর ঘরে বয়ে এনেছিল; মোমবাতির একটা বাক্সকে রেখে দিল ঘরের কোণ; বিস্ফোরক ভর্তি একটা টিনের পাত্র রাখল মোমবাতির বাক্সটার উপরে; বিস্ফোরক গুঁড়োর একটা পিপে রেখে দিল ফ্লিণ্টের তক্তপোষের নীচে; একটা লম্বা পলতেকে ঝুলিয়ি রাখল কাঠের গজালে। ফেট্লক বুঝতে পারল, খনির কাজ আরম্ভ করবার সময় হয়েছে; শিগ্গিরই পাহাড় ফাটাবার কাজ আরম্ভ হবে। পাহাড় ফাটবার কাজ সে দেখেছে; সে বিষয়ে তার কিছুটা ধারণাও আছে; কিন্তু নিজের হাতে সে কাজ কখনও করে নি। তার অনুমানই ঠিক-পাহাড় ফাটাবার সময় এসেছে। সকালে দু'জনে মিলে, পল্তে, ড্রিলিং-এর যন্ত্র, বিস্ফোরকের পাত্র-সব কিছু গর্তের কাছে বয়ে নিয়ে গেল; গর্তটা আট ফুট গভীর; সেখানে ওঠা নামা করবার জন্য একটা ছোট মই লাগানো হয়েছে। দু'জনে নেমে গেল; নির্দেশ মত ফেট্লক ড্রিলটা ধরল-কি ভাবে সেটাকে ধরতে হয় তাও সে জানে না- আর ফ্লণ্ট আঘাত করতে লাগল। হাতুড়িটা নেমে এল; যা হবার কথা ঠিক সেইভাবেই ফেট্লক-এর হাত থেকে ড্রিলটা ছিটকে লাফিয়ে উঠল।

"এই নিগারের ঘেয়ো বাচ্চা, এ ভাবে বুঝি ড্রিল ধরে? তুলে নে! এই ভাবে ধর্! শক্ত করে ধরিস্। ব্যাটা! মজা বোঝাব পরে!"

একঘন্টা পরে ড্রিলিং শেষ হল।

"এবার গুঁড়োটা ঢাল্।"

ছেলেটা গুঁড়ো ঢালতে শুরু করল।

"গাধা!"

চোয়ালে একটা মোক্ষম থাপ্পড় কসিয়ে ছেলেটাকে সরিয়ে দিল।

"উঠে যা! এখানে পড়ে পড়ে নাকে কাঁদতে হবে না। এবার আগে পল্তেটা গুঁজে দে। এবার গুঁড়োটা ঢাল্। থাম্, থাম্, তুই কি পুরো

গর্তটাই ভরে ফেলবি নাকি? এমন মাথা-মোটা গাধাও তো কখনও-কিছু ময়লা ফেলে দে! কিছু পাথরের টুকরো ফেলে দে! এবার ঢেকে দে! থাম্! থাম্! হায় স্কট! ভাগ্ এখান থেকে!" লোহাটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটাকে অকথ্য গালাগালি করতে করতে নিজেই ভাল করে চেপে দিতে পাগল। তারপর পল্তেয় আগুন দিয়ে গর্তের ভিতর থেকে উঠে এসে এক দৌড়ে পঞ্চাশ গজ দূরে চলে গেল। ফেট্লকও পিছন পিছন ছুটল। দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, আর তারপরেই বজ্রের মত শব্দ করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ও পাথর ফেটে আকাশে ছিটকে পড়তে লাগল; কিছু সময় পরেই সেই পাথরের টুকরোগুলি বৃষ্টির ফোঁটার মত পড়তে লাগল; তারপর আবার সব চুপচাপ।

"ঈশ্বর করতেন তুই যদি ওর মধ্যেই থেকে যেতিস", মনিব মন্তব্য করল।

আবার তারা গর্তের মধ্যে নেমে গেল, সব কিছু পরিষ্কার করল, এবং নতুন করে আর একটা ছিদ্র করে তার মধ্যে বিস্ফোরক ভরে দিল।

"এদিকে শোন্! আর কত পল্তে এভাবে নষ্ট করবি? পল্তেয় কি করে আগুন ধরাতে হয় তাও জানিস না?"

"না স্যার।"

"জানিস্ না! ঠিক আছে, পিঠের উপর দু'ঘা না পড়লে কিছুই হবে না।"

লোকটি গর্তের ভিতর থেকে উঠে এসে বলল:

"আরে গাধা, সারাটা দিনই লাগাবি না কি? পল্তেটা কেটে আগুন ধরা।"

বেচারি কাঁপতে কাঁপতে বলল:

"দয়া করে যদি-মানে-আমি-"

"আবার কথা! কেটে ধরিয়ে দে!"

ছেলেটা পল্তে কেটে আগুন ধরিয়ে দিল।

"হায় স্কট! এক মিনিটের পল্তে! তোকে এই গর্তের মধ্যে-"

রেগে গর্তের ভিতর থেকে মইটা তুলে সে দৌড়তে লাগল। ছেলেটা ভয়ে কাঠ!

"হায় ঈশ্বর! বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছ! বাঁচাও! হায়, আমি কি করব? আমি কি করব?" ছেলেটা চেঁচাতে লাগল।

যতটা সম্ভব দেয়াল ঘেঁসে সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; জ্বলন্ত পল্তে দেখে ভয়ে তার বাক্‌রোধ হয়ে গেল; নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল; অসহায়ের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল; দু' সেকেণ্ড, এইবার সে ছাতু হয়ে উড়ে যাবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। লাফ দিয়ে পল্তের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল, পল্তের যে ইঞ্চি খানেক মাটির উপরে ছিল সেটা কেটে দিল; সেও বেঁচে গেল

ভয়ে আধমরা হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই। তবু গভীর আনন্দে বিড়বিড় করে বলল:

"সেই আমাকে শিখিয়ে দিল! পথ একটা খুঁজে পেয়েছি; এখন শুধু অপেক্ষা।"

মিনিট পাঁচেক পরে বাক্‌নার গর্তের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে নীচে উঁকি দিল। অবস্থাটা বুঝতে পেরে সে মইটা নামিয়ে দিল; ছেলেটি কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে মই বেয়ে উঠে এল। ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাকে দেখে বাক্‌নারও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সহানুভূতি জানিয়ে অনুশোচনার সঙ্গে বলল:

"ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল বুঝলি। এ কথা কাউকে বলিস না; উত্তেজনার মুখে কি যে করেছি আমি নিজেই বুঝতে পারি নি। তোর শরীরও ভাল দেখাচ্ছে না; আজকের মত যথেষ্ট কাজ হয়েছে; আমার ঘরে চলে যা; যা ইচ্ছে হয় খেয়ে বিশ্রাম করগে। ব্যাপারটা নেহাৎই দুর্ঘটনা বুঝলি? আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে কি বলব।"

ছেলেটা যেতে যেতেই বলল, "আমিও ভয় পেয়েছিলাম, তবে আমারও একটা শিক্ষা হল; আমি কিছু মনে করি নি।"

তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে বাক্নার আপন মনেই বলল, "কত সহজেই ওকে তুষ্ট করা যায়! জানি না আবার বলে বেড়াবে কিনা। বলতেও তো পারে!......আহা, যদি ওখানেই মরে যেত!"

ছেলেটি কিন্তু বিশ্রামের সুযোগ নিল না; নিজের কাজ নিয়েই মনের সুখে মেতে রইল। পাহাড়ে কোল থেকেই একটা ঘন জঙ্গল ফ্লিণ্ট-এর ঘর পর্যন্ত চলে গেছে; ফেট্লক-এর অধিকাংশ কাজই চলল সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে; বাকি জাজ তার নিজেরই ঘরে। সব কাজ শেষ করে সে বলল:

"যদি আমার মতলব সে টের পেয়ে যায় তাহলে আর বেশীদিন ওগুলো ফেলে রাখবে না। তাকে বোঝাতে হবে যে আমি আগেকার মত মাথা-মোটা গাধাই আছি-অন্তত আজ সারাদিন ও কাল। তারপরের দিন রাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে; কে তাকে শেষ করল, আর কেমন করেই বা শেষ হল তা নিয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। মতলবটা তো সেই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে; বেড়ে মতলব!"

৫

পরের দিনটা এল, চলেও গেল।

প্রায় মাঝরাত। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখা দেবে নতুন দিনের সকাল। ঘটনাস্থল সরাইখানার বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। লোহার স্টোভটা আগুনে তেতে লাল হয়ে উঠেছে; সেটার গা থেকে গরম হাওয়া বের হচ্ছে; চাষাড়ে লোকগুলি মোটা পোশাক পরে, ঝোলানো টুপি মাথায় দিয়ে, উঁচু বুটের মধ্যে ট্রাউজারের তলাটা গুঁজে দিয়ে, গায়ে ভেস্ট চড়িয়ে কোটবিহীন অবস্থায়ই স্টোভটার চারপাশে জমায়েত হয়েছে। বিলিয়ার্ড-বলের কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই-অর্থাৎভিতরে নেই; বাইরে চলেছে বাতাসের আর্তনাদ। লোকগুলি অস্বস্তির সঙ্গে কিসের যেন অপেক্ষায় আছে। একটি কদাকার মাঝ-বয়সী চওড়া-কাঁধ খনির লোক উঠে দাঁড়াল। তার গোঁফ-জোড়া ধূসর, অসামাজিক মুখে বিরূপ দুটি চোখ। একটা পল্তের তাল বগলের নীচে লুকিয়ে আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস নিয়ে সে চলে গেল। একটা কথাও বলল না, কাউকে অভিবাদনও জানাল না। লোকটি ফ্লিণ্ট বাক্নার। সে চলে যাবার পরে দরজাটা বন্ধ হতেই সকলে নানা মন্তব্য করতে লাগল।

কামার জেক পার্কার বলল, "এ রকম সময়-মাফিক লোক দেখা যায় না। তাকে চলে যেতে দেখলেই বোঝা যায় বারোটা বেজেছে, ওয়াটারবেরি-ঘড়ি দেখার দরকার হয় না।

খনি-মজুর পিটার হয়েস বলল, "আমি যতদূর জানি, ওটাই তার একমাত্র গুণ।"

ওয়েলস-ফার্গো-র লোক ফার্গুসন বলল, "সে তো সমাজের বালাই স্বরূপ। আমি যদি এ দোকান চালাতাম তো সোজা বলে দিতাম, খামার খালি করে দাও বাপু।"

হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল, "তোমরাই বল বাছারা, সে কখনও কাউকে এক পাত্তর খাইয়েছে বলে তোমাদের মনে পড়ে কি?"

"সে খাওয়াবে? ফ্লিণ্ট বাক্নার? হায় লরা!"

চারদিক থেকে লোকটির উদ্দেশ্যে নানা রকম বিদ্রূপ বর্ষিত হতে লাগল। তারপর কিছু সময় চুপ করে থেকে খনির লোকটা প্যাট রিলে বলল:

"সে হচ্ছে ১৫নং ধাঁধা। আর এক ধাঁধা ঐ ছেলেটা। আমি তো ওদের বুঝেই উঠি না।"

হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল, "কেউ বোঝে না। আচ্ছা, তারা যদি ১৫নং ধাঁধা, তাহলে সেই অপর লোকটির নম্বর কত হবে? তার তো সবটাই রহস্যে ঢাকা-এদের দু'জনকেই সে টেক্কা মারে। তাই না?"

"তাহলে বাজি!"

সকলে একই কথা বলল। শুধু একজন বাদে। সে নবাগত পিটার্সন। সকলের জন্য পানীয়ের হুকুম দিয়ে সে জানতে চাইল, অপর লোকটি কে। সকলে একসঙ্গে জবাব দিল, "আর্চি স্টিলম্যান!"

"সেও কি রহস্যময়?" পিটার্সন জিজ্ঞাসা করল।

ওয়েলস-ফার্গো-র লোক ফার্গুসন বলল, "সে রহস্যময় কি না? আর্চি স্টিলম্যান রহস্যময় কিনা? আরে, তার বোকামি তো চতুর্থ-তালিকা।"

ফার্গুসন লেখাপড়া জানে।

পিটার্সন তার সম্পর্কে সব কথা জানতে চাইল; সকলেই জানাতে উদ্গ্রীব। কিন্তু মদের দোকানের মালিক বিলি স্টিভেন্স সবাইকে চুপ করতে বলে নির্দেশ দিল যে এক এক করে বলাই ভাল। সকলের জন্য পানীয় পরিবেশন করে সে ফার্গুসনের উপরেই কাজের ভারটা দিল। ফার্গুসন বলতে লাগল:

"দেখুন, সে একটা ছেলে। তার সম্পর্কে আমরা এইটুকুই শুধু জানি। তার কাছ থেকে কথা বের করতে আপনি নাজেহাল হয়ে যাবেন, কিন্তু কোন ফল হবে না, কিছুই জানতে পারবে না অন্তত তার মনে কি আছে, সে কি কাজ করে, কোথা থেকে এসেছে, এই সব কথা তো বটেই। আর তার প্রধান বড় রহস্যের ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবে। বাস, হয়ে গেল।"

"সেই বড় রহস্যটা কি?"

"দৃষ্টি হতে পারে। শ্রবণ হতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি হতে পারে। যাদুও হতে পারে। যেটা খুসি বেছে নিন-বয়স্ক পঁচিশ; শিশু ও ভৃত্য-অর্ধেক দাম। এবার বলছি সে কি করতে পারে। আপনি এখন থেকে উধাও হয়ে গেলেন; যেখানে ইচ্ছা গিয়ে আপনার মাথায়ই আঙুলটা রাখবে।"

"কি যে বলেন!।"

"ঠিকই বলছি। আবহাওয়া তার কাছে কিছুই না-প্রাকৃতিক পরিবেশকে সে গ্রাহ্যই করে না।"

"বলেন কি! অন্ধকার? বৃষ্টি? বরফ? অ্যাঁ?"

"ও সবই তার কাছে সমান। গ্রাহ্যই করে না।"

"আচ্ছা-কুয়াসার বেলায়ও তাই?"

"কুয়াসা! তার চোখ বুলেটের মত কুয়াসাকে ভেদ করে চলে যেতে পারে।"

"কি জানেন স্যার, সে যখন এখানে বসে সকলের সঙ্গে কথা বলতে থাকবে তখন আপনি লুকিয়ে আপনার ঘরে চলে যান, সেখানে একটা বই খুলুন-হ্যাঁ, স্যার, এক ডজন বই-তার পৃষ্ঠাসংখ্যাটা মনে করে রাখুন; দেখবেন সে এখান থেকে বেরিয়ে সোজা সেই ঘরে গিয়েই ঢুকবে, প্রতিটি বইয়ের সঠিক পাতাটি খুলবে, বলে দেব; কখনও ভুল করবে না।"

"সে তো তাহলে শয়তান।"

"তার চাইতেও বড় এবার আপনাকে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলব। সেদিন রাতে সে-"

হাঠাৎ বাইরে একটা সোরগোল শোনা গেল; দরজাটা খুলে গেল; উত্তেজিত জনতা ভিতরে ঢুকল; সকলের আগে শিবিরের একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

"আমার মেয়ে! আমার মেয়ে! তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে হারিয়ে গেছে! ঈশ্বরের দোহাই, আর্চি স্টিলম্যানকে খুঁজে বের করতে আমাকে সাহায্য করুন। আমরা তাকে সর্বত্র খুঁজেছি।"

মদের দোকানের মালিক বলল:

"বসুন, বসুন মিসেস হোগান। চিন্তা করবেন না। তিনি ঘন্টা আগে এখানে এসে একটা সে ঘুরোবার জায়গা চায়। তারপরই দোতলায় উঠে গেছে। হ্যাম স্যাণ্ডুইচ, দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এস। ১৪নং ঘরে আছে।"

যুবকটি অবিলম্বেই নীচে নেমে এল। মিসেস হোগানের কাছ থেকে সব বিবরণ জেনে নিল।

"বিবরণ আর কি দেব। সন্ধ্যা সাতটায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম; ঘন্টা খানেক আগে নিজে শুতে গিয়ে দেখি মেয়ে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঘরে ছুটে গেলাম বাবা, তোমাকে পেলাম না। হেন জায়গা নেই যেখানে তোমার খোঁজ করি নি। শেষ পর্যন্ত এখানে তোমাকে পেলাম। আমি আর আমাতে নেই বাবা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমাকে পেয়ে গিয়েছি। তুমি আমার মেয়েকে বের করে দাও। এস! দেরি করো না!"

"এগিয়ে চলুন ম্যাডাম, আমি আপনার সঙ্গে আছি। আগে আপনার ঘরে যান।"

গোটা দলই খোঁজায় যোগ দিল. গ্রামের দক্ষিণ অংশের সকলেই জেগে উঠেছে, শ' খানেক লোক বাইরে অপেক্ষা করে ছিল, জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে কালো কালো মূর্তিগুলো নড়াচড়া করছে। তিন-চার জন সারি বেঁধে সকলে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল হোগানদের বাড়িতে।

মিসেস বলল, "ঐ যে তক্তপোষটা দেখছ, ওখানেই শুয়ে ছিল; সাতটার সময় ওখানেই মেয়েকে শুইয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন সে যে কোথায় আছে তা ঈশ্বরই জানেন।"

আর্চি বলল, "একটা লন্ঠন দিন।" শক্ত মাটির মেঝের উপর লণ্ঠনটা রেখে মাটিটা পরীক্ষা করে দেখার ভান করে সে হাঁটু গেড়ে বসল। মাটির এখানে-ওখানে আঙুল ছুঁইয়ে সে বলতে লাগল, "এই তো তার পায়ের দাগ। দেখতে পাচ্ছেন?"

দলের কয়েকজন হাঁটু ভেঙে বসে দেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কয়েকজনের মনে হল, পায়ের দাগের মত কিছু যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; অন্যরা মাথা নেড়ে স্বীকার করল যে পরিষ্কার শক্ত মাটিতে তাদের চোখে কোন দাগই ধরা পড়ছে না। একজন বলল, "মাটিতে কোন শিশুর পায়ের দাগ হয় তো পড়তে পারে, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

যুবক স্টিলম্যান বাইরে পা বাড়াল, আলোটা মাটিতে রাখল, বাঁ দিকে ঘুরে তিন পা এগোল, ভাল করে পরীক্ষা করল; তারপর বলল, "দিক নির্ণয় করে ফেলেছি-চলে আসুন; কেউ একজন লণ্ঠনটা নিন।"

সে দ্রুতপায়ে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল; পিছনে জনতা; পাহাড়ের সংকীর্ণ খাদ ধরে তারা এঁকে-বেঁকে এগোতে লাগল। এই ভাবে এক মাইল চলে খাদের মুখে পৌঁছে গেল; সামনেই জঙ্গলে-ঢাকা প্রান্তর-প্রকাণ্ড, অস্পষ্ট। সকলকে থামিয়ে স্টিলম্যান বলল, "ভুল পথে যাওয়া চলবে না; আবার দিক-নির্ণয় করতে হবে।"

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে বিশ গজ জায়গা ভাল করে পরীক্ষা করল; তারপর বলল, "চলে আসুন ঠিক আছে।" লণ্ঠনটা একজনের হাতে দিল। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সিকি মাইল এগিয়ে গেল খানিকটা ডান দিক বরাবর; তারপর দিক পরিবর্তন করে একটা অর্ধবৃত্ত পরিক্রমা করল; তারপর আবার ঘুরে গিয়ে পশ্চিম দিকে প্রায় আধ মাইল এগিয়ে থামল।

"এখানেই তার পথ শেষ হয়েছে, বেচারি শিশুটি। লণ্ঠনটা তুলে ধরুন, সে কোথায় বসেছিল দেখতে পাবেন।"

কিন্তু জায়গাটা নিছক ক্ষারদ্রব্যে ভরা এতই ইস্পাতের মত শক্ত যে দলের মধ্যে কারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ছিল না যাতে তার মধ্যে কারও বসবার মত কোন চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারে। শুধু সন্তানহারা জননী হাঁটু ভেঙে বসে বিলাপ করতে করতে জায়গাটাতে চুমো খেতে লাগল।

একজন বলে উঠল, "কিন্তু তাহলে সে কোথায়? সে যে এখানে নেই অন্তত সেটা তো দেখতে পাচ্ছি।"

স্টিলম্যান লণ্ঠন হাতে নিয়ে স্থানটাতে চক্কর দিতে লাগল, যেন পায়ের ছাপ খুঁজছে।

তারপর চিন্তাক্লিষ্ট সুরে বলল, "কিছুই বুঝতে পারছি না তো।" আবার পরীক্ষা করল। "কোন লাভ নেই। সে যে এখানেই ছিল সেটা নিশ্চিত। সে যে এখান থেকে হেঁটে কোথাও যায় নি-সেটাও নিশ্চিত। এ তো দেখছি গোলক ধাঁধা; বের হবার পথই পাচ্ছি না।"

মায়ের সব আশা মিলিয়ে গেল।

"হায় ঈশ্বর! হায় পবিত্র মেরী! নিশ্চয় কোন উড়ন্ত পশু তাকে নিয়ে গেছে। আর আমি তাকে দেখতে পাব না।"

আর্চি বলল, "আমি আশা ছাড়ছি না। তাকে পাবই-হতাশ হবেন না।"

"এই কথাগুলির জন্যই ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবেন আর্চি স্টিলম্যান," বলতে বলতে মহিলাটি তার হাতটা ধরে আবেগের সঙ্গে চুমো খেল।

নবাগত পিটার্সন বিদ্রূপের সুরে ফার্গুসনের কানে কানে বলল, "এই স্থানটা খুঁজে বের করাই এক মোক্ষম নাটক, তাই না? কিন্তু এত পথ ছুটে আসার তো কোন দরকারই ছিল না; এ কাণ্ড তো অন্য যে কোন স্থানেই করা যেত, না কি বলেন?"

কথার এই প্যাঁচ ফার্গুসনের ভাল লাগল না। সে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "আপনি কি বলতে চান যে মেয়েটি ছিল না? আমি বলছি সে এখানেই ছিল। এখন আপনি যদি এ দিয়ে একটা গোলমাল পাকাতে চান তো-"

স্টিলম্যান বলে উঠল, "ঠিক আছে। আসুন, আপনারা প্রত্যেকে এসে এটা দেখুন! এটা তো সারাক্ষণই আমাদের চোখের সামনেই ছিল, তবু আমরা দেখতে পাই নি।"

যে স্থানটা সে দেখাল সকলেই তার উপর ঝুঁকে পড়ল। আর্চির আঙুল যেখানে ছিল সেখানে ঈঙ্গিত বস্তুটি দেখাবার জন্য সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই শোনা গেল বহুজনের হতাশার দীর্ঘশ্বাস। প্যাটে রিলে ও হ্যাম স্যাণ্ডুইচ এক নিঃশ্বাসে বলে উঠল, "কোথায় আর্চি? এখানে তো কিছু নিই।"

"কিছু নেই? একে আপনারা বলছেন কিছু নেই? সঙ্গে সঙ্গে সে আঙুল দিয়ে মাটিতে একটা ছবি এঁকে ফেলল।" এই যে-এখনও চিনতে পারছেন না? এটাই ইন্‌জুন বিলি-র চিহ্ন। সেই মেয়েটিকে পেয়েছে।"

"ঈশ্বরের জয় হোক!" মা বলে উঠল।

"লণ্ঠনটা সরিয়ে নিন। পথের হদিস পেয়ে গেছি। আমার পিছনে আসুন!"

ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে ছুটতে লাগল; তিন শ' গজ পথ ছুটে গিয়ে একটা বালিয়াড়ির ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সকলেই তার পিছন পিছন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। সে অপেক্ষা করছিল। দশ পা দূরে একটা ছোট কুঁড়েঘর-পুরনো কাঁথা-কম্বল দিয়ে তৈরি একটা খুপড়ি মত; তার ফাঁক দিয়ে একটা আবছা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

যুবকটি বলল, "মিসেস হোগান, আপনি আগে যান। প্রথম দেখার সৌভাগ্য আপনারই হোক।"

মিসেস হোগানের পিছনে পিছনে গিয়ে সকলেই সেই খুপড়ির মধ্যে উঁকি দিল। সে কী দৃশ্য! ঈন্‌জুন বিলি মাটিতে বসে আছে; আর শিশুটি তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে; উন্মাদ আলিঙ্গনে মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। আর্চি স্টিলম্যানও বাদ গেল না। চাপা ভগ্ন কণ্ঠে তার মুখ দিয়ে আন্তরিক প্রশংসার যে স্রোত বইতে লাগল তা একমাত্র একটি আইরিশ জননীর পক্ষেই বুঝি সম্ভব।

বিলি বলতে লাগল, "দশটা নাগদ আমি একে দেখতে পাই। ওখানেই ঘুমিয়ে ছিল। খুব ক্লান্ত-মুখটা ভেজা, বোধ হয় কাঁদছিল। এবার বাড়ি নিয়ে যান, কিছু খাইয়ে দিন, নিশ্চয় ওর খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

অসীম কৃজ্ঞতায় মা তাকেও "ছদ্মবেশী দেবদূত" বলে জড়িয়ে ধরল। সে মর্যাদার অধিকারী হলেও সত্যসত্যই সে ছদ্মবেশেই ছিল। ঐ ভূমিকায় অভিনয়ের সাজেই সে তখন সেজেছিল।

সকালে দেড়টা নাগাদ "জনি যখন বিজয়গৌরবে বাড়ি ফিরে আসে" গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা গ্রামে ঢুকল। তাদের হাতে লণ্ঠন; সারা পথ তারা মদ খেতে খেতে এসেছে। সকলে এসে সরাইখানায় জড়ো হল; সকালের যেটুকু সময় বাকি ছিল তাকেও রাত করে তুলল।

৬

পরদিন বিকেলে সমস্ত গ্রাম প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। একটি গম্ভীর, মর্যাদাসম্পন্ন বিদেশী সরাইখানায় এসে উঠেছে। তার চালচলনে ও চেহারায় বিশিষ্টতার ছাপ। রেজিস্টারে লিখিয়েছে দুর্ধর্ষ নাম:

শার্লক হোমস

এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক খনি থেকে অন্য খনিতে খবরটা গুনগুনিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সকলের হাতের যন্ত্রপাতি থেমে গেল। সারা শহর সেখানে এসে জমায়েত হল। প্যাট রিলে-র খনিটা ছিল ফ্লিণ্ট বাক্‌নারের ঠিক পরেই। গ্রামের উত্তর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে একটা লোক প্যাট রিলেকে চীৎকার করে কথাই বলল। সেই সময় ফেট্‌লক জোন্সকে যেন অসুস্থ মনে হল। নিজের মনেই সে বিড়বিড় করে বলল:

"শার্কল খুড়ো! কী দুর্ভাগ্যরে বাবা!-ঠিক এই সময়েই সে এসে হাজির হল! আর এদিকে আমি...." সে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। তারপর ভাবল: "কিন্তু তাকে ভয় পাবার কি আছে? আমি তাকে যতটা জানি সে রকম ভাবে তাকে যারা জানে তারা ভাল করেই জানে যে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে, সূত্র সাজিয়ে রেখে, তার নির্দেশমত কাজ করবার জন্য একটা লোককে ভাড়া করে এনে অপরাধটা করলে তবেই সে-অপরাধীকে সে ধরতে পারে, অন্যথা নয়। ..কিন্তু এক্ষেত্রে তো কোন সূত্রই থাকবে না, কাজই কোন্ কেরামতিটা সে দেখাবে? কিছুই না। না স্যার, সব কিছুই প্রস্তুত। এখন কাজটাকে ফেলে রাখলে..না, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। ফ্লিণ্ট বাক্‌নারকে আজ রাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে।" তারপরেই আর একটা অসুবিধা দেখা দিল। "শার্লক খুড়ো আজ রাতেই বাড়ির খবরাখবর জানতে চাইবে; তাহলে তার হাত থেকে ছাড়া পাব কেমন করে? অথচ আটটা বাজার দু'এক মিনিট আগে থেকেই যে আমাকে আমার ঘরে হাজির থাকতে হবে।" ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে; তাকে মহা চিন্তায় ফেলে দিল। কিন্তু একটা পথও সে বের করে ফেলল। "আমরা বেড়াতে বেরিয়ে যাব; তারপর মিনিট খানেকের জন্য তাকে রাস্তায় রেখে আমি চলে যাব, আর তাহলেই আমি কি করি না করি কিছুই সে দেখতে পাবে না: কোন কাজ করবার সময় গোয়েন্দাকে তোমার পিছু নেওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠ পথই হল তাকে তোমার সঙ্গে রাখা। হ্যাঁ, সেটাই সব চাইতে নিরাপদ-তাকে আমার সঙ্গে নিয়েই যাব।"

ইতিমধ্যে সরাইখানার সামনেকার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে; সেই মহাপুরুষকে এক নজর দেখবার আশায় গ্রামবাসীরা সেখানে এসে ভিড় করেছে। সে কিন্তু ঘরের মধ্যেই আছে, বাইরে বের হয় নি। ফার্গুসন, জেক পার্কার ও হ্যাম স্যাণ্ডুইচ ছাড়া আর কারও তাকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। মহান বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দার এই অত্যুৎসাহী ভক্তরা সরাইখানার মালগুদামটা ভাড়া নিয়েছে; দশ বারো ফুট চওড়া ছোট গলিটার ওপারের সেই ঘর থেকে গোয়েন্দার ঘরটা দেখা যায়। তারা তিনজন সেই ঘরে লুকিয়ে আছে এবং জানালার পর্দায় কয়েকটা ফুটো করে রেখেছে। মিঃ হোমসের পর্দাটা নামানোই ছিল; কিন্তু এক সময় সে পর্দা তুলে দিল। ফলে যে অসাধারণ লোকটির লৌকিক ক্রিয়াকলাপের খ্যাতিতে সারা জগৎ ভরে গেছে তাকে মুখোমুখি দেখবার একটা লোমহর্ষক অথচ সুখকর উত্তেজনা

লাভের সুযোগ এই গুপ্তচরদের কপালে জুটে গেল। ঐ তো সে বসে আছে-রূপকথা নয়, ছায়ামূর্তি নয়, আসল, জীবন্ত, দেহধারী মানুষটি প্রায় তাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে।

ভীত গলায় ফার্গুসন বলল, "মাথাটা দেখ! সত্যি, একখানা মাথা বটে!"

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কামার বলল, "নাকটা দেখ! চোখটা দেখ! বুদ্ধি? যেন বুদ্ধির একটা ভাণ্ডার!"

হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল, "আর মুখের ঐ পান্ডুরতা। অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করলেই ও রকমটা হয়ে থাকে। আমরা বাজে লোকেরা আসল চিন্তার তো খবর রাখি না।"

ফার্গুসন বলল, "তা তো রাখিই না। আমাদের যত চিন্তা ভাবনা তো তিমির তেল আর চর্বি নিয়ে।"

"ঠিক বলেছ ওয়েলস্ ফার্গো। আর ঐ ভ্রূকুটিটা দেখ-ওটাই তো গভীর চিন্তার লক্ষণ-নীচে, আরও নীচে, চল্লিশ বাঁও নীচে-বস্তুর একেবারে গভীরে। কি যেন একটা খুঁজছে।"

"সে তো নিশ্চয়ই। তাছাড়া-ঐ ভয়ংকর গাম্ভীর্য আর পাণ্ডুর ভাবটা দেখ-কোন মানুষের ও রকমটা হয় না।"

"না, ডলার দিয়ে এটা কেনা যায় না। অথচ ওটা তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। এর মধ্যেই চারবার তার মৃত্যু হয়েছে; সে কথা সকলেই জানে। তিনবার স্বাবাবিক মৃত্যু, আর একবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু। শুনেছি, কবরের মত সেও স্যাঁতসেঁতে ও ভিজে জিনিসের গন্ধ শুঁকতে পারে। আর-"

"শ্-শ্! তাকিয়ে দেখ! সে বুড়ো আঙুলটা রেখেছে কপালের এক কোণে, তর্জনীটা রেখেছে আর এক কোণে। মনে মনেই সে কাজ শুরু করে দিয়েছে।"

"ঠিক বটে। এবার সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে গোঁফে তা দিচ্ছে, আর-"

"এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে; সবগুলো সূত্রকে ডানল হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের আঙুলের উপর সাজিয়ে রাখছে। দেখেছে? ঐ সে হাত দিল তর্জনীতে-ঐ মধ্যমায়-ঐ অনামিকায়-"

"কী অহংকার।"

"আর ভ্রূকুটিটা দেখ! সূত্রটা যেন ধরতে পারছে না, তাই-"

"দেখ, দেখ-সে হাসছে!-বাঘের মত -অন্য আঙুলগুলোকে এমন ভাবে মেলাচ্ছে যেন কিছুই হয় নি! সূত্রটা খুঁজে পেয়েছে; নিশ্চয় পেয়েছে।"

মিঃ হোমস টেবিলটাকে জানালার কাছে টেনে নিয়ে এল; গুপ্তচরদের দিকে পিছন দিয়ে বসল; তারপর লিখতে শুরু করল। গুপ্তচররা গর্ত থেকে চোখ সরিয়ে নিল, পাইপ ধরাল, তারপর আরাম করে ধূমপান করতে করতে কথা বলতে লাগল। ফার্গুসন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল:

"বাছারা, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, সে একটি আশ্চর্য মানুষ! তার সারা দেহে তারই চিহ্ন ছড়িয়ে আছে।"

জেক পার্কার বলল, "যা বলেছ ওয়েলস্ ফার্গো; এ রকম খাঁটি কথা তুমি আর কখনও বল নি।"

ফার্গুসন বলল, "তার আসল শক্তিই হল চোখ-প্যাঁচার মত তীক্ষ্ণ। আমি তো যতদূর বুঝেছি, এটা একটা প্রকৃতিগত প্রচণ্ড জান্তব ক্ষমতা। তোমাকে তাহলে বুঝিয়ে বলছি। মনে কর তুমি মিসেস হোগান। আমি তোমাকে তার মত করে প্রশ্ন করছি, তুমি জবাব দাও।"

"ঠিক আছে। তাই কর।"

"ম্যাডাম, দয়া করে মনটাকে এদিকে দিন। এবার বলুন, ছেলে না মেয়ে?"

"মেয়ে প্রভু।"

"হুম-মেয়ে। খুব ভাল। বয়স?"

"ছ'য়ে পড়েছে প্রভু।"

"হুম-ছেলেমানুষ, দুর্বল-দু' মাইল। খুবই ক্লান্ত হবার কথা। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। দু' মাইল দূরে বা কাছাকাছি কোথাও তাকে পাওয়া যাবে। দাঁত?"

"পাঁচটা প্রভু; আর একটা উঠছে।"

"খুব ভাল, খুব ভাল, খু-ব ভাল। আর মোজা? জুতো?"

"হ্যাঁ প্রভু, দুইই ছিল।

"বোনা তো? মরোক্কো?"

"বোনা প্রভু। আর ছোট পশুর চামড়া।"

"হুম-ছোট পশু। ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠল। যা হোক, যেতে দিন, ও আমরা ঠিক করে নেব। ধর্ম?"

"ক্যাথলিক প্রভু।"

"খুব ভাল। বিছানার কম্বল থেকে একটা টুকরো আমাকে ছিঁড়ে দিন তো। ধন্যবাদ। আধা পশমী-বিদেশী মাল। খুব ভাল। মেয়েটির পোশাক থেকে একটু কিছু দিন তো। ধন্যবাদ। সুতী। চমৎকার সূত্র, চমৎকার। দয়া করে মেঝের ধুলো একপাত্র আমাকে দিন তো। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। প্রশংসনীয়, প্রশংসনীয়! মনে হচ্ছে, এতক্ষণে ব্যাপারটা ঠিকমত ধরতে পেরেছি।-দেখ বাছারা, এতক্ষণে দরকারী সব সূত্রই সে পেয়ে গেছে। আর দরকার নেই। তারপর এই অসাধারণ লোকটি কি করবে? ওই টুকরোগুলো আর ধূলোর পাত্রকে টেবিলের উপরে রেখে দুই কনুইতে ভর দিয়ে সেগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে জিনিসগুলোকে পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করবে-দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে নিজের মনেই বলবে 'মেয়ে'; জিনিসগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে বলবে 'ছ' বছর বয়স; আবার নতুন করে সাজিয়ে আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে 'পাঁচটা দাঁত-একটা উঠছে-ক্যাথলিক-হাতে বোনা-সুতী-ছোট পশুর চামড়া-যাকগে। তারপর শরীরটা খাড়া করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে-চুলের ভিতরে হাত চালাতে চালাতে বলবে 'ছোট পশুর চামড়াটাই গোলমেলে!' তারপর উঠে দাঁড়াবে ভ্রূকুটি করবে, আঙুল ধরে ধরে সূত্রগুলো মেলাতে থাকবে-এবং অনামিকায় গিয়ে থামবে। কিন্তু শুধু মুহূর্তের জন্য-উজ্জ্বল হাসিতে আগুন-লাগা ঘরের মত তার মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠবে; রাজকীয় ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জনতাকে বলবে, 'আপনারা দু'জন একটা লণ্ঠন নিয়ে ইন্‌জুন বিলির কাছে গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসুন-বাকি সকলে শুতে চলে যান; গুড নাইট ম্যাডাম; গুড নাইট ভদ্রজনরা।' তারপর ম্যাটারহর্ণ-এর ভঙ্গীতে অভিবাদন জানিয়ে সে সরাইখানার পথে পা বাড়াবে। এই তার কায়দা-একমাত্র কায়দা-বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিগত-পনেরো মিনিটেই সব শেষ-লোকজন সঙ্গে করে দেড় ঘন্টা ধরে সারা ঝোপ-জঙ্গল খুঁজে বেড়াবার কোন দরকারই হয় না। কি বল তোমরা?"

হ্যাম স্যান্ডুইচ বলল, "জ্যাকসনের দিব্যি, খাসা! ওয়েলস্-ফার্গো, ঠিক যেন সেই লোকটিই এখানে হাজির-হুবহু এক। তার এর চাইতে ভাল ছবি বইতেও ছাপা হয় নি। জর্জের দিব্যি, আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি-তোমরা পাচ্ছ না বাছারা?"

নিজের সাফল্যে ফার্গুসন যেমন খুসি তেমনই কৃতজ্ঞ। নীরবে বসে এই খুসিটুকু উপভোগ করে তারপর ভয়ে ভয়ে বলল:

"আমি তো ভাবছি সে ঈশ্বরের সৃষ্টি তো?"

এক মুহূর্ত কেউ কোন জবাব দিল না; তারপর হ্যাম স্যান্ডুইচ সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে বলল:

"মনে হয়, একদিনে সবটা নয়।"

৭

সেদিন সন্ধ্যা আটটা নাগাদ তুষারপাতের মধ্যে দুটি লোক সতর্ক পা ফেলে ফ্লিণ্ট বাক্নারের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোক দুটি শার্লক হোমস ও তার ভাই-পো।

ফেট্লক বলল, "এখানে একটু দাঁড়াও খুড়ো; ছুটে একবার আমার আমার ঘরে যাব; এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব।"

সে কি যেন চাইল-খুড়ো সেটা দিল-আর সেও অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এল। দু'জনে কথা বলতে বলতে চলতে শুরু করল। ন'টা নাগাদ তারা সরাইখানায় ফিরে গেল। এই মহাপুরুষটিকে দেখবার জন্য বিলিয়ার্ড-রুমে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তারা সেই ঘরের ভিতর দিয়েই গেল। জনতা রাজকীয় সম্বর্ধনায় চেঁচিয়ে উঠল। মিঃ হোমস বারবার সবিনয়ে মাথা নুইয়ে এই প্রশংসাকে গ্রহণ করল, আর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তার ভাই-পোটি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বলল:

"ভদ্রমশাইরা, খুড়ো শার্লকের হাতে কিছু কাজ আছে; আমি তাকে বারোটা একটা পর্যন্ত আটকে রাখব; তখন না পারলে আরও আগে তিনি আবার নীচে নামবেন; তিনি আশা করেন, তখন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ তার সঙ্গে পানীয় গ্রহণ করবেন।"

ফার্গুসন চেঁচিয়ে উঠল, "হায় জর্জ, তিনি তো একজন রাজাবিশেষ। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শার্লক হোমসের জন্য তিনবার জয়ধ্বনি কর। হিপ, হিপ, হিপ-"

"হুর্‌রে! হুর্‌রে! হুর্‌রে! বাঘ!"

সমবেত গর্জন বাড়িটা বুঝি কেঁপে উঠল। দোতলায় উঠে খুড়ো ভাই-পোকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল:

"আমাকে আবার এই গোলমালে জড়ালে কেন?"

"দেখ খুড়ো, আশা করি তুমি জনপ্রিয়তা হারাতে চাও না? তা যদি হয় তো খনি-অঞ্চল এসে কখনও সকলের থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়ো না। লোকগুলো তোমার প্রশংসা করছে, কিন্তু তুমি যদি তাদের সঙ্গে বসে একটু পান না করেই তাদের যেতে দাও তাহলে তারা ভাববে তুমি একটি 'স্নব'। তাছাড়া, তুমিই তো বলেছ, অর্ধেক রাত আমাদের জাগিয়ে রাখবার মত গল্প তোমার স্টকে মজুত আছে।"

খুড়ো স্বীকার করল, ছেলেটি ঠিকই বলেছে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আর একদিক থেকেও সে যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে সে কথা ভাই-পোটি কাউকে বলে নি; শুধু নিজেকেই বলেছে: "খুড়ো ও অন্যান্যদের দিয়ে একটা 'অ্যালিবাই' প্রমাণ করবার মওকা এতে মিলে যাবে।"

তিন ঘন্টা ধরে খুড়ো-ভাইপোতে জোর কথা-বার্তা চলল। তারপর মাঝরাতের পরে ফেট্লক সিঁড়ি দিয়ে নীচে এল এবং সরাইখানা থেকে দশ বারো দশ বারো পা দূরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল। পাঁচ মিনিট পরেই ফ্লিণ্ট বাক্নার বিলিয়ার্ড-রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং প্রায় তার গা ছুঁয়ে চলে গেল।

"এইবার তাকে বাগে পেয়েছি!" ছেলেটা বিড়বিড় করে বলল। ছায়া-মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল, "বিদায়-চির-বিদায় ফ্লিণ্ট বাক্নার; একদিন আমার মাকে বলেছিলে-থাক সে কথা: এবার শোধবোধ; এই তোমার শেষ পথচলা বন্ধু!"

বলতে বলতে সে সরাইখানায় ফিরে গেল। "এখন থেকে একটা পর্যন্ত ঠিক এক ঘন্টা সময়। এই সময়টা সকলের সঙ্গে কাটাব: খাসা

'অ্যালিবাই' হবে।"

শার্লক হোমসকে নিয়ে সে বিলিয়ার্ড-রুমে গেল। উৎসাহী সপ্রশংস খনির লোকদের উপস্থিতিতে ঘরটা তখন ঠাসা; অতিথি পানীয় আনবার হুকুম দিল, আর শুরু হয়ে গেল হৈ-চৈ। সকলেই খুসি; সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ; গান, গল্প, পানীয় পর পর চলতে লাগল; সময় উড়ে চলল। একটা বাজতে ছ' মিনিট বাকি; হৈ-হল্লা চরমে উঠেছে; এমন সময়-

বুম্‌!

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। খাদের মাথায় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সেই গম্ভীর শব্দটা কাঁপতে কাঁপতে ভেসে গেল; তারপর ধীরে ধীরে কমতে কমতে একসময় থেমে গেল। স্তব্ধতা ভেঙে লোকজন সব দরজার দিকে ছুটে গেল। বলে উঠল: "একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।"

বাইরে অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "হয়েছে দূর পাহাড়ের খাদে; আগুনের ঝলক আমি দেখেছি।"

জনতা ছুটে বেরিয়ে গেল-হোমস, ফেট্‌লক, আর্চি স্টিলম্যান, প্রত্যেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা এক মাইল পথ পার হয়ে গেল। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেল, ফ্লিণ্ট বাক্‌নার-এর ঘরের মেঝেটা আবর্জনা-স্তূপে ভর্তি; ঘরটার চিহ্নমাত্র নেই-না একটা কাঁথা-কম্বল, না একটুকরো কাঠ। ফ্লিণ্টেরও দেখা নেই। সকলেই ইতস্তত খোঁজাখুঁজি শুরু করল। ইতিমধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠল:

"এই যে সে!"

সত্যিই তাই। খাদের পঞ্চাশ গজ নীচে তাকে পাওয়া গেল-অর্থাৎ পাওয়া গেল একটা বিচূর্ণিত প্রাণহীন মাংসপিণ্ড। সকলের সঙ্গে ফেট্‌লক জোন্সও ছুটে গিয়ে দেখতে লাগল।

পনেরো মিনিটেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত সারা হল। জুরীদের মুখপাত্র হ্যাম স্যাণ্ডুইচ রায়টা ধরিয়ে দিল। অশিক্ষিত ভাষার কারুকার্যে ভরা সেই রায়ের উপসংহারে বলা হল: "নিজের দ্বারা অথবা এই জুরীর অপরিচিত কোন মানুষ বা মানুষের দ্বারা মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে; একখানি ঘর ছাড়া তার কোন পরিবার বা সম্পত্তি ছিল না; ঘরখানিও সম্পূর্ণ উড়িয়া গিয়াছে; ঈশ্বর তাহার আত্মার শান্তি বিধান করুন। আমেন।"

তারপর ধৈর্যহীন জুরী আবার জনতার সঙ্গে মিশে গেল, কারণ আসল লক্ষ্যস্থল তো সেখানেই উপস্থিত-শার্লক হোমস। খনির লোকেরা নীরবে সশ্রদ্ধভাবে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ল বিধ্বস্ত বাড়িটার দিকে অনেকখানি জায়গা খোলা রেখে। সেই খোলা জায়গাটায় লণ্ঠনহাতে ভাই-পোটিকে নিয়ে মহাপুরুষটি ইতস্তত ঘুরতে লাগল। যেখানে ঘরটা ছিল একটা ফিতে দিয়ে সে জায়গাটার মাপ-জোক করল; ঝোপ-জঙ্গল থেকে রাস্তার দূরত্ব মাপল; জঙ্গলের উচ্চতা এবং আরও কিছু কিছু জিনিসেরও মাপ নিল। এখান থেকে একটুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া নিল, ওখান থেকে নিল একটুকরো কাঠ, আবার সেখান থেকে নিল এক চিম্‌টে মাটি। গম্ভীরভাবে সেগুলোকে পরীক্ষা করে নিজের কাছেই রেখে দিল। পকেট-কম্পাসের সাহায্যে জায়গাটার একটা নকসা আঁকল। ঘড়ি দেখে সময় নিল। আর পকেট-থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপের অংকটাও জেনে নিল। শেষ পর্যন্ত রাজকীয় ভঙ্গীতে অভিবাদন করে বলল:

"কাজ শেষ। ভদ্রজনরা, এবার কি আমরা ফিরে যাব?"

সে সরাইখানার পথ ধরল। জনতা চলল তার পিছনে। সকলেরই মুখে এই মহাপুরুষটির আলোচনা, তার প্রশংসা। মাঝে মাঝে এই শোচনীয় ঘটনার কারণ এবং কে এর কর্তা তা নিয়েও নানা রকম মতামত প্রকাশ চলতে লাগল।

ফার্গুসন বলল, "আমাদের মহা ভাগ্য যে তাকে এখানে পেয়েছি, কি বল হে তোমরা?"

হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল, "এটাই তো এই শতাব্দীর সব চাইতে বড় ঘটনা। কথাটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। বুঝলে তো আমি কি বলছি?"

কামার জেক পার্কার বলল, "এই খনি-শিবিরের নাম ছড়াবে। তাই নয় কি ওয়েলস্ ফার্গো?"

"দেখ, আমার মতামত যখন চাইছ তখন আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি: কালই 'স্ট্রেট ফ্লাশ' খনির দাম ছিল ফুট প্রতি দু' ডলার; আর আজ তো কেউ ষোল ডলারেও পাবে না।

"ঠিক বলেছ ওয়েলস্ ফার্গো! একটা নতুন খনি-অঞ্চলের এত বড় ভাগ্য কদাচিৎ দেখা যায়। দেখলে তো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ধুলো-ময়লা সবই কুড়িয়ে নিলেন? কী চোখ! কোন সূত্রই তার চোখ এড়ায় না।"

"ঠিক বলেছ। অন্যের কাছে এগুলোর হয় তো কোন অর্থই নেই; কিন্তু তার কাছে এরাই যেন একটা পুঁথি-বড় বড় অক্ষরে ছাপা।"

"এ কথা তো বেদ-বাক্যের মত সত্যি। কিন্তু কাজটা কে করেছে বলে মনে হয়?"

শক্ত প্রশ্ন। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। অনেকের নামই করা হল, আবার সেগুলো একে একে বাতিল করাও হল। ফ্লিণ্ট বাক্নারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তো শুধু হিলেয়ারের সঙ্গে; কারও সঙ্গে তো তার ঝগড়া-বিবাদও ছিল না; আসলে কেউ আলাপ-পরিচয় করতে গেলেও সে আমলই দিত না; অবশ্য কারও সঙ্গে সে এমন খারাপ ব্যবহার করত না যার ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে পারে। তবু গোড়া থেকেই একটা নাম সকলের জিভের ডগায়ই এসেছিল, যদিও উচ্চারিত হলে একেবারে সকলের শেষে-সে নামটি ফেট্লক জোন্স। প্যাট রিলেই কথাটা বলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে বলে উঠল, "আরে, তার কথা তো আমরা সকলেই ভেবেছি, কারণ ফ্লিণ্ট বাক্নারকে মেরে ফেলবার মত হাজার কারণ তার ছিল, আর সে এ কাজ করলে অন্যায়ও কিছু হত না। কিন্তু একটা কথা তো থেকেই যাচ্ছে-ঘটনাস্থলের ত্রিসীমানাতেও তো সে ছিল না।"

প্যাট বলল, "তা জানি; ঘটনার সময়ে সে তো বিলিয়ার্ড-রুমে আমাদের সঙ্গেই ছিল।"

"হ্যাঁ, ঘটনাটা ঘটবার একঘণ্টা আগে থেকেই সেখানে ছিল।"

"ঠিক তাই। বেচারির কপাল ভাল। তা না হলে তো সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহটা তার উপর গিয়েই পড়ত।"

৮

সরাইখানার খাবার ঘরের সব আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে; আছে শুধু পাইন কাঠের ছ' ফুট একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। টেবিলটাকে ঘরের এক পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর একটা চেয়ার পাতা হয়েছে তার উপরে। রাজকীয় গম্ভীর ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে আছে শার্লক হোমস। অন্য সকলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা লোকে ভর্তি। তামাকের ধোঁয়া ঘন হয়ে উঠেছে। সর্বত্র গভীর স্তব্ধতা।

সকলে যাতে আরও চুপচাপ থাকে সেজন্য মহাপুরুষটি হাত তুলে ইসারা করল; কয়েক মিনিট হাতটাকে সেই ভাবেই রাখল; সংক্ষেপে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল আর "হুম্-হুম্" বলে একের পর এক উত্তরগুলো লিখতে নিতে লাগল। এই ভাবেই উপস্থিত লোকজনদের কাছ থেকে সে ফ্লিণ্ট বাক্নারের স্বভাব, চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে সব খবরই জেনে নিল। তার থেকে এটাই জানা গেল যে, ফ্লিণ্ট বাক্নারকে খুন করবার মত রাগ গোটা শিবিরে একমাত্র মহাপুরুষটির ভাই-পোরই থাকা সম্ভব। মিঃ হোমস মৃদু হেসে ধীর গলায় প্রশ্ন করল:

"বিস্ফোরণের সময় ফেট্লক জোন্স কোথায় ছিল আপনারা কেউ জানেন কি?"

সকলে সশব্দে জবাব দিল:

"এ বাড়ির বিলিয়ার্ড-রুমে।"

"ওঃ। সে কি তখন সবে সেখানে এসেছিল?"

"একঘণ্টা আগে থেকেই সেখানে ছিল।"

"আচ্ছা। এটা তো প্রায়-প্রায়-আচ্ছা, বিস্ফোরণের জায়গাটা এখান থেকে কতটা দূর?"

"মাইল খানেক।"

"ওঃ। খুবই ভাল 'অ্যালিবাই' এটা নয়, কিন্তু-যাকগে। তাহলে এই ঘটনার সঙ্গে জোন্স ছেলেটার যে দূর সম্পর্কও ছিল সেটাও বাতিল হয়ে গেল। এবার এই দুর্ঘটনার যারা চাক্ষুস সাক্ষী তাদের ডাকা যাক; তাদের বক্তব্য আমরা শুনতে চাই।"

ছোট ছোট সূত্রগুলোকে বের করে হোমস সেগুলোকে একটা কার্ডবোর্ডের উপর সাজিয়ে হাঁটুর উপরে রাখল। ঘরভর্তি লোক রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল।

"আমরা লঘিমা ও দ্রাঘিমার মাপ মোটামুটি পেয়েছি, আর তা থেকেই দুর্ঘটনার সঠিক স্থানটাও নির্ণয় করতে পেরেছি। সেখানকার উচ্চতা, তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতাও আমরা জেনে নিয়েছি-এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ সেদিন রাতে ঠিক ঐ সময়টাতে খুনীর মানসিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা জানবার পক্ষে এই তথ্যগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।"

(জনতার সপ্রশংস গুঞ্জন: "জর্জের দিব্যি, কী গভীর চিন্তাধারা!")

হাঁটুর উপরকার সূত্রগুলোর উপর আঙ্গুল রেখে সে বলল, "এবার এই সব নীরব সাক্ষীকে তাদের বক্তব্য বলতে আহ্বান করা যাক।

"এখানে আছে সুতীর একটা খালি শিকারের থলে। এটা কি বলে? বলে: প্রতিহিংসা নয়, ডাকাতিই উদ্দেশ্য। আর কি বলে? বলে: খুনীর বুদ্ধিশুদ্ধি কম-অথবা বোকাও বলা যায় না কি? এ কথা কেমন করে বুঝলাম? কারণ কোন সুস্থ বুদ্ধির লোক বাক্‌নারের মত একটি প্রায় নিঃসম্বল লোককে খুন করার কথা ভাবত না। কিন্তু খুনী তো কোন অপরিচিত লোকও হতে পারে? এবারও থলেটাই জবাব দিক। ওটার ভিতর থেকে এই জিনিসটা বের করে নিলাম। এটা রূপোয় মোড়া এক খন্ড আগ্নেয় শিলা। জিনিসটা অদ্ভুত। পরীক্ষা করে দেখুন, আপনি-আপনি-আপনি। এবার ওটা ফিরিয়ে দিন। এ অঞ্চলের মাত্র একটি আকরিক ধাতু প্রবাহেই এ ধরনের আগ্নেয় শিলা পাওয়া যায়, আর সে প্রবাহটা প্রায় দু' মাইল বিস্তৃত। আমার মতে অদূর ভবিষ্যতে এই আকর-প্রবাহটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করবে আর তার ফলে এই অঞ্চলের দু'শ' জন মালিক স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে। আচ্ছা, সেই আকর-প্রবাহটির নাম বলুন তো দয়া করে।"

"সম্মিলিত খৃস্টীয় বিজ্ঞান ও মেরী আন!" সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল।

সকলে উন্মাদ আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল। অশ্রুসজল চোখে একে অন্যের সঙ্গে কর-মর্দন করতে লাগল।

অবস্থা শান্ত হলে মিঃ হোমস আবার বলতে আরম্ভ করল:

"তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি তথ্য প্রতিষ্ঠিত হল; যথা খুনী কিছুটা অল্পবুদ্ধি; সে কোন অপরিচিত লোক নয়; তার উদ্দেশ্য ডাকাতি, প্রতিহিংসা নয়। এবার শুরু করা যাক। আমার হাতে একটুকরো পল্‌তে আছে, তাতে আগুনে পোড়ার গন্ধ এখনও পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি সাক্ষী দিচ্ছে? আগ্নেয় শিলার পরিপূরক সাক্ষী হিসাবে বিবেচনা করলেই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খুনী একজন খনি-কর্মী। আর কি বলছে? বলছে: খুনীর হেপাজতে বিস্ফোরকদ্রব্য ছিল। আর কি? এই বিস্ফোরকদ্রব্য বাড়ির রাস্তার দিকে বসানো হয়েছিল-বাড়ির সম্মুখ দিকে-কারণ ঘটনাস্থলের ছ' ফুটের মধ্যে আমি সেটা দেখতে পেয়েছিলাম।

"সুইডেনে তৈরি দেশলাইয়ের একটা কাঠি আমার আঙ্গুলে ধরা আছে-যে ধরনের কাঠি বাক্সের গায়ে ঘসে জ্বালানো হয়। বিধ্বস্ত ঘরটা থেকে ছ' শ' বাইস ফুট দূরে রাস্তার উপর আমি এটা পেয়েছি। এটা কি বলে? বলে: ঐখানেই পল্‌তেয় আগুন দেওয়া হয়েছিল। আর কি বলে? বলে: খুনী লোকটি ন্যাটা। কি করে জানলাম? সেটা আপনাদের ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না; চিহ্নগুলো এতই সূক্ষ্ম যে

এইমাত্র দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর অভিনিবেশের ফলেই সেটা বোঝা সম্ভব। কিন্তু লক্ষণগুলো সবই এখানে রয়েছে, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এমন একটি ঘটনা যেটা যে কোন ভাল গোয়েন্দা কাহিনীতেই আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন-সেটা হল, সব খুনীরাই ন্যাটা হয়।"

সশব্দে নিজের উরুতে একটা থাপ্পড় কসিয়ে হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলে উঠল, "জ্যাকসনের দিব্যি, তাই তো বটে! কী আশ্চর্য, এ কথাটা আমি আগে ভেবে দেখি নি।"

আরও কয়েকজন বলে উঠল, "আমিও না!" "আমিও না!" "কিছুই ওর চোখ এড়ায় না-চোখ দুটোর দিকে তাকাও!"

"ভদ্রজনরা, নিহত শিকারের কাছ থেকে খুনী যত দূরেই থাকুক না কেন, তবু সে আঘাতের হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায় নি। এই যে কাঠের টুকরোটা এখন আপনাদের দেখাচ্ছি এটা তাকে আঘাত করেছিল। ফলে রক্ত ঝরেছিল। সে যেই হোক এই আঘাতের গোপন চিহ্ন তার শরীরে দেখতে পাওয়া যাবে। আগুন ধরাবার সময় সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই আমি এটাকে কুড়িয়ে পেয়েছি।" উঁচু আসন থেকে সে সকলের দিকে চোখ ফেরাল; তার মুখ কালো হয়ে উঠল; ধীরে ধীরে হাত তুলে একজনকে দেখিয়ে বলল:

"ঐ যে খুনী দাঁড়িয়ে আছে!"

মুহূর্তের জন্য সারা ঘরটা যেন বিস্ময়ে পঙ্গু হয়ে রইল। তার পরেই বিশটি কণ্ঠ একসঙ্গে ফেটে পড়ল:

"স্যামী হিলেয়ার? কী সাংঘাতিক, না! সে? এ যে চূড়ান্ত বোকামি!"

"খুব সাবধানে ভদ্রজনরা-ব্যস্ত হবেন না। দেখুন-ভুরুতে রক্তের দাগ।"

হিলেয়ার ভয়ে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল। বুঝি বা কেঁদেই ফেলবে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল; যেন প্রত্যেকের কাছেই সাহায্য ও সহানুভূতি চাইছে; তারপর হোমসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল:

"বলবেন না, বলবেন না! আমি এ কাজ করি নি; আমার কথা বিশ্বাস করুন, এ কাজ আমি করি নি। কপালের এই ঘা-টা কেমন করে হয়েছিল-"

হোমস চেঁচিয়ে বলল, "কন্স্টেবল, একে গ্রেপ্তার কর। কথা দিচ্ছি, পরোয়ানাটা পরে দেব।"

কন্স্টেবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুটা এগিয়ে গেল-ইতস্তত করল-তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

হিলেয়ার পুনরায় কাতর আবেদন জানাল: "আর্চি, এ কাজ করতে ওদের দিও না; এর ফলে আমার মায়ের মৃত্যু হবে! এ আঘাতটা কেমন করে পেয়েছি তা তো তুমি জান। ওদের সে কথা বল; আমাকে বাঁচাও আর্চি; আমাকে বাঁচাও!"

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে স্টিলম্যান বলল:

"হ্যাঁ, আমি তোমাকে বাঁচাব। ভয় পেয়ো না।" তারপর জনতাকে লক্ষ্য করে বলল, "ও যেভাবেই আঘাতটা পেয়ে থাকুক, তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনই সম্পর্ক নেই, আর সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও নয়।"

"ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন আর্চি, তুমিই সত্যিকারের বন্ধু!"

"হুর্‌রে আর্চি! যাও তো বাবা, ওদের থ্যাতা নাক ভোতা করে দাও।"

সকলে একবাক্যে গর্জে উঠল। একদিকে বন্ধুর জন্য গর্ববোধ, আর অন্যদিকে তার প্রতি আনুগত্যবোধ-এই দু'য়ে মিলে সমস্ত পরিস্থিতির রংটাই বদলে দিল।

একটু চুপ করে থেকে গোলমাল থামলে স্টিলম্যান বলল: "টম জেফ্‌রিসকে আমি বলব ওদিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে, আর কনস্টেবল হ্যারিসকে বলব অন্য দরজায় দাঁড়াতে। দেখবেন, কেউ যেন এ ঘর থেকে বেরিয়ে না যায়।"

"যেমন বলা তেমনই কাজ। তুমি চালিয়ে যাও!"

"আমার বিশ্বাস, অপরাধী এখানেই আছে। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়ে থাকে অচিরেই তাকে আপনারা দেখতে পাবেন। এবার আসুন শোচনীয় দুর্ঘটনার আগাগোড়া সব কথাই আপনাদের বলব। খুনের উদ্দেশ্য ডাকাতি নয়, উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা। খুনী, স্বল্পবুদ্ধি নয়। দু' শ' বাইশ ফুট দূরে সে দাঁড়িয়ে ছিল না। কাঠের টুকরো ছিট্‌কে এসে তার গায়ে লাগে নি। ঘরের গায়ে সে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখে নি। সে শিকারের থলে সঙ্গে নিয়ে আসে নি এবং ন্যাটাও নয়। এই সব ভুলগুলি বাদ দিলে মাননীয় অতিথির বক্তব্য মোটামুটি ঠিক।"

ঘরের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল; বন্ধুবন্ধুর দিকে মাথা নেড়ে যেন বলল, "তলে তলে এইটেই তো আসল কথা। বাহাদুর ছেলে বটে। কিছুতেই হার মানবে না!"

অতিথির প্রশান্তি তবু অবিচলিত। স্টিলম্যান বলতে লাগল:

"আমারও কিছু সাক্ষীসাবুদ আছে; সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে তাও আপনাদের বলছি।" একটু রো মোটা তার তুলে ধরল। সেটা দেখবার জন্য জনতা ঘাড় খাড়া করল। "এটার গায়ে গলানো চর্বির একটা প্রলেপ দেওয়া আছে। আর আছে এই আধ-পোড়া মোমবাতিটা। বাকি অংশটায় এক ইঞ্চি পর পর দাগ কাটা আছে। এই জিনিসগুলি কোথায় পেলাম তাও বলছি। যুক্তি-বিচার, অনুমান, সূত্রগুলোকে নানা ভাবে সাজানো এবং পেশাদার গোয়েন্দারা অন্য যে সব নাটকীয় ভাবভঙ্গী দেখিয়ে তাকে সে সব তুলে রেখে সহজ সরলভাবে আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলব কেমন করে এই শোচনীয় ঘটনাটি ঘটেছে।"

সে একমুহূর্ত থামল; নীরবতা ও উৎকণ্ঠার সাহায্যে সমবেত জনতার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলতে কিছুটা সময় নিল; তারপর আবার বলতে লাগল:

"অনেক কষ্ট করেই খুনী তার পরিকল্পনার ছকটা এঁকেছিল। ছকটা খুবই ভাল, কৌশলপূর্ণ; এতে তার বুদ্ধিদীপ্ত মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়, স্বল্পবুদ্ধির নয়। যাতে উদ্ভাবনকারীর উপর কোন রকম সন্দেহ না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রেখেই পরিকল্পনাটা করা হয়েছিল। প্রথমেই মোমবাতিটার গায়ে এক ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে দাগ কেটে এমন ভাবে সেটাতে আগুন ধরিয়েছিল যাতে নির্দিষ্ট সময়ে সেটা কার্যকরী হতে পারে। সে পরীক্ষা করে দেখেছিল যে মোমবাতিটার চার ইঞ্চি পুড়তে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। যতক্ষণ ধরে এই ঘরে ফ্লিণ্ট বাক্‌নারের চরিত্র ও গতিবিধি সম্পর্কে তদন্তের কাজ চলছিল ততক্ষণে উপরের ঘরে বসে আধ ঘণ্টা যাবৎ এটাই আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখছিলাম। আর তা থেকেই বুঝতে পেরেছি, হাওয়া থেকে নিরাপদে রাখলে মোমবাতিটা পুড়তে কি রকম সময় লাগে। মোমবাতিটা কি হারে পোড়ে সেটা দেখে নিয়ে অপরাধী মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়েছিল-সেটাই এতক্ষণ আপনাদের দেখালাম-আর তারপরে আর একটা মোমবাতিতে দাগ কেটে নিয়েছিল।

"নতুন মোমবাতিটাকে সে একটা টিনের মোমবাতি-দানের মধ্যে বসিয়ে দেয়। তারপর ঠিক পাঁচ ঘণ্টার দাগের কাছে গরম তার দিয়ে মোমবাতিটার ভিতরে একটা গর্ত করে নেয়। সে তারটা আপনাদের আগেই দেখিয়েছি-তারটার গায়ে চর্বি গলিয়ে ঠাণ্ডা করে প্রলেপের মত করে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"ফ্লিণ্ট বাক্‌নারের ঘরের পিছন দিককার খাড়া পাহাড়ের গায়ে যে ঘন ঝোপ-জঙ্গল আছে, কষ্ট করে-বলা উচিত কঠোর পরিশ্রম করে একটা খালি ময়দার পিপে টানতে টানতে সে জঙ্গল বেয়ে সে উঠে আসে। সেই নিরাপদ গুপ্তস্থানে সেটাকে রেখে তার নীচে মোমবাতিদানটাকে বসিয়ে দেয়। তারপর প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট পলতে মেপে নেয়-ঘর থেকে পিপেটা ততটা দূরেই ছিল। পিপের পাশে একটা গর্ত করে-এই সেই বড় ভ্রমর যেটা দিয়ে এ কাজটা সে করেছিল। সব কিছু ঠিকঠাক করে পলতের একটা দিক রাখে বাক্‌নারের ঘরের সঙ্গে, আর অপর দিকে একটা খাঁজ কেটে মোমবাতির গর্তের মধ্যে সেটাকে ঢুকিয়ে দেয়-এমন ভাবে সময় বেঁধে দেয় যাতে গতকাল সন্ধ্যা আটটা নাগাদ মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলে আজ সকাল একটার সময় বিস্ফোরণটা ঘটে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি এই ভাবেই কাজটা করা হয়েছিল। পিপেটা জঙ্গলের মধ্যেই আছে, বাকি মোমবাতিটাও আছে টিনের মোমবাতিদানের ভিতরে, পোড়া পল্‌তেটা আছে সেই ভ্রমর দিয়ে করা গর্তের মধ্যে আর অপর অংশটা নেমে গেছে ঠিক সেখানে যেখানে উড়ে-যাওয়া

ঘরটা ছিল। অধ্যাপক যখন এখানে বসে অবান্তর ঘটনাকে বাতিল করছিলেন আর এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন সব খুঁটিনাটি জিনিস সংগ্রহ করছিলেন, সেই ফাঁকে ঘণ্টাখানেক বা দু' ঘণ্টা ধরে আমি এই সব কিছু নিজের চোখে দেখে এসেছি।"

সে থামল। ঘরের মানুষগুলো একটা লম্বা শ্বাস টেনে হাত-পাগুলোকে টান করে খুসির মেজাজে হাসিতে ফেটে পড়ল। হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল, "বাহাদূর বটে! তাই তো অধ্যাপকের পিছনে ঘুর-ঘুর না করে সে বনে জঙ্গলে টুঁ মেরে বেড়াচ্ছিল। তবেই বোঝ-ছেলেটা বোকা নয়।"

স্টিলম্যান আবার কথা বলতে শুরু করল:

"এক বা দু' ঘণ্টা আগে আমরা যখন বাইরে গিয়েছিলাম তখনই ঐ ভ্রমর ও মোমবাতির মালিক ঐ জিনিস দুটোকে লুকনো স্থান থেকে নিয়ে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে আরও একটা ভাল জায়গায় গিয়ে পাইনের কাঁটা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখে। সেখানেই আমি সেগুলিকে দেখতে পেয়েছিলাম। ভ্রমরটা পিপের ছিদ্রের সঙ্গে ঠিক মিলেও গেছে। আর এখন-"

মহাপুরুষটি বাধা দিল। ব্যঙ্গের সুরে বলল:

"ভদ্রজনরা, একটা সুন্দর রূপকথা তো শোনা গেল-সত্যি খুব সুন্দর। এবার আমি এই যুবককে দু' একটা প্রশ্ন করতে চাই।

উপস্থিত কেউ কেউ ঠোঁট বাঁকাল। ফার্গুসন বলল:

"এবার বুঝি আর্চির সঙ্গে লেগে গেল।"

অন্য অনেকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তারা গম্ভীর হয়ে গেল। মিঃ হোমস বলল:

"পর পর সাজিয়ে বেশ সুশৃংখলভাবে এই রূপকথাটি কে পরীক্ষা করে দেখা যাক। পরীক্ষাটা হবে যাকে বলে জ্যামিতিক ক্রম অনুসারে-বিবরণগুলিক পরস্পর সন্নিবদ্ধ করে ক্ষমাহীন শৃংখলা ও অভ্রান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে অভিযান চালানো হবে এই টিনের তৈরি ভুলের খেলনা দুর্গের দিকে, অনভিজ্ঞ কল্পনার এই স্বপ্ন-মিনারের দিকে। হে তরুণ যুবক, শুরুতে আমি আপাতত আপনাকে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করতে চাই-হ্যাঁ, আপাতত। আমি কি ধরে নিতে পারি যে আপনার মতে উল্লেখিত মোমবাতিটা জ্বালানো হয়েছিল গতকাল রাত আটটা নাগাদ?"

"হ্যাঁ স্যার, আটটা নাগাদ।"

"ঠিক আটটায় কি?"

"না, অতটা সঠিক করে বলতে পারব না।"

"হুম। আপনি কি মনে করেন, ঠিক ঐ সময়ে কোন লোক সেখান দিয়ে গেলে তার সঙ্গে খুনীর দেখা হয়ে যেতে পারত?"

"হ্যাঁ, তাই মনে হয়।"

"ধন্যবাদ। কথা শেষ। তবে আবার বলছি, আপাতত-সবই আপাতত।"

অতিথির দিকে তাকিয়ে স্টিলম্যান বলল, "আমি স্বয়ং সেখানে হাজির ছিলাম সাড়ে আট-না, ন'টা নাগাদ।"

"বটে! চমৎকার-খুবই চমৎকার। তাহলে হয় তো খুনীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

"না। কারও সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।"

"ওঃ। তাহলে-মাফ করবেন-আপনার তথ্যের কোন প্রাসঙ্গিকতা আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"প্রাসঙ্গিকতা নেইও। আপাতত। আমি বলছি নেই-আপাতত।"

একটু থেমে আবার বলল: "খুনীর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কিন্তু তার খোঁজ যে পেয়েছি সেটা নিশ্চিত, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে সে এই ঘরেই আছে। আমি চাই, আপনারা সকলেই একে একে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাবেন-ঠিক এইখান দিয়ে যেখানে ভাল আলো আছে-যাতে আপনাদের পা দুটি আমি দেখতে পাই।"

ঘরময় উত্তেজনার গুঞ্জন উঠল। শুরু হল যাত্রা। অতিথিটি আপ্রাণ চেষ্টায় গম্ভীর হয়ে রইল, আর স্টিলম্যান চোখের উপর হাত রেখে প্রতি জোড়া পায়ের উপর কড়া নজর রাখল। একে একে পঞ্চাশজন চলে গেল,-কোন ফল হল না। ষাট, সত্তর। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন উদ্ভট মনে হতে লাগল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বরে মন্তব্য করল:

"মনে হচ্ছে আজ রাতে খুনীরা বড়ই দুর্লভ!"

উপস্থিত সকলেই বিদ্রূপটা উপভোগ করে হেসে উঠল। আরও দশ বারো জন প্রার্থী হেঁটে গেল-বরং বলা যায় ঠাট্টায় ভঙ্গীতে দুলে দুলে নেচে চলে গেল-আর তখনই হঠাৎ স্টিলম্যান হাত বাড়িয়ে বলল:

"এই সেই খুনী!"

"ফেট্লক জোন্স!" জনতা গর্জন করে উঠল। সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। নানা রকম মন্তব্য শোনা গেল।

গণ্ডগোল যখন চরমে উঠল তখন অতিথিটি হাত বাড়িয়ে সকলকে শান্ত হতে বলল। একটি বিখ্যাত নাম ও প্রবল ব্যক্তিত্বের রহস্যময় প্রভাব সকলকেই শান্ত হতে যেন বাধ্য করল। মর্যাদা ও আবেগের সঙ্গে অতিথি বলল:

"ব্যাপার গুরুতর। একটি নির্দোষ জীবনের উপর উদ্যত হয়ে আঘাত। অথচ সে সন্দেহাতীতভাবে নির্দোষ! সংশয়াতীতভাবে নির্দোষ। সেটাই আমি প্রমাণ করছি; সকলে শুনুন; দেখুন, একটি মাত্র সরল ঘটনা কেমন করে এই নির্বোধ মিথ্যাকে অনায়াসে মুছে দেয়। মন দিয়ে শুনুন। বন্ধুগণ, এই ছেলেটি গতকাল সন্ধ্যায় একবারও আমার দৃষ্টির বাইরে যায় নি!"

কথাগুলি সকলকেই প্রভাবিত করল। সকলেই জিজ্ঞাসায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে স্টিলম্যানের দিকে তাকাল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। স্টিলম্যান বলে উঠল:

"আমি জানতাম সেখানে আরও একজন ছিল।" দ্রুত টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে প্রথমে অতিথির পায়ের দিকে, তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি ছিলেন তার সঙ্গে! সে যখন মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিল যার ফলে পরে এক সময় গুঁড়ো পদার্থটা জ্বলে উঠেছিল তখন আপনি তার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজও দূরে ছিলেন না। [উত্তেজনা] আরও বড় কথা, দেশলাইটাও আপনি দিয়েছিলেন!"

স্পষ্টতই অতিথিটি আহত হল; অন্তত সকলের তাই মনে হল। কথা বলবার জন্য সে মুখ খুলল; কিন্তু কথাগুলি সহজভাবে মুখ থেকে বের হল না।

"এটা-মানে-এটা তো-পাগলামি-এটা-"

স্টিলম্যান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুলল না। একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি তুলে দেখাল।

"এই দেখুন একটা কাঠি। এটা পেয়েছি পিপেটার মধ্যে-এই যে আরও একটা।"

অতিথি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল:

"হ্যাঁ-আপনি নিজেই এগুলো সেখানে রেখে দিয়েছিলেন!"

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। স্টিলম্যান পাল্টা জবাবে বলল:

"এটা মোমের তৈরি-এ জিনিস এ শিবিরের কেউ দেখে নি। এর বাক্সটার খানাতল্লাসীর ব্যাপারে আমি প্রস্তুত আছি। আপনিও প্রস্তুত কি?"

এবার অতিথি বিচলিত হয়ে উঠল-অতি বড় নির্বোধের চোখেও সেটা ধরা পড়ল। সে হাত দুটি নাড়ল, বার দুই ঠোঁট ও নাড়ল, কিন্তু কথা বের হল না। সকলে সাগ্রহ উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ। ইতিমধ্যে স্টিলম্যান শান্তভাবে বলল:

"আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি।"

কয়েক মুহূর্ত আবার চুপচাপ; তারপর নীচু গলায় অতিথি বলল:

"তল্লাসীতে আমার আপত্তি আছে।"

কেউ হৈ-হল্লা করল না বটে, কিন্তু একের পর এক একই কথা অস্পষ্ট গলায় উচ্চারিত হল:

"তাহলে তো বোঝাই গেল! ইনি এখন আর্চির হাতের মুঠোয়!"

এখন কি করা হবে? কেউ তা জানে না। সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা বড়ই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হল-কারণ সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে যার জন্য এই সরল মানুষগুলি মোটেই প্রস্তুত ছিল না; তাই হঠাৎ আঘাত লেগে থেমে যাওয়া ঘড়ির মত তারাও কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রটা আবার চলতে শুরু করল, দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে আলোচনা শুরু হল, নানা প্রস্তাব নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করবার পরে একটা প্রস্তাব মোটামুটি ভাবে সমর্থিত হল: ফ্লিণ্ট বাকনারকে সরিয়ে দেবার জন্য খুনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথার লোকরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল; তারা বলল, পূর্বাঞ্চলীয় রাস্ট্রসমূহের পচা মাথাওয়ালা লোকগুলো এটাকে একটা কেলেংকারি বলে রটনা করে বোকার মত হৈ-চৈ শুরু করে দেবে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথারই জয় হল; তাদের প্রস্তাবেই সকলে সম্মতি দিল; তাদের দলপতি সকলকে শান্ত হতে বলে তাদের প্রস্তাবটি ঘোষণা করল: ফেট্লক জোন্সকে কারাগারে পাঠিয়ে তার বিচারের ব্যবস্থা করা হোক।

প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। আপাতত আর কিছু করারও নেই। এই ব্যবস্থায় সকলে মোটামুটি খুসিই হল, কারণ ভিতরে ভিতরে সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, কতক্ষণে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পারবে পিপে ও অন্যান্য জিনিসগুলি সেখানে সত্যি আছে কি না।

কিন্তু না-যাত্রায় বাধা পড়ল। বিস্ময়ের তখনও শেষ হয় নি। প্রথমটায় ফেট্লক জোন্স সকলের অলক্ষ্যেই নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল; কিন্তু যখন তার গ্রেপ্তার ও বিচারের কথা ঘোষণা করা হল তখন সে হতাশ হয়ে বলে উঠল:

"না! কোন লাভ নেই। আমি জেলে যেতে চাই না; বিচারও চাই না; আমার দুর্ভগ্যের অন্ত নেই, দুঃখ-দুর্দশারও শেষ নেই। আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও; সব শেষ করে দাও। সবই প্রকাস পাবে-কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। সে এমনভাবে সব কথা বলে দিল যেন সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল-জানি না এ সব কথা সে জানল কেমন করে। সেখানে গিয়ে আপনারাও পিপে ও অন্য জিনিসগুলি দেখতে পাবেন; তখন আর আমার কোন আশাই থাকবে না। আমি তাকে খুন করেছি; আপনারা হলেও তাই করতেন; সে যদি আপনাদের সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করত। আর আপনারা আমার মতই ছেলেমানুষ হতেন,-দুর্বল, গরিব, সাহায্য করবার মত একটি বন্ধুও নেই-"

হ্যাম স্যাণ্ডুইচ চেঁচিয়ে বলল, "তাকে ঠাণ্ডা করেছ বেশ করেছ! তোমরা সকলেও দেখ বাছারা-"

কন্‌স্টেবলদের মধ্যে থেকে: "গোলমাল নয়! গোলমাল নয়!"

একটি কণ্ঠস্বর: "তুমি যা করতে যাচ্ছিলে তা কি তোমার খুড়ো জানতেন?"

"না, জানতেন না।"

"তিনি কি সত্যি সত্যি দেশলাইয়ের কাঠি তোমাকে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কি জন্য আমি চাইছি তভা তিনি জানতেন না।"

"তুমি যখন এমন একটা কাজে বেরিয়ে গেলে তখন গোয়েন্দা জেনেও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ঝুঁকি তুমি নিলে কেন? ব্যাপার কি বল তো?"

ছেলেটি ইতস্তত করতে লাগল; বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সলজ্জভাবে বলল:

"গোয়েন্দাদের আমি চিনি, কারণ তারা তো আমার পরিবারেরই মানুষ; তাই কোন কাজ যদি তাদের না জানাতে চান তো তার সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে কাজটা করবার সময় তাদের কাছাকাছি রেখে দেওয়া।"

হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে সকলে তার এই সরল জ্ঞানের বাণীকে সম্বর্ধনা জানাল; কিন্তু তাতে বেচারির বিভ্রান্তি কিছুমাত্র কমল না।

৯

মিসেস স্টিলম্যানকে লেখা চিঠি থেকে; তারিখের ঘরে লেখা শুধু মঙ্গলবার।

একটা অব্যবহৃত কাঠের ঘরে ফেট্লক জোন্সকে তালা-চাবি বন্ধকরে বিচারের অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হল। কন্স্টেবল হ্যারিস তার দু' দিনের খাবার ব্যবস্থা করে দিল, নিজের উপর ভালভাবে নজর রাখতে বলল, এবং কথা দিল যে আবার খাবারের প্রয়োজন হলেই সে তার সঙ্গে দেখা করবে।

পরদিন সকালে আমরা জন কুড়ি লোক বন্ধুত্বের খাতিরে হিলেয়ালের সঙ্গে গিয়ে তার স্বর্গত আত্মীয় বাক্নারের সৎকারের কাজে সাহায্য করলাম। হিলেয়ার হল প্রধান শবাধারবাহী, আর আমি হলাম তার প্রথম সহকারী। সবে কাজকর্ম সব শেষ করেছি এমন সময় ছেঁড়া পোশাক পরা একটি বিষণ্ণ অপরিচিত লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাথা নীচু করে আমাদের পাশে এল। সঙ্গে সঙ্গে নাকে লাগল সেই গন্ধযাকে আমি সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি! আমার নিঃশেষিতপ্রায় আমার রাজ্য সে গন্ধযেন স্বর্গের সুবাস বয়ে আনল।

মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে তার কাঁধে হাত রাখলাম। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সকলেই ছুটে এল। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত জোড় করে কাঁপা গলায় অনুরোধ জানাল, আমি যেন তাকে আর যন্ত্রণা না দেই। বলল:

"শার্লক হোমস, তুমি আমাকে সারা পৃথিবী তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ, অথচ ঈশ্বর সাক্ষী, কোন মানুষের কোন ক্ষতি আমি করি নি।"

তার অর্থহীন চোখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, লোকটা পাগল। মাগো, এটা আমারই কৃতকর্মের ফল। সেই মুহূর্তে মনে হল, কোন দিন হয় তো তোমার মৃত্যু-সংবাদে এই দুঃখেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সকলে এসে তাকে তুলে ধরল, তার চারদিকে ভিড় দাঁড়াল, করুণাপরবশ হয়ে অনেক আশা ও আশ্বাসের কথা তাকে শোনাল-সে এখন বন্ধুজনের মধ্যেই আছে, তারাই তার যত্ন নেবে, তাকে আশ্রয় দেবে, যে কেউ তার গায়ে হাত তুলবে তাকেই শেষ করে ফেলবে। খনি-শিবিরের কাঠ-খোট্টা লোকগুলোর স্বভাবই এই: তাদের অন্তরের দক্ষিণ দিকটায় যদি সাড়া জাগাতে পার তো তারা তোমার মায়ার মত; আর যদি জেগে ওঠে অন্তরের বিপরীৎ দিকটা তো তারাই হয়ে ওঠে দুরন্ত, যুক্তিহীন। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সকলে সাধ্যমত অনেক কিছুই করল, কিন্তু কোন ফল হল না। শেষটায় সুকৌশলী ওয়েলস ফার্গুসন বলল:

একমাত্র শার্লক হোমসই যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে তোমার আর কোন ভয়ের কারণ নেই।"

বন্ধুহীন পাগল সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "কেন?"

"কারণ সে আবার মরেছে।"

"মরেছে! মরেছে! আঃ, আমার মত একটা হতভাগার সঙ্গে তোমরা মস্করা করো না। সে মারা গেছে? সত্যি-সে কি সত্যি কথা বলছে বাছারা?"

"ঠিক যেমন তুমি দাঁড়িয়ে আছ তেমনিই সত্যি!" হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল। অন্য সবাই সমস্বরে তাকে সমর্থন করল।

ফার্গুসন বলল, "গত সপ্তাহে সে যখন তোমাকে খুঁজে ফিরছিল তখন সান বার্নার্ডনোতে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছিল। সে জন্য তারা দুঃখিত, কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই।"

সবজান্তার মত হ্যাম স্যাণ্ডুইচ বলল, "তাকে স্মরণ করে তারা একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছে।"

"জেমস ওয়াকার" একটা দীর্ঘশ্বাস টানল-স্বস্তির শ্বাস-কিন্তু মুখে কিছু বলল না; তার চোখের উদাস ভাব কিছুটা কমল, মুখটাও বেশ পরিস্কার হল, দৃষ্টির বিষণ্ণতাও কিছুটা হ্রাস পেল। সকলে বাড়ি ফিরে গেলাম। ছেলেরা মিলে যথাসম্ভব ভাল রান্নাবান্না করে তাকে খাওয়াল; এদিকে হিলেয়ার ও আমি নিজেদের নতুন পোশাক দিয়ে তাকে টুপি থেকে জুতোর ফিতে পর্যন্ত সব কিছু দিয়ে সাজালাম; একজন শান্তশিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মত করে তুললাম।" "বৃদ্ধ" কথাটাই ঠিক, যদিও কিছুটা দুঃখজনক বটে। নুয়ে-পড়া দেহ, চুলে বরফের কুঁচি, আর মুখের উপর দুঃখ-দুর্দশার অনিবার্য ছাপ-এ সব মিলিয়ে তাকে বুড়ো করেই তুলেছে, যদিও বয়সের হিসাবে এখনও সে যুবক। সে খেতে লাগল, আর আমরা ধূমপান করতে করতে গল্প করতে লাগলাম। খাওয়া শেষ হলে তবে তার কথা বলার মত শক্তি ফিরে এল। স্বেচ্ছায় সে তখন তার অতীত ইতিহাস আমাদের শোনাল। ঠিক ঠিক তার কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারব না; তবে যথাসম্ভব চেষ্টা করব।

"ভুল লোক" -এর কাহিনী

ঘটনাটা এই রকম: আমি তখন ডেন্ভার-এ। সেখানে আমি অনেক দিন ছিলাম; ঠিক কতদিন ছিলাম সেটা কখনও মনে করতে পারি, আবার কখনও পারি না-অবশ্য তাতে কিছু আসে-যায় না। হঠাৎ সে স্থান ছেড়ে যাবার একটা নির্দেশ পেলাম, অন্যথায় অনেক অনেক বছর আগে পূর্বাঞ্চলে একটি ভয়ংকর অপরাধের দায়ে আমাকে ধরিয়ে দেওয়া হবে।

সে অপরাধের কথা আমি জানতাম, কিন্তু আমি সে অপরাধী নই, সে একই নামের আমার এক জ্ঞাতি ভাই। সে অবস্থায় কি করব? ভয়ে আমার মাথা গুলিয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সময়ও দেওয়া হল অত্যন্ত অল্প-মনে হয় মাত্র একটি দিন। সব কথা ফাঁস হলে আমার সর্বনাশ হবে; বিনা বিচারে তারা আমাকে শাস্তি দেবে, আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবে না। জনতার বিচারই এই রকম; পরে যখন বুঝতে পারে তাদের ভুল হয়েছে, তখন দুঃখ প্রকাশ করে; কিন্তু তখন তো অনেক দেরি হয়ে যায়-ঠিক যেমনটি হয়েছে মিঃ হোমসের বেলায়। তাই স্থির করলাম, সব কিছু বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে চলে যাব এবং হাওয়া থেমে গেলে প্রয়োজনীয় প্রমাণ-পত্র নিয়ে ফিরে আসব। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে চলে গেলাম পাহাড়ের ওপারে অনেক দূরে। ছদ্মনাম নিয়ে ছদ্মবেশে সেখানেই বাস করতে লাগলাম।

ক্রমেই নানা গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম; দুশ্চিন্তা বেড়ে চলল; এমন কি এক সময় নানা রকম ভূত দেখতে লাগলাম, তাদের কথা শুনতে লাগলাম। কোন বিষয় নিয়ে পরিস্কারভাবে ভাবনাচিন্তা করবার শক্তিও হারিয়ে ফেললাম। সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। মাথায় যন্ত্রণা হত। অবস্থা খারাপ হয়েই চলল; আরও অনেক ভূত, অনেক কথা তারা যেন সারাক্ষণই আমাকে ঘিরে থাকত; প্রথমে রাতের বেলায়, তারপরে তারা দিনেও হানা দিতে লাগল। তারা সর্বদাই আমার বিছানার চারদিকে ফিস্ফিস্ করে কথা বলত, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। ঘুম চলে গেল। বিশ্রামের অভাবে শরীরও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

তারপরেই অবস্থা সঙীন হয়ে উঠল। একদিন রাতে তারা ফিস্ফিসিয়ে বলল, "আমার তো কিছু করতে পারব না, কারণ আমরা তাকে দেখতে পাই না, কাজেই লোকদের কাছে তাকে ধরিয়েও দিতে পারি না।"

তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। একজন বলল: "শার্লক হোমসকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। বারো দিনের মধ্যে সে এখানে এসে পড়বে।"

তারা একমত হল, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলল, আনন্দে হি-হি করে হেসে উঠল। আমার বুক ভেঙে গেল, কারণ সে লোকটির কথা আমি পড়েছি; সুতরাং তার অতিমানবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শ্রান্তিহীন প্রচেষ্টার ফলে আমার যে কি অবস্থা হবে তা ভালই বুঝতে পারলাম।

ভূতরা তাকে আনতে চলে গেল, আর মাঝে রাতে বিছানা থেকে উঠে আমিও পালালাম। সঙ্গে শুধু একটা ছোট থলে। তার মধ্যেই আমার যথাসর্বস্ব-ত্রিশ হাজার ডলার; তার দুই-তৃতীয়াংশ এখনও থলের মধ্যেই আছে। চল্লিশ দিন পরে সেই লোকটি আমার খোঁজ পেয়ে গেল। কোন রকমে আবার পালিয়ে গেলাম। অভ্যাসবশত সরাইখানার খাতায় তার আসল নামটাই সে লিখে ফেলেছিল; অবশ্য পরে সেটা কেটে "ডাগেট বার্কলে" নামটা বসিয়ে দেয়। কিন্তু ভয় মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে তোলে; আমিও কাটাকুটির ভিতর থেকে আসল নামটা পড়তে পেরে হরিণের মত পালিয়ে গেলাম।

সাড়ে তিন বছর ধরে সে আমাকে পৃথিবীর সর্বত্র-প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ, অস্ট্রেলেসিয়া, ভারতবর্ষ-যত দেশের কথা তোমাদের মনে আসে সর্বত্র সে আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। তারপর ফিরে এসে মেক্সিকো হয়ে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত; একদণ্ড বিশ্রামও আমার কপালে জোটে নি। আজ আমি বড় ক্লান্ত! সে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, কিন্তু আমি কখনও তার বা অন্য কারও ক্ষতি করি নি।

তার কাহিনী এখানেই শেষ। বুঝতেই পারছ, সব কিছু শুনে এখানকার সকলেরই মন গলে গেল। আর আমি-তার প্রতিটি কথা আমার মনের যেখানে এসে লাগল সেখানেই যেন একটা ফুটো হয়ে বসে গেল।

স্থির হল, বৃদ্ধ লোকটি আমাদের সঙ্গেই থাকবে এবং আমার ও হিলেয়ারএর অতিথি হবে। ঠিক করলাম, খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে নিয়ে ডেন্‌ভার-এ ফিরে যাব এবং তার বিষয়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে দেব।

খনির লোকদের স্বভাব মতই হাড়-কাঁপানো কর-মর্দন করে সকলে বুড়ো লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরদিন ভোরে ওয়েলস ফার্গো ফার্গুসন ও হ্যাম স্যাণ্ডুইচ আস্তে আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গোপনে বলল:

"অপরিচিত বুড়োটির প্রতি খারাপ ব্যবহারের কথা সকলেই জেনে গেছে। সারা খনি-অঞ্চলটা তেতে উঠেছে। চারদিকে থেকে এসে তারা জড়ো হচ্ছ-অধ্যাপককে শাস্তি দিতে তারা বদ্ধপরিকর। কনস্টেবল হ্যারিস ফ্যাঁসাদে পড়ে গেছে। টেলিফোনে শেরিফকে খবর দিয়েছে। চলে এস!"

ছুটে গেলাম। অন্যের কথা জানি না কিন্তু আমি মনে মনে চাইছিলাম যে শেরিফ এসে পড়ুক; কারণ বুঝতেই তো পারছ, আমার কাজের জন্য শার্লক হোমসের ফাঁসি হোক এটা আমি চাইতে পারি না। শেরিফের কথা আমি অনেক শুনেছি; তবু নিশ্চিত হবার জন্য বললাম:

"তিনি কি উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাতে পারবেন?"

"উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাবেন! জ্যাক ফেয়ারফ্যাক্সও তা পারেন কি! আমার হাসি পাচ্ছে! পারবেন কি! আমার জানতে ইচ্ছা করছে!"

পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে চললাম। দূরাগত চিৎকার ও চেঁচামেচিতে শান্ত বাতাস ভরে উঠেছে; আমরা যত এগোচ্ছি, সে শব্দ ততই বাড়ছে। গর্জনের পর গর্জন, ক্রমেই জোরে, আরও জোরে, কাছে, আরও কাছে। অবশেষে সরাইখানার সামনেকার খোলা জায়গায় সমবেত জনতার কাছে যখন পৌঁছে গেলাম তখন তাদের চিৎকারে কানে তালা লাগবার মত অবস্থা। ড্যালি-র খাদ থেকে আগত কিছু ষণ্ডাগোছের লোক হোমসকে চেপে ধরেছে, সে কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত; ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি; তার বৃটিশ হৃদয়ে মৃত্যুর ভয় যদি বা থেকে থাকে তবু তার লৌহ-কঠিন ব্যক্তিত্ব সে ভয়কে সংযত করে রেখেছে, বাইরে তার তিলমাত্র প্রকাশ নেই।

ড্যালি-র দলের শ্যাড্‌বেলি হিগিন্স বলল, "সকলে ভোট দাও! তাড়াতাড়ি! ফাঁসি হবে, না গুলি?"

তার এক সঙ্গী চেঁচিয়ে বলল, "কোনটাই না। এক সপ্তাহের মধ্যে সে আবার বেঁচে উঠবে; একমাত্র পুড়িয়ে ফেললেই তবে তার স্থায়ী অবসান ঘটবে।"

আশপাশের শিবির থেকে সমাগত সব দলই বজ্র-গর্জনে তার কথা সমর্থন করে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে বন্দীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে চেঁচাতে লাগল: "আগুন! ভোটের ফল। আগুন!" টানতে টানতে তাকে ঘোড়ার খুঁটির কাছে নিয়ে গেল, তার দিকে পিঠ দিয়ে তাকে শিকল দিয়ে বাঁধল, গাছগাছালি এনে তার কোমর পর্যন্ত জমা করল। তার কঠিন মুখ কিন্তু এতটুকু কাঁপল না; পাতলা ঠোঁটে তখনও সেই ঘৃণার হাসি।

"দেশলাই! একটা দেশলাই আন!"

শ্যাডবেলি দেশলাইর কাঠি জ্বালাল, হাত দিয়ে বাতাস থেকে আড়াল করে ধরল, মাথা নীচু করল, তারপর পাইনের ডালের নীচে সেটাকে ধরল। জনতা নিশ্চুপ। ডালে আগুন ধরল; দু'এক মিনিটের মধ্যেই একটা ক্ষীণ শিখা জ্বলে উঠল। দূরাগত অশ্ব-ক্ষুরের শব্দ যেন শুনতে পেলাম-ক্রমে সেটা স্পষ্ট হল-আরও আরও স্পষ্ট, আরও; কিন্তু নিজেদের কাজে ব্যস্ত জনতা সেটা খেয়ালই করল না। দেশলাইর কাঠিটা নিভে গেল। আর একটা কাঠি ধরিয়ে লোকটি নীচু হল; আবার আগুনের শিখা দেখা গেল। এবার আগুনটা ছড়িয়ে পড়ল। কিছু কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে নিল। জল্লাদ লোকটি পোড়া কাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কীর্তি দেখতে লাগল। একটা পাহাড়ের মোড় ঘুরে ক্ষুরের শব্দ বজ্রগর্জনে দ্রুত আমাদের দিকে নেমে আসতে লাগল। পর মুহূর্তেই ধ্বনি উঠল:

"শেরিফ!"

জনতাকে সরিয়ে সে সোজা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল; ঘোড়াটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল; সে হাঁক দিল:

"হাই ভবঘুরের দল। সরে যাও!"

সকলেই কথামত কাজ করল। শুধু দলপতি ছাড়া। সে দাঁড়িয়েই রইল। হাত বাড়াল রিভলবার বের করতে। শেরিফ তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলল:

"হাত নামা ব্যাটা পাষণ্ড। লাথি মেরে আগুন নিভিয়ে ফেল্। এবার অপিরিচিতের বাঁধন খুলে দে।;

লোকটা তার কথামতই কাজ করল। শেরিফ তখন একটা বক্তৃতা দিল। ঘোড়াটাকে সামরিক ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে সে কথা বলতে লাগল। কথায় কোন উত্তাপ সঞ্চার না করে মাপমত সুচিন্তিত ভাষায় এমনভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করল যেটা তার চরিত্র ও পদমর্যাদারই অনুকূল।

তারপর বন্দীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আগন্তুক, আপনি কে আর এখানে কি করছিলেন?"

"আমার নাম শার্লক হোমস্! আমি কিছুই করি নি।"

নামের শব্দটাই শেরিফের উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। আবেগের সঙ্গে সে বলল, যে মানুষের অদ্ভুত সব কার্য-কলাপের ফলে তাঁর যশ ও কৃতিত্বের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অপূর্ব সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটের গুণে সেই সব কার্যকলাপের ইতিহাস প্রতিটি পাঠকের হৃদয় জয় করেছে, আমাদের নক্ষত্র ও রেখালাঞ্ছিত পতাকার তলে এসে সেই মানুষের উপরেই নেমে এসেছে এমন অন্যায় উৎপীড়ণ-এটা আমাদের দেশের পক্ষে এক মহা কলঙ্ক। সমস্ত জাতির হয়ে শেরিফ তার কাছে ক্ষমা চাইল, আনত হয়ে হোমসকে অভিবাদন জানাল, কনস্টেবল হ্যারিসকে নির্দেশ দিল হোমসকে যেন তার বাসায় পৌঁছে দেয় এবং তার উপর যেন আর কোন রকম নির্যাতন না হয়। তারপর জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: "যার যার গর্তে পালাও, নীচাশয়ের দল!" সকলে চলে গেল। তখন সে আবার বলল: "শ্যাডবেলি আমার সঙ্গে চল; তোমার ব্যবস্থা আমি নিজের হাতে করব। না-পিস্তলটা রাখ; ওটার জন্য যেদিন আমি তোমাকে ভয় করব সেদিন গত বছরের একশ' বিরাশি জনের দলে যোগ দেবার সময় আমার হবে।" সে ধীরগতিতে ঘোড়া চালাল; শ্যাডবেলি চলল তার পিছনে পিছনে।

প্রাতরাশের সময় হলে আমরা যখন বাসার দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় খবর এল, ফেট্‌লক জোন্স গত রাতেই হাজত থেকে পালিয়েছে; সে উধাও! সে জন্য কেউ দুঃখিত হল না। খুড়োর যদি ইচ্ছা হয় তো তার খোঁজ করুক; তার তো সেটাই কাজ; শিবিরের লোকদের তাতে কোনও আগ্রহ নেই।

১০

দশ দিন পরে।

"জেমস ওয়াকার" এখন শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেয়েছে; তার মনের উন্নতি দেখা যাচ্ছে। আগামী কাল সকালে তাকে নিয়ে ডেন্‌ভার যাচ্ছি।

পরদিন রাত। ছোট স্টেশন থেকে ডাকে দেওয়া সংক্ষিপ্ত চিঠি।

আজ সকালে যাত্রা মুহূর্তে হিলেয়ার আমার কানে কানে বলল: "যখন তুমি নিরাপদ মনে করবে, যখন বুঝবে যে এতে তার মনটা বিচলিত হয়ে তার আরোগ্যের পথে বিঘ্ন ঘটাবে না, তখন ওয়াকারকে খবরটা দিও: পুরনো দিনের যে অপরাধের কথা সে বলেছে সেটা করেছিল তারই এক জ্ঞাতি ভাই, সেও তাই বলেছে। আসল অপরাধীকে আমরা কাল কবর দিয়েছি-এ শতাব্দীর সেই সব চাইতে অসুখী মানুষটি ফ্লিণ্ট বাক্‌নার। তার আসল নাম ছিল জ্যাকব ফুলার!" মাগো, না জেনেই আমি তার শোকযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম, আর আমার সহায়তায়ই তোমার স্বামী ও আমার বাবা আজ কবরে শায়িত। তার বিশ্রাম নির্বিঘ্ন হোক।

১৯০২

জীবনের পাঁচটি বর

The Five Boons of Life

১

জীবনের প্রভাতকালে একটি ভাল পরী তার ঝুড়ি নিয়ে এসে বলল:

"এতে কতকগুলি উপহার আছে। একটি নাও, বাকিগুলি রেখে দাও। সাবধান, খুব বুদ্ধি করে পছন্দ করো; আহা; খুব বুদ্ধি করে পছন্দ করো! কারণ এদের মধ্যে শুধু একটিই মূল্যবান।"

উপহার ছিল পাঁচটি: যশ, ভালবাসা, অর্থ, সুখ, মৃত্যু।

একটি যুবক সাগ্রহে বলল: "চিন্তা করার কোন দরকার নেই;" সে সুখ পছন্দ করল।

সে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ল আর যৌবনে উপভোগ করার মত সমস্ত সুখ খুঁজে নিল। কিন্তু সময় এলে দেখা গেল সুখই স্বল্পস্থায়ী ও হতাশাব্যঞ্জক, ব্যর্থ এবং শূন্য; এবং তারা প্রত্যেকেই চলে যাবার সময় তাকে অবজ্ঞা করে যায়। অবশেষে সে বলল: "এতগুলো বছর আমি নষ্ট করলাম। যদি আর একবার পছন্দ করবার সুযোগ পেতাম, তাহলে বুদ্ধিমানের মত পছন্দ করতাম।"

২

পরী এসে বলল:

"চারটি উপহার বাকি আছে। আর একবার পছন্দ কর; আর মনে রেখ-সময় চলে যাচ্ছে আর এদের মধ্যে কেবল একটিই হলো মূল্যবান।"

লোকটি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল, তারপর "ভালবাসা" বেছে নিল; পরীর চোখে যে জল দেখা দিল তা সে লক্ষ্য করল না।

অনেক অনেক বছর পরে লোকটিকে একটা শূন্য বাড়িতে একটি মৃতদেহের পাশে বসে থাকতে দেখা গেল। সে আপনমনে বলছে: "একের পর এক তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে; আর এখন এখানে শুয়ে আছে সে, আমার শেষ প্রিয়তমা। নিঃসঙ্গতার পর নিঃসঙ্গতা এসে আমাকে বিধ্বস্ত করেছে; কারণ সেই বিশ্বাসঘাতক বণিক "ভালবাসা" আমাকে যে সুখের মুহূর্তগুলি বিক্রি করেছে তার প্রতিটির বিনিময়ে আমি তাকে দিয়েছি হাজার হাজার দুঃখময় মুহূর্ত। তাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকে অভিশাপ দিচ্ছি।"

৩

"আবার পছন্দ কর।" সেই পরী আবার বলল। "এতগুলো বছর নিশ্চয়ই তোমার শিক্ষা হয়েছে। তিনটি উপহার বাকি আছে। মনে রেখো-তার মধ্যে একটিই হলো মূল্যবান; তাই বুদ্ধি করে পছন্দ করো।"

লোকটি অনেকক্ষণ ভালব, তারপর বেছে নিল "যশ"; আর পরীটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল।"

অনেক বছর পার হয়ে গেলে সে আবার এল, এবং লোকটি যখন দিনের শেষে এক নির্জন জায়গায় বসে চিন্তা করছিল তখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানতো লোকটির মনের কথা:

"আমার নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িতে পড়ল, আমার প্রশংসা ছিল সকলের মুখে মুখে; কিছু সময়ের জন্য সেটা আমার ভালও লেগেছিল। কিন্তু সে কত অল্প সময়ের জন্য! তারপর এল ঈর্ষা; তারপর কুৎসা; তারপর ঘৃণা; তারপর লাঞ্ছনা। তারপর এল বিদ্রূপ, যাতে আছে শ্লেষের ইঙ্গিত। এবং সবশেষে এল করুণা, সব খ্যাতির অন্তিম শয্যা। হায়, খ্যাতির পরিণাম কী তিক্ত ও দুঃখবহ! প্রথমে লোকে কাদা

ছোড়ে, আর পরিণতিতে দেয় অবজ্ঞা আর অনুকম্পা।"

৪

"তবু আবার পছন্দ কর।" পরীর কণ্ঠ স্বর। "দুটি উপহার বাকি আছে। হতাশ হয়ো না। শুরুতে এদের মধ্যে কেবল একটিই ছিল মূল্যবান, এবং সেটি এখনও এখানে আছে।"

অর্থ-সেই তো শক্তি। আমি কী অন্ধই ছিলাম!" "এতদিন বেঁচে থেকে সুখ পাব। খরচ করব, উড়িয়ে দেব, সকলকে চমকে দেব। যারা আমাকে বিদ্রূপ করেছে, অবজ্ঞা করেছে, তারা আমার সামনে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে, আর আমি আমার ক্ষুধার্ত হৃদয় তাদের ঈর্ষায় পূর্ণ করব। মনের সমস্ত বিলাস, আনন্দ ও মনোহারী বস্তু, এবং দেহের যত সন্তুষ্টি মানুষের কাছে প্রিয়-সব আমি পাব। একের পর এক সব আমি কিনব! সমাদর, সম্মান, শ্রদ্ধা, পূজা-এই অতি সাধারণ পৃথিবী-জীবনের নকল রসের যে সমস্ত পসরা সাজিয়েছে তার সব আমি কিনব, কিনব, কিনব। অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর এতদিন বোকার মত পছন্দ করেছি; কিন্তু যা হাবর তা হয়েছে; তখন মূর্খ ছিলাম, তাই যা ভাল মনে হয়েছে তাই করেছি।"

তিনটি বছর পার হয়ে গেল; এমন একদিন এল যেদিন লোকটি একটি ছোট্ট চিলেকোঠা ঘরে বসে কাঁপছিল; শরীর শুকিয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে, পোশাক ছিঁড়ে গেছে; শুক্‌নো রুটির ছিল্‌কা চিবোতে চিবোতে বিড়বিড় করে বলছে:

"ধিক জীবনের সব উপহারকে, কারণ তারা শুধু ঠাট্টা আর গিল্‌টি করা মিথ্যাই। মিথ্যাই তাদের বলা হয়, উপহার। তারা উপহার নয় ঋণমাত্র। সুখ, প্রেম, যশ, অর্থ: এরা হলো ব্যথা, শোক, লজ্জা ও দারিদ্র্য-পৃথিবীর এই সমস্ত স্থায়ী হত্যের সাময়িক ছদ্মবেশ মাত্র। পরী ঠিকই বলেছিল, তার ভাঁড়ারে কেবল একটি উপহারই ছিল দামী, কেবল একটি উপহারই মূল্যহীন নয়। সে উপহার অপরিমেয়; যা মধুর ও প্রিয়, যা স্বপ্নহীন অনন্ত নিদ্রায় ডুবিয়ে দেয় সেই ব্যথাকে, যা দেহকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ, আর সেই লজ্জা ও শোককে যা মনকে কুড়ে কুড়ে খায়-তার সঙ্গে তুলনায় অন্য উপহারগুলি যে কত সস্তাও তুচ্ছ তা আমি আজ বুঝতে পারছি। সেই উপহার আমাকে এনে দাও! আমি ক্লান্ত, আমি বিশ্রাম করব।"

৫

পরী এল; আবার সঙ্গে নিয়ে এল চারটি উপহার; তার মধ্যে ছিল না "মৃত্যু"। সে বলল:

"আমি এক মায়ের আদরের ছোট্ট শিশুকে সেটা দিয়ে দিয়েছি। সে অজ্ঞান ছিল, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করত, আমাকে বলেছিল পছন্দ করে দিতে। কিন্তু তুমি তো আমাকে পছন্দ করে দিতে বল নি।"

"ওঃ, কি দুর্ভাগা আমি। আমার জন্য কি বাকি আছে?"

"যা তোমারও প্রাপ্য নয়: বৃদ্ধ বয়সের অসংযত আপমান।"

১৯০২

একটি কুকুরের কাহিনী

A Dog's Tale

আমার বাবা ছিল সেন্ট বার্নার্ড-বংশোদ্ভূত, মা ছিল মেষপালকের দলে, কিন্তু আমি পুরোহিত-বংশের সন্তান, (Presbyterian)। এ কথা মা আমাকে বলেছিল; আমি নিজে এ সব সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝি না। আমার কাছে এগুলি অর্থহীন বড় বড় কথা মাত্র। মা এ সব ভালবাসত; এ সব কথা বলতে তার ভাল লাগত; এত কথা সে জানল কি করে এ কথা ভেবে অন্য কুকুররা তাকে দেখে অবাক হত, ঈর্ষা বোধ করত। কিন্তু আসলে এটা কোন সত্যিকারের শিক্ষা নয়; এটা শুধু লোক-দেখানো: খাবার ঘরে ও বসবার ঘরে লোকজন এলে সে কান পেতে তাদের কথা শুনত; আবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রবিবার-বিদ্যালয়ে গিয়ে শুনে আসত; কোন বড় কথা শুনলেই সে বারবার সেটাকে মনে মনে আউড়ে রপ্ত করে নিত; তারপর আশেপাশে কুকুরদের কোন জমায়েত হলেই সেই কথাটাকে সেখানে ঝেড়ে দিত এবং ছোট আদুরে কুকুর থেকে বড় আকারের বলবান কুকুর পর্যন্ত সকলকেই অবাক করে দিত, ঘাবড়ে দিত, আর তাতেই তার সব দুঃখকষ্টের লাঘব হত। কোন আগন্তুক সেখানে হাজির থাকলে তার অবশ্যই সন্দেহ হত; সে কথাটার মানে জানতে চাইত। মাও মানেটা বলে দিত। অচেনা কুকুরটা কিন্তু এতটা আশা করত না, ভাবত মাকে জব্দ করবে; কিন্তু মা যখন মানেটা বলে দিত তখন সেই লজ্জা পেত, অথচ সে ভেবেছিল মাকেই লজ্জায় ফেলবে। অন্যরাও এর জন্যই অপেক্ষা করে থাকত; তার জন্য খুসি হত, গর্ববোধ করত, কারণ অভিজ্ঞতা থেকেই তারা জানত কি ঘটবে। মা যখনই একটা বড় কথার অর্থ বলে দিত তখনই তারা প্রশংসায় বিগলিত হয়ে ভাবত যে অর্থটা সঠিক হল কি না সে সন্দেহ পর্যন্ত কখনও কোন কুকুর করে নি; না করাটাই যে স্বাভাবিক, কারণ একদিকে সে এমন ঝটপট জবাবটা দেয় যে মনে হয় বুঝি একটা অভিধানই কথা বলছে, আর অন্য দিকে অর্থটা ঠিক কিনা সেটা তারা জানবেই বা কার কাছ থেকে? সেখানে তার মাই তো একমাত্র লেখাপড়া-জানা কুকুর। ক্রমে আমি যখন আরও বড় হলাম তখন একসময় মা একটা নতুন কথা আমদানি করল-অন-আঁতেল, এবং সারা সপ্তাহ ধরে নানা জমায়েতে কথাটা চালাতে লাগল; আর সেই সময়ই আমি লক্ষ্য করলাম যে সারা সপ্তাহে আটটা ভিন্ন ভিন্ন জমায়েতে তাকে কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করা হল আর প্রতিবারেই সে একটা করে নতুন সংজ্ঞা দিতে লাগল; তা থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে শিক্ষার চাইতে তার উপস্থিত বুদ্ধিটাই বেশী; কিন্তু মুখে কিছুই বলালাম না। একটা শব্দকে সে সব সময় হাতের কাছে রেখে দিত একটা রক্ষা-কবচের মত; হঠাৎ বে-কায়দায় পড়লে জরুরী আশ্রয় হিসাবে সেটার দিকে হাত বাড়াত-শব্দটা হল "সমার্থবাচক"। কখনও কোন নতুন শব্দের অর্থ নিয়ে গোলমালে পড়লেই সে অসংকোচে বলে দিত, "এটা হ-য-ব-র-ল-র সঙ্গে সমার্থবাচক", আর প্রশ্নকর্তা ভ্যাবাচেকা খেয়ে হাঁ করে থাকত।

বড় বড় বাক্য নিয়েও ওই একই ব্যাপার। গাল-ভরা কোন বাক্য পেলেই মা দুটি রাত ও দুটি বিকেল বারবার সেটাকে আউড়ে নানা জায়গায় নতুন নতুনভাবে সেটাকে বুঝিয়ে দিয়ে বেড়াত; তার কাছে বাক্যটাই বড়, তার অর্থ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই; তাছাড়া সে এটাও জানত যে তার ভুল হলেও সেটা ধরবার মত কেউ নেই। আবার মাঝে মাঝে সে এমন সব ছোট ছোট মজার কাহিনী শুনে আসনে যেগুলো বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে বাড়ির লোকজন ও অতিথিরা হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ত। অবশ্য যথারীতি সে একটা গল্পের মুড়োর সঙ্গে আর একটা গল্পের লেজ জুড়ে দিয়ে এক "বকচ্ছপ" গল্প বানাত যায় মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যেত না। তাই সেই সব গল্প বলতে বলতে মা যখন সারা মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে হাসত ও পাগলের মত ঘেউ-ঘেউ করে ডাকত, তখন আমি বুঝতে পারতাম যে মা-ও অবাক হয়ে ভাবছে যে সে যখন প্রথম গল্পটা শুনেছিল তখন যতটা মজা লেগেছিল এখন ততটা মজাদার মনে হচ্ছে না কেন। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হত না, কারণ অন্য কুকুররাও গড়াগড়ি খেতে ও ঘেউ ঘেউ করে ডাকত। হাসির কারণটা ধরতে না পেরে মনে মনে লজ্জিত হলেও তারা কখনই সন্দেহ করতে পারত না যে দোষটা নয়, যেহেতু সেটা বুঝবার মত বুদ্ধিশুদ্ধি কারও ছিল না।

এ থেকেই বুঝতে পারছেন যে মা ছিল অহংকারী আর ছেবলা; তবু অনেক গুণও তার ছিল যাতে এই ত্রুটিটা শুধরে যেত। তার মনটা ছিল দয়ালু, চাল-চলন ছিল শান্ত; কেউ তার প্রতি কোন অন্যায় করলে সেটা মনের মধ্যে পুষে রাখত না, সহজেই মন থেকে মুছে ফেলে ভুলে যেত। ছেলেমেয়েদেরও মা এই শিক্ষাই দিয়েছিল; তার কাছ থেকেই আমরা শিখেছিলাম সাহসী হতে, বিপদ দেখা দিলে কাজে তৎপর হতে, এবং বন্ধু বা অপরিচিত কেউ বিপন্ন হলে পালিয়ে না গিয়ে এবং ফলাফল চিন্তা না করে তাকে যাহায্য করতে, বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে। আর এ সব সে আমাদের শেখাত শুধু মুখে নয়, কাজেও; আর সেই শিক্ষাই তো শ্রেষ্ঠ, নিশ্চিত ও স্থায়ী। কত যে সাহসের কাজ, আশ্চর্য সব কাজ মা করেছে! সে ছিল সত্যিকারের সৈনিক; আবার এত বিনয়ী-তাকে প্রশংসা না করে, তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে আপনি পারবেন না; এমন কি তার সমাজে রাজা চার্লসের শিকারী-কুকুরও সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকতে

পারত না। কাজেই, বুঝ তেই পারছেন, শিক্ষার চাইতেও অনেক বেশী গুণ তার ছিল।

২

অবশেষে আমি যখন বড় হয়ে উঠলাম তখন আমি বিক্রি হয়ে গেলাম; আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল; মাকে আর কখনও দেখি নি। তার বুক ভেঙে গিয়েছিল; আমারও; দু'জনেই অনেক কাঁদলাম; মা আমাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগল, বলল-একটা বিশেষ সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, কাজেই চোখের জল না ফেলে যার যার কর্তব্য করে যেতে হবে, ভালভাবে বাঁচতে হবে, ফলাফলের আশা না করে অপরের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। সে বলল, যে সব মানুষ এই ভাবে চলে পরজন্মে তারা অনেক ভাল ভাল পুরস্কার পায়, আর যদিও আমরা জন্তুরা সেখানে যেতে পারব না তথাপি ভালভাবে বেঁচে থাকলে এই জীবনেই যে যোগ্যতা ও মর্যাদা আমরা অর্জন করতে পারব সেটাই তো পুরস্কার।

এই ভাবে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, চোখের জলের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে শেষ বারের মত দেখলাম, এবং আমি যাতে ভালভাবে মনে করে রাখতে পারি সেজন্য সকলের শেষে মা আমাকে বলল: "যখনই অন্যের কোন বিপদ দেখবে তখনই আমাকে স্মরণ করে নিজের কথা ভাববে না, ভাববে তোমার মায়ের কথা, আর সে যা করত সেই ভাবে কাজ করবে।"

সে কথা আমি ভুলতে পারি? না।

৩

আমার নতুন বাড়িটা কী সুন্দর। মস্ত বড় বাড়ি, কত ছবি, কত সাজ-সজ্জা, দামী আসবাবপত্র, অন্ধকারের ছায়া কোথাও নেই, পরিপূর্ণ সূর্যের আলোয় সব কিছু ঝলমল করছে; চারদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, মস্ত বড় বাগান-ঘাস, ভাল ভাল গাছ ও ফুলের আর শেষ নেই! আর আমিও যেন পরিবারেরই একজন; তারা আমাকে ভালবাসত, আদর করত, নতুন একটা নাম না দিয়ে মায়ের দেওয়া প্রিয় নাম "আইলীন মাভুরনীন" বলেই আমাকে ডাকত। একটা গান থেকে নামটা মা পেয়েছিল; গ্রে-পরিবার গানটা জানত; তারা বলত, নামটা সুন্দর।

মিসেস গ্রের বয়স ত্রিশ; কী মিষ্টি আর সুন্দর কল্পনাও করতে পারবেন না; স্যাডির বয়স দশ, দেখতে মায়ের মতই, ঠিক যেন তারই একটি প্রতিমূর্তি, এক রাশ সোনালি চুল পিঠের উপর নেমে এসেছে, পরনে ছোট ফ্রক; আর ছোট বাচ্চাটার বয়স এক বছর, মোটাসোটা, গালে একটা টোল পড়ে; মিঃ গ্রের বয়স আটত্রিশ, লম্বা, একহারা, সুন্দর চেহারা, মাথার সামনে ছোট একটু টাক, চটপটে, চলাফেরা দ্রুত, কাজের লোক, সারা মুখে বুদ্ধির দীপ্তি যেন ঝলমল করে! একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। কথাটার অর্থ আমি জানি না, মা হয় তো জানে। একটা কথা এখানে শুনি-ল্যাবরেটরি। ল্যাবরেটরি কিন্তু বই না, ছবি না, হাত ধোবার জায়গাও না, যদিও কলেজ-প্রেসিডেন্টের কুকুরটা তাই বলেছিল-না, সেটা তো ল্যাভাটরি; ল্যাবরেটরি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার; সেখানে পাত্র থাকে, বোতল থাকে, বিদ্যুৎ থাকে, তার থাকে, আরও অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি থাকে; প্রতি সপ্তাহেই অন্য বিজ্ঞানীরা আসে, বসে, যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করে, আলোচনা করে এবং এমন সব কাজ করে যাকে বলে পরীক্ষণ ও আবিষ্কার; অনেক সময় আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনি, দেখি, আর মায়ের মত শিখতে চেষ্টা করি; কিন্তু আমাকে দিয়ে ও সব হবে না।

কখনও বা কর্ত্রীর কাজের ঘরে মেঝেয় শুয়ে ঘুমোই; আমাকে পা-পোষ মনে করে সে আমার গায়ে পা ঘসে; সে জানে ওতে আমি খুসি হই, কারণ ঐ ভাবে সে আমাকে আদর করে; কখনও নার্সারিতে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসি-সকলেই আমাকে নেড়েচেড়ে আদর করে; আবার বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়লে নার্স যদি কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে যায় তো দোলনার পাশে গিয়ে তাকে দেখি; কখনও স্যাডিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে ও বাগানে ছুটাছুটি করি, শ্রান্ত হলে গাছের ছায়ায় গা এলিয়ে দেই, আর স্যাডি বই পড়ে; কখনও বা আশপাশের কুকুরদের সঙ্গে দেখা করতে যাই-কাছাকাছিতেই বেশ কয়েকটি ভাল কুকুর আছে; তার মধ্যে একটি তো যেমন সুন্দর তেমনই ভদ্র; কোঁকড়া লোমওয়ালা একটি আইরিশ কুকুর, নাম রবিন অ্যাডেয়ার; সেও আমার মতই পুরোহিত-বংশের সন্তান; তার মালিক একজন স্কচ মন্ত্রী।

বাড়ির চাকররা সকলেই আমার প্রতি সদয়, আমাকে ভালবাসে; কাজেই আমার জীবন বেশ সুখেই কাটছে। আমার চাইতে সুখী ও কৃতজ্ঞ কুকুর আর একটিও নেই। সে কথা একশ' বার। মায়ের স্মৃতিকে স্মরণ করে তার শিক্ষামত কাজ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করি,

আর তার ফলেই এই সুখ পেয়েছি।

তারপরই আমার বাচ্চাটা এল; আমার সুখের পেয়ালা পূর্ণ হল। কেমন টলতে টলতে চলে, নরম, কোমল, ভেলভেটের মত গা, সুন্দর ছোট ছোট থাবা, মায়া-ভরা দুটো চোখ, মিষ্টি নিষ্পাপ মুখ; আর ছেলেমেয়েরা ও তাদের মাও তাকে কতই না ভালবাসে, আদর করে। জীবনটা কতই না মধুর হয়ে উঠল-

তারপর এল দুঃখের শীত। একদিন আমি নার্সারিতে পাহারায় ছিলাম। অর্থাৎ আমার বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলাম। বাচ্চাটি ঘুমিয়ে ছিল তার দোলনায় আমার বিছানার পাশে, ঠিক অগ্নিকুণ্ডটার ধারে। দোলনায় একটা উঁচু তাঁবুর মত টাঙানো ছিল; তার ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখা যায়। নার্স গিয়েছিল বাইরে, আমরা দু'জন ছিলাম ঘুমিয়ে। কাঠের আগুনের একটা ফুল্‌কি ছিটকে তাঁবুটার নীচে গিয়ে পড়ল। মনে হয়, বেশী কিছু সময় কেটে যাবার পরে বাচ্চাটির চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, তাঁবুটা জ্বলছে; আগুন সিলিং পর্যন্ত উঠেছে! কোন কিছু ভাববার আগেই ভয়ে লাফিয়ে মেঝেতে পড়ে দরজার দিকে অর্ধেক পথ ছুটে গেলাম; কিন্তু আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই মায়ের সেই বিদায়-বাণী আমার কানে বাজতে লাগল; বিছানার কাছে ফিরে গেলাম। আগুনের মধ্যে মাথাটা ঠেলে দিয়ে কোমরের বেল্টটা ধরে টানতে টানতে বাচ্চাটিকে বের করে আনলাম, এবং দরজার কাছে পৌঁছে ধোঁয়ার কুণ্ডুলির মধ্যে পথ হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম; আবার বেটাকে চেপে ধরে টানতে টানতে তাকে দরজার বাইরে নিয়ে গেলাম। বাচ্চাটি সমানে চীৎকার করছে, আমিও হলের মোড় ঘুরে এগিয়ে চলেছি; আনন্দে ও গর্বে আমি তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছি; এমন সময় কানে এল মনিবের চীৎকার:

"পালা, পালা, পাজি কুত্তা!" নিজেকে বাঁচাবার জন্য দিলাম এক লাফ, আর সেই লোকটি আশ্চর্য তড়িৎগতিতে হাতের বেত নিয়ে আমাকে তাড়া করল। প্রাণের ভয়ে আমি এদিক-ওদিকে ছুটতে লাগলাম; সেও আমার পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত আমার সামনের ডান দিককার পায়ে সজোরে আঘাত করল; আর্তনাদ করে আমি পড়ে গেলাম; বেতটা আবার উঠল, কিন্তু নেমে এল না; নার্সের গলা ভেসে এল, "নার্সারিতে আগুন লেগেছে"; মনিব সেই দিকে ছুটে গেল; আর আমারও বাকি হাড় ক'খানা রক্ষা পেল।

খুব ব্যথা করছিল; তা করুক, সময় নষ্ট করা চলবে না; যে কোন মুহূর্তে সে ফিরে আসতে পারে; তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হলের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম। সেখানে ভাঙা বাক্স প্রভৃতি জঞ্জাল জমা করে রাখা আছে; বাড়ির লোকজন সেখানে কদাচিৎ যায়। কোন রকমে সেখানে উঠে অন্ধকারে সেই ডাঁই করা জিনিসপত্রের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। সেখানে ভয় পাবার কোন মানে হয় না, তবু আমার ভয় করতে লাগল। এত ভয় করতে লাগল যে আহা-উহু করে যে ব্যথার একটু উপশম করব তাও সাহস হচ্ছিল না। পাটা চেটে চেটে তবু একটু একটু আরাম পেলাম।

আধ ঘন্টা ধরে নীচে হৈ-হট্টগোল, ছুটাছুটি চলতে লাগল। তারপর আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে আমার ভয়টাও কেটে যেতে লাগল। একটু পরেই আবার একটা শব্দ শুনে আমার বুকের ভিতরটা জমে গেল। তারা আমাকে ডাকছে-গালাগালি করছে-আমার খোঁজ করছে!

দূরের জন্য শব্দটা অস্পষ্ট শোনা গেলেও তাতে আমার ভয় কমল না। এত ভয়ংকর শব্দ বুঝি আর কখনও শুনি নি। এখানে-ওখানে-সেখানে একনাগাড়ে ডাকাডাকি চলল: হলে, নানা ঘরে, দুটো তলায়, মাটির নীচের ঘরে; তারপর বাইরে, দূরে, আরও দূরে-আবার সে শব্দ বাড়ির মধ্যেই ফিরে এল। মনে হল, সে শব্দ বুঝি কোনদিন থামবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামল। ততক্ষণে চিলে-কোঠার অস্পষ্ট গোধূলির আলো মুছে রাতের কালো আঁধার ঘরটাকে ঘিরে ধরেছে।

তারপর সেই শান্ত স্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে আমার ভয় কেটে গেল; পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিশ্রামটা ভালই হল। যখন ঘুম ভাঙল তখন একেবারে গোধূলি নেমে এসেছে। অনেকটা ভাল লাগছে। বসে বসে পালাবার একটা মতলব ভাঁজতে লাগলাম। ভাল একটা মতলব মাথায়ও এল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল: আমার বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থেকে কি হেবে!

হতাশা নেমে এল। কিছুই করার নেই। বুঝতে পারলাম, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে হবে; থাকতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে, যা ঘটবে তাই মেনে নিতে হবে-সেটা আমার ভাবনার বিষয়ই নয়; এই তো জীবন-মা তো তাই বলে দিয়েছে। তারপর-আবার, আবার সেই ডাকাডাকি শুরু হল! সামনে অনেক দুঃখ। নিজের মনেই বললাম, মনিব কখনও ক্ষমা করবে না। অবশ্য কেন যে সে আমার প্রতি এত বিরূপ ও ক্ষমাহীন হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। হয় তো কুকুরের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়, মানুষ হলে বুঝতে

পারত।

ডাকের পর ডাক-মনে হল সে ডাক বুঝি দিন রাত চলছে। ক্রমে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে প্রায় পাগল করে তুলল; বুঝতে পারলাম, ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। এ অবস্থায় পড়লে সকলেই প্রচুর ঘুমোয়, আমিও ঘুমোতে লাগলাম। একদিন ভয়ানক ভয় পেয়ে জেগে উঠলাম-মনে হল ডাকটা যেন চিলে-কোঠা থেকেই আসছে! ঠিক তাই: গলাটা স্যাডির; সে কাঁদছে; আমার নামটা ভেঙে ভেঙে তার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে; সে যা বলছে কানে শুনেও তা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না:

"ফিরে আয়-ওরে, আমাদের কাছে ফিরে আয়; ক্ষমা কর-তোকে ছাড়া আমরা বড় কষ্টে-"

মনের আনন্দে একটা সকৃতজ্ঞ ডাক আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর পরমুহূর্তেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভাঙা আবর্জনাগুলো পেরিয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে; চীৎকার করে সকলকে বলে উঠল: "পাওয়া গেছে, তাকে পাওয়া গেছে!"

তার পরের দিনগুলি-আঃ বড় সুন্দর। মা, স্যাডি, চাকরবাকর-আরে, সকলে যেন আমাকে পূজা করতে লাগল। আমার বিছানা করে তাদের মন ভরে না; ভাল ভাল খাবার না দিলে তাদের মন খুঁতখুঁত করে; আমার বীরত্বের কথা শুনতে বন্ধু ও প্রতিবেশীরা প্রতিদিন দল বেঁধে আসতে লাগল। দিনে অন্তত বারোবার মিসেস গ্রে ও স্যাডি নবাগতদের সে কাহিনী শোনাত; বলত, আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি বাচ্চাটিকে বাঁচিয়েছি, আর সে জন্য আমাদের দু'জনের গায়ের পোড়া দাগগুলিও তাদের দেখাত। কিন্তু তারা যখন জিজ্ঞাসা করত আমি খোঁড়া হলাম কেমন করে, তখন তারা লজ্জা পেয়ে অন্য কথা পাড়ত।

আমার গৌরবের কিন্তু সেখানেই শেষ নয়; না, মনিবের বন্ধুরা আসত, বিশ জন বিশিষ্ট মানুষের একটি গোটা দল এসে আমাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেত, আমাকে নিয়ে আলোচনা করত, যেন আমিও তাদের একটি আবিষ্কার। কেউ বলত, একটি মূক প্রাণীর এ এক আশ্চর্য রূপ; যতদূর তারা মনে করতে পারে তার মধ্যে এটাই প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতম প্রকাশ; কিন্তু মনিব বাধা দিয়ে বলত, "এটা প্রবৃত্তির অনেক উপরের জিনিস; এটা বিচার-বুদ্ধি; আর এ জিনিস অনেক মানুষ অপেক্ষা এই বেচারি চতুষ্পদ প্রাণীটির মধ্যেই অনেক বেশী পরিমাণে আছে।" তারপর সে হেসে বলত, "আরে, আমাকেই দেখুন না-আমি একটি মর্মন্তুদ পরিহাস! এত বুদ্ধির অধিকারী হয়েও আমি কিনা অনুমান করে বসলাম যে কুকুরটা পাগল হয়ে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে, অথচ এই পশুটির বুদ্ধি-তার বিচার-শক্তি না থাকলে শিশুটি তো মারাই যেত!"

তাদের তর্কের আর শেষ নেই, আর সে সব তর্ক আমাকেই ঘিরে। বড় ইচ্ছা করছিল, আমার এই পরম সম্মানের কথা আমার মা জানুক; তাহলে সে কত না গর্ববোধ করত।

তারপর তারা আলোক-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা শুরু করল; আলোচনার বিষয়: মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট ক্ষতির ফলে জীব অন্ধ হয়ে যেতে পারে কিনা। একমত হতে না পেরে তারা স্থির করল এ বিষয়টা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। তাদের কথাবার্তা একঘেয়ে লাগায় একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম; আর কিছু জানতে পারলাম না।

দেখতে দেখতে বসন্ত এসে গেল। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। সব কিছু মনোরম, সুন্দর। কর্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে চলে গেল বেড়াতে। যাবার সময় আমাকে ও আমার বাচ্চাটাকে কত আদর করল। মনিব তার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তাই আমরা দু'জনই খেলে-বেড়িয়ে মনের সুখে দিন কাটাই আর ভাবি, কতদিনে কর্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ফিরে আসবে।

একদিন সেই বিজ্ঞানীরা আবার এল। বলল, এবার পরীক্ষাটা করা হবে। তারা বাচ্চাটাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল। আমিও তিনপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেলাম। বাচ্চাটার প্রতি সকলের এত মনোযোগ দেখে আমার বেশ ভাল লাগল, গর্ব হতে লাগল। তারা অনেক আলোচনা করল; পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাল। হঠাৎ বাচ্চাটা চীৎকার করে উঠল। সকলে তাকে মেঝেতে নামিয়ে দিল। সে টলমল করে হাঁটতে লাগল। মাথাময় রক্তের ছোপ। মনিব হাততালি দিয়ে বলে উঠল:

"ঐ দেখুন, আমি জিতেছি-এবার স্বীকার করুন! ওটা তো বাদুরের মত অন্ধ হয়ে গেছে!"

সকলে বলল, "তা ঠিক-আপনার থিয়োরি প্রমাণিত হয়েছে। আজ থেকে বিপন্ন মানুষ আপনার কাছে অনেক ঋণে ঋণী হল।" মনিবকে

ঘিরে ধরে সকলে তার হাত চেপে ধরল, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার প্রশংসা করতে লাগল।

সে সব কিছু আমি চোখেও দেখলাম না, কানেও শুনলাম না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম বাচ্চাটার কাছে; বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে মাথায় রক্ত চেটে নিলাম। বাচ্চাটাও আমার কোলের মধ্যে মাথা রেখে গর্-গর্ করতে লাগল; মায়ের ছোঁয়া পেয়ে অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও ও যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেল। একটু পরেই বাচ্চাটা মেঝের উপর নাক খুব্‌ড়ে পড়ে গেল। চুপ করে গেল। আর একবারও নড়ল না।

আলোচনা থামিয়ে মনিব পরিচারককে ডেকে বলল, "ওটাকে বাগানের এক কোণে কবর দিয়ে দাও।" তারা আবার আলোচনা শুরু করল। আমি পরিচারকের পিছন পিছন গেলাম। মনে মনে খুব খুসি, কারণ বাচ্চাটার তখন আর কোন কষ্ট ছিল না, শান্তিতে ঘুমুচ্ছিল। আমরা বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। গ্রীষ্মকালের সেখানকার মস্ত বড় দেবদারু গাছটার ছায়ায় আমরা সকলে মিলে কত খেলা করেছি। পরিচারক সেখানে একটা গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাটাকে তার মধ্যে শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল। স্যাডি যেমন করে গাছের চারা মাটিতে পুঁতে দেয়, পরিচারকটা বোধ হয় সেই ভাবে আমার বাচ্চাটাকেও পুঁতে দেবে। খুব খুসি হলাম, কারণ তাহলে তো আমার বাচ্চাটাও ধীরে ধীরে বড় হবে, রবিন অ্যাডেয়ার-এর মত সুন্দর হয়ে উঠবে। কর্ত্রীরা বাড়ি ফিরে তাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। পরিচারককে সাধ্যমত সাহায্য করলাম। কাজ শেষ করে সে আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিল; তখন তার চোখে জল; বলল: "বেচারি, ওর ছেলেকেই তুই বাঁচিয়েছিলি!"

পুরো দুটো সপ্তাহ অপেক্ষা করে আছি। সে তো এল না। এ সপ্তাহে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে, একটা ভয়ংকর কি যেন ঘটে গেছে। সেটা কি আমি জানি না, কিন্তু ভয় আমাকে কাবু করে ফেলেছে; চাকররা ভাল ভাল খাবার এনে দিচ্ছে, আমি খেতে পারছি না; তারা আমাকে আদর করে, রাতের বেলায়ও আমার কাছে আসে, কাঁদতে কাঁদতে বলে, "আহারে-ওর কথা ভুলে যা; বাড়ি চল্; আমাদের কষ্ট দিস্ না!" আমার আরও ভয় করে, আতংক বাড়ে। আরও দুর্বল হয়ে পড়লাম। গতকাল তো দাঁড়াতেই পারি নি। সূর্য পাটে বসছে; ঠাণ্ডা রাত নেমে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে চাকররা কি সব বলাবলি করতে লাগল আমি তার মানে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমার বুকটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল।

"আহা বেচারিরা! কিছু বুঝতেই পারে না। সকালেই কর্ত্রীরা ফিরে আসবেন; যে কুকুরটা এমন সাহসের কাজ করেছিল এসেই তার খোঁজ করবেন; তখন কে সাহস করে সত্য কথাটা তাদের শোনাবে:

"জীবজন্তুরা মরলে যেখানে যায় ছোট্ট বন্ধুটিও সেখানেই চলে গেছে!"

১৯০৩

৩০,০০০ পাউণ্ডের দান-পত্র

The 30,000 Pound Bequest

লেকসাইড একটা সুন্দর ছোট শহর। জনসংখ্যা পাঁচ কি ছ' হাজার। শহরটি বেশ ছিমছাম করে সাজানো, দূর পশ্চিমের অন্য সব শহরের মতই। গির্জায় আসন-ব্যবস্থা পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের; দূর পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই ধরনের ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে; সেখানে প্রত্যেকেই ধর্মপ্রাণ, প্রতিটি প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেখানে বাস করে। লেকসাইডে উঁচু-নীচুর ভেদ নেই-অন্তত সেটা স্বীকার করা হয় না; প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আর তার কুকুরকে চেনে; সর্বত্র সহজ মেলামেশা ও বন্ধুত্বের আবহাওয়া।

সালাডিন ফস্টার একটা বড় দোকানের হিসাবরক্ষক; লেকসাইড-এর একমাত্র মোটা বেতনের কর্মচারী। এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর; চোদ্দ বছর সে এই দোকানে চাকরি করছে; বিয়ের সপ্তাহে বছরে চার শ' ডলার বেতনে কাজ শুরু করেছিল; বছরে এক শ' ডলার করে বেড়ে চার বছরে অনেক উপরে উঠেছে; সেই থেকে সে আট শ'তে থেমে আছে-বেতনের অংকটা ভালই, আর সে যে তার যোগ্য সকলেই তা স্বীকার করে।

স্ত্রী ইলেকট্রা তার যোগ্য সহধর্মিণী, যদিও-তার মতই-স্বপ্নদর্শী ও কল্পনাবিলাসী। বিয়ের পরে-তখন তো সে উনিশ বছরের ছোট্ট মেয়েটিই ছিল-তার প্রথম কাজই হল শহরের শেষ প্রান্তে এক একর জমি কেনা এবং নগদে দামটা মিটিয়ে দেওয়া-মাত্র পঁচিশ ডলার হলেও সেটাই তখন তার সর্বস্বধন। সালডিনের সঞ্চয় ছিল আরও পনেরো কম। সেখানে স্ত্রী একটা সব্জী বাগানু করল, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগে চাষবাসের ব্যপস্থা করল এবং শতকরা একশ' বাগ মুনাফা ঘরে তুলল। সালাডিনের প্রথম বছরের বেতন থেকে ত্রিশ ডলার সেভিংস ব্যাংকে রাখল, দ্বিতীয় বছরের বেতন থেকে ষাট, তৃতীয় বছর থেকে একশ' এবং চতুর্থ বছরের বেতন থেকে রাখল দেড়শ' ডলার। সালাডিনের বেতন বছরে আট শ'-তে উঠল; ইতিমধ্যে সংসারে দুটি শিশুর আবির্ভাব হয়েছে, খরচ বেড়েছে। তা সত্ত্বেও ইলেকট্রা সেই বেতন থেকে বছরে দু'শ' করে ব্যাংকে রেখেছে। বিয়ের সাত বছর পরে সেই বাগানের জমির মাঝখানে দু' হাজার ডলার ব্যয়ে একটি সাজানো-গোছানো আরামদায়ক ছোট বাড়ি তৈরি করল, এবং অর্ধেক দাম নগদে দিয়ে গৃহপ্রবেশ করল। সাত বছর পরে সব দেনা শোধ হয়ে গেল এবং কয়েক শ' ডলার বাড়তি আয়ের ব্যবস্থাও হল।

জমির দাম বেড়ে যাওয়াতেই এই বাড়তি উপার্জনটা হল। অনেক আগেই স্ত্রীটি আরও দু'-এক একর জমি কিনেছিল; এখন ভাল লাভে সেই জমি ভাল ভাল লোকের কাছে বিক্রি করে দিল। তারাও এখানে বাড়ি করবে, ভাল প্রতিবেশী হবে, তার নিজের ও মেয়েদের ভাল সঙ্গী হবে। বছরে একশ' ডলার লগ্নী থেকেও তার একটা বাঁধা আয় আছে। ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়ছে, দেখতে সুন্দর হচ্ছে; বেশ সুখেই তার দিন কাটছে। স্বামী নিয়ে সে সুখী, মেয়েদের নিয়ে সুখী, আর স্বামী ও মেয়েরাও তাকে নিয়ে সুখী। এখান থেকেই শুরু হল ইতিহাস।

ছোট মেয়ে ক্লাইটেম্ নেস্ট্রার-সংক্ষেপে ডাক নাম ক্লাইটি-বয়স এগারো, তার দিদি গোয়েণ্ডোলেন-সংক্ষেপে গোয়েন-বয়স তেরো; মেয়ে দুটি বড় ভাল। নাম দুটি শুনলেই বোঝা যায় বাবা-মার রক্তে আছে কল্পনা-বিলাসের ছোঁয়া; আবার বাবা-মার নাম শুনলেও বোঝা যায় যে সে ছোঁয়াটুকু বংশগত। সুখী পরিবারটির সকলেরই একটা করে আদরের নাম ছিল। সালাডিনের নামটা অদ্ভুত ও মেয়েলি-স্যালি; ইলেকট্রার নামও তাই, একটু পুরুষালি-আলেক। সারাটা দিন স্যালি একজন ভাল হিসাবরক্ষক ও বিক্রেতা; সারাদিন আলেক একজন ভাল ও বিশ্বস্ত মা ও গৃহকর্ত্রী, যেমন চিন্তাশীল তেমনই ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন; কিন্তু রাতের বেলা আরামদায়ক শোবার ঘরে ঢুকেই কাজের জগৎটাকে তারা দূরে সরিয়ে দেয়, চলে যায় আর একটা সুন্দরতর জগতে, পরস্পরকে নানা রোমান্স পড়ে শোনায়, স্বপ্ন দেখে, বড় বড় প্রাসাদ ও প্রাচীন কালের বিরাট সব দুর্গের আলোকোজ্জ্বল হৈ-চৈ ও জাঁকজমকের মধ্যে রাজা, রাজপুত্র এবং অভিজাত নারী-পুরুষদের সাহচর্যে সময় কাটিয়ে দেয়।

২

এবার এল একটা বড় সংবাদ! হতবুদ্ধিকর সংবাদ-আসলে আনন্দের সংবাদ। এল একটা পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে; সেখানে পরিবারের একমাত্র জীবিত আত্মীয়টি বাস করত। সে স্যালির আত্মীয় হয় দূর সম্পর্কের খুড়ো, আর না হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় জ্ঞাতি ভাই; নাম টিল্‌বিউরি ফস্টার, বয়স সত্তর, চিরকুমার, বিখ্যাত ধনী, আর সেই অনুপাতে মেজাজটাও রুক্ষ ও খিটখিটে। অতীতে একবার স্যালি

তার সঙ্গে পত্রযোগে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ভুল আর কখনও করে নি। এতদিনে টিল্‌বিউরি স্যালিকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে তার মৃত্যু আসন্ন, আর তাই সে স্যালিকে নগদ ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে যেতে চায়; ভালবেসে নয়, যেহেতু এই টাকা তাকে অনেক দুঃখ ও হতাশা ভোগ করিয়েছে তাই তার ইচ্ছা যে টাকাটা এমন হাতে পড়ুক যেখানে তার অনিষ্টকর কাজটা যথারীতিই চলবে বলে সে আশা করে। তার উইলে এই দানের উল্লেখ থাকবে এবং টাকাটা দেওয়া হবে। অবশ্য এই শর্ত সাপেক্ষে যে স্যালি উইলের অছিদের কাছে প্রমাণ করতে পারবে যে মুখের কথায় অথবা চিঠিপত্রে সে কখনও এই দানের কথা জানত না, মৃত্যুপথযাত্রীর শাশ্বত বাসস্থানে যাত্রা সম্পর্কে কোন খোঁজখবর সে করে নি, এবং সৎকার-অনুষ্ঠানে যোগ দেয় নি।

যে মুহূর্তে আলেক এই চিঠির প্রচণ্ড ধাক্কাকে সামলে উঠল, তখনই সে আত্মীয়টির বাসস্থলে লোক পাঠিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রের গ্রাহক হয়ে গেল।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তখন এই মর্মে বোঝা-পড়া হল যে আত্মীয়টি যতদিন জীবিত আছে ততদিন তারা কারও কাছে এই বড় খবরটা প্রকাশ করবে না; কারণ তা করলে হয়তো কোন অজ্ঞান লোক কথাটাকে মৃত্যুশয্যার পাশে নিয়ে গিয়ে এমন ভাবে বিকৃত করে বলবে যাতে মনে হবে যে তারা অবাধ্যের মত এই দানের জন্য কৃতজ্ঞ হয়েছে, এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রকাশ্যে এ কথাটাকে স্বীকার ও প্রকাশ করার মতই অপরাধ করেছে।

সারাটা দিন স্যালি পুথিপত্র ওলোট-পালোট করে কাটাল; আলেকও কোন কাজেই মন দিতে পারল না। দু'জনই তখন একই স্বপ্ন দেখছে:

"ত্রি-শ হাজার ডলার!"

সারাটা দিন এই প্রেরণাময় শব্দের গুঞ্জনই তাদের মাথায় অনুরণিত হতে লাগল।

বিয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আলেকই সব টাকা-পয়সা নিজের হাতের মুঠোয় রেখে এসেছে; অপ্রয়োজনে একটা কপর্দকও খরচ করা কাকে বলে স্যালি তা জানে না।

"ত্রি-শ হাজার ডলার।" গুঞ্জন চলতেই থাকল। অনেক টাকা, চিন্তার অতীত টাকা!

সারা দিন ধরে আলেক ভাবল টাকাটা কি ভাবে লগ্নি করা যায়, আর স্যালি ভাবল কি ভাবে সেটা খরচ করা যায়।

সেদিন রাতে আর রোম্যান্স পড়া হল না। বাবা-মাকে চুপচাপ ও আশ্চর্য রকমের গোমড়া-মুখ দেখে মেয়েরা অনেক আগেই সরে পড়ল। দুটো পেন্সিল সারাক্ষণ কর্মব্যস্ত রইল-পরিকল্পনার লেখাজোখা চলতে লাগল। অবশেষে স্যালিই প্রথম কথা বলল:

"আঃ, চমৎকার হবে আলেক! প্রথম এক হাজার দিয়ে আমরা গ্রীষ্মকালের জন্য একটা ঘোড়া ও বগি-গাড়ি কিনব, আর শীতকালের জন্য একটা ছোট জাহাজ ও চামড়ার পোশাক।"

আলেক দৃঢ় সিদ্ধান্তের ভঙ্গীতে বলল:

"মূলধন ভাঙিয়ে? সেটি হচ্ছে না। কোটি কোটি পেলেও না।"

স্যালি খুব হতাশ হল; তার মুখের আলোই নিভে গেল।

অনুযোগের সুরে বলল, "আঃ আলেক! সারা জীবনই তো কঠোর পরিশ্রম করেছি, টানাটানি করে চালিয়েছি; এখন তো আমরা ধনী হয়েছি; এখন-"

সে কথা শেষ করল না; আলেকের চোখের দৃষ্টি নরম হয়েছে; তার কথায় সে যেন গলেছে; তবু স্যালিকে বোঝাবার মত করে বলল:

"দেখ বাপু, মূলধনটা আমরা খরচ করব না, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার থেকে যা আয় হবে-"

"তাতেই হবে, তাতেই হবে আলেক! তুমি কত ভাল! বেশ মোটা আয়ই হবে, আর সেটা যদি আমরা খরচ করি-"

"তা হবে না বাপু, মোটেই তা হবে না; তার একটা অংশ তুমি খরচ করতে পার। তার মানে একটা সঙ্গত অংশ। কিন্তু মূলধনের পুরোটাই-প্রতিটি পেনি-কাজে লাগাতে হবে। সেটাই যে উচিত কাজ হবে তা তুমি নিশ্চয় বোঝ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু ততদিন যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ছ' মাস আগে তো সুদের প্রথম কিস্তিটা পাওয়া যাবে না।"

"হ্যাঁ-আরও বেশী দেরিও হতে পারে।"

"আরও দেরি? কেন? ওরা কি ষাণ্মাসিক সুদ দেয় না?"

"সে রকম লগ্নি করলে দেয়; কিন্তু আমি, সে রকম লগ্নি করব না।"

"তাহলে কি রকম করবে?"

"যাতে মোটা সুদ পাওয়া যায়।"

"মোটা। তা ভাল। কি রকম লগ্নি বল তো?"

"কয়লা। নতুন খনি। আমি দশ হাজার রাখতে চাই।"

"খুব ভাল কথা আলেক। সে সব শেয়ার সত্যি ভাল। কিন্তু কত পাওয়া যাবে? কখন পাওয়া যাবে?"

"প্রায় এক বছরে। ছ' মাসে তারা শতকরা দশ দেবে। আমি সব জানি; এই সিন্‌সিনাটি সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপন আছে।"

"পুরো মূলধনটাই তাহলে আটকে দাও। আমি এখনই চিঠি লিখে গ্রাহক হয়ে যাচ্ছি-কাল হয় তো দেরি হয়ে যাবে।"

সে লেখার টেবিলে ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক বাধা দিল। তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল:

"মাথা খারাপ করো না। টাকাটা পাবার আগেই গ্রাহক হওয়া চলবে না; সে কথা জান না?"

স্যালির উৎসাহ দু'-এক ডিগ্রি কমলেও সে পুরো শান্ত হল না।

"কেন বল তো আলেক? তুমি তো জান টাকাটা আমরা পাবই-আর শিগ্‌গিরই পাব। হয় তো এতক্ষণে তার সব দুঃখের অবসান হয়েছে। আমার তো মনে হয়-"

আলেক শিউরে উঠে বলল:

"কি বলছ স্যালি? এ রকম কথা বলতে নেই; এ যে কেলেংকারির কথা।"

"আহা, কথাটাকে ও ভাবে নিচ্ছ কেন? আমি তো বলছি কথার কথা।"

"তাই বলে এরকম অলক্ষুণে কথা বলবে? তুমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমাকে ও রকম কথা বললে তোমার ভাল লাগত?"

"তা হয় তো লাগত না। যাক গে, টিল্‌বিউরির কথা থাক আলেক। তার চাইতে কাজের কথা হোক। আমার তো মনে হয় খনিই পুরো

ত্রিশ হাজারের উপযুক্ত স্থান। আপত্তি আছে?"

"এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখা? সেটাই আপত্তি আর কি!"

"ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ। বাকি বিশ নিয়ে কি করবে? সেটা কোথায় রাখবে ভেবেছে?"

"তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই; বাকিটা সম্পর্কে কিছু করবার আগে খোঁজ খবর নিতে হবে।"

"তুমি যখন মনস্থির করেই ফেলেছ তখন তাই হবে," স্যালি একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল:

"এখন থেকে দশ হাজারে বছরে বিশ হাজার লাভ আসবে। সেটা তো আমরা খরচ করতে পারব, তাই না আলেক?"

আলেক মাথা নাড়ল।

বলল, "না গো, প্রথম অর্ধ-বার্ষিক লভ্যাংশটা পাবার আগে অতটা উঠবে না। তার কিছু অংশ তুমি খরচ করতে পারবে।"

"ধুত্তোর, মোটে ঐটুকু-আর তার জন্য গোটা বছরটা হাঁ করে থাকতে হবে! যত সব-"

"আহা, একটু ধৈর্য ধর! তিন মাসের মধ্যেও লভ্যাংশটা ঘোষিত হতে পারে-সে সম্ভাবনাও তো রয়েছে।"

"ওঃ জলি! ধন্যবাদ।" স্যালি লাফিয়ে উঠে স্ত্রীকে একটা চুমো খেল। "তিন হাজার-একেবারে গুণে গুণে তিন হাজার! তার কতটা আমরা খরচ করতে পারব আলেক? একটু বাড়াও প্রিয়ে, হ্যাঁ, এই তো ভাল মানুষের মত কথা।"

আলেক এতই খুসি হয়ে গেল যে সে চাপে পড়ে যে-টাকাটা দিতে রাজী হল তার মতে সেটা বেহিসেবী খরচের চূড়ান্ত-এক হাজার ডলার। স্যালি তাকে আধ ডজন চুমো খেল, কিন্তু তাতেও যেন তার সব আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল না। কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে আলেক বুঝি সব বিবেচনা হারিয়ে ফেলল; সে প্রিয়তমাকে আরও কিছু মঞ্জুর করে ফেলল-দানের যে বিশ হাজার তখনও বাকি ছিল তার থেকেও বছরে যে পঞ্চাশ ষাট হাজার পাওয়া যাবে বলে তার আশা তা থেকেও দু' হাজার দিতে রাজী হয়ে গেল। খুসিতে স্যালির চোখে জল এসে গেল; সে বলল:

"ওঃ, তোমাকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করছে!" করলও তাই। তারপর নোট-বইটা টেনে নিয়ে সকলের আগে কি কি বিলাস-সামগ্রী কিনবে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে বসে গেল। "ঘোড়া-বগি-ছোট নৌকো-পোশাক-পেটেণ্ট-লেদারের জুতো-কুকুর-টুপি-গির্জার আসন-নতুন দাঁত-আচ্ছা আলেক!"

"বল?"

"হিসাব কষে যাচ্ছ তো? ঠিক আছে। বিশ হাজার লগ্নি করা কি হয়েছে?"

"না, ও নিয়ে তাড়া নেই; আগে দেখি শুনি, ভাবি।"

"কিন্তু তুমি যেন হিসাব করছ; সেটা কি নিয়ে?"

"আরে, কয়লা থেকে যে ত্রিশ হাজার আসছে সেটা কি কাজে লাগবে সেটা ভাবতে হবে না?"

"স্কট! কী মাথা! আমার তো মাথায়ই আসে নি। কি ভেবেছ? কতদূর ভেবেছ?"

"বেশী দূর নয়-দু' তিন বছর। দু' বার পাল্টা লগ্নি করেছি-একবার তেলে, একবার গমে।"

"বাঃ আলেক, চমৎকার! মোট কত দাঁড়াল?"

"আমি তো মনে করি-তা, কোন রকম ঝুঁকি না নিয়েই বলা যায় যে একশ' আশি হাজার তো হবেই, হয় তো বেশীই হবে।"

"বটে! খুব আশ্চর্য, তাই না? অনেক কষ্ট পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা সুদিনের দেখা পেয়েছি।আলেক!"

"বল।"

"মিশনারীদের জন্য আমি কিন্তু পুরো তিন শ'ই খরচ করব-এখন তো আমাদের আর খরচের জন্য ভাবতে হবে না।"

"এর চাইতে ভাল কাজ আর কি হতে পারে গো; আর এটা তো তোমার মত মানুষেরই উপযুক্ত, যা নিঃস্বার্থ ছেলে তুমি।"

প্রশংসা শুনে স্যালির খুসির সীমা রইল না; তবু সে যথার্থই জানাল যে, আলেকের জন্যই এ সব কিছু সম্ভব হয়েছে, কারণ সে না থাকলে স্যালির হাতে টাকাটা আসতই না।

তারপর তারা শুতে গেল; খুসির উদ্দামে ভুলেই গেল যে বসবার ঘরে মোমবাতিটা তখনও জ্বলছে। পোশাক ছাড়বার আগে কথাটা মনেই পড়ল না; স্যালি বলল, "পুড়ছে পুড়ুক, ওটুকু এখন আমাদের সইবে, হাজার-শক্তির মোমবাতি একটা তো।" কিন্তু আলেক নেমে গিয়ে নিভিয়ে দিল।

ফল ভালই হল; কারণ ফিরবার সময় তার মাথায় এমন একটা মতলব এল যাতে একশ' আশি হাজার দেখতে দেখতে পাঁচ লাখ হয়ে যাবে।

৩

আলেক যে ছোট সংবাদপত্রটার গ্রাহক হয়েছিল সেটা বৃহস্পতিবারের কাগজ; টিল্‌বিউরির গ্রাম থেকে পাঁচ শ' মাইল দূরে সেটা এসে পৌঁছল শনিবার টিল্‌বিউরির চিঠিটা ছাড়া হয়েছিল শুক্রবার; মরতে একটা দিন দেরি হওয়ায় খবরটা সে সপ্তাহের কাগজে ছাপা হতে পারে নি; অবশ্য পরের সপ্তাহের সংখ্যায় প্রকাশ হবার পক্ষে যথেষ্ট সময় ছিল। ফলে তার ভাগ্যে সন্তোষজনক কিছু ঘটল কিনা সেটা জানবার জন্য ফস্টারকে পুরো একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকতে হল। সপ্তাহ আর কাটতে চায় না; মনের উপর চাপও বাড়ে। অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকবার সুযোগ না থাকলে তারা হয় তো সে চাপ সহ্য করতেই পারত না। সে সুযোগ যে ছিল তাতো আমরা আগেই দেখছি। স্ত্রী একের পর এক টাকা জমিয়ে যাচ্ছে, আর স্বামী সে টাকা খরচ করে চলেছে-অবশ্য স্ত্রী তাকে যতটা পর্যন্ত খরচ করতে দিচ্ছে।

অবশেষে শনিবার এল। এক "সাপ্তাহিক সাগামোর"। মিসেস ইভার্সলি বেনেট তখন উপস্থিত ছিল। সে প্রেস্‌বিটেরিয়ান পাদ্‌রির স্ত্রী; একটা দাতব্যের ব্যাপারে ফস্টারদের কাছে এসেছিল। মিসেস বেনেট দেখল একজনও তার একটি কথাও শুনছে না; সব আলোচনা হঠাৎ থেমে গেছে। কাজেই ক্ষুব্ধ হয়ে সে উঠে চলে গেল। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই একান্ত আগ্রহে আলেক খবরের কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলল। দু'জনেই অতি দ্রুত শোক-সংবাদের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। নৈরাশ্য! টিল্‌বিউরির কথা কোথাও উল্লেখ নেই। আলেক জন্ম থেকেই খৃস্টান, তার কর্তব্যবোধ প্রখর। নিজেক সংযত করে দু' পয়সা পরিমাণ লোক দেখানো খুসির ভাব দেখিয়ে বলল:

"তিনি যে এ যাত্রা বেঁচে গেছেন সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ-"

"ধিক তার মোটা চামড়াকে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে-"

"স্যালি। তোমার কি চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই!"

"রেখে দাও চক্ষুলজ্জা!" সে রেগে বলল। "তোমারও তো মনে মনে এই একই ভাব। আর লোক-দেখানো বক-ধার্মিক না হলে তুমিও

এই কথাই বলতে।"

তার মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আলেক বলল:

"এরকম নিষ্ঠুর অসঙ্গত কথাগুলি তুমি কেমন করে বলতে পারলে আমি তো ভেবেই পাই না। বক-ধার্মিক আবার কি জিনিস!"

স্যালি মনে ব্যথা পেল; তবু নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত এই সাব্যস্ত হল যে পরবর্তী সপ্তাহের কাগজের জন্য তাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে-যে ভাবেই হোক টিল্‌বিউরির মৃত্যুটা পিছিয়ে গেছে। এই কথা ভেবে তারা বিষয়ান্তরে গেল এবং আগের মতই খুসি মনে সংসারের কাজকর্মে মন দিল।

এদিকে, আসল কথাটা জানা থাকলে তাদের এ চিন্তা কিন্তু ভুল হয়েছে। টিল্‌বিউরি তার কথা রেখেছে, অক্ষরে অক্ষরে রেখেছে; সে মারা গেছে; যথাসময়েই মারা গেছে। আজ চারদিন হল সে মারা গেছে, মরে বাসি হয়ে গেছে; সে পুরোপুরি মরেছে, সম্পূর্ণরূপে মরেছে, কবরখানায় আগত যে কোন নবাগতের মতই মরেছে; আর সে খবরটা এ সপ্তাহের "সাগামোর"-এ প্রকাশ করবার মত যথেষ্ট সময় দিয়েই মরেছে; কিন্তু ঘটনাচক্রে সংবাদটা ছাপা হয় নি; সে ধরনের দুর্ঘটনা কোন শহরের সংবাদপত্রে ঘটতে পারত না, কিন্তু "সাগমোর"-এর মত একটা গেঁয়ো সংবাদপত্রে হামেশাই ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় পাতাটা পূরণ করা সবে শেষ করা হয়েছে এমন সময় "হোস্টেলার্স লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টস্ আইসক্রিম পার্লার্স" থেকে বিনি পয়সার এক কোয়ার্ট স্ট্রবেরি ফলের রস এসে হাজির হল, আর সেজন্য সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বেপরোয়া প্রচেষ্টার ধাক্কায় বেচারি টিল্‌বিউরির এক স্টিক পরিমাণ শোক-সংবাদটি পড়ে গেল।

তারপর স্ট্যাণ্ডিং-গ্যালিতে যাবার পথে টিল্‌বিউরি-র শোক-সংবাদটা "পাই" হয়ে ছাপাখানার অন্য হরফের সঙ্গে মিশে গেল। তা না হলে পরবর্তী কোন সংখ্যায় সংবাদটা নিশ্চয় ছাপা হত। কিন্তু ছাপাখানায় কোন সংবাদ একবার "পাই" হয়ে গেলে সেখানেই তার অন্ত্যেষ্টি হয়ে যায়; কখনও তার পুনর্জন্ম ঘটে না; তার ছাপা হবার সম্ভাবনা চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যায়। আর তাই, টিল্‌বিউরি চাক বা না চাক, কবরে শুয়ে প্রাণ ভরে যতই সে বকবক করুক-তার মৃত্যু-সংবাদ "সাপ্তাহিক সাগামোর"-এর পাতায় এসে কোনদিনই দিনের আলো দেখতে পাবে না।

৪

পাঁচটি সপ্তাহ একঘেয়েভাবে কেটে গেল। প্রতি শনিবারে "সাগামোর" নিয়মিতভাবেই এল, কিন্তু টিল্‌বিউরি ফস্টারের কোন উল্লেখ তাতে পাওয়া গেল না। স্যালির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল; সক্ষোভে বলল:

"কী যকৃৎরে বাবা, এ যে দেখছি অমর!"

আলেক তাকে কড়া ধমক লাগাল; গম্ভীরভাবে বলল:

"নিজের সম্পর্কে এ রকম একটা মন্তব্য শোনার পরেই যদি হঠাৎ তোমার মৃত্যু ঘটে তাহলে কেমন লাগবে?"

বিশেষ কিছু না ভেবেই স্যালি জবাবা দিল, "আমার ভাগ্য ভাল যে সে রকম অবস্থা কখনও হবে না।"

এই ভাবে ছ' মাস চলে গেল। "সাগামোর" এখনও টিল্‌বিউরি সম্পর্কে নীরব। স্যালি অনেকবার আকারে-ইঙ্গিতে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছে, কিন্তু আলেক তাতে নজর দেয় নি। এবার সে সাহস করে সোজাসুজি প্রস্তাব করল, সে ছদ্মবেশে টিল্‌বিউরির গ্রামে যাবে এবং প্রসঙ্গক্রমে ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করবে। প্রস্তাবে বাধা দিয়ে আলেক বলে উঠল:

"তুমি ভেবেছ কি? তোমাকে নিয়েই তো যত ঝামেলা আমাকে পোয়াতে হয়। কখন যে আগুনে পুড়ে মর সেই ভয়ে সারাক্ষণ ছোট ছেলের মত তোমার উপর নজর রাখতে হয়। যেখানে আছ সেখানেই থাক!"

"কেন আলেক? আমি কথা দিচ্ছি, ধরা না পরেই কাজটা আমি করতে পারব।"

"স্যালি ফস্টার, কেন বুঝতে পারছ না যে তোমাকে তো সর্বত্র খোঁজ-খবর নিতে হবে?"

"হলই বা; তাতে কি? আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না।"

"শোন একবার কথা! আরে, একদিন তো অছিদের কাছে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি কোন খোঁজ-খবর কর নি। তখন কি হবে?"

এ-কথাটা তার মনে ছিল না। সে জবাব দিল না; জবাব দেবার মত কিছু ছিল না। আলেক বলল:

"ও মতলব মন থেকে নামাও; আর কখনও এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। টিল্‌বিউরি তোমার জন্য ফাঁদ পেতেছে। এট যে ফাঁদ অ কি বুঝতে পারছ না? সেও তোমার উপর নজর রেখেছে; আশা করছে যে এই ভুলই তুমি করবে। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। স্যালি!"

"বল?"

"যতদিন বেঁচে থাকবে-একশ' বছর বাঁচলেও-কখনও খোঁজ-খবর করবে না। কথা দাও!"

"ঠিক আছে," একটা নিঃশ্বাস ফেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলল।

তখন আলেক নরম হয়ে বলল:

"অধৈর্য হয়ো না। আমাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে; আমরা অপেক্ষা করতে পারি; তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আমাদের অল্পসল্প নিশ্চিত আয় যা আছে সেটা ক্রমাগত বাড়ছে; আর ভবিষ্যতের ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত আমি কোন রকম ভুল করি নি-আমাদের আয় হাজারে-হাজারে, অযুতে-অযুতে বাড়ছে। আমাদের মত সম্ভাবনাময় পরিবার এ রাজ্যে আর একটিও নেই। এর মধ্যেই তো আমরা টাকার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছি। তা কি তুমি জান না?"

"হ্যাঁ, তাতো বটেই আলেক।"

"তাহলে ইশ্বর আমাদের জন্য যা দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দাও। অকারণে দুশ্চিন্তা করো না। ইশ্বরের বিশেষ সাহায্য ছাড়া কি এই প্রচুর সম্পত্তি আমরা করতে পারতাম?"

ইতস্তত করে, "না, তা হয় তো পারতাম না। তবে-"

"আঃ, চুপ কর! আমি জানি তুমি কোন ক্ষতি করতে চাও না, কিন্তু তুমি মুখ খুললেই এমন সব কথা বলতে আরম্ভ কর যে আমার গা শিউরে ওঠে। তোমাকে নিয়ে আমার ভয়ের অন্ত নেই। এতদিন আমি বজ্রকে ভয় করতাম না, কিন্তু এখন বজ্রের ডাক শুনলেই আমি-" তার গলা ধরে গেল; কথা শেষ না করেই সে কাঁদতে লাগল।

স্যালি অবস্থা বুঝে চুপ করে গেল; কিন্তু মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল। অনেক ভেবেচিন্তে মতলব একটা বের করল। এক শিলিং এক শিলিং করে অনেক দিন ধরে যে মূল্যবান অর্থ সে জমিয়েছে তাই দিয়ে সে বাড়ির মাথায় একটা বজ্র-বারণ-দণ্ড বসিয়ে নিল।

কিছুদিন পরে আবার সেই পুরনো স্বভাব ফিরে এল।

অভ্যাসের কী আশ্চর্য ক্ষমতা! কত সহজে, কত তাড়াতাড়ি অভ্যাস গড়ে ওঠে-ছোটখাট অভ্যাসও আমাদের সত্তাকেই বদলে দেয় সব। আকস্মিক ভাবে যদি পর পর দু'দিন সকাল দুটো পর্যন্ত জেগে থাকতে হয় তাহলেই শরীর অসুস্থ বোধ হয়, কিন্তু পর পর আরও কয়েকদিন সেটা ঘটলেই সেটা অভ্যাস হয়ে যায়; আবার এক মাস যদি হুইস্কি কাওয়া যায়-কিন্তু এ সব তো সকলেরই জানা কথা।

আকাশে অট্টালিকা গড়ার অভ্যাস, দিবাস্বপ্নের অভ্যাস-কত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে! সেটাই একটা বিলাস হয়ে দেখা দেয়; অলস মুহূর্তে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে আমরা উড়ে যাই; তার মধ্যেই মশগুল হয়ে থাকি; কল্পনার মায়ায় ভুলে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ি-হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি আর এত সহজে আমাদের স্বপ্ন-জীবন আর বাস্তব-জীবন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে তাদের আর আমরা আলাদা করে চিনতেই পারি না।

একে একে আলেক একখানা শিকাগোর দৈনিক পত্রিকা ও "ওয়াল স্ট্রীট পয়েন্টার" পত্রিকার গ্রাহক হল। টাকা লগ্নি করার দিকে নজর রেখে সে সারাটা সপ্তাহ কাগজ দু'খানা অন্ন তন্ন করে পড়ে। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক জগতের ঋণ-পত্রের লেনদেন ও লাভ-লোকসানের হিসাব সে এত দ্রুত ও এত সফলতার সঙ্গে করতে পারে যে তা দেখে স্যালির বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কোন ক্ষেত্রেই তার মাথা ঘুরে যায় না।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আলেক ও স্যালির কল্পনা-শক্তি বেশ পেকে উঠল। দু'জনই যেন যন্ত্রের মত কাজ করতে লাগল। ফলে আলেক দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে কল্পনায় টাকার পাহাড় জমিয়ে তোলে, আর স্যালিও সমান তালে সেটাকে খরচ করতে থাকে। গোড়ায় তাদের হিসাবের ব্যাপারটা ছিল দুর্বল, কারণ তখন তাদের কোনরকম শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না, অভিজ্ঞতা ছিল না, অনুশীলন ছিল না। এখন সেগুলো করায়ত্ত হওয়ার কাল্পনিক দশ হাজার ডলারের লগ্নিটা শতকরা তিন শ' ডলার লাভ পিঠে নিয়ে এসে হাজির হয়!

ফস্টার দম্পতির কাছে সে এক মহাদিন। আনন্দে তারা বাক্যহারা। বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে বসে বসে তারা এই প্রচণ্ড সত্যটাকেই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল যে কাল্পনিক নগদ অর্থে তারা তখন কয়েক লক্ষ ডলারের মালিক হয়ে বসেছে।

সে এক স্মরণীয় রাত্রি। ক্রমেই তারা যে প্রচণ্ড ধনী হয়ে উঠেছে এই বোধটা দু'জনের মনের মধ্যে স্থায়ী বাসা বেঁধে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা টাকার একটা বিলি-বন্দোবস্ত করে ফেলল। এই স্বপ্নদর্শী দম্পতির চোখ দিয়ে যদি আমরা তাকাতে পারতাম তাহলে দেখতে পেতাম-তাদের পরিচ্ছিন্ন ছোট কাঠের বাড়িটা উধাও হয়ে গেছে, আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে সামনে ঢালাই লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা দোতলা ইঁটের বাড়ি; দেখতে পেতাম-বসবার ঘরের সিলিং থেকে একটা তিন থাকওয়ালা গ্যাসের ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে; সাধারণ মোটা কার্পেটের জায়গায় মেঝেতে পাতা হয়েছে গজ প্রতি ডলার দামের উঁচুদরের ব্রুসেলস্-কার্পেট, সাধারণ অগ্নিকুণ্ডটা উধাও হয়ে সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে একটা অভিজাত অগ্নিকুণ্ড। তাছাড়াও দেখতে পেতাম আরও অনেক কিছু-বগি গাড়ি, ভাল পোশাক, টুপি, কত কি।

সেদিন থেকে মেয়েরা ও প্রতিবেশীরা সেই পুরনো কাঠের বাড়িটা চোখে দেখলেও আলেক ও স্যালি দেখতে লাগল একটা দোতলা পাকা বাড়ি; সেদিন থেকে এমন একটা রাতও কাটে না যেদিন আলেক কাল্পনিক গ্যাসের বিল নিয়ে মাথা না ঘামায়, আর স্যালির মুখ থেকে তাকে বেপরোয়া মন্তব্য না শুনতে হয়: "তাতে কি হল? এ খরচ করবার সামর্থ্য আমাদের আছে।"

ধনী হবার সেই প্রথম রাতে ঘুমুতে যাবার আগেই ফস্টার দম্পতি ঠিক করল যে এই উপলক্ষে একটা উৎসব করতে হবে। স্থির হল-একটা পার্টি দেওয়া হবে। কিন্তু মেয়েদের আর প্রতিবেশীদের কি বলে বোঝাবে? তারা যে ধনী হয়েছে এ কথা তো বাইরে প্রকাশ করা যাবে না। স্যালি প্রকাশ করতেই চেয়েছিল,কিন্তু আলেকের ঠাণ্ডা মাথা, সে তাতে রাজি হল না। সে বলল, যদিও টাকাটা হাতে পাওয়ারই সামিল, তবু যতদিন সত্যি সত্যি হাতে না আসছে ততদিন অপেক্ষা করাই ভাল। কথাটাকে গোপন রাখতেই হবে-কি মেয়েদের কাছে, কি প্রতিবেশীদের কাছে।

দু'জনেই মুস্কিলে পড়ে গেল। উৎসব তারা করবেই, উৎসব করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু কথাটাই যখন গোপন রাখতে হবে, তখন উৎসবটা কিসের? তিন মাসের মধ্যে কোন জন্মদিন নেই। টিল্‌বিউরিকেও উপলক্ষ করা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাহলে কি নিয়ে তারা উৎসব করবে? শেষ পর্যন্ত স্যালির মাথায়ই মতলবটা এল। মুহূর্তে সব গোলমালের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। তারা উৎসব করবে আমেরিকা আবিষ্কারকে উপলক্ষ করে। চমৎকার ধারণা!

স্যালির কথা শুনে আলেকের গর্বের সীমা নেই-আলেক বলল, এ চিন্তা তো তার মাথায়ই আসত না। প্রশংসায় ডগমগ হলেও স্যালি মুখে বলল, এটা আর এমন কি, যে কারও মাথায়ই এটা আসতে পারত। তাতে আলেক সগর্বে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল:

"অবশ্য! যে কেউ পারত-যে কউ! যেমন হোসান্না ডিল্‌কিন্স! অথবা এডেলবার্ট পিনাট-হ্যাঁ, তারা একবার চেষ্টা করেই দেখুক না!

একটা চল্লিশ একর জমির দ্বীপ আবিষ্কারের কথা যদি ধর, সেটাও তারা পারত কি না সন্দেহ; আর একটা পুরো মহাদেশ আবিষ্কার! আরে স্যালি ফস্টার, তুমি তো ভাল করেই জান যে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেলেও সে কাজ তাদের দিয়ে হত না।"

হায় নারী, তার তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে! তবু ভালবাসার বশে সে যদি স্বামীকে একটু বেশী বড় করে দেখেই থাকে তো সেটা দোষের হলেও সে দোষ যেমন মিষ্টি তেমনই মধুর, আর তাই অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য।

৫

উৎসব ভালই জমল। যুবক ও বৃদ্ধ সব বন্ধুরাই হাজির হল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিল ফুসি ও গ্রেসি পিনাট ও তাদের ভাই এডেলবার্ট-একজন উঠতি টিনের কারিগর; আর ছিল হোসান্না ডিল্‌কিন্স জুনিয়র, সেও একজন পলস্তারার কারিগর, সবে তার শিক্ষানবীশী শেষ করেছে। বেশ কয়েক মাস হল এডেলবার্ট ও হোসান্না। গোয়েণ্ডোলেন ও ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে, আর মেয়ে দুটির বাপ-মাও তাতে মনে মনে বেশ পুলকই অনুভব করেছে। কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ তাদের মনোভাব বদলে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুটি মেয়ে ও দু'জন কারিগরের মধ্যে একটা সামাজিক ব্যবধান গড়ে উঠেছে। মেয়ে দুটি এখন আরও উপরের দিকে নজর দিতে পারে-আর দেওয়াই উচিত। হ্যাঁ, তাই। উকিল বা বণিকের নীচে কাউকে বিয়ে করা তাদের পক্ষে ঠিক হবে না; আর সে ব্যাবস্থা তাদের বাবা-মারাই করবে; তারাই দেখবে যাতে অসম-যোটক না হয়।

এই সব ভাবনাচিন্তা অবশ্য গোপনে গোপনেই চলছিল; বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না। তবু তাদের চলনে-বলনে এমন কিছু বাইরে প্রকাশ পাচ্ছিল যার প্রশংসা করলেও অতিথিরা ভিতরে ভিতরে কিছুটা অবাক হচ্ছিল। সকলেই এ নিয়ে আলোচনা করল, কিন্তু কারণটা কেউ অনুধাবন করতে পারল না। এটা যেমন আশ্চর্য তেমনই রহস্যময়। কেউ কেউ অবশ্য না বুঝেই মন্তব্য করল:

"দেখে মনে হচ্ছে এরা যেন কোন সম্পত্তি হাতে পেয়েছে।"

ব্যাপার তো আসলে তাই।

স্যালি বলল: "এখনই কথাটা ভেঙো না; ওরা মনে ব্যথা পাবে। এ ব্যাপারে তোমার কি কাউকে মনে ধরেছে? কারও কথা ভেবেছ কি?"

না, সে রকম কিছু আলেক ভাবে নি। বাজারটা যাচাই করে দেখতে হবে-তাই করেছে মাত্র। যেমন, উঠতি উকিল ব্র্যাডিশ্‌ ও উঠতি দাঁতের ডাক্তার ফুল্‌টন-এর কথা তাদের মনে হয়েছে। স্যালি চায় তাদের একদিন ডিনারে নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু আলেকের মত-এখনই নয়; তাড়া তো কিছুই নেই। দু'জনের উপরই নজর রাখ, অপেক্ষা কর; এ রকম গুরুতর ব্যাপারে ধীরে সুস্থে চললে কখনও লোকসান হয় না।

দেখা গেল তারা বুদ্ধির কাজই করেছে; কারণ তিন সপ্তাহের মধ্যেই আলেক এমন একটা দাঁও মারল যাতে কাল্পনিক এক লক্ষ ডলার চড়চড় করে চার লক্ষ ডলারে উঠে গেল। সেদিন রাতে আলেক ও স্যালি একেবারে মেঘের দেশে ভেসে গেল। এই প্রথম তারা ডিনারে শ্যাম্পেন হাজির করল। আসল শ্যাম্পেন না হলেও যে পরিমাণ কল্পনা তার পিছনে খরচ করল সে তুলনায় বেশ ভাল জিনিস। প্রস্তাবটা স্যালির, তবে আলেকেরও তাতে সায় ছিল। মেয়েদের বিয়ের কথা নতুন করে উঠল। দাঁতের ডাক্তার অথবা উকিলের কথাই উঠল না; তাদের গণ্যের মধ্যেই ধরা হল না। বাতিল হয়ে গেল। মাংস চালানদারের ছেলে আর গ্রাম্য ব্যাংকারের ছেলের কথা উঠল। কিন্তু আগের মতই এবারও তারা অপেক্ষা করে ভেবেচিন্তে দেখবার নীতিই গ্রহণ করল।

ভাগ্য আবার প্রসন্ন হল। সদাজাগ্রত আলেক একটা দাঁও পেয়ে গেল; মোটা দাঁও, ঝুঁকিও অনেক, তবু সে দুঃসাহসের সঙ্গে ডানা মেলল। কিছুদিন বুক কাঁপল, মনে অস্বস্তি দেখা দিল, কারণ ফস্‌কালেই নির্ঘাৎ ধ্বংস। তারপর ফল বেরুল। আনন্দে বাক্যহারা হয়ে আলেক অনেক কষ্টে শুধু বলল:

"অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে স্যালি-আমার এবার পাক্কা দশ লাখের মালিক"!

স্যালি কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলল। বলল:

"আহা ইলেক্ট্রা, রমণী-রত্ন তুমি, মাথার মণি তুমি; এতদিনে আমরা ভয়হীন হলাম; টাকার মধ্যে গড়াগড়ি দিলাম। আর আমাদের কৃপণতা করা সাজে না। এবার চাই "ভিউভ ক্লিকোৎ!"

মাংস-চালানদার ও ব্যাংকারের ছেলেদের শিঁকেয় তুলে রেখে তারা এবার লাট সাহেবের ছেলে ও কংগ্রেস-সদস্যের ছেলের কথা ভাবতে বসল।

৬

ফস্টারদের কাল্পনিক অর্থনীতি যে ভাবে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে শুরু করল তার বিস্তারিত বিবরণ অনুসরণ করা বড়ই শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। আশ্চর্য তার গতি; মাথা ঝিমঝিম করে; চোখে ধাঁধা লাগে। আলেক যাতে হাত দেয় তাই রূপকথার সোনা হয়ে যায়; তার উজ্জ্বলতায় আকাশ পর্যন্ত ঝলসে ওঠে। লাখের পর লাখ-বন্যার স্রোতের মত উদ্দাম তার গতি-বেড়েই চলেছে-বেড়েই চলেছে। পঞ্চাশ লাখ-এক কোটি-দশ কোটি-বিশ-ত্রিশ-তার কি শেষ নেই?

এই অদ্ভুত বিকারের মধ্যে দুটি বছর কেটে গেল-নেশায় মত্ত ফস্টাররা সময়ের গতি বুঝতেও পারল না। তাদের সম্পদ এখন কোটি কোটি ডলারকেও ছাড়িয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি ভাল কোম্পানির পরিচালক-সভার তারা সদস্য হয়েছে; যত দিন যেতে লাগল ততই কোটির উপর কোটি জমতে লাগল-এক ধাপে পাঁচ, কখনও এক ধাপে দশ। তিনশ' কোটি দ্বিগুণ হল-তার দ্বিগুণ হল-আবার-আবার!

অর্বুদ-বৃন্দ-পদ্ম-মহাপদ্ম!

ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে পড়ল। একটা হিসাব-নিকাস করে সব কিছু বোঝা দরকার। ফস্টাররা সেটা বুঝল, অনুভব করল, উপলব্ধি করল যে কাজটা করা একান্ত প্রয়োজন; সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও বুঝল যে এত বড় একটা কাজকে সুষ্টভাবে সুসম্পন্ন করতে হলে একটানা কাজ করতে হবে-মাঝখানে বন্ধরাখা চলবে না। দশ ঘণ্টার কাজ; কিন্তু একটানা দশ ঘণ্টা অবসর তারা কোথায় পাবে? স্যালিকে প্রতিদিন সারা দিন পিন, চিনি, আর কাপড় বেচতে হয়; আলেককেও প্রতিদিন সারা দিন রান্না করতে হয়, বাসন ধুতে হয়, ঝাঁটি দিতে হয়, বিছানা করতে হয়। সাহায্য করবারও কেউ নেই, কারণ উঁচু সমাজে চলাফেরার জন্য মেয়েদের রেহাই দিতেই হয়। ফস্টাররা জানে একটানা দশ ঘণ্টা সময় পাবার একটাই উপায় আছে-মাত্র একটা উপায়। নামটা বলতে দু'জনেরই লজ্জা করতে লাগল; দু'জনই অপেক্ষা করে রইল, যদি অপর জন নামটা বলে। শেষ পর্যন্ত স্যালি বলল:

"কাউকে তো বলতেই হবে। আমিই বলছি। ধর, নামটা আমি বলেই ফেলেছি। জোর গলায় উচ্চারণ করলাম বলে কিছু মনে করো না।"

আলেকের মুখ লাল হয়ে উঠল, তবু সে কৃতজ্ঞ বোধ করল। আর কোন কথা না বলে তারা অবসর-দিনটা (Sabbath) ভঙ্গ করল। একমাত্র সেই দিনই তাদের একটানা দশ ঘণ্টা ছুটি। আর এক পা অগ্রসর হলেই পতনের শুরু। অন্যরাও এই পথ ধরবে। প্রচুর অর্থ হাতে এলে তার প্রলোভনে অনভ্যস্ত মানুষের নৈতিক কাঠামো মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে।

পর্দাগুলো নামিয়ে দিয়ে তারা অবসর-দিনটা ভঙ্গ করল। অনেকক্ষণ ধরে কঠোর পরিশ্রম করে বিষয়-সম্পত্তির একটা তালিকা তৈরি করল। বড় বড় সব নামের দীর্ঘ মিছিল। রেল-ব্যবস্থা, স্টীমার লাইন, স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েল, সামুদ্রিক তার, টেলিগ্রাম-ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে শুরু করে ক্লন্ডাইক, ডি বিয়ার্স, টামানি গ্রাফ্‌ট্‌ ও ডাক বিভাগ পর্যন্ত।

লাখ লাখ ডলার, সবই নিরাপদ লগ্নিতে রাখা, স্বর্ণপ্রসূ, সুদ-প্রদানকারী। আয় বছরে ১২০,০০০,০০০ ডলার। একটানা খুসির শব্দ করে আলেক বলল:

"এই যথেষ্ট তো?"

"যথেষ্ট আলেক।"

"এখন আমরা কি করব?"

"চুপচাপ থাকব।"

"ব্যবসা থেকে অবসর নেব?"

"ঠিক তাই।"

"আমি সম্মত। অনেক ভাল কাজ করা হয়েছে; এবার লম্বা বিশ্রাম নেব; টাকাটা ভোগ করব।"

"খুব ভাল! আলেক!"

"বল?"

"আয়ের কতটা আমরা খরচ করতে পারি?"

"সবটাই।"

স্বামীর মনে হল তার গা থেকে এক জন ওজনের শিকল খুলে পড়ল। একটা কথাও বলল না; তার সুখ ভাষার অতীত।

তারপর থেকে তারা বিশ্রাম-দিনটি ভেবেই চলল। সেটাই প্রথম ভুল পদক্ষেপ। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পরেই তারা সারাটা দিন নতুন নতুন মতলব বের করার কাজে কাটিয়ে দেয়-কেমন করে টাকা খরচ করা যায় তারই মতলব। মাঝ রাত পর্যন্ত ঐ কাজই চলতে থাকে। প্রথম খরচের ফন্দি এল স্যালির মাথায়-চর্বি-বাতির খরচ। প্রথমটায় আলেক চিন্তিত হয়েছিল; তারপর চিন্তা করা ছেড়ে দিল। স্যালি মোমবাতি ব্যবহার করতে শুরু করল, আর সেজন্য ভাড়ার তোলপাড় করতে লাগল। অনভ্যস্ত হাতে অনেক টাকা এলে সেটা অভিশাপেবই সামিল; এতে তার নৈতিক অধঃপতন ঘটে। ফস্টাররা যখন গরিব ছিল; তখন আগুণিত মোমবাতি দিয়া তাদের বিশ্বাস করা যেত। কিন্তু এখন তারা-না। সে কথা থাক। মোমবাতি থেকে আপেল তো এক পা পথ: স্যালি আপেলের অভ্যাস করল; তারপর সাবান; তারপর মিছরি; তারপর টিনের খাবার; তারপর চিনেমাটির বাসন। একবার অধঃপতনের পথে পা দিলে খারাপ থেকে আরও খারাপের পথে নেমে যাওয়া কত সহজ।

ইতিমধ্যে ফস্টারদের আর্থিক অভিযানের আরও অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। কল্পনার পাকা বাড়ির স্থান দখল করেছে এক সুরম্য প্রাসাদ-সেখানে তক্‌মাধারী চাকর-বাকর গিজগিজ করছে, দেশ-বিদেশের রাজধানী থেকে অভ্যাগত খ্যাতিমান ও শক্তিমান সব অতিথিরা জমায়েত হয়েছে।

সে প্রাসাদ এখান থেকে অনেক অনেক দূরে উদয়-সূর্যের দিকে-তার দূরত্ব অপরিমেয়-জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও পরিমাপেও অনেক দূর-মার্কিন অভিজাত রাজ্যের উঁচু সমাজের পবিত্র দেশের রোড দ্বীপের নিউ আইল্যাণ্ড-এ। নিয়ম বেঁধে তারা প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের পরেই প্রতিটি অবসর-দিবসের বাকি সময়টা কাটায় সেই প্রাচুর্যে-ভরা বাড়িতে, কখনও ইওরোপে, কখনও তাদের নিজস্ব পাল-তোলা নৌকোতে চেপে। লেকসাইড-এর এক প্রান্তে অবস্থিত এই বাড়িতে বাস্তব জীবনের কঠোর, কঠিন ছ'টা দিন কষ্টে সৃষ্টে কাটিয়ে সপ্তম দিনে চলে যায় রূপকথার রাজ্যে-এটাই এখন তাদের নিয়মিত কর্মসূচী ও অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

কঠোর সংযত বাস্তব জীবনে তারা পুরনো দিনের মানুষ-পরিশ্রমী, কর্মনিষ্ঠ, সতর্ক, বাস্তববোধসম্পন্ন, স্বল্পব্যয়ী; ছোট্ট প্রেস্‌বিটেরিয়ান গির্জার অনুগামী; মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্বশক্তি নিয়ে গির্জায় সুউচ্চ কঠোর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত। কিন্তু স্বপ্ন-জীবনে তারা কল্পনার একান্ত অনুবর্তী-সে কল্পনা যেমনই হোক, যত পরিবর্তনশীলই হোক।

সমৃদ্ধির শুরু থেকেই ফস্টাররা তাদের কাল্পনিক খরচপত্রের বহর বাড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তু তার পরে যত সমৃদ্ধি বাড়ছে ততই তাদের

খরচ ও ধাপে ধাপে বাড়ছে। কালক্রমে সে খরচ সত্যি মাত্রা ছাড়িয়েছে। প্রতি রবিবারেই আলেক একটা দুটো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলে, একটা দুটো হাসপাতাল বানায়; তা ছাড়া একটা দুটো রাওটন হোটেল; এক গাদা গির্জা। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে মনোমালিন্যও দেখা দিত। স্যালি হয় তো আলেকের খরচের বহরের জন্য তাকে খোঁটা দিত। তা শুনে আলেক অভিমানভরে কেঁদে ফেলত। তখন স্যালি তাকে সান্ত্বনা দিত, ক্ষমা চাইত। আলেক আবার স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ধরত।

৭

একদা রবিবার অপরাহ্ণে দু'জনে তাদের স্বপ্নের পাল-তোলা নৌকায় গ্রীষ্মের সাগর-বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; অলস বিলাসে নৌকোর পিছনের গলুইতে হেলান দিয়ে বসে ছিল, দু'জনই নিশ্চুপ, যার যার চিন্তায় মগ্ন। দু'জনের এই নীরবতা সম্প্রতি বড়ই বেড়ে গেছে; আগেকার সেই ঘনিষ্ঠতায় ও সহৃদয়তার যেন ভাঁটা পড়েছে। এখন (রবিবারগুলোতে) আলেক বুঝতে পারে যে তার পতি-দেবতাটি ক্রমেই অহংকারে ফেঁপে-ফুলে উঠছে, বিরক্তিকর হয়ে উঠছে।

কিন্তু সে-তার নিজেরও কি দোষ-ত্রুটি নেই? তা তো আছেই। একটা কথা সে স্যালির কাছেও গোপন রেখেছে, তার প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করেছে, আর সে জন্য অনেক কষ্টও পেয়েছে। সেই চুক্তি ভেঙেছে, আবার তার কাছে সেটা লুকিয়েছে। লোভের বশবর্তী হয়ে সে আবার ব্যবসায়ে নেমেছে। তাদের যথাসর্বস্বের ঝুঁকি নিয়ে দেশের যত রেল-ব্যবস্থা, যত কয়লা ও ইস্পাত কোম্পানি সব সে কিনে নিয়েছে, আর পাছে বেঁফাস কথার ফাঁকে স্যালি ব্যাপারটা জেনে ফেলে সেই ভয়ে অবসর-দিবসের প্রতিটি ঘণ্টা কাঁপতে কাঁপতে কাটিয়েছে।

"আচ্ছা-আলেক?"

"বল।"

"তুমি কি জান আলেক, আমরা একটা ভুল করে চলেছি-মানে, তুমি ভুল করছ? আমি বিয়ের ব্যাপারটার কথা বলছি।" সে উঠে বসল। একটা ব্যাঙের মত গোলগাল, উদার-ব্রঞ্জের বুদ্ধমূর্তির মত। গম্ভীর গলায় বলল, "ভেবে দেখ, পাঁচ বছর পার হয়ে গেল। গোড়া থেকেই তুমি সেই একই নীতি আঁকড়ে ধরে আছ: আমরা যেমন যেমন উঠছি, তুমিও প্রতিটি ধাপের জন্য পাঁচ পয়েণ্ট করে বাড়িয়ে দিচ্ছ। যখনই ভাবি এবার বিয়েটা লাগবে তখনই একটা বড় কিছু তোমার নজরে আসে, আর আমাকে হতাশ হতে হয়। তোমাকে খুসি করা বড়ই শক্ত। একদিন হয় তো আমার সব হারিয়ে ফেলব। প্রথমে আমার দাঁতের ডাক্তার ও উকিলকে বাতিল করেছি। ঠিকই করেছি-যথার্থ কাজ করেছি। তারপর বাতিল করেছি ব্যাংকারের ছেলেকে ও মাংস-চালানকারীর ছেলেকে-সেটাও ঠিকই করেছি। তারপর বাতিল করেছি কংগ্রেস-সদস্যের ছেলে ও লাট সাহেবের ছেলেকে-এটাও ঠিকই হয়েছে, তা মানছি। তারপর সেনেটরের ছেলে ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্টের ছেলে-তাও ঠিকই হয়েছে, কারণ ঐ সব পদমর্যাদার কোন স্থায়িত্ব নেই। তারপর তুমি অভিজাত সমাজের দিকে হাত বাড়ালে; ভাবলাম এতদিনে তেলে হাত পড়েছে; সেখানে ডুব দিলেই পেয়ে যাব কোন প্রাচীন বংশ-সম্ভ্রান্ত, পবিত্র, দেড়শ' বছরের প্রাচীনতায় সমৃদ্ধ; আর তারপরেই বিয়ে। কিন্তু না, এমন সময় ইওরোপ থেকে এল একটি আসল অভিজাত দম্পতি, আর সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দো-আঁসলাদের তুমি ছুড়ে ফেলে দিলে। আমি হতাশ হলাম। আলেক! সেই থেকে কী দীর্ঘ মিছিল! ব্যারনেটদের বাতিল করলে ব্যারনদের জন্য; ব্যারনদের বাতিল করলে ভাই-কাউণ্টদের জন্য; ভাইকাউণ্টদের আর্লদের জন্য; আর্লদের মার্কুইসদের জন্য; মার্কুইসদের একজোড়া ডিউকের জন্য। আর নয় আলেক, এবার নগদানগদি সওদা করে ফেল! তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার হাতুড়ির নীচে মাথা দিয়েছে চারজন ডিউক; চার দেশের; সকলেই বংশমর্যাদায় পোক্ত; সকলেই আকণ্ঠ ঋণে ডুবে আছে। সকলেই উঁচু বংশের লোক, কাজেই আমাদের আপত্তি থাকতে পারে না। আলেক, আর দেরি করো না, আর ঝুলিয়ে রেখো না: সবগুলো ছক মেলে ধর, মেয়েরা পছন্দ করে নিক!"

আলেক সারাক্ষণই মিটিমিটি হাসছিল; অবাক করে দেবার একটা খুসির ঝিলিক তার চোখে। শান্ত গলায় বলল:

"স্যালি, রাজবংশ হলে কেমন হয়?"

বলে কি! বেচারি স্যালি! মুহূর্তের জন্য তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তারপরই আত্মস্থ হয়ে লাফ দিয়ে স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও আবেগে মুখর হয়ে উঠল:

"জর্জের দিব্যি! আলেক, তুমি কত বড়-সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলা তুমি! তুমি যে কত বড় তা আমি কোন দিনই বুঝতে পারব না। তোমার মনের গভীরতার সন্ধান আমি কোন দিন পাব না। অথচ আমি কি না তোমার কাজের সমালোচনা করছিলাম। আমি কিন্তু প্রিয়তমে, আমার আর দেরি সইছে না-সব কথা খুলে বল!"

প্রশংসামুগ্ধ নারী তখন স্বামীর কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে চুপি চুপি একটি রাজপুত্রের নাম বলল। বেচারির তখন দম বন্ধ হবার উপক্রম। উল্লাসে তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল।

বলল, "আচ্ছা! বেশ বড় মাছ ধরেছ! তার তো আছে একটা জুয়ার আড্ডা, একটা কবরখানা, একজন বিশপ ও একটা গির্জা-সব তার নিজস্ব। আর আছে মূল্যবান শতকরা পাঁচ শ' সুদের কোম্পানির কাগজ; ইওরোপের সব চাইতে নির্দায় সম্পত্তি। আর কবরখানাটা-সেটা তো পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে অভিজাত-আত্মহত্যাকারী ছাড়া আর কাউকে সেখানে জায়গা দেওয়া হয় না। অবশ্য জমি বেশী নেই; তবে যা আছে তাই যথেষ্ট; কবরখানার ভিতরে আট শ' একর, আর বাইরে বিয়াল্লিশ। একটা রাজত্ব-সেটাই তো আসল কথা; জমিটা কিছু না। জমি তো যথেষ্টই আছে; সাহারাটা জুড়ে দিলেই হল।"

আলেকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সে খুব খুসি। বলল:

"ভেবে দেখ স্যালি-এ পরিবারের কেউ কখনও ইওরোপের রাজা-রাজরাদের বাইরে বিয়ে-থা করে নি; আমাদের নাতিরা সিংহাসনে বসবে!"

"সত্যি আলেক-তারা হাতে রাজদণ্ড ধরবে, ইচ্ছামত সেটাকে চালনা করবে, ঠিক যেভাবে আমি গজকাঠি চালাই। খুব ভাল সম্বন্ধ ধরেছ। কিন্তু ভাল করে বেঁধেয় তো? ফস্কে যাবে না?"

"না, না। সেটুকু ভরসা আমার উপর করতে পার। তাছাড়া, এ লোক লোকসান নয়, লাভ। অপরটিও তাই।"

"সে আবার কে আলেক?"

"মহামহিমরাজবংশীয় সিগিসমুণ্ড্-সিগফ্রীড-লয়েনফেল্ড-ডিংকেলস্পিয়েল-শোয়ার্টজেন্‌বের্গ ব্লুট ওয়াস্ট, কাটজেনিয়ামের বংশানুক্রমিক গ্র্যাণ্ড ডিউক।"

"আরে! তুমি বলছ কি!"

"ঠিকই বলছি। আমার কথা বিশ্বাস করতে পার," আলেক বলল।

স্যালির মন খুসিতে ভরে উঠল। আবেগে সে স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল:

"কী আশ্চর্য ব্যাপার, আর কী সুন্দর! জার্মেনির তিনশ' চৌষট্টিটি প্রাচীন জনপদের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ; বিসমার্ক যখন সব জমিদারি ছেটে ফেলেছিলেন তখন যে ক'টি বংশের রাজত্ব রক্ষা পেয়েছিল এটি তাদেরই অন্যতম। সে রাজত্ব আমি চিনি, সেখানে আমি ছিলাম। সেখানে আছে একটা রজ্জু-পথ, একটা মোমবাতির কারখানা, আর একটা সেনাদল। স্থায়ী বাহিনী। পদাতিক ও অশ্বারোহী। তিনটি সৈনিক ও একটা ঘোড়া। আলেক, অনেক অপেক্ষা করেছি, অনেক মনস্তাপ সয়েছি, অনেক আশাভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন এবার আমি খুসি হয়েছি। আর এ সবই তুমি করেছ, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ প্রাণাধিকা। কবে হচ্ছে?"

"পরবর্তী রবিবার।"

"ভাল। বেশ রাজকীয় মর্যাদায় দুটো বিয়েরই ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। তবে আমি যতদূর জানি কোন রাজবংশের পক্ষে একটি মাত্র বিবাহ-প্রথাই স্বীকৃত; সেটা অসম বিবাহ (morganatic)।"

"তার অর্থ কি স্যালি?"

"তা জানি না; তবে সেটাই রাজকীয় প্রথা-একমাত্র রাজাদের মধ্যেই প্রচলিত।"

"তাহলে তাই হবে। সেই বিয়েই আমি চাই। অসম বিয়েই হবে, নচেৎ বিয়েই হবে না।"

আনন্দে হাত ঘসতে ঘসতে স্যালি বলল, "তাহলে তো পাকাই হয়ে গেল! আমেরিকাতে এ বিয়ে এই প্রথম। নিউপোর্ট শুনে ঈর্ষায় জ্বলবে।"

তারপরই তারা চুপ করে গেল। স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে উড়ে গেল পৃথিবীর দূর দূর দেশে-সব মুকুটধারী ও তাদের পরিবারকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং নিখরচায় তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে।

৮

তিন তিনটি দিন স্বামী-স্ত্রী মেঘের বুকে মাথা রেখে বাতাসে বেড়াতে লাগল। চার পাশটাকে দেখতে লাগল আবছা দৃষ্টিতে, যেন গুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে। স্বপ্নেই ডুবে রইল; কেউ কথা বললে শুনতে পায় না; শুনলেও বুঝতে পারে না; কথার জবাব দেয় আবোল-তাবোল। স্যালি ঝোলাগুড় বেচল ওজনে, চিনি বেচল গজ মেপে, আর মোমবাতি চাইলে দিল সাবান। ওদিকে আলেক বিড়ালটাকে ধুতে পাঠিয়ে নোংরা কাপড়কে দুধ খাওয়াতে বসল। সকলেই অবাক, হতবাক। ফস্টারদের হল কি?

তিন দিন। তারপর শুরু হল ঘটনা। অবস্থা ভালর দিকেই গেল; আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে আলেকের কাল্পনিক বাজার চড়তে লাগল। আরও-আরও চড়তে লাগল! কেনা দাম পার হয়ে গেল। আরও-আরও -আরও চড়ছে! কেনা দামের পাঁচ পয়েণ্ট বেশী-তারপর দশ-পনেরো-বিশ! এমন সময় আলেকের কাল্পনিক দালালরা কল্পনার বহুদূর জগৎ থেকে পাগলের মত চিৎকার করে বলতে লাগল, "বেচে দাও! বেচে দাও! ঈশ্বরের দোহাই, বেচে দাও!"

আশ্চর্য খবরটা সে স্যালিকে শোনাল। স্যালিও বলল, "বেচে দাও, বেচে দাও-ভুল করো না। বেচে দাও!" কিন্তু আলেক ঠোঁট চেপে বসে রইল; বলল, যদি মরতেও হয় তবু আরও পাঁচ পয়েণ্ট না ওঠা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবেই।

এই অপেক্ষাই কাল হল। ঠিক পরদিনই দেখা দিল সেই ঐতিহাসিক মন্দা-রেকর্ড মন্দা-সর্বধ্বংসী মন্দা-ওয়াল স্ট্রীটের নীচ থেকে মাটি সরে গেল-পাঁচ ঘণ্টায় সোনার মত দামী সব কোম্পানির কাগজের দাম পঁচানব্বই পয়েণ্ট পড়ে গেল, আর কোটিপতিরা সব বোয়ারির পথে পথে ভিক্ষা করতে লাগল। আলেক যতক্ষণ পারল তার সব কাগজ ধরে রাখল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আর ডাক মেটাতে পারল না তখন তার কাল্পনিক দালালরাই সব বেচে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার ভিতরকার পুরুষটি হাওয়া হয়ে গেল, বেরিয়ে এল চিরন্তন নারী। স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল:

"আমারই দোষ, আমাকে ক্ষমা করো না, আমি তা সইতে পারব না। আমরা এখন পথের ভিখারী! ভিখারী! কী দুঃসহ অবস্থা। বিয়ে হবে না; সে আশা শেষ হয়ে গেছে; এখন তো দাঁতের ডাক্তারকেও পাওয়া যাবে না।"

একটা কটু ভর্ৎসনা স্যালির জিভে এসেছিল: "আমি তো পায়ে ধরে সেধেছিলাম বেচে দিতে, কিন্তু তুমি-" সে কথা সে বলল না; অনুতপ্ত মানুষটাকে আরও আঘাত দিতে তার মন চাইল না। বরং একটা মহত্তর চিন্তা তার মাথায় এল। সে বলল:

"আলেক আমার, ভেঙে পড়ো না; সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি! আমার খুড়োর দান-করা অর্থের একটা পেনিও তুমি কখনও লগ্নি করো নি, লগ্নি করেছ শুধু তার ভবিষ্যতে প্রাপ্য উপস্বত্ব; তোমার অতুলনীয় অর্থনৈতিক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ভবিষ্যতে যে অর্থ উপার্জিত হতে পারত, আমরা শুধু সেটাই হারিয়েছি। অতএব মনে ফুর্তি আনো, দুঃখ দূর কর; আমাদের ত্রিশ হাজার এখনও অক্ষতই আছে; আর ইতিমধ্যে যে অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করেছ, ভাব তো দু' বছরের মধ্যেই তুমি কি না করতে পারবে! বিয়ে তো আর ভেঙে যাচ্ছে না, একটু শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে।"

কথাগুলি বড় ভাল। আলেকও বুঝল কথাগুলি ঠিক, আর তার ফল হল বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি। তার চোখের জল থেমে গেল; তার মনও আবার আগের মতই চাঙ্গা হয়ে উঠল। উজ্জ্বল চোখে, সকৃতজ্ঞ অন্তরে প্রতিজ্ঞার ভঙ্গীতে হাতটা তুলে সে বলে উঠল:

"এখানে দাঁড়িয়ে এখনই আমি ঘোষণা করছি-"

একজন আগন্তুকের আগমনে তার কথায় বাধা পড়ল। "সাগামোর" পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক। তার এক বিস্মৃতপ্রায় ঠাকুরমার জীবনযাত্রা প্রায় সমাপ্তির মুখে; কর্তব্যবোধে তার সঙ্গে একবার দেখা করতেই সম্পাদক-মশাই লেক-সাইডে এসেছিল; তার সঙ্গে একটু ব্যবসায়িক স্বার্থ যোগ করে সে খোঁজ খবর করে ফস্টারদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কারণ তারা নানা কাজে এতই ব্যস্ত যে চার বছরের গ্রাহক-চাঁদা পাঠাবার কথা তাদের মনেই ছিল না। তাদের কাছে পাওনা হয়েছে ছ' ডলার। স্বভাবতই এ হেন আগন্তুক ফস্টারদের কাছে খুবই স্বাগত। এ লোকটি খুড়ো টিল্‌বিউরির কবর, তার কবর-যাত্রার কত বাকি সে খবর নিশ্চয়ই রাখে। তারা অবশ্য কোন রকম প্রশ্নই করতে পারবে না, কারণ তাতে দান-পত্রের শর্ত ভঙ্গ করা হবে; তবে সে বিষয়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে করতে এক সময় না এক সময় প্রত্যাশিত খবরটা অবশ্যই জানা যাবে। কিন্তু সে পথে কাজ হল না, সম্পাদক সে পথেই হাঁটল না। কিন্তু কৌশলে যা ঘটানো গেল না, আকস্মিকভাবেও তা ঘটে গেল না। কি একটা কথাপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে সম্পাদক বলল:

"আরে! এ যে দেখছি টিল্‌বিউরি ফস্টারের মতই কড়া লোক!"

হঠাৎ কথাটা শুনেই ফস্টার দম্পতি লাফ দিয়ে উঠল। সেটা লক্ষ্য করে সম্পাদক ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল:

"কোন রকম আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এটা একটা কথার কথা মাত্র; কি জানেন, একটা ঠাট্টার কথা-তার বেশী নয়। আপনাদের কোন আত্মীয় বুঝি?"

মনের জ্বলন্ত আগ্রহকে কোন রকমে চাপা দিয়ে স্যালি নিস্পৃহতার ভান করে বলল:

"আমি-মানে-ঠিক যে জানাশোনা তা নয়, তবে তার কথা শুনেছি বটে।"

সম্পাদক ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কথায় ফিরে যেতেই স্যালি বলল, "তিনি-তিনি কি-মানে ভাল-"

"তিনি ভাল আছেন কি না? সে কি, তিনি তো পাঁচ বছর হল 'শওল'-এ (সেখানে আত্মাদের বাস) আছেন!"

ফস্টাররা শোকে কাঁপতে লাগল, যদিও দেখে মনে হবে আনন্দের কাঁপুনি। কোন রকম ধরা না দিয়ে স্যালি বলল:

"আহা, এই তো জীবন, এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই-এমন কি ধনীরাও পার পায় না।"

সম্পাদক হাসল।

বলল, "যদি টিল্‌বিউরিকে মনে করে কথাটা বলে থাকেন তো বলি, তার বেলায় কথাটা খাটে না। এক কপর্দকও তার ছিল না। শহরের খরচে তাকে কবরস্থ করা হয়েছিল।"

দু' মিনিট ফস্টাররা পাথরের মত বসে রইল। তারপর ফ্যাঁকাসে মুখে ভাঙা গলায় স্যালি জিজ্ঞাসা করল:

"এ কথা সত্যি? আপনি জানেন এটা সত্যি?"

"তাই তো মনে হয়। আমিই তো অছিদের একজন ছিলাম। একটা ঠেলাগাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেটা আমার কাছেই রেখে গিয়েছিল। গাড়িটার চাকা না থাকায় কোন কাজেই লাগত না। তবু একটা জিনিস তো বটে; তাই দায় মেটাবার জন্য একটা ছোট শোক-সংবাদের মত লিখেছিলাম, কিন্তু সেটা যেন খবরের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।"

ফস্টারদের কানে কোন কথাই ঢুকছে না-তাদের পাত্র পূর্ণ হয়েছে, তাতে আর কিছুই ধরবে না মাথা নীচু করে তারা বসে রইল; বুকের যন্ত্রণা ছাড়া আর কোন বোধ তাদের নেই।

এক ঘণ্টা পরে। তারা তখনও সেই ভাবেই বসে আছে-মাথাটা নীচু, নিশ্চল, নির্বাক। আগন্তুক কখন চলে গেছে তারা জানতেও পারে নি।

তারপর তারা নড়েচড়ে বসল; শ্রান্তভাবে মাথা তুলল; বিস্মিত, চকিত দৃষ্টিতে যেন স্বপ্নের ঘোরে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ছেলেমানুষের মতে আবোল-তাবোল বকতে লাগল। মাঝে মাঝেই একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে যাচ্ছে; আবার চুপ করছে; যেন কি করছে না করছে তাই বুঝতে পারছে না। কখনও বা সমবেদনায় ও সমর্থনে পরস্পরের হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে; যেন বলতে চাইছে: "আমি তোমার কাছেই আছি, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না, দু'জনে মিলেই সব সহ্য করব; কোথাও না কোথাও মুক্তি আছে, বিস্মৃতি আছে; কোথাও না কোথাও কবর আছে, শান্তি আছে; ধৈর্য ধর, সেদিন দূরে নয়।"

আরও দু' বছর তারা বেঁচে রইল। তাদের মনের উপর নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার; সর্বদাই চিন্তা করে, অস্পষ্ট অনুতাপ আর বিষণ্ণ স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকে, কোন কথা বলে না; তারপর একই দিনে এল তাদের মুক্তি।

শেষের দিকে স্যালির বিধ্বস্ত মনের উপর থেকে মুহূর্তের জন্য অন্ধকারটা সরে গিয়েছিল। সে বলেছিল:

"আকস্মিক ও অসাধু পথে অর্জিত প্রচুর অর্থ তো একটা ফাঁদ। তাতে আমাদের কোন উপকার হয় নি; তার উৎকট আনন্দ ছিল একান্তই ক্ষণস্থায়ী। অথচ তারই জন্য আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছিলাম আমাদের সুন্দর, সরল, সুখী জীবন-আমাদের দেখে অন্যরা যেন সতর্ক হয়।"

চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর মৃত্যুর শীতল হাত যখন ধীরে ধীরে তার হৃৎপিণ্ডের দিকে এগিয়ে এল, চৈতন্য যখন মস্তিষ্ক থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তখন সে বিড় বিড় করে বলতে লাগল:

"মৃত্যু তাকে দিল দুঃখ, আর সে প্রতিশোধ নিল আমাদের উপর, অথচ আমরা তার কোন ক্ষতি করি নি। তার মনে সেই বাসনাই ছিল: নীচ কৌশলের সঙ্গে সে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিল ত্রিশ হাজার; সে জানত আমরা সেটাকে বাড়াতে চেষ্টা করব, আর সেই চেষ্টায়ই আমাদের জীবন নষ্ট হবে, আমাদের বুক ভেঙে যাবে। আর একটু খরচ করলেই সে অর্থবৃদ্ধির এই ইচ্ছার হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারত; যে কোন দয়াবান মানুষ তাই করত; কিন্তু তার মনে ছিল না উদারতা-ছিল না করুণা-ছিল না-"

এ কি স্বর্গ? না নরক?

Was It Heaven? Or Hell?

১

"তুমি মিথ্যা বলেছ?"

"তুমি স্বীকার কর-সত্যি সত্যি স্বীকার কর-তুমি মিথ্যা বলেছ!"

২

পরিবারটি তে ছিল চারটি মানুষ: ছত্রিশ বছর বয়স্ক বিধবা মার্গারেট লেস্টার; তার ষোল বছর বয়সের মেয়ে হেলেন লেস্টার; শ্রীমতী লেস্টারের দুই যমজ অবিবাহিতা মাসি হান্না এবং হেস্টার গ্রে, বয়স সাতষট্টি বছর। এই তিন রমণী ছোট্ট মেয়েটি কে আদর-যতিন করত; তার মিষ্টি মনের গতি-বিধির প্রতিচ্ছবি তারা দেখত তার মুখের আয়নায়; তার প্রস্ফুটি ত সৌন্দর্য দেখে তারা তাদের মনকে তাজা করে তুলত; তার গলায় গান শু নত; কৃতজ্ঞচি ত্তে ভাবত যে মেয়েটি র মধ্যে এই গু ণগু লি আছে বলেই পৃথিবী তাদের কাছে কতখানি শূন্য হয়ে যেত; সব ভেবে তারা শিউ রে উঠ ত। এমনি করেই জাগ্রত ও ঘুমন্ত সব অবস্থাতেই এই তিনটি নারী তাদের দিন ও রাত্রি কাটি য়ে দিত।

স্বভাবে এবং মনের দিক থেকে এই বয়স্ক মাসিরা ছিল সত্যিই প্রিয়, স্নেহময়ী এবং ভাল, কিন্তু নৈতিকতা এবং আচ রণের দিক থেকে তাদের শিক্ষা এত আপোষহীনভাবে কঠো র ছিল যে তা তাদের নির্দয় না হলেও বাহ্যত কর্কশ করে তুলেছিল। তাদের প্রভাব বাড়িতে এত বেশী কার্যকরী ছিল যে মা এবং মেয়ে তাদের নৈতিক ওধর্মীয় দাবীগু লিকে খুসি মনে, সন্তুষ্ট চি ত্তে, আনন্দের সঙ্গে, বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। এ রকম করা তাদের স্বভাবগতই হয়ে উ ঠে ছিল। এবং সেই জন্যই এই শান্তিময় স্বর্গে কোন সংঘাত, বিরক্তি, দোষারোপ ও মনোমালিন্য ছিল না।

এখানে মিথ্যার কোন স্থান ছিল না। এখানে মিথ্যা ছিল চি ন্তার অতীত। পরম সত্য, লৌহ-কঠি ন সত্য, সুদৃঢ় এবং আপোষহীন সত্যই এখানে প্রতিটি বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ করত, তার পরিণতিতে যাই ঘটু ক না কেন। অবশেষে একদিন পারিপার্শ্বিকের চা পে সেই বাড়ির আদরের মেয়েটি একটি মিথ্যা দিয়ে তার ঠোঁ টকে কলঙ্কিত করল-এবং চো খের জলে, আত্ম-ধিক্কা রের সঙ্গে তা স্বীকার করল। মাসিরা এমন বিহ্বল হয়ে পড়ল যে তা অবর্ণনীয়। মনে হয়েছিল বুঝি বা আকাশটা গুঁ ড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে, এবং পৃথিবীটা প্রচ ণ্ড সংঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা পাশাপাশি বসেছিল; মুখ ফ্যাকাশে ও কঠো র; নির্বাক হয়ে অপরাধীর দিকে তাকিয়েছিল; আর অপরাধী নতজানু হয়ে একবার এর কোলে আর একবার তার কোলে মাথা রেখে ফু পিয়ে কাঁদছিল, সহানুভূতি ও ক্ষমা ভিক্ষা করে কোন সাড়া না পেয়ে বিনীতভাবে দু'জনের হাত চু ম্বন করছিল, আর তারা দু'জনেই তার কলংকিত ঠোঁ টে র ছোঁয়া থেকে তাদের হাত সরিয়ে নিচ্ছিল।

তারই ফাঁ কে হেস্টার মাসি বরফ -কঠি ন বিস্ময়ে দু'বার বলল:

"তুমি মিথ্যা কথা বলেছ?"

তারই ফাঁ কে হান্না মাসিও সবিস্ময়ে দু'বার বলল:

"তুমি স্বীকার কর-তুমি সত্যিই স্বীকার কর-তুমি মিথ্যা বলেছ!"

এটু কুই তারা বলতে পেরেছিল। পরিস্থিতিটা ছিল নতুন, অশ্রুতপূর্ব ও অবিশ্বাস্য; তারা বুঝ তে পারছিল না, তারা জানত না কি করে এর মোকাবিলা করবে; তাদের বাক্‌শক্তি প্রায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে ঠি ক হল যে ভ্রান্ত শিশু টি কে তার অসুস্থ মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে; তাঁরও জানা দরকার কি ঘটে ছে। হেলেন প্রার্থনা

করল, মিনতি জানাল, অনুরোধ জানাল, এই বাড়তি অপমানের হাত থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হোক, আর তার মাকেও এই দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করা হোক; কিন্তু তা তে পারে না; কর্তব্যের খাতিরে এ দুঃখ সহ্য করতেই হবে, কারণ কর্তব্য সবকিছুর উপরে, কোন কিছুর জন্যই কর্তব্যচ্যুত হওয়া যায় না, কর্তব্যের ক্ষেত্রে কোন আপোষই সম্ভব নয়।

হেলেন তবুও মিনতি জানাল, বলল যে এ পাপ তার নিজের, তার মায়ের এতে কোন হাত ছিল না-তাহলে মা কেন তার জন্য কষ্ট পাবে?

কিন্তু মাসিরা তাদের ন্যায়বিচারে অনমনীয়;তারা বলল, বাবা মার পাপ যেমন সন্তানে বর্তায় তেমনই তার উল্টোটাও ন্যায়বিচারসম্মত; কাজেই এটাই ন্যায়সঙ্গত যে পাপী সন্তানের মাকেও সেই পাপের জন্য প্রাপ্য দুঃখ, যন্ত্রণা ও লজ্জার যথাযোগ্য অংশ ভোগ করতেই হবে।

তারা তিনজনে রোগিনীর ঘরের দিকে চলল।

এই সময় ডাক্তাবাবু ঐ বাড়ির দিকে আসছিলেন। যদিও তখনও তিনি বেশ কিছুটা দূরেই ছিলেন। তিনি ভাল চিকিৎসক ও ভাল মানুষ। তাঁর অন্তরটাও ভাল ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতি ঘৃণা দূর হতে কোন একজন মানুষের লাগত এক বছর, দু' বছর লাগত তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে, তিন বছর লাগত তাকে পছন্দ করতে, এবং চার থেকে পাঁচ বছর লগাত তাকে ভালবাসতে শিখতে। বেশী ধীরে ধীরে এবং কষ্ট করে এই শিক্ষা লাভ করতে হত। তবে তাতে লাভই হত। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী; সিংহের মত মাথা, সিংহের মত মুখ, কর্কশ কণ্ঠ স্বর; এবং মেজাজ মাফিক চোখ দুটি কখনও জলদস্যুর মত, কখনও রমণীসুলভ। কোন রকম সহবৎ জানতেন না, তার ধারাও ধারতেন না; কথাবার্তায়, আচরণে, সাহসে, স্বভাবে তিনি ছিলেন প্রচলিত ধারার পরিপন্থী। বেশ খোলামেলা লোক, তবে কিছুদূর পর্যন্ত; সব ব্যাপারেই তাঁর একটা নিজস্ব মতামত আছে, আর সব সময়ই তা ঠোঁটের ডগায় শোনাবার জন্য তৈরিই থাকে; শ্রোতারা তা পছন্দ করছে কি না তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না। যাকে ভালবাসেন তাকে ভালই বাসেন, এবং উচ্চ কণ্ঠে তা জানিয়েও দেন। যৌবনে তিনি ছিলেন একজন নাবিক; এবং সমুদ্রের নোনা হাওয়া তার মধ্য থেকে এখনও বেরিয়ে আসে। তিনি একজন কঠোর ও বিশ্বস্ত খ্রীস্টান; তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনিই দেশের শ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান; তাঁর খ্রীস্টভক্তিই সম্পূর্ণ সঠিক, স্বাস্থ্যকর, সাধারণ জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ, সমৃদ্ধ, তাতে কোন বিকৃতির স্থান নেই। যে সব লোক কৌশলে স্বার্থসাধন করতে চাইত, অথবা যারা তার চরিত্রের কোমল দিকটার সুযোগ খুঁজে নিতে চাইত, একমাত্র তারাই তাকে বলত একমাত্র খ্রীস্টান-তবু এই শব্দটির সূক্ষ্ম তোষামোদের সুরটি তাঁর কানে বাজনার মত মনে হত; এবং তার প্রথম অক্ষরটি তার কাছে এত আনন্দজনক ও তীব্র মনে হত যে অন্ধকারে কোন ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত হলেও তিনি যেন তা দেখতে পেতেন। ডাক্তারটি যা বিশ্বাস করতেন, তা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন এবং সুযোগ পেলেই তার জন্য লড়াই করতেন; আর এই ধরনের সুযোগ আসতে বিরক্তিকর দীর্ঘ বিরতি ঘটলে তিনি নিজেই সে সময়টা কমিয়ে আনতেন। নিজস্ব স্বাধীন আলোকে তিনি ছিলেন গভীরভাবে বিবেকবান; এবং যা কর্তব্য বলে মনে করতেন; পেশাদারী বা নীতিবাগীশদের উপদেশের সঙ্গে তা মিলছে কি না সেটা তার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। তরুণ বয়সে, যখন সমুদ্রে থাকতেন তখন তিনি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন, কিন্তু খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পরে তিনি একটা নিয়ম তৈরি করে নেন যে একান্ত প্রয়োজন না হলে অশ্লীল কথা বলবেন না এবং পরবর্তী কালে কঠোরভাবে সে নিয়ম পালন করেই চলেছেন। সমুদ্রে তিনি ছিলেন পাঁড় মাতাল, কিন্তু খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পরে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন দৃঢ় ও সরল নেশাহীন ব্যক্তি, এবং সেই থেকে কদাচিৎ গান করতেন-যখন কর্তব্য বলে মনে হত সেই রকম অবস্থা ছাড়া তিনি কখনই তা করতেন না; আর সে অবস্থা বছরে মাত্র কয়েকবারই ঘটত, তবে বার পাঁচেকের বেশী নয়।

স্বাভাবতই এরকম মানুষ প্রভাবশালী ও আবেগপ্রবণ হয়। তিনিও তাই ছিলেন, এবং তার অনুভূতিকে ঢাকবার কোন প্রবণতাও তার ছিল না, অথবা থাকলেও সেটা প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা বোধ করতেন না। মনের অবস্থা সব সময়ই তার মুখে ফুটে উঠত। যখনই তার চোখে কোমল আলো ফুটে উঠত তখনই বোঝা যেত যে তার মন ভাল আছে; আবার যখনই ভুরু কুঁচকে আসতো, তখনই ঘরের আবহাওয়া দশ ডিগ্রী নীচে নেমে যেত। বন্ধুদের বাড়িতে তিনি সকলেরই খুব ভালবাসার পাত্র ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে সকলে খুব ভয়ও করত।

লেস্টারদের বাড়ির বাসিন্দাদের প্রতি তার একটা গভীর ভালবাসা ছিল, এবং এখানকার বাসিন্দারাও আগ্রহের সঙ্গে এই অনুভূতির প্রতিদান দিত। তার অতিমাত্রায় খ্রীস্টভক্তি নিয়ে তারা যেমন দুঃখপ্রকাশ করত, তেমনি তাদের খ্রীস্টভক্তিকেও তিনি খোলাখুলিভাবে অবজ্ঞা করতেন; তথাপি দুই পক্ষই পরস্পরকে সমান ভালবেসে চলত।

তিনি বাড়িটির দিকেই আসছিলেন-মাসিরা এবং অপরাধী মেয়েটি ও রোগীর ঘরের দিকেই যাচ্ছিল।

৩

পূর্ব বর্ণিত তিনজন বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল: মাসিরা গম্ভীর, আর মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা বালিশে মাথাটা ঘোরাল; মেয়ের উপর নজর পড়তেই তাঁর ক্লান্ত চোখ দুটি সহানুভূতি ও উচ্ছসিত মাতৃস্নেহে জ্বলে উঠল; দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আশ্রয় দিতে চাইল।

"থাম!" বলল হান্নামাসি; হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা দিল।

"হেলেন" অন্য মাসি গম্ভীরভাবে বলল, "তোমার মাকে সব বল। তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ কর; কোন কিছুই স্বীকার করতে বাকি রেখ না।" বিচারকদের সামনে অভিভূত ও অসহায় হয়ে বাচ্চা মেয়েটি তার দুঃখের ঘটনার শেষ কথাটি পর্যন্ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, তারপর তীব্র আবেগে চিৎকার করে বলল:

"মাগো, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না!-আমি যে বড় নিঃসঙ্গ!"

"আমার বাচ্চা, তোকে ক্ষমা? ওরে, আমার কাছে আয়!-এখানে আমার বুকের উপর মাথা রাখ, শান্তিতে থাক্! তুই যদি হাজার মিথ্যেও বলে থাকিস্-"

একটা শব্দ হল-একটা সাবধানবাণী-গলাখাঁকারির শব্দ। মাসিরা চোখ তুলে তাকাল; তাদের পোশাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন যে ডাক্তারটি তাঁর মুখ বজ্র-মেঘের মত গম্ভীর। মা ও মেয়ে তাঁর উপস্থিতির কথা কিছুই বুঝতে পারে নি; তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বুকে বুক দিয়ে শুয়েছিল। অপরিমিত সুখে মগ্ন হয়ে, সব কিছু ভুলে। ডাক্তারটি তার সামনের এই দৃশ্য বহুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখলেন, কারণ অনুসন্ধান করলেন; তারপর হাত তুলে মাসিদের ইশারা করলেন। তাঁরা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর কাছে গেল এবং বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি নীচু হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন:

"আমি কি বলি নি যে এই রোগীকে সমস্ত উত্তেজনা থেকে দূরে রাখতে হবে? তোমরা কি সব যা তা করছিলে? এখান থেকে চলে যাও!"

তারা কথা শুনল। আধ ঘণ্টা পরে হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বসবার ঘরে এলেন, প্রসান্ত উৎফুল্ল, রৌদ্রালোকে ঝল্‌মল্। হেলেনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে মিষ্টি মিষ্টি মজার কথা বললেন; আর সেও আবার তার ঝক্‌ঝকে ও সুখী রূপটি ফিরে পেল।

তিনি বললেন, "তাহলে এখন বিদায় মা-মণি। তোমার ঘরে যাও, মার কাছ থেকে দূরে থেক এবং ভালভাবে থেক। দাঁড়াও-জিভটা বার কর। এই তো ঠিক আছে-তুমি একটা বাদামের মত সুস্থ! তবু গালটা টিপে দিয়ে বললেন, এখন পালাও; আমি তোমার মাসিদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

সে এখান থেকে চেল গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের মুখে আবার মেঘ নেমে এল; বসে পড়ে তিনি বললেন:

"তোমরা অনেক ক্ষতি করেছ-এবং হয়তো কিছু ভালও করেছ। কিছু ভাল, হ্যাঁ-সেরকমই মনে হচ্ছে। ঐ মহিলার অসুখটা হচ্ছে টাইফয়েড। তোমাদের জন্যই তা বোঝা গেল, আমার মনে হয় তোমাদের পাগলামির জন্য আর সেটাই কাজের কাজ হয়েছে। আমি তো এতদিন রোগটা ধরতেই পারছিলাম না।"

এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বয়স্ক মহিলা দু'জন ভয়ে কাঁপতে লাগল।

"বস! তোমরা কি করতে চাও?"

"কি করতে চাই? আমরা এক্ষুণি তার কাছে যাব। আমরা-"

"সে রকম কিছুই করবো না; একদিনের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি করেছ। তোমরা কি একটা খেলাতেই সব পাপ ও বোকামির বোঝা উড়িয়ে দিতে চাও? আমি বলছি, বসে পড়। আমি ওঁর জন্য ঘুমের ব্যবস্থা করেছি; ওঁর ঘুমের প্রয়োজন; তোমরা যদি আমার আদেশ ছাড়া তাঁকে বিরক্ত কর আমি তোমাদের মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বার করে দেব-অবশ্য যদি কিছু ঘিলু থাকে।"

বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ হলেও তারা বাধ্য হয়েই বসে পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন:

"তাহলে এখন আমি এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চাই; ওরা আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যেন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আবেগ আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নি। তোমরা আমার আদেশ জানতে; তবু ওখানে যাবার এবং গোলমাল বাধাবার সাহস পেলে কি করে?"

হেস্টার কাতর দৃষ্টিতে হান্নার দিকে তাকাল, হান্নাও হেস্টারের দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল-এই সহানুভূতিশূন্য অর্কেস্ট্রায় তারা কেউই অংশীদার হতে চাইছিল না। ডাক্তারই তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তিনি বললেন:

"বলে ফেল হেস্টার।"

তার শালের কোণটা আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে নাড়ত চোখ নামিয়ে দুর্বল গলায় হেস্টার বলল:

"কোন সাধারণ কারণে আমরা আপনার অবাধ্য হই নি। ব্যাপারটা খুব গুরুতর। আমাদের কর্তব্যও বটে। কর্তব্যের ক্ষেত্রে কারও কোন পছন্দ থাকতে পারে না; সমস্ত সাধারণ বিবেচনাকে সরিয়ে রেখে তা পালন করতে হয়। আমরা তার মার সামনে তাকে অভিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে একটা মিথ্যা কথা বলেছিল।"

ডাক্তার এক মুহূর্ত রমণীদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; মনে হল তিনি একটি সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা বোঝাবার জন্য মনে মনে চেষ্টা করছেন; তারপরই তিনি ফেটে পড়লেন;

"সে একটা মিথ্যে কথা বলেছ! এই তো? হা ভগবান! আমি তো একদিনে লক্ষটা মিথ্যে কথা বলি। আর প্রত্যেক ডাক্তারই তাই বলে। এবং প্রত্যেক মানুষই, আপনাদের ধরেই বলছি-তাই বলে। আর এটাই এমন গুরুতর ব্যাপার হয়ে পড়ল যার জন্য তোমরা আমার আদেশ অমান্য করবার এবং ঐ মহিলাটির জীবন বিপন্ন করবার সাহস পেলে! শোন হেস্টার গ্রে, এটা পুরোপুরি পাগলামি; মেয়েটি এমন মিথ্যে বলতে পারে না যা অন্যের ক্ষতি করতে পারে। সেটা অসম্ভব-একেবারেই অসম্ভব। তোমরাও তা জান-দু'জনেই জান; ভাল করেই জান।"

হান্না তার বোনকে বাঁচাতে এগিয়ে এল:

"এটা যে সে রকম ধরনের মিথ্যে কথা হান্না ঠিক তা বলে নি, আর তা ছিলও না। তবু এটা মিথ্যে তো বটে।"

"দেখ আমি বলছি, এ রকম বোকার মত কথা আমি আগে কখনো শুনি নি। বিভিন্ন রকম মিথ্যের মধ্যে পার্থক্য করার মত বুদ্ধিও কি তোমাদের নেই? তোমরা কি জান না যে উপকারী মিথ্যে আর আঘাতকারী মিথ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য?

"সব মিথ্যেই পাপ" সাঁড়াশীর মত ঠোঁটদুটি চেপে হান্না বলল, "আর সমস্ত মিথ্যেই নিষিদ্ধ।"

সেই একমাত্র খ্রীস্টান ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। ঐ কথাটিকে তিনি পাল্টা আঘাত করতে চাইছিলেন, কিন্তু ঠিক কিভাবে এবং কোথা থেকে শুরু করবেন বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে শুরু করলেন:

"হেস্টার, তুমি কি কোন মানুষকে অনাবশ্যক কোন লজ্জা বা আঘাত থেকে রক্ষা করতেও একটা মিথ্যে কথা বলবে না?"

"না।"

"কোন বন্ধুর জন্যও না?"

"না।"

"কোন প্রিয়তম বন্ধুর জন্যও না?'

"না। আমি বলব না।"

ডাক্তার এই অবস্থায় নিঃশব্দে যুঝতে লাগলেন; তারপর প্রশ্ন করলেন:

"তাকে তীব্র যন্ত্রণা, দুঃখ ও শোক থেকে রক্ষা করতেও না?"

"না। তার জীবন রক্ষা করতেও না।"

আবার বিরত। তারপর:

"তার আত্মার জন্যও না?'

আবার নিশ্চুপ-যেন কিছুক্ষণের জন্য বিরতি-তারপর মৃদুস্বরে অথচ স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে হেস্টার উত্তর দিল:

"তার আত্মার জন্যও নয়।"

কিছুক্ষণের জন্য কেউ কোন কথা বলল না; তারপর ডাক্তার বললেন:

"হান্না, তোমারও কি একই কথা?"

"হ্যাঁ," সে উত্তর দিল।

"আমি তোমাদের দু'জনকেই জিজ্ঞাসা করছি-কেন?"

"কারণ এ রকম মিথ্যে কথা বলা, অথবা যে কোন মিথ্যে বলাই পাপ; যে কোন মিথ্যেই আমাদের আত্মাকে ভ্রষ্ট করতে পারে-আর যদি অনুশোচনা করবার মত সময় পাবার আগেই আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে তাই ঘটবে।"

"আশ্চর্য....আশ্চর্য....এতো বিশ্বাসই করা যায় না।" তারপর তিনি রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলেন: "এ রকম আত্মাকে কি রক্ষা করতেই হবে?" তিনি উঠে দাঁড়ালেন, অস্ফুট স্বরে গজর গজর করতে করতে ঠকঠক করে পা ফেলে দরজার দিকে এগোলেন। চৌকাঠের কাছে গিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন: "সংশোধন কর। তোমাদের ঘৃণ্য, ক্ষুদ্র আত্মাকে রক্ষা করতে তোমাদের এই নীচ, জঘন্য এবং স্বার্থপর প্রচেষ্টাকে বর্জন কর, এমন কিছু কাজের খোঁজ কর যাতে অন্তত কিছুটা মর্যাদা থাকে। আত্মাকে ত্যাগ কর। কোন মহৎ কাজে ত্যাগ কর। তখন যদি তা থেকে ভ্রষ্টও হও, তাহলেই বা তোমাদের কি যায় আসে? সংশোধন কর।"

দুই ভাল মানুষ বৃদ্ধা অসাড়, বিধ্বস্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ উৎপীড়িত, অপমানিত হয়ে বসে রইল এবং ক্ষুব্ধ, তিক্ত চিত্তে এই সব অপবিত্র ভাষার কথাই ভাবতে লাগল। দু'জনের মনেই খুব আঘাত লেগেছে; এ আঘাত তারা কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

"সংশোধন কর।"

ক্ষুব্ধ হয়ে তারা বারবার শব্দটির পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। "সংশোধন কর-এবং মিথ্যে বলতে শেখ।"

সময় বয়ে চলল; যথাসময়ে তাদের মনেরও পরিবর্তন ঘটল। মানুষের কর্তব্য তারা পালন করেছে-সেটা হল নিজেকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা; সেটা শেষ হলে তবেই মানুষ অন্য ছোটখাট বিষয় ও অন্য মানুষের কথা নিয়ে চিন্তা করতে পারে। এবার দুটি বৃদ্ধা মহিলার মন আবার তাদের আদরের বোনঝি এবং তার ভয়ঙ্কর রোগের দিকে ফিরে গেল; তাদের আত্মপ্রেম যে আঘাত পেয়েছিল তা

তারা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল, এবং তাদের হৃদয়ে তীব্র ইচ্ছা জাগল সেই দুঃখী মেয়েটি কে সাহায্য করার; তাকে আরাম দেবার; তাকে সেবা করার; তাদের দুর্বল হাতে যতখানি সম্ভব ততখানি তার জন্য পরিশ্রম করার; এবং তারই স্বাস্থ্যের সেবায় তাদের দুর্বল বৃদ্ধ শরীরকে পাত করার।

"সে সুযোগে আমরা পাবই," চোখের জলে হেস্টার বলল। "আমাদের মত সেবিকা আর কোথাও নেই, কারণ এমন কেউ নেই যে আমৃত্যু তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে পাহারা দেবে। ভগবান জানেন, আমরাই তা করব।"

"আমেন!" চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুমোদন এবং সমর্থন জানিয়ে হান্না বলল। "ডাক্তার আমাদের জানেন; আমরা যে আর তাঁর অবাধ্য হব না তাও জানেন; কাজেই তিনি আর কাউকে ডাকবেন না। সে সাহসই তিনি পাবেন না!"

"সাহস?" হেস্টার রেগে গিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে বলল, "ঐ খ্রীস্টান শয়তানটি সব পারে! কিন্তু এ সময় সে চেষ্টা করা তার পক্ষে ভাল হবে না। কিন্তু হান্না, যাই বল না কেন, তিনি গুণী জ্ঞানী এবং সৎ, এ রকম কিছু তিনি চিন্তাই করবেন না.......এখন নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে একজনের ঐ ঘরে যাবার সময় হয়েছে। উনি সেখানে কি করছেন? কেন উনি আসছেন না এবং কিছু বলছেন না?"

তারা তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তিনি ঢুকলেন, বলেন এবং কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

"মার্গারেট একটি অসুস্থ মহিলা, সে এখনো ঘুমোচ্ছে, কিন্তু সে শীঘ্রই জেগে উঠবে; তখন তোমরা কেউ তার কাছে যাবে। ভাল হয়ে উঠবার আগে তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। তাকে দিন রাত দেখাশুনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। তার কতটা দায়িত্ব তোমরা দু'জন নিতে পারবে?"

"সবটাই!" দুই মহিলা একসঙ্গে চিৎকার করে বলল। ডাক্তারের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল; উৎসাহের সঙ্গে তিনি বললেন:

"তোমাদের কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। তোমরা যতটা পারবে ততটা সেবাই তো করবে, কারণ এই শহরে এই পবিত্র কাজে তোমাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই। কিন্তু তোমরা সবটা করতে পারবে না, এবং তোমাদের তা করতে দেওয়াটাও অপরাধ হবে।" এটা তো বিরাট প্রশংসা, মূল্যবান প্রশংসা; তাও আবার এ রকম একটা লোকের কাছ থেকে; দুই যমজ বৃদ্ধার মনের প্রায় সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। "তোমাদের টিল্লী এবং আমাদের বুড়ী ন্যান্সী বাদবাকিটা করবে-তারা দু'জনেই ভাল নার্স, ওদের চামড়া কালো হলেও মনটা সাদা; ওরা সতর্ক, স্নেহময়ী, কোমল-একেবারে নিখুঁত দু'জন সেবিকা!-হ্যাঁ, শোন! হেলেনের উপরেও একটু নজর রেখ, সেও অসুস্থ, এবং আরো বেশী অসুস্থ হতে পারে।"

মহিলা দু'জন সামান্য অবাক হল, যেন ঠিক বিশ্বাস করল না। হেস্টার বলল:

"তা কি করে হয়? একঘণ্টাও হয় নি আপনি বলেছেন সে একটা বাদামের মত সতেজ।"

ডাক্তার শান্তভাবে উত্তর দিলেন:

"সেটা মিথ্যে বলেছিলাম।"

মহিলা দু'জন ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল; হান্না বলল:

"আপনি কি করে এ রকম ঘৃণ্য স্বীকারোক্তি করছেন, তাও এ রকম উদাসীন সুরে, যখন আপনি জানেন যে এ ধরনের ঘটনায় আমাদের উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া-"

"চুপ! তোমরা বিড়ালের মত মূর্খ, তোমরা দু'জনেই; তোমরা জান না কি কথা বলছ; তোমরা সব নীতিবাগীশ মূষিকদের মত; তোমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিথ্যে বল, কিন্তু যেহেতু তোমরা মুখে তা বল না, বল শুধু তোমাদের মিথ্যাবাদী চোখ দিয়ে মিথ্যাবাদী গতিবিধি দিয়ে, তোমাদের বঞ্চনাকারী ভঙ্গী দিয়ে এবং ভ্রান্ত আকার ইঙ্গিত দিয়ে; তাই তোমরা ভগবানের সামনে পৃথিবীর সামনে সাচ্ছন্দে নাক উঁচু করে বেড়াও; এবং সাধুকল্প অকলংক সত্যসন্ধানী হিসাবে নিজেদের প্রচার করে থাক; অথচ কোন মিথ্যা যদি কখনও

তোমাদের আত্মার হিম-ঘরে ঢোকে তো তীব্র ঠান্ডায় জমে গিয়ে তারও মৃত্যু ঘটবে! যতক্ষণ না উচ্চারিত হচ্ছে ততক্ষণ কোন মিথ্যেই নয়-এ রকম বোকার মত ধারণা নিয়ে কেন তোমরা বড়াই করে বেড়াবে? চোখ দিয়ে মিথ্যে বলা আর মুখ দিয়ে মিথ্যে বলার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কিছুই না, একটু চিন্তা করলেই তোমরা তা বুঝতে পারবে। এ রকম কোন মানুষই নেই যে তার জীবনে রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে না; আর তোমরা-আরে, তোমরা দু'জনেই তো বল তিরিশ হাজার মিথ্যে কথা, তবু তোমরাই এক কপট আতংকে জ্বলে উঠেছ কারণ আমি ঐ শিশুটিকে একটি কল্যাণকর নিষ্পাপ মিথ্যে বলেছি তাকে তার কল্পনার হাত থেকে বাঁচাতে-যে কল্পনার গতি রোধ না করলে এক ঘন্টার মধ্যে রক্ত গরম হয়ে আবার তার জ্বর আসত।

"এস, একসঙ্গে বসে ব্যাপারটা চিন্তা করি। সবিস্তারে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করি। যখন তোমরা দু'জন রোগীর ঘরে গোলমাল পাকাচ্ছিলে তখন যদি জানতে যে আমি আসছি তখন তোমরা কি করতে?"

"কি করতাম?"

"তোমরা পালিয়ে যেতে এবং হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে-তাই নয় কি?"

মহিলা দু'জন চুপ।

"তোমাদের ইচ্ছে এবং উদ্দেশ্য কি হত?"

"কি?"

"আমার কাছে তোমাদের দোষ ঢাকা; তোমরা আমাকে ভুলিয়ে এই অনুমান করাতে যে মার্গারেটের উত্তেজনা কি কারণে ঘটেছে তা তোমরা জান না। এক কথায়, আমাকে মিথ্যে কথা বলতে-নিঃশব্দে মিথ্যে। উপরন্তু, সম্ভবত একটা ক্ষতিকর মিথ্যে।"

যমজ মহিলা দু'জনের মুখ লাল হয়ে উঠল; কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

"তোমরা শুধু যে অগণিত নিঃশব্দ মিথ্যে বল তাই নয়, তোমরা মুখেও মিথ্যে বল-তোমরা দু'জনেই বল।"

"না, তা ঠিক নয়।"

"হ্যাঁ, তাই ঠিক। তবে তোমরা যা বল তা ক্ষতিকর নয়। ক্ষতিকর মিথ্যে উচ্চারণ করার কথা তোমরা স্বপ্নেও ভাবতে পার না। তোমরা কি জান যে এটাও একটা স্বীকৃতি-একটা স্বীকারোক্তি?"

"আপনি কি বলতে চান?"

"এটি একটি অচেতন স্বীকৃতি যে আকারহীন মিথ্যে কোন অপরাধই নয়; এটি একটি স্বীকারোক্তি যে তোমরা হামেশাই এই রকম পার্থক্য করে থাক। যেমন, গত সপ্তাহে সেই ঘৃণ্য হিগবিদের সঙ্গে খানার টেবিলে বসবার জন্য তোমরা শ্রীমতী ফস্টার নাম্নী বৃদ্ধাটির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে একটি চিরকুট লিখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলে এবং জানিয়েছিলে যে তোমরা যেতে পার নি বলে ভীষণ দুঃখিত হয়েছ। এটা তো মিথ্যে কথা। এত বড় নির্ভেজাল মিথ্যে আর কোনদিন উচ্চারিত হয় নি। পার তো অস্বীকার কর হেস্টার-আর একটা মিথ্যে দিয়ে অস্বীকার কর।"

হেস্টার মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল।

"তা চলবে না। উত্তর দাও। এটা কি মিথ্যে ছিল, না ছিল না?"

দুই মহিলারই গাল লাল হয়ে উঠল; অনেক কষ্ট ও চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তারা স্বীকার করল:

"এটা মিথ্যেই ছিল।"

"ভাল-সংশোধন শুরু হয়েছে; তোমাদের এখনো আশা আছে; তোমাদের প্রিয়তম বন্ধুর আত্মাকে বাঁচাতেও তোমরা একটি মিথ্যে কথা বলবে না, কিন্তু একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলার অসুবিধে থেকে নিজেদের বাঁচাতে বিনাদ্বিধায় তা গল্‌গল্‌ করে বলবে।"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হেস্টার দু'জনের হয়ে ঠান্ডা গলায় বলল:

"আমরা মিথ্যে বলেছিলাম; আমরা তা বুঝতে পেরেছি; এ রকম আর ঘটবে না। মিথ্যে বলা পাপ। আমরা কোন মিথ্যে কথাই আর বলব না, তা যে রকমই হোক, এমন কি ভদ্রতা বা পরোপকারের জন্যও না; ঈশ্বর যে দন্ডের বিধান দিয়েছেন তার যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে কাউকে রক্ষা করতেও না।"

"ওঃ, কত তাড়াতাড়ি তোমাদের পতন ঘটবে। আসলে, ইতিমধ্যেই তোমরা ভুল করে বসেছ, কারণ এক্ষুণি তোমরা যা বললে সেটিও মিথ্যে। বিদায়! সংশোধন কর! তোমাদের মধ্যে একজন রোগীর ঘরে যাও।"

৪

বারো দিন পরে।

মা এবং শিশুটি সেই ভয়াবহ রোগের কবলে পড়ে ভুগেই চলেছে। দু'জনেরই বাঁচবার আশা খুব সামান্য। দুই বোনকেই ফ্যাকাসে ও বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল কিন্তু তারা তাদের সেবার কাজ ত্যাগ করে নি। তাদের হৃদয় ভেঙ্গে পড়ছিল, কিন্তু তাদের মনোবল ছিল অবিচলিত ও অনমনীয়। বারোটি দিন ধরে মা শিশুটির জন্য ব্যাকুল হচ্ছিল, আর শিশুটি মার জন্য; কিন্তু দু'জনেই জানত তাদের এই আকুল প্রার্থনা পূর্ণ হবে না। প্রথম দিনে-যখন মাকে বলা হল যে তার অসুখটা টাইফয়েড, তখন সে খুবই ভয় পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, আগের দিন হেলেন যখন রোগীর ঘরে স্বীকারোক্তি করার জন্য এসেছিল, তখনই সে রোগটা বাঁধিয়ে বসেছিল কি না; হেস্টার তখন তাকে বলল যে ডাক্তারবাবু এই ধারণাটাকে একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও এটা সত্যি কথা তবু হেস্টারের তা বলতে কষ্ট হল, কারণ সে ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করে নি; কিন্তু যখন এই খবরে মায়ের মুখে আনন্দ দেখতে পেল, তখনই তার বিবেকের দংশন অনেকটা কমে এল। সেদিন বিকেলেই হেলেনকে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় নিয়ে যাওয়া হল। রাত্রে তার অবস্থা আরো খারাপ হল। সকালে তার মা জিজ্ঞাসা করল:

"সে ভাল আছে তো?"

হেস্টার চুপ করে গেল, তার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কথা বেরোল না। মা নির্জীবের মত তাকিয়ে রইল, চিন্তা করল, অপেক্ষা করল; হঠাৎ সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বলল:

"হা ভগবান! কি হয়েছে? সে কি অসুস্থ?"

তখন বেচারি মাসির যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠল; তার মুখে কথা ফুটল:

"না-শান্ত হও; সে ভাল আছে।"

অসুস্থ রমণীর সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। বলল:

"এই সুখের কথাগুলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমাকে চুম্বন কর। এই কথাগুলি বলার জন্য তোমাদের কি বলে যে শ্রদ্ধা জানাব।"

হেস্টার এই ঘটনা হান্নাকে জানাল; ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে হান্না বলল:

"বোন, এটা যে মিথ্যে কথা।"

হেস্টারের ঠোঁট করুণভাবে কাঁপতে লাগল; একটা ঢোক গিলে বলল:

"হান্না, আমি জানি এটা পাপ, কিন্তু আমার করার ছিল না। আমি তার মুখে যে ভয় আর যন্ত্রণা দেখেছিলাম তা আমি সহ্য করতে পারি নি।"

"সেটা কোন ব্যাপারই নয়। এটা মিথ্যাই। ভগবান এর জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন।"

"উঃ, আমি তা জানি," হেস্টার হাত মুচড়ে চিৎকার করে বলল, "কিন্তু এখনও যদি আবার সে রকম হয় তো আমার কিছু করার থাকবে না। আমি জানি আমি আবার এ কাজই করব।"

"তাহলে সকালে আমার জায়গায় তুমি হেলেনের কাছে থাক। আমিই সব কিছু তাকে জানাব।"

হেস্টার তার বোনকে জড়িয়ে ধরল, মিনতি করল।

"এ কাজ করো না হান্না, করো না-তুমি তাকে মেরে ফেলবে।"

"আমি অন্তত সত্যি কথাটা বলব।'

সকালে মায়ের জন্য একটি নিষ্ঠুর সংবাদ তাকে বয়ে আনতে হল আর সে জন্য সে তৈরি হয়েই এল। সে যখন কাজ সেরে ফিরে এল, হেস্টার তখন বিবর্ণ, কম্পিত মুখে হলঘরে অপেক্ষা করছিল। সে ফিসফিস্ করে বলল:

"হায় দুর্ভাগিনী, নিঃসঙ্গ মা! খবরটা শুনে সে কি করল?'

"হান্নার চোখ জলে ভরে উঠল। সে বলল:

"ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তাকে বলেছি যে শিশুটি ভাল আছে।"

হেস্টার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সকৃতজ্ঞভাবে বলে উঠল, "ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন, হান্না!" শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রশংসার বন্যায় সে তাকে ভাসিয়ে দিল।

এরপর থেকে তারা তাদের শক্তির সীমা সম্পর্কে অবহিত হল, এবং ভাগ্যকে মেনে নিল। নম্রভাবে আত্মসমর্পণ করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কঠিন প্রয়োজনের কাছে তারা নতি স্বীকার করল। প্রত্যেক দিন সকালে তারা মিথ্যে কথাটি বলত, আর প্রার্থনার সময় সেই পাপকে স্বীকার করত; ক্ষমা ভিক্ষা করত না, কারণ তারা তার উপযুক্ত নয়, তবে তারা দেখাতে চাইত যে তারা তাদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন এবং তারা তা লুকোতে বা তার জন্য কোন অজুহাত দিতে চায় না।

দিনের পর দিন বাড়ির শিশু-প্রতিমাটি যখন একটু একটু করে অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল, শোকাকুলা মাসি দু'জন তখন রোগাক্রান্ত মায়ের কাছে তার ফুরন্ত শোভা ও তাজা সৌন্দর্যের কথা অতিরঞ্জিত করে বলত, আর মা যখন খুসির উচ্ছাসে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাত তখন তারা বুকের মধ্যে অনুভব করত ছুরিকাঘাতের যন্ত্রণা!

প্রথম দিকে যখন শিশুটির একটা পেনসিল ধরার মত শক্তি ছিল তখন সে ভালবেসে মাকে ছোট ছোট সুন্দর চিঠি লিখত; তাতে সে তার অসুস্থতার কথা গোপন রাখত; তার মাও কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে দুটি চোখ ভরিয়ে সেগুলি বারে বারে পড়ত, বারে বারে চুম্বন করত, এবং মূল্যবান জিনিসের মত বালিশের তলায় জমিয়ে রাখত।

তারপর এমন একদিন এল যখন তার হাত থেকে সে শক্তিও চলে গেল, তার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, জিভ শোচনীয়ভাবে অসংলগ্ন প্রলাপ বকতে আরম্ভ করল। বেচারী মাসীরা পড়ল গভীর সংকটে। মায়ের জন্য আর কোন সুন্দর চিঠি আসে না। তারা যে কি করবে বুঝতে পারছিল না। হেস্টার সাবধানে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করল, একটা সম্ভাব্য কৈফিয়ৎ খুঁজতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোন উপায়

খুঁজে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল। মায়ের মুখে সংশয় ঘনালো, তার পর দেখা দিল শংকা। হেস্টার তা দেখল, বুঝল বিপদ আসন্ন এবং অবস্থার মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হল। পরাজয়ের কবল থেকে জয়কে ছিনিয়ে আনার দৃঢ়সংকল্পে নিজেকে শক্ত করল। সে শান্ত স্বরে মাকে বুঝিয়ে বলল:

"আমি ভেবেছিলাম, হেলেন রাত্রে "স্লোয়েন্স" এ গিয়েছিল একথা জানলে তুমি কষ্ট পাবে; সেখানে একটা ছোটখাট ভোজসভা ছিল, এবং যদিও তুমি এতটা অসুস্থ থাকায় সে যেতে চায় নি, তবু আমরা তাকে জোর করে পাঠিয়েছিলাম, কারণ তার বয়স অল্প এবং সময় কাটবার জন্য অল্প বয়সের এই সমস্ত আনন্দের তার প্রয়োজন আছে; আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে তুমি আমাদের এ ব্যবস্থা মেনে নেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে এসেই তোমাকে চিঠি লিখবে।"

"তোমরা কত ভাল; আমাদের কত ভালবাস ও আমাদের জন্য কত চিন্তা কর! মেনে নেব কি বলছ? আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দুর্ভাগা ছোট্ট নিঃসঙ্গ মেয়েটি! তাকে বলো, আমি চাই সে যতটা পারে আনন্দে থাকুক-এ সব আনন্দ থেকে তাকে আমি একটুও বঞ্চিত করতে চাই না। শুধু স্বাস্থ্যটা ভাল রেখে যেন চলে-একটুকুই আমি চাই।তার স্বাস্থ্য যেন খারাপ না হয়; সেটা আমি সহ্য করতে পারব না। সে যে এই ছোঁয়াচ থেকে বেঁচে ছে এজন্য আমি কত কৃতজ্ঞ-আহা কত অল্পের জন্য সে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে, হেস্টার মাসি! চিন্তা কর তো ঐ সুন্দর মুখখানি জ্বরে বিবর্ণ হয়ে পুড়ে যাচ্ছে। এ চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য। তাকে সুস্থ রেখ। তাকে তাজা রেখ। আমি যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি; সেই আদরের মেয়েটি-বড় বড় নীল উৎসুক চোখ দুটি; আঃ কী মিষ্টি, শান্ত আর মনোলোভা! হেস্টার মাসি গো, সে কি আগের মতই সুন্দর আছে?"

"ওঃ সে আগে যা ছিল তার চেয়েও বেশী সুন্দর; উজ্জ্বল ও রমণীয় হয়েছে"-হেস্টার ঘুরে দাঁড়াল; লজ্জা ও দুঃখ লুকোতে ওষুধের শিশি হাতড়াতে লাগল।

৫

কিছুক্ষণ পরে মাসিরা হেলেনের ঘরে একটা কঠিন দুরূহ কাজ নিয়ে পড়ল। ধৈর্য এবং আগ্রহের সঙ্গে নিজেদের অসাড় ও নড়বড়ে আঙুল দিয়ে তারা দরকারি চিঠিটা জাল করার চেষ্টা করছিল। বারবার বিফল হলেও একটু একটু করে তারা উন্নতি করতে লাগল। সবচেয়ে দুঃখের কথা, সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হল, সেখানে দেখবার মত কেউ ছিল না; তারা নিজেরাও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। প্রায়ই চিঠিটার উপরে তাদের চোখের জল পড়ে সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছিল; মাঝে মাঝে হয়তো একটা এলোমেলো কথা চিরকুটটিকে বিপজ্জনক করে তুলছিল; তবে অবশেষে হান্না এমন একটা খসড়া তৈরি করল যার লেখা হেলেনের লেখার হুবহু নকল এবং যা যে কোন সন্দেহপ্রবণ চোখকেও ফাঁকি দেবার মত। সে চিঠিটা মায়ের কাছে নিয়ে গেল; মা আগ্রহের সঙ্গে সেটি নিল, চুমো খেল, আদর করল, বারবার তার দামী কথাগুলি পড়তে লাগল, এবং গভীর খুসিতে চিঠির শেষের অংশটি সবিস্তারে পড়তে লাগল:

"মাউসি গো, আমি যদি তোমাকে দেখতে পেতাম, তোমার চোখে চুমো খেতে পারতাম, আর তোমার হাত দুটি যদি আমাকে জড়িয়ে থাকত! আমি খুব খুসি যে আমার অভ্যেসগুলো তোমাকে বিরক্ত করে না। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। সকলেই আমাকে ভালবাসে, তবু মাগো, তোমাকে ছাড়া আমি কত নিঃসঙ্গ।"

"আহা বাছারে, আমি জানি ঠিক কি তার মনের অবস্থা। আমাকে ছাড়া সে কখনও পুরোপুরি সুখী হতে পারে না, আর আমি-ওঃ, আমি তো তার চোখের আলোয়ই বেচে আছি। তাকে বলো, সে তার খুসিমত তার অভ্যাসগুলি বজায় রাখতে পারে আর হান্না মাসি-তাকে বলো, আমি এতদূর থেকে পিয়ানোর আওয়াজ শুনতে পাই না, তার গানের মিষ্টি সুরও না। ভগবাম জানেন, আমার কত ইচ্ছে, যদি শুনতে পারতাম! কেউ জানে না ঐ কণ্ঠস্বর আমার কাছে কত মধুর; কোনদিন তা থেমে যাবে-সে কথা ভাবতেও-! তোমরা কাঁদছ কেন?"

"শুধু এই জন্য-এই জন্য-যে এটা একটা স্মৃতি। যখন আমি আসছিলাম সে গাইছিল, 'লোমণ্ড হ্রদ' কী করুণ সুর। যখনই সে এটা গায় আমি বিচলিত হয়ে পড়ি।"

"আমিও। তার বুকের মধ্যে যখন যৌবনের দুঃখ গুমড়ে ওঠে; এবং অলৌকিক উপায়ে সে দুঃখকে দূর করতে সে যখন গান গায় তখন সে যে কী হৃদয়বিদারক সৌন্দর্য.......হান্না মাসি?"

"বল মার্গারেট?"

"আমি বড় অসুস্থ। মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ মধুর স্বর আমি আর শুনতে পাব না।"

"বলো না-বলো না, মার্গারেট! আমি তা সহ্য করতে পারি না!"

মার্গারেট অভিভূত হল, বিচলিত হল, আস্তে আস্তে বলল:

"এস-এস, আমার দু'হাত দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে থাকি। কেঁদ না। এখানে-আমার গালের উপর তোমার গালটা রাখ। শান্ত হও। আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। যদি পারি আমি বাঁচব। ওঃ সে যে আমাকে ছাড়া কি করছে?".......সে কি প্রায়ই আমার কথা বলে?-আমি জানি সে বলে।"

"ওঃ সব সময়-সব সময়!"

"আমার মিষ্টি মেয়ে। সে যে মুহূর্তে বাড়িতে আসবে তখনই আমাকে চিঠি লিখবে তো?"

"হ্যাঁ- প্রথম মুহূর্তেই। সে তার জিনিসপত্র রাখবার জন্যও অপেক্ষা করবে না।"

"আমি জানতাম। সে এই রকমই আবেগময়ী, স্নেহশীলা। জিজ্ঞাসা না করেও আমি জানতাম, তবু তোমাদের মুখে শুনতে চাইছিলাম। আদুরে স্ত্রী জানে যে তার স্বামী তাকে ভালবাসে, তবু প্রতিদিন সে তাকে সে কথা শুধু শোনবার আনন্দের জন্য.......। এবার সে কলম ব্যবহার করেছে। সেটাই ভাল; পেনসিলের দাগ মুছে যেতে পারে, আর তা হলে আমার আফ্‌শোষ হত। তোমরাই কি পরামর্শ দিয়েছ যাতে সে কলম ব্যবহার করে?"

"হ্যাঁ-না-সে-এটা তার নিজস্ব ধারণা?"

মা খুসি হল; বলল:

"আমি আশা করেছিলাম তোমার ঐ কথাই বলবে। এ রকম ভাল আর বিচক্ষণ মেয়ে দেখা যায় না!.....হান্না মাসি?"

"বাছা, মার্গারেট?"

"যাও, তাকে বল আমি সব সময় তার কথা চিন্তা করি, তাকে আদর করি। তোমরা আবার কাঁদছ। আমার জন্য এত চিন্তিত হয়ো না; আমার মনে হয় এখনও পর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই।"

শোকার্ত বার্তাবাহিকাটি গিয়ে সেই সব কথা মেয়েকে বলল; কিন্তু কিছুই তার কানে গেল না। মেয়েটি তখন প্রলাপ বকছে; জ্বরতপ্ত চোখে হা করে তার দিকে তাকিয়ে আছে; চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুই চিনতে পারছে মা।

"তুমি কি-না, তুমি তো আমার মা নও। আমি তাকে চাই-ওঃ আমি তাকে চাই। এক মিনিট আগেও সে এখানে ছিল, আমি তাকে চলে যেতে দেখি নি। মা কি এখন আসবে? তাড়াতাড়ি আসবে? এখনই কি আসবে?....এখানে কত বাড়ি ....সব যেন আমাকে চেপে ধরেছে....এবং সব কিছু ঘুরছে, পাক্ খাচ্ছে আর ঘুরছে....উঃ, আমার মাথা, আমার মাথা!"-এই ভাবে সে অনবরত কাল্পনিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল; সীমাহীন অস্থীরতায় হাত দুটি ছুড়তে লাগল।

বেচারী হান্না অস্ফুট করুণ সুরে সান্ত্বনা দিতে দিতে তার শুকনো ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিতে লাগল, তার উত্তপ্ত ভুরুতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, এবং তার মা যেএসব না জেনে সুখেই আছে সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

প্রতিদিন মেয়েটি অতলে, অতিদ্রুত আরও অতলে, মৃত্যুর গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল,আর প্রতিদিন সেই শোকার্তা সেবিকারা তার উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও সুন্দর চেহারার মিথ্যা সমাচার সুখী মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে লাগল; মার জীবনযাত্রাও তখন প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রত্যেকদিন তারা মেয়েটির হাতের লেখা নকল করে মিষ্টি চিঠিগুলি লিখত, এবং অনুতপ্ত বিবেক ও রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত, মা আকুল হয়ে সেগুলি পড়ছে, আদর করছে, আর অমূল্য জিনিসের মত সেগুলি সঞ্চয় করে রাখছে, কারণ সেগুলি লিখেছে একটি মিষ্টি মেয়ে, সেগুলি তার কাছে পবিত্র, কারণ তার সন্তানের স্পর্শ সেগুলিতে লেগে আছে। তারা এইসব কিছু দেখত আর কাঁদত।

অবশেষে সেই দয়ালু বন্ধুটি এল যে সবার জন্য নিয়ে আসে স্বস্তি এবং শান্তি। মৃদু আলো জ্বলছিল। ভোরের আগেকার গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে আবছা মূর্তিগুলি নিঃশব্দে হলঘরটিতে নড়াচড়া করতে লাগল, হেলেনের বিছানার পাশে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। সময় যে হয়ে এসেছে তাও সকলে বুঝতে পারল। মুমূর্ষু মেয়েটি চোখের পাতা বন্ধকরে অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে; বুকের উপরকার চাদরটা ধীরে ধীরে উঠানামা করছিল, কারণ তার জীবনীশক্তি ক্রমেই শেষ হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ পরে পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস অথবা ক্ষীণ ফোঁপানির শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করতে লাগল। তখন সবার মনে একই চিন্তার ভিড়: করুণ মৃত্যু; একটু একটু করে মহা অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া; বেচারি মাও এখানে উপস্থিত নেই যে একটু সাহায্য করবে, সাহস দেবে; আশীর্বাদ করবে।

হেলেন ছট্‌ফট্ করতে লাগল; হাত বাড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগল, যেন সে কিছু চাইছে-কয়েক ঘণ্টা হল সে অন্ধ হয়ে গেছে। শেষ মুহূর্তটি সমাগত; সকলেই তা বুঝল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেস্টার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, "আহা, বাছা আমার, সোনা আমার!" মুমূর্ষু মেয়েটির মুখে খুসির আলো ঝল্‌ঝল্ করে উঠল; যে দুটি হাত তাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে মায়ের হাত মনে করে সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "ওঃ, মামণি, আমি কত সুখী-আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম-এখন আমি মরতে পারি।"

দু'ঘণ্টা পরে হেস্টার সবকিছু জানাবার জন্য তৈরি হল। মা জিজ্ঞাসা করল:

"মেয়ে কেমন আছে?"

'ভাল আছে।"

৭

একগুচ্ছ সাদা ও কালো সিল্কের কাপড় বাড়িটার দরজার ঝুলিয়ে দেওয়া হল; সেগুলি বাতাসে দুলে মর্মরিত হচ্ছিল, যেন ফিস্‌ফিস্ করে দুঃসংবাদ ঘোষণা করছে। দুপুরে মৃতদেহ সৎকারের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল; পবিত্র শিশুর দেহটি শবাধারে শোয়ান হল; সুন্দর মিষ্টি মুখখানিতে গভীর প্রশান্তি। হান্না এবং কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি ল্লী-এই দুটি শোকার্ত প্রাণী পাশে বসে বিলাপ করছে। কাঁপতে কাঁপতে হেস্টার ঘরে এল; সে তখন ভীষণ বিপদে পড়েছে। সে বলল:

"মা একটা চিরকুট চাইছে।"

হান্নার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এ কথাটা সে চিন্তাই করে নি; তার মনে হয়েছিল যে তাদের দুঃখের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বুঝল তা হয় নি। কিছুক্ষণ সেই দুটি নারী শূন্য দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর হান্না বলল:

"এ থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন পথ নেই-চিঠি ওকে দিতেই হবে, নইলে অন্য কিছু সন্দেহ করবে।"

"এবং সব বুঝে ফেলবে।"

"হ্যাঁ। এতে তার বুক ভেঙ্গে যাবে।"

মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখ জলে ভরে এল। "আমিই লিখব," সে বলল।

হেস্টার চিরকুটটা নিয়ে গেল। শেষের লাইন ক'টিতে লেখা ছিল:

"মাউসি গো, মিষ্টি মা গো, আমরা খুব শিগ্‌গিরই একসঙ্গে হব। এটা খুব ভাল খবর না? কথাটা কিন্তু সত্যি; ওরা সকলেই বলছে এটা সত্যি।"

মা দুঃখ পেল; বলল:

"আহা বাছারে, যখন সে জানবে তখন কি করে সহ্য করবে? আমি জীবনে আর কখনও তাকে দেখতে পাব না। কথাটা নির্মম, বড় নির্মম। সে সন্দেহ করে নি তো? তোমরা তাকে সাবধানে রাখছ তো?"

"সে মনে করে তুমি খুব শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবে।"

"হেস্টার মাসি গো, তোমরা কত ভাল, সাবধানী। তার কাছে এমন কেউ যায় না তো যা তাকে অসুখের ছোঁয়াচ লাগাতে পারে?"

"সেটা তো অপরাধ হবে।"

"কিন্তু তোমরা তো তাকে দেখ।"

"হ্যাঁ-তবে দূর থেকে।"

"সেটাই ভাল। অপরাধকে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু তোমরা দুই অভিভাবক যেন দেবদূত-ইস্পাতও তোমাদের মত খাঁটি নয়। অন্য কেউ হলে অবিশ্বাসী হত, ঠকাত, মিথ্যে কথা বলতেও পারত।"

হেস্টারের চোখের পাতা নেমে এল; ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল।

"হেস্টার মাসি, আমি তাকে মনে করে তোমাকে চুম্বন করছি; যখন আমি চলে যাব এবং বিপদ কেটে যাবে, তখন তার মিষ্টি ঠোঁটে এই চুম্বনটি এঁকে দিও; তাকে বলো, তার মা এটি পাঠিয়েছে, এবং তার মায়ের সমস্ত ভগ্নহৃদয় একে জড়িয়ে আছে।"

এক ঘন্টার মধ্যে মৃতের মুখের উপর অশ্রুবর্ষণ করতে করতে হেস্টার তার করুণ কর্তব্যটি সমাধা করল।

৮

আবার প্রভাত হল, দিনের আলো ফুটল, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। হান্না ভগ্নস্বাস্থ্য মায়ের কাছে নিয়ে এল সেই সুসংবাদ, সেই সুন্দর চিঠি, যাতে আবারও লেখা হয়েছে, "আমাদের আর বেশী অপেক্ষা করতে হবে না মা গো, এবার আমরা মিলিত হব।"

একটা ঘণ্টার গম্ভীর ধ্বনি, আর্ত সুর বাতাসে ভেসে এল।

"হান্না মাসি, ঘণ্টা বাজছে; আর একটি শোকার্ত হৃদয় বিশ্রাম পেয়েছে। আমিও অচিরেই পাব। তোমরা দেখো, ও যেন আমার কথা ভুলে না যায়।"

"ওঃ, ভগবান জানেন সে কখনও ভুলবে না!"

"হান্না মাসি, একটা আশ্চর্য সুর কি শুনতে পাচ্ছ? মনে হচ্ছে, অনেকের পায়ের শব্দ যেন একসঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

"আমরা আশা করেছিলাম তুমি তা শুনতে পাবে না। অল্প কয়েকজনকে ডাকা হয়েছে, শুধু-শুধু হেলেনের জন্য, বেচারী তো ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকে। কিছু গান-বাজনা হবে-সেও তো গান-বাজনা ভালবাসে। আমাদের ধারণা এতে তুমি কিছু মনে করবে না।'

'মনে করব? ওঃ না-ওর মন যা চায় তাই ওকে দাও। তোমরা ওকে কত ভালবাস, আমাকেও কত ভালবাস! ঈশ্বর সর্বদা তোমাদের মঙ্গল করুন।"

কিছুক্ষণ শোনবার পর:

'কী মধুর! এটা ওরই অর্গান। ও কি নিজেই বাজাচ্ছে? তোমাদের কি মনে হয়?" নিস্তব্ধ বাতাসে সেই মৃদু মনমাতানো সুর তার কানে ভেসে এল। হ্যাঁ, এ তারই হাতের স্পর্শ, আমি এ সুর চিনি। ও গান গাইছে, আরে-এ যে একটা স্তোত্র। সবচেয়ে পবিত্র, বড় মর্মস্পর্শী, বড়ই শান্তিময়।.....মনে হচ্ছে আমার সামনে স্বর্গের দরজা খুলে গেছে।......আমি যদি এখনই মরতে পারতাম.......

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূর থেকে ভেসে এল সে সুরের বাণী:

হে ভগবান, তোমার কাছে যাব,
আরও কাছে,
যদি ক্রুশের পথেও হয়,
তাতেই আমার মুক্তি।

স্তোত্রটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আত্মাও চিরবিশ্রামের দেশে চলে গেল; আর জীবনে যারা ছিল এক, মরণেও তারা বিচ্ছিন্ন হল না। দুই বোন, কাঁদতে কাঁদতে ও হাসতে হাসতে বলল:

"কি ভাগ্যি, সে কখনও জানতে পারে নি।"

৯

মধ্যরাত্রে তারা একসঙ্গে বসে শোক করছিল, এমন সময় অপার্থিব উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের মাঝখানে আবির্ভূত হল দেবদূত। বলল:

"মিথ্যাবাদীদের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে। সেখানে তারা চিরকাল -চিরকাল নরকের আগুনে জ্বলবে। অনুশোচনা কর!"

প্রিয় বিয়োগে ব্যথিত দুই নারী তার সামনে নতজানু হয়ে হাত জোর করে পাকা চুলে ভরা মাথা শ্রদ্ধায় নত করল। কিন্তু তাদের জিভ মুখের ভিতর আটকে রইল; তারা বোবা হয়ে রইল।

"কথা বল! যাতে আমি স্বর্গের অধীশ্বরের কাছে তোমাদের বার্তা নিয়ে যেতে পারি এবং তার আদেশ নিয়ে আসতে পারি। সে আদেশের বিরুদ্ধে কোন আবেদন গ্রাহ্য হয় না"

আবার তারা মাথা নীচু করে অভিবাদন করল। একজন বলল:

"আমরা বিরাট পাপ করেছি আর সেজন্য লজ্জাও পাচ্ছি, একমাত্র পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত অনুশোচনাই আমাদের মুক্ত করতে পারে, কিন্তু আমরা হতভাগ্য জীবরা মানবিক দুর্বলতার শিকার; আমরা জানি, আবার যদি ঐ রকম নির্মম অবস্থায় পড়ি তাহলে আবার আমাদের পতন হবে, আবারও আমরা আগের মতই পাপ করব। যারা শক্তিমান তারাই বেঁচে থাকে এবং মুক্তি পায়, কিন্তু আমাদের কোন আশাই নেই।"

মাথা উঁচু করে তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল। দেবদূত চলে গেল। যখনই তারা বিস্মিত হয়ে কাঁদতে লাগল, তখনই সে আবার এল; নীচু হয়ে তাদের কানে কানে আদেশটি জানাল।

১০

সেটা কি ছিল স্বর্গ? অথবা নরক?

১৯০২

একটি উপকথা
A Fable

কোন এক সময়ে একজন শিল্পী একটি খুব সুন্দর ছোট ছবি এঁকে সেটাকে এমনভাবে রাখল যাতে আয়নায় ছবিটি পুরে ছায়াটা দেখতে পাওয়া যায়। "এতে দূরত্বটা দ্বিগুণ হওয়ায় ছবির রেখাগুলো নরম হয়ে ওঠে এবং ছবিটা আগের চাইতে দ্বিগুণ মনোরম দেখায়।"

শিল্পীর বাড়ির পোষা বিড়ালটির মুখে এই কথা শুনল বনের সব পশুরা; তারা ঐ বিড়ালটিকে খুব প্রশংসার চোখে দেখত, কারণ বিড়ালটি ছিল শিক্ষিত, মার্জিত রুচি ও সভ্য; সে এমন অনেক কিছু তাদের বলত যা তারা আগে জানত না বা জানলেও সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। এবার তারা বিড়ালের মুখে আয়নার ছবিটির ছায়া সম্পর্কে এই নতুন কথা শুনে খুব উৎসুক হয়ে উঠল। ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝবার জন্য এ সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। তারা যখন জিজ্ঞাসা করল ছবিটা কি জিনিস তখন বিড়াল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সে বলল, "এটা একটা সমতল জিনিস। খুব সুন্দরভাবে সমতল, আশ্চর্য রকমের সমতল, এর সমতলত্ব দেখে মুগ্ধ হতে হয়; আর কী সুন্দর!"

এই কথা শুনে বনের পশুদের উত্তেজনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তারা বলল, পৃথিবীর বিনিময়েও তারা ছবিটা দেখবে। তখন ভলুক জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, কিসের জন্য ছবিটাকে এত সুন্দর মনে হয়?"

"ছবিটা দেখতেই সুন্দর বলে" বিড়াল বলল।

এই উত্তর শুনে পশুদের মনের আকর্ষণ ও অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেল। তারা আগের চাইতেও বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তখন গরু জিজ্ঞাসা করল:

"আয়না কাকে বলে?"

বিড়াল বলল, "আয়না হল দেয়ালের মধ্যে একটা গর্ত। তুমি যদি তার দিকে তাকাও তাহলেই ছবিটা দেখতে পাবে আর সে ছবি এত সুন্দর, এত সূক্ষ্ম, এত স্বর্গীয় যে তার অকল্পনীয় সৌন্দর্য তোমাকে এতই অনুপ্রাণিত করবে যে তোমার মাথা ঘুরতে থাকবে, অতি-আনন্দে তুমি মূর্ছিত হয়ে পড়বে।"

গাধা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি; এবার সে এ ব্যাপারে একটু সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। সে বলল, এত সুন্দর কোন জিনিস এর আগেও ছিল না এবং আজ নেই। তার মতে যখন কোন জিনিসের সৌন্দর্য বিরাট বিশেষণ যোগ করে গলাবাজি করা হয় তখন সে সৌন্দর্য সন্দেহের অবকাশ রাখে।

স্বাভাবিকভাবে এই সন্দেহ পশুদের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আর তাতে বিড়ালটি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। দিন দু'য়েকের মধ্যে এ ব্যাপারে আর কেউ কোন উচ্চবাচ্য করল না; কিন্তু পরে আবার নতুন করে উৎসাহ দেখা দিল এবং সকলের আগ্রহ স্পষ্ট চোখে পড়ল। তারা তখন গাধাটাকে খুব বকাবকি করল, কারণ সে বিনা প্রমাণেই ছবিটা সুন্দর নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করায় তাদের এত বড় একটা সম্ভাবিত আনন্দকে নষ্ট করে দিয়েছে।

এত বকুনি খেয়েও গাধাটা কিন্তু বিচলিত হল না। সে খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বলল, তার আর বিড়ালের মধ্যে কে ঠিক বলেছে সেটা স্থির করবার একটাই উপায় আছে: সে নিজেই সেখানে গিয়ে গর্তটা দেখে এসে বলবে সে কি দেখল। পশুরা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আর খুসি হয়ে গাধাকে সেখানে যেতে বলল-গাধাও তাদের কথামত কাজ করল।

কিন্তু সে জানত না ঠিক কোথায় দাঁড়াতে হবে, তার জন্য সে ভুল করে আয়না আর ছবিটার মাঝখানে দাঁড়াল। তাতে ফল হল-আয়নার ছবিটাকে দেখাই গেল না। গাধাটা ফিরে এসে বলল:

"বিড়াল মিথ্যে কথা বলেছে। ঐ গর্তে একটা গাধা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কোন সমতল জিনিসের চিহ্নমাত্রও সেখানে চোখে পড়ল না। যদিও সেটা খুব সুন্দর আর ভাল একটা গাধা, তবুও সেটা শুধু একটা গাধা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

হাতি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাছের থেকে খুব পরিষ্কারভাবে দেখেছিলে তো?"

"ওহে পশুরাজ হাতি, আমি খুব কাছ থেকে পরিষ্কার দেখছি। আমি এত কাছে থেকে দেখছি যে আমার নাক আয়নাটাতে লেগে গিয়েছিল।"

হাতি বলল, "এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার। যতদূর জানি বিড়ালটা তো সব সময়ই আমাদের সত্যি কথাই বলে। তার চেয়ে বরং আর একজন সাক্ষী পাঠিয়ে দেখা যাক। ভালুক, তুমি বরং যাও, গর্তটা দেখ, তারপর ফিরে এসে বল কি দেখলে।"

ভালুক তখন সেখানে গেল। ফিরে এসে বলল: "বিড়াল আর গাধা দু'জনেই মিথ্যে কথা বলেছে। গর্তে একটা ভালুক ছাড়া আর কিছুই নেই।"

পশুরা তো এবার অবাক হয়ে মহা ধাঁধায় পড়ে গেল। প্রত্যেকেই তখন নিজে গিয়ে দেখতে চাইল আসলে ব্যাপারটা কি। হাতিও তাদের এক এক করে পাঠাতে লাগল।

প্রথমে গেল গরু। গর্তে একটি গরু ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

বাঘ একটা বাঘ ছাড়া আর কিছুই দেখল না। সিংহ, সিংহ ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

চিতা দেখল শুধুই একটা চিতাবঘ। উট ও দেখল একটা উট, আর কিছু নয়।

হাতি তখন ভীষণ রেগে গিয়ে ঠিক করল, সে নিজেই গিয়ে আসল সত্যটা জেনে আসবে। ফিরে এসে সে সমস্ত প্রজাদের মিথ্যে কথা বলবার জন্য খুব বকুনি দিল এবং বিড়ালের নৈতিক ও মানসিক অন্ধত্বের জন্য এমন রেগে গেল যে, তাকে আর শান্ত করা গেল না। সে বলল, একটা আধকানা মূর্খ ছাড়া সকলেই ঐ গর্তে একটা হাতি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না।

বিড়ালের শিক্ষা

তুমি যদি তোমার কল্পনার আয়না এবং বাস্তবের মধ্যে দাঁড়াও তাহলে তুমি যা কিছু সঙ্গে নেবে তাই সেখানে দেখতে পাবে। তোমার কান দুটো যদি সেখানে নাও দেখতে পাও, তবু জানবে কান দুটো সেখানেই আছে।

১৯০৯

অনুবাদ: ঈশিতা দত্ত

যে-মানুষ হ্যাড্লিবুর্গ-এর চরিত্র হনন করেছিল

The Man That Corrupted Hadelyburg

অনেক বছর আগেকার কথা। আশেপাশের সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে হ্যাড্লিবুর্গই ছিল সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শহর। তিন যুগ ধরে শহরটার এই খ্যাতি অক্ষুন্নই আছে; অন্য যে কোন সম্পদ অপেক্ষা এই খ্যাতির জন্যই শহরটা অধিক গর্ববোধ করে থাকে। সে গর্ব এতই বেশী এবং তাকে অক্ষুন্ন রাখতে শহরটা এতই ব্যগ্র যে শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের সদ্ব্যবহারের নীতি শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়, এবং সমগ্র শিক্ষা-ক্রমের মধ্যে এই নীতি শিক্ষাকেই সংস্কৃতির প্রধান বস্তু বলে ধরে নেওয়া হয়। তাছাড়া, চরিত্র গড়ে ওঠার কালেও যুবকদের সামনে থেকে সব রকম প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় যাতে তাদের সততা দৃঢ় ও কঠিন হয়ে উঠবার সুযোগ পায় এবং তাদের অস্থির সঙ্গে মিশে যায়। আশপাশের শহরগুলো তার এই সসম্মান প্রাধান্যের জন্য তাকে ঈর্ষা করত; ঠোঁট বেঁকিয়ে হ্যাড্লিবুর্গের এই গর্বকে বলত দেমাক; কিন্তু তা সত্ত্বেও হ্যাড্লিবুর্গ শহর যে সত্যি রকম দোষের অতীত এ কথা স্বীকার করতে তারাও বাধ্য হত; একটু চাপ দিলেই তারা এ কথাও স্বীকার করত যে হ্যাড্লিবুর্গের কোন যুবক যখন নিজের শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও দায়িত্বপূর্ণ চাকরির সন্ধানে যায় তখন সে যে হ্যাড্লিবুর্গ থেকে এসেছে সেটাই যথেষ্ট সুপারিশ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাল-প্রবাহে একদা একটি অপরিচিত যাত্রীর মনে আঘাত দেবার দুর্ভাগ্য হ্যাড্লিবুর্গের কপালে দেখা দিল; এবশ্য কাজটা সে না জেনেই করেছিল; তাছাড়া সেটা নিয়ে সে মাথাও ঘামায় নি। কারণ হ্যাড্লিবুর্গ এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে অপরিচিত লোকজন বা তাদের মতামতে তার কিছুই যায়-আসে না। তথাপি এই লোকটির বেলায় ব্যতিক্রম হিসাবে একটু সতর্ক থাকলেই ভাল হত, কারণ লোকটি ছিল তিক্ত প্রকৃতির ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। সারা বছর ধরে অনেক জায়গায় সে ঘুরল, কিন্তু সেই আঘাতের কথাটা তার মন থেকে গেল না; অবসর পেলেই সে ভাবে, কি উপায়ে সেই আঘাতের একটা যোগ্য জবাব দেওয়া যায়। অনেক মতলবই তার মাথায় এল, মতলবগুলো বেশ ভালও বটে, কিন্তু কোনটাই খুব লাগসই মনে হল না। যে মতলবটা সব চাইতে দুর্বল তার ফলেই হয় তো অনেক লোক আঘাত পেত, কিন্তু সে চায় এমন একটা মতলব যা গোটা শহরকেই আঘাত করবে, একটি লোককেও অক্ষত থাকতে দেবে না। শেয় পর্যন্ত একটা মনের মত মতলব তার মাথায় এল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পৈশাচিক আনন্দে তার মস্তিস্কটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অবিলম্বে সে পুরো মতলবটা ভাঁজতে বসে গেল; মনে মনে বলল, "এই কাজই করতে হবে-গোটা শহরকে আমি নষ্ট করে দেব"

ছ' মাস পরে সে হ্যাড্লিবুর্গে এসে হাজির হল। রাত দশটা নাগাদ একটা বগি গাড়িতে চেপে সে ব্যাংকের বুড়ো ক্যাশিয়ারের বাড়ি গিয়ে উঠল। একটা বস্তা নিয়ে বগি থেকে নামল, বস্তাটা ঘাড়ে নিয়ে টলতে টলতে উঠোনটা পেরিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। একটি মহিলার গলা শোনা গেল, "ভিতরে আসুন", সে ভিতরে ঢুকে বস্তাটাকে স্টোভের পাশে নামিয়ে রাখল। বৃদ্ধ মহিলাটি বাতির নীচে বসে "মিশনারী হেরাল্ড" পড়ছিল। লোকটি বিনীতভাবে বলল:

"আপনি যেমন আছেন তেমনই বসে থাকুন ম্যাডাম, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। এই তো-এটা বেশ ভালভাবেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে; এটা যে এখানে আছে সেটা কেই বুঝতে পারবে না। এক মিনিটের জন্য আপনার স্বামীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কি ম্যাডাম?"

"না, সে ব্রিকস্টন গেছে; হয়তো কোন অসুবিধা হবে না। আমি শুধু চেয়েছিলাম এই বস্তাটা তার হেপাজতে রেখে যেতে, যাতে প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া গেলেই ওটা তার হাতে তুলে দেওয়া যায়। আমি এখানে নবাগত; তিনি আমাকে চেনেন না; আমার মনের অনেক দিনের একটা সাধ মিটানোর জন্যই আজ রাতে এই শহর হতে আমি চলে যাচ্ছি। আমার সে সাধ মিটেছে; খুসি মনে কিছুটা গর্বের সঙ্গেই আমি চলে যাচ্ছি; আপনি আমাকে আর কোনদিন দেখতে পাবেন না। বস্তাটার গায়ে একটা কাগজ লাগানো আছে; তাতেই সব কথা লেখা আছে। শুভ রাত্রি ম্যাডাম।"

রহস্যময় আগন্তুককে দেখে বৃদ্ধা ভয় পেয়েছিল; সে চলে যাওয়াতে খুসি হল। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে সে বস্তাটার কাছে গিয়ে কাগজটা তুলে নিল। তাতে লেখা আছে:

"সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে; অথবা গোপনে অনুসন্ধান করে আসল লোককে খুঁজে বের করতে হবে-যে কোন একটা ব্যবস্থা

করলেই চলবে। এই বস্তায় একশ' ষাট পাউন্ড চার আউন্স ওজনের স্বর্ণমুদ্রা আছে-"

"কী সাংঘাতিক, আর আমাদের দরজায় তালা লাগানো হয় নি!"

মিসেস রিচার্ডস্ কাঁপতে কাঁপতে ছুটে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল, জানালার পর্দাগুলো নামিয়ে দিল এবং ভীত, বিচলিত ও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, নিজেকে ও এই সম্পদকে আরও নিরাপদ রাখতে আর কি কার উচিত। চোর-টোর আছে কিনা বুঝবার জন্য কান পাতল, তারপর কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আবার বাতির কাছে গিয়ে কাগজটা পড়ে শেষ করল:

"আমি বিদেশী; নিজের দেশেই ফিরে যাচ্ছি; সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করব। আমেরিকার পতাকাতলে দীর্ঘদিন বাস করবার সময় তার কাছ থেকে যা পেয়েছি সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ; দু'-এক বছর আগে তার জনৈক নাগরিক-হ্যাড্লিবুর্গের জনৈক অধিবাসী আমার প্রতি যে পরম সদয় ব্যবহার করেছেন সেজন্য তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার দয়ায় দুটো ঘটনা আমি উল্লেখ করব। আমি ছিলাম একজন জুয়াড়ী। আবার বলছি-ছিলাম। জুয়া খেলে তখন আমি সর্বস্বান্ত। এই গ্রামে এসেছিলাম রাতের বেলা-ক্ষুধার্ত, কপর্দকহীন। সাহায্যের জন্য হাত পাতলাম-রাতের অন্ধকারে; দিনের আলোয় ভিক্ষা চাইতে লজ্জা করেছিল। ঠিক লোকের কাছেই হাত পেতেছিলাম। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন কুড়ি ডলার-আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন বলতে পারি। তিনি আমাকে সম্পদও দিয়েছেন, কারণ সেই টাকায় জুয়া খেলে আমি নিজেকে ধনী করে তুলতে পারছি। আর শেষ পর্যন্ত এমন একটা মন্তব্য তিনি করেছিলেন যেটা আজ পর্যন্তও আমার মনে আছে এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে জয় করেছে; আমার মধ্যে যেটুকু নীতিবোধ অবশিষ্ট ছিল তাকে রক্ষা করেছে; আর কোন দিন আমি জুয়া খেলব না। কিন্তু সেই মানুষটি যে কে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি তাকে খুঁজছি, খুঁজছি এই টাকাটা তাকে দিতে। তারপর তিনি এই টাকা দান করুন, ফেলে দিন, রাখুন, যা খুসি করুন। আমি শুধু এইভাবেই আমার কৃতজ্ঞতাটুকু জানতে চাই। এখানে থেকে যেতে পারলে আমি নিজেই তাকে খুঁজে বের করতে পারতাম; কিন্তু সে যাই হোক, তাকে অবশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এটি একটি সৎ শহর, সব রকম পতনে উর্ধ্বে; আমি জানি নির্ভয়ে এ শহরকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। আমার প্রতি যে মন্তব্য তিনি কেরছিলেন তাই দিয়েই তাকে চিনতে রারা যাবে; আমার দৃঢ় ধারণা সে মন্তব্য তার স্মরণে আছে।

"এবার আমার পরিকল্পনার কথা বলি: যদি গোপনে অনুসন্ধান চালাতে চান তো তাই করুন। যাকেই আসল লোক বলে মনে হবে তাকেই এই চিঠির বক্তব্য শোনাবেন। সে যদি বলে 'আমি সেই লোক, আর আমি অমুক-অমুক মন্তব্য করেছি' তাহলেই মিলিয়ে দেখবেন-অর্থাৎ বস্তাটা খুললেই তার মধ্যে একটা সিল-করা খাম পাবেন আর তার মধ্যেই পাবেন মূল মন্তব্যটা। লোকটি যে মন্তব্যের কথা বলবে সেটা যদি খামের ভিতরকার মন্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে তাকেই টাকাটা দিয়ে দেবেন, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না, কারণ সেই আসল লোক?

"আর যদি প্রকাশ্যে সন্ধান করতে চান তো এই লোকটা কোন স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করুন-আর তার সঙ্গে এই নির্দেশটি যোগ করে দিন: আজ থেকে ত্রিশ দিনের মাথায় প্রার্থী যেন স্বয়ং সন্ধ্যা (শুক্রবার) আটটার সময় টাউন-হলে উপস্থিত হয়ে একটি সিল-করা খামে তার মন্তব্যটি রেভাঃ মিঃ বার্জেস-এর হাতে দেন (যদি তিনি দয়া করে এ কাজটা করে দিতে রাজী হন); এবং মিঃ বার্জেসও যেন তখনই বস্তার সিল ভেঙে খুলে মিলিয়ে দেবেন যে মন্তব্যটা সঠিক কিনা; সঠিক হলে এইভাবে আবিস্কৃত আমার উপকারীকে যেন আমার একান্ত কৃতজ্ঞতাসহ টাকাটা দিয়ে দেন।

মিসেস রিচার্ডস্ উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল এবং শীঘ্রই এই ধরনের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল: কী আশ্চার্য ব্যাপার!.......আর যে দয়ালু লোকটি তার রুটিখানা জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল তারই বা কী ভাগ্য!........আমার স্বামী যদি এ কাজটা করত!-আমরা এত গরিব এত বুড়ো আর গরিব! (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) কিন্তু সে-লোক তো আমার এডোয়ার্ড নয়; সে তো কোন অপরিচিত লোককে কুড়ি ডলার দেয় নি। এখন বুঝতে পারছি সেটা কত দুঃখের কথা।....(হঠাৎ শিউরে উঠে) কিন্তু এ তো জুয়াড়ীর টাকা। পাপের বেতন! এ টাকা আমরা নিতে পারি না; ছুঁতেও পারি না। এর কাছেও ঘেঁসতে আমি চাই না; এ তো অপবিত্র বস্তু।" সে ওদিককার একটা চেয়ারে সরে গেল। "এখন এডোয়ার্ড এসে এটাকে ব্যাংকে দিয়ে এলে বাঁচি; যে কোন মুহূর্তে একটা চোর এসে হাজির হতে পারে; এটা কাছে নিয়ে একলা থাকা যে কী ভয়ংকর।"

এগারোটায় মিঃ রিচার্ডস্ এল। তার স্ত্রী বলল, "তুমি আসায় কত যে খুসি হয়েছি", আর সে বলল, "আমি বড় ক্লান্ত-ক্লান্তিতে অবশ; গরিব হওয়া যে কী কষ্ট; এই বয়সে এতোটা পথ পাড়ি দেওয়া। মাইনের জন্য সব সময় কেবল ঘুর-ঘুর, ঘুর-ঘুর-অন্যের ক্রীতদাস; আর

তিনি বেশ আরামে আয়েসে চটি পরে বাড়িতে বসে আছেন।"

"তুমি তো জান এডোয়ার্ড, তোমার জন্য আমিও কত দুঃখ পাই; তবু এই কথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ কর: আমাদের একটা উপার্জন আছে; আমাদের সুনাম আছে-"

"ঠিক মেরি, সেটাই তো সব। আমার কথায় তুমি কিছু মনে করো না-ওটা একটা সাময়িক বিরক্তির ফল; ওর কোন মানে নেই। আমাকে চুমো খাও-বাস, সব কষ্ট দূর হয়ে গেল, আমার আর কোন নালিশ নেই। তুমি কি করছিলে? এই বস্তায় কি আছে?"

স্ত্রী তখন গোপন কথাটা তাকে জানাল। মুহূর্তের জন্য সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল; তার পরেই বলল:

"এটার ওজন একশ' ষাট পাউণ্ড? আরে মেরি, এযে চল্লিশ হাজার ডার-ভাব তো-একটা সম্পত্তি! এ গ্রামের দশটা লোকেরও তো এত সম্পত্তি নেই। কাগজটা দাও তো।"

তাড়াতাড়ি সেটা পড়ে নিয়ে সে বলল:

"বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার! আরে, এত একটা রোমান্স; যে সব অবাস্তব জিনিস বইতে পড়া যায়, কখনও চোখে দেখা যায় না, এ যে তাই।" খুসিতে সে ডগমগ হয়ে উঠল। বুড়ি স্ত্রীর গালে টোকা মেরে ঠাট্টা করে বলল, "আরে, আমরা তো এখন ধনী মেরি, মহাধনী। এখন শুধু সোনাটাকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে কাগজটা সরিয়ে ফেললেই হল। জুয়াড়ীটা যদি কখনও খোঁজ করতে আসে তাহলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আমরা শুধু বলব: "কী সব অবোল-তাবোল বকছেন আপনি! আপনার কথা ও আপনার সোনার বস্তার কথা তো আমরা আগে কখনও শুনি নি; তাখন তাকে যা বোকা-বোকা দেখাবে, আর-"

"আর এদিকে তুমি যখন এই সব মস্করা করছ ততক্ষণ সোনাটা কিন্তু এখানেই রয়েছে, আর চোরদের আসার সময়ও ক্রমেই এগিয়ে আসছে।"

"সত্যি কথা। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি করব-গোপনে অনুসন্ধান করব? না, তা নয়; তাতে রোমান্সটাই নষ্ট হয়ে যাবে। প্রকাশ্য অনুসন্ধানই ভাল। কি রকম একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে ভাব। অন্য. শহরগুলো আমাদের কি রকম ঈর্ষা করবে; কারণ তারাও জানে, কোন অপরিচিত লোক এ রকম লোক একটা জিনিস নিয়ে হ্যাড্‌লিবুর্গ ছাড়া আর কোন শহরকেই বিশ্বাস করত না। এটাই আমাদের মোক্ষম তাস। এখনই সংবাদপত্রের আপিসে চললাম, নইলে দেরী হয়ে যাবে।"

"আরে দাঁড়াও-দাঁড়াও-এ জিনিস দিয়ে আমাকে একা ফেলে যেয়ো না এডোয়ার্ড!"

কিন্তু সে তখন চলে গেছে। অবশ্য খুবই অল্প সময়ের জন্য। বাড়ি থেকে একটু দূরেই সংবাদপত্রের সম্পাদক-মালিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাকে দলিলটা দিয়ে বলল, "তোমার জন্য একটা ভাল জিনিস এনেছি কক্স, এটা ছেপে দিও।"

"অনেক দেরী হয়ে গেছে মিঃ রিচার্ডস্; তবে আমি দেখছি কি করা যায়।"

বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে বসে তারা এই আকর্ষণীয় রহস্য নিয়েই আলোচনা করতে লাগল; তাদের চোখে ঘুম নেই। প্রথমে প্রশ্নই হল, অপরিচিত লোককে কুড়ি ডলার দিয়েছিল কে? উত্তরটা সহজ; দু'জনই এক নিঃশ্বাসে বলে উঠল:

"বার্কলে গুডসন।"

রিচার্ডস্ বলল, হ্যাঁ, সেই হতে পারে, এ কাজ তারই উপযুক্ত; এ রকম লোক শহরে আর কেউ নেই।"

"সে কথা সকলেই স্বীকার করবে এডোয়ার্ড-অবশ্য গোপনে। ছ' মাস হল গ্রামটি যেন আবার তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ফিরে গিয়েছিল-সৎ, সংকীর্ণ, স্বধর্মনিষ্ঠ, ও কঞ্জুষ।"

"মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে তো এই কথাই বলে গেছে-আর ঠিক কথাই বলেছে, প্রকাশ্যেই বলেছে।"

"হ্যাঁ, আর সে জন্য সকলে তাকে ঘৃণাও করেছে।"

"তা তো বটেই; তবে সে তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। আমি তো মনে করি, রেভারেণ্ড বার্জেস ছাড়া আমাদের মধ্যে সেই সব চাইতে বেশী ঘৃণা পেয়েছে।"

"দেখ, বার্জেস-এর এটা প্রাপ্য। শহরটাই ছোট লোকে ভরা, তাই তারা তো তাকে এই চোখেই দেখবে। এড়োয়ার্ড, অপরিচিত লোকটি যে বার্জেসএর হাত দিয়েই টাকাটা দিতে বলেছে এটা কি অদ্ভুত কথা নয়?"

"দেখ, হ্যাঁ, তা বটে। তবে কি না-তবে কি না-"

"রাখ তো তোমার তবে কি না'। তুমি কি তাকে এ কাজের ভার দিতে?"

দেখ মেরি, এও তো হতে পারে যে এ গ্রামের লোকের চাইতে অপরিচিত লোকটিই তাকে ভাল করে জানে।"

"তাতে কি বার্জেস-এর খুব সুবিধা হত!"

স্বামীটির মুখে কোন জবাব জুটল না; স্ত্রীটি তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রিচার্ডস্ কিছুটা ইতস্তত করেই বলল: "মেরি, বার্জেস তো খারাপ লোক নয়।"

স্ত্রীটি তো অবাক।

"বাজে কথা!" সে চেঁচিয়ে বলল।

"আমি জানি, সে খারাপ লোক নয়। তার প্রতি সাধারণের বিরাগের ভিত্তি তো সেই একটা জিনিস-যে জিনিস নিয়ে এত হৈ-চৈ হয়েছিল।"

"একটা জিনিসই বটে! কেন, সেই 'একটা জিনিস'ই কি যথেষ্ট নয়?"

"যথেষ্ট যথেষ্ট। তবে সে জন্য সে দোষী নয়।"

"কী বলছ তুমি! দোষী নয়! সকলেই জানে সে দোষী ছিল।"

"মেরি, আমি বলছি, সে নির্দোষ ছিল।"

"আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না, বিশ্বাস করিও না। তুমি কি করে জানলে?"

"এটা স্বীকারোক্তি। এ জন্য আমি লজ্জিত, কিন্তু এ স্বীকারোক্তি আমি করবই। একমাত্র আমিই জানি যে সে ছিল নির্দোষ। আমি তাকে বাঁচাতে পারতাম,আর-আর-দেখ, তুমি তো জান সারা শহর কি রকম তেতে উঠেছিল-তাই আমার সাহসে কুলোয় নি। তার ফলে সকলেই আমার বিরুদ্ধে চলে যেত। নিজেকে সেদিন ছোট মনে হয়েছিল-অনেক ছোট, কিন্তু আমি সাহস পাই নি; সে অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার মত পৌরুষ আমার ছিল না।"

মেরিকে কেমন যেন বিচলিত বোধ হল; কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর তোতলামির মত করে বলল:

"আমি-আমি মনে করি না যে এতে তোমার কোন-এমন কাজ করা উচিত নয়-অ্যাঁ-জনসাধারণের মতামত-সকলকেই সতর্ক হতে হয়-কাজেই-" কঠিন পথ; যেন কাদায় তার পা আটকে গেল; কিন্তু একটু পরেই সে আবার শুরু করল। "খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু-সে

কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।সত্যি এডোয়ার্ড, সে কাজ আমরা করতে পারি নি। কোন কিছুর জন্যই তোমাকে আমি সে কা করতে দিতাম না।"

"তার ফলে অনেক মানুষের শুভেচ্ছা আমরা হারাতাম মেরি; আর তখন-আর তখন-"

"দেখ এডোয়ার্ড, এখন আমার শুধু ভয়, না জানি আমাদের সম্পর্কে সে কি ভাবে।"

"সে? আমি যে তাকে বাঁচাতে পারতাম সে সন্দেহ তার মনে জাগে না।"

স্বস্তির সুরে স্ত্রী বলে উঠল, "আঃ! শুনে সুখী হলাম! তুমি যে তাকে বাঁচাতে পারতে এ কথা সে যতদিন না জানবে, ততদিন সে-সে-যাকগে, এটাই অনেক ভাল। আরে, সে যে এ কথা জানে না সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল, কারণ সে তো সব সময়ই আমাদের বন্ধু হতে চেষ্টা করে, আমরাই খুব একটা উৎসাহ দেখাই না। এ নিয়ে অন্যরা আমাকে কত ঠাট্টা করেছে। ঐ তো উইলসনরা, উইলকক্সরা,হার্কনেস্‌রা 'তামার বন্ধু বার্জেস,' বলে আমাকে ক্ষেপিয়ে মজা পাবার চেষ্টা করে, কারণ তারা জানে যে এতে আমি বিরক্ত হই। সে এ ভাবে আমার পিছনে লেগে থাকুক সেটা আমি চাই না; সে যে কেন এমন করে বুঝি না।"

"আমি বলতে পারি। এও আর একটি স্বীকারোক্তি। ব্যাপার যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছিল এবং সারা শহর তাকে তাড়াবার মতলব করছিল, তখন আমার বিবেকে বড় বাঁধল, ততটা আমি সহ্য করতে পারলাম না, গোপনে তার কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে দিলাম, আর সেও শহর ছেড়ে চলে গেল এবং যতদিন এ শহরটা তার পক্ষে নিরাপদ না হল ততদিন বাইরেই কাটিয়ে দিল।"

"এড়োয়ার্ড, শহরের লোকরা যদি জানতে পারত-"

"ও কথা বলো না। সে কথা ভাবলে এখনও আমার ভয় হয়, কাজটা করে ফেলেই আমার অনুশোচনাও হয়েছিল। পাছে তোমার মুখ দেখে কেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে সেই ভয়ে আমি তোমাকেও কিছু বলি নি। দুশ্চিন্তায় সে রাতে আমার ঘুম হয় নি। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝলাম যে কেউ আমাকে সন্দেহ করছে না। তারপর থেকেই কাজটা করতে পারার জন্য আমি খুসি বোধ করতাম। আজও তাই করি মেরি-পুরোপুরি খুসি বোধ করি।"

"আজ আমিও খুসি, কারণ তা না করলে তার প্রতি ভয়ংকর ব্যবহার করা হত। হ্যাঁ, আমি খুসি, কারণ তুমি তো জান সেটা করাই সেদিন ছিল তোমার কর্তব্য। কিন্তু এডোয়ার্ড, ধর এখনও যদি কোনদিন কথাটা ফাঁস হয়ে যায়!"

"হবে না।"

"কেন?"

"কারণ সকলেই গুডসনকেই দায়ী মনে করে।"

"তাই তো করা উচিৎ।"

"নিশ্চয়। অবশ্য সে পরোয়া করে না। সকলে বেচারি বুড়ো সল্‌স্‌বেরিকে বোঝাল, সে যেন গিয়ে তার ঘাড়েই দোষটা চাপায় আর সেও সেখানে গিয়ে তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল, তাকে দোষী সাব্যস্ত করল। গুডসন তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জবাব যদি চাও তো তোমাকে একটা পরামর্শ দেই সস্‌স্‌বেরি; আমার জবাব শুনবার জন্য আবার যখন আসবে তখন একটা ঝুড়ি নিয়ে এসো যাতে তোমার হাড়গোড়গুলো বেয়ে নিয়ে যেতে পার। ব্যাপারটা সেখানেই মিটে গেল, আর আমরাও বেঁচে গেলাম। ও ব্যাপারটাই চাপা পড়ে গেল।"

দু'জনে আবার সোনার বস্তার রহস্য নিয়েই মেতে উঠল। কিন্তু শীঘ্রই তাদের আলোচনায় কেমন যেন বাধা পড়তে লাগল-মাঝে মাঝেই তারা গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রিচার্ডস্‌ উঠে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল এবং দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে ওঠা নিশাচর মানুষের মত দুই হাতে নিজের চুল টানতে লাগল। তারপর কি যেন একটা সংকল্প

স্থির করে টুপিটা নিয়ে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল; একটা কথা পর্যন্ত বলল না। তার স্ত্রী মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে কি যেন ভাবতে লাগল; সে যে তখন একলা রয়েছে সে খেয়ালও তার নেই। মাঝে মাঝেই নিজের মনে বলতে লাগল, "আমাদের নিয়ো না......কিন্তু-কিন্তু-আমরা যে গরিব-বড়ই গবির।.....আমাদের নিয়ো না.....আঃ, এতে কারই বা ক্ষতি হবে?-আর কেউ কোনদিন জানতেও পারবে না।.....আমাদের নিয়ো......" তার কথা থেমে গেল। একটু পরে চোখ তুলে তাকিয়ে আধা ভয়ে আধা খুসিতে সে বলে উঠল:

"সে চলে গেছে! কিন্তু, তার হয় তো দেরী হতে পারে....বড় বেশী দেরী হতে পারে.......নাও হতে পারে, হয় তো এখনও সময় আছে।" উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। শরীরটা ঈষৎ কাঁপছে। শুকনো গলায় বলল, "ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন-এ সব কথা ভাবাও খারাপ-কিন্তু...প্রভু, কি দিয়ে তুমি আমাদের গড়েছ-কি বিচিত্রভাবে তুমি আমাদের গড়েছ!"

আলোটা কমিয়ে দিয়ে সে চুপি চুপি বস্তাটার কাছে গেল। হাঁটু ভেঙে বসে বস্তাটার উঁচু-নীচু গায়ে আদর করে হাত বুলোতে লাগল; তার দুই চোখ ফুটে উঠল লোভের আলো নিজের মনেই বলল, "সে যদি একটু অপেক্ষা করত!-আহা, এত তাড়াহুড়ো না করে শুধু যদি একটু অপেক্ষা করত।"

ইতিমধ্যে কক্স আপিস থেকে বাড়ি ফিরে গেল; এই আশ্চর্য ঘটনার কথা স্ত্রীকে সবই বলল; সাগ্রহে এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারা বলল, স্বর্গত গুডসনই এ শহরের একমাত্র লোক যে একটি অপরিচিত দুঃখী লোককে কুড়ি ডলারের মত এত মোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে। একটু দু,জনই চুপ করে গেল। কেমন যেন বিচলিত ও অস্থির হয়ে উঠল। অবশেষে স্ত্রী যেন নিজেকেই বলল:

"রিচার্ডস্রা ছাড়া এ গোপন খবর আর কেউ জানে না.....আর জানি আমরা....আর কেউ না।"

একটু চমকে উঠে স্বামীটি চিন্তা ছেড়ে সাগ্রহে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে একবার টুপিটার দিকে আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকাল-যেন নীরবে কিছু জিজ্ঞাসা করল। মিসেস কক্স গলায় হাত রেখে দু'-একটা ঢোঁক গিলল; তারপর কোন কথা না বলে মাথাটা নাড়ল। মুহূর্তকাল পরেই দেখল, বাড়িতে সে একা।

ওদিকে রিচার্ডস্ ও কক্স তখন নির্জন পথ ধরে বিপরীত দিকে থেকে দ্রুত ছুটে চলেছে। ছাপাখানার সিঁড়ির নীচে হাঁপাতে হাঁপাতে দু'জনের দেখা হয়ে গেল। রাতের আলোতেই দু'জন দু'জনের মুখের ভাষা পড়ে নিল। কক্স চুপি চুপি বলল:

"আমরা ছাড়া কেউ এ কথা জানে না তো?"

চুপি চুপি জবাব এল।

"কেউ না, সত্যি বলছি, একটি প্রাণীও না।"

"যদি এখনও বেশী দেরী না হয়ে থাকে-"

দু'জন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল; এমন সময় একটা ছেলে এসে তাদের ধরে ফেলল। কক্স জিজ্ঞাসা করল:

"কে? জনি না কি?"

"হ্যাঁ স্যার।"

সকালের ডাক তোমাকে ছাড়তে হবে না-কোন ডাকই না; আমি না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

"ডাক তো চলে গেছে স্যার।"

"চলে গেছে! আর কণ্ঠস্বরে অবর্ণনীয় হতাশা।

"হ্যাঁ স্যার ব্রিক্সটন ও তার পরবর্তী সব শহরের টাইম-টেবল আজ থেকে বদলে গেছে স্যার-তাই অন্যদিন অপেক্ষা বিশ মিনিট আগেই কাগজ পাঠাতে হয়েছে। আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছিল; আর দু' মিনিট পরে এলেই-"

বাকিটা শুনবার জন্য অপেক্ষা না করেই তারা দু'জন মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। দশ মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। তারপর বিরক্ত গলায় কক্স বলল:

"তোমার যে হঠাৎ এত তাড়াহুড়া পড়ে গেল কেন তা তো বুঝি না।"

বিনীত জবাব এল:

"এখন এবশ্য বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনি তো জানেন, সব কিছু বুঝতেই আমার একটু দেরী হয়। কিন্তু এর পরে-"

"এর পরের কথা চুলোয় যাক। হাজার বছরে আর এ সুযোগ আসবে না।"

তারপর শুভরাত্রি না জানিয়েই বন্ধুরা বিদায় নিল এবং মারাত্মকভাবে আহত লোকের মত কোন করমে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে পোঁছবামাত্রই স্ত্রীরা সাগ্রহে "তারপর?" বলেই তাদের মুখ দেখে জবাবটা আঁচ করতে পেরে মুখে কিছু না বলেই দুঃখে কষ্টে একেবারে ভেঙে পড়ল। দুই বাড়িতেই গরম-গরম কথাবার্তা চলল-ব্যাপারটা নতুন; আলোচনা আগেও হয়েছে, কিন্তু গরম-গরমও নয়, উদ্ধতও নয়। আজকে রাতের আলোচনায় চলল পরস্পরের বিষোদগার। মিসেস নিসার্ডস্ বলল:

"তুমি যদি একটু অপেক্ষা করতে এড়োয়ার্ড-চিন্তা করে দেখবার জন্য যদি একটু সময় নিতে; তা নয়, খবরটা দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটলে ছাপাখানায়।"

"ওতে লেখা ছিল, প্রকাশ করতে হবে।"

"সেটা কিছুই না; ইচ্ছা করলে গোপনেও করতে পার, সে কথাও তো লেখা ছিল। কি, ঠিক কি না?"

"তা অবশ্য ছিল; সে কথা ঠিক; কিন্তু যখন ভাবলাম এর ফলে কী হৈ-চৈ টাই না পড়ে যাবে, কেন অপরিচিত লোক হ্যাড্‌লিবুর্গকে এতখানি বিশ্বাস করেছে এটা যে কত বড় সম্মান-"

"সে তো বটেই; সে তো আমিও বুঝি; কিন্তু একটু ভেবেচিন্তে দেখার জন্য তুমি যদি অপেক্ষা করতে তাহলেই বুঝতে পারতে যে আসল লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ সে এখন করবে, আর তার ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন কেই নেই; কাজেই যার একান্ত দরকার সে রকম কেউ টাকাটা পেলে কারও প্রাণেই আঘাত লাগত না, আর -আর-"

স্ত্রীটি কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য স্বামী বলল:

"কিন্তু যাই বল মেরি, যা ঘটে তা ভালর জন্যই ঘটে-নিশ্চয়ই তাই; তুমিও তা জান। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটাই ভবিতব্য-"

"ভবিতব্য! বোকার মত কোন কাজ করলেই লোকে ভবিতব্যের দোহাই দেয়। আবার এও তো হতে পারে যে এইভাবে আমরা টাকাটা পাব সেটাই ছিল ভবতব্য, এথচ তুমিই আগ বাড়িয়ে বিধাতার বিধানকে ভেস্তে দিলে- সে অধিকার তোমাকে কে দিয়েছিল? এটা খুবই অন্যায় হয়েছে-পাপ হয়েছে, তোমার মত একজন ধর্মভীরু, বিনীত লোকের উপযুক্ত কাজ মোটেই নয়-"

"কিন্তু মেরি, তুমি তো জান অন্য সব গ্রামবাসীর মতই আমরাও সারাটা জীবন সততার শিক্ষা পেয়ে পেয়ে এটাই আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে যে কোন সৎকর্মের সুযোগ এলে এক মুহূর্তের জন্যও আমরা চিন্তা করতে পারি না-"

"আঃ, আমি জানি, আমি জানি-সারা জীবন ধরে সততার শিক্ষার এই ফল-জন্মাবধি সব রকম প্রলোভনের হাত থেকে সততাকে বাঁচিয়ে চলার এই ফল; তাই তো এ সততা এত কৃত্রিম ও দুর্বল যে প্রলোভনের এক ধাক্কায় ভেসে গেল; সেটা তো আজ রাতেই আমরা দেখলাম। ঈশ্বর জানেন, আজ পর্যন্ত আমার এই পচা অবিনশ্বর সততা সম্পর্কে সন্দেহের ছায়ামাত্র আমার মনে ছিল না,-আর আজ জীবনে প্রথম সত্যিকারের বড় প্রলোভনের সামনে পড়েই আমি-এড়োয়ার্ড, এই বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে আমার মতই গোটা শহরের সততাই পচে গেছে; তোমার সততার মতই পচে গেছে। এটা একটা বাজে শহর, কুঞ্জুষ শহর, একমাত্র সততা ছাড়া আর কোন গুণ তার নেই; এথচ আজ আমি বিশ্বাস করি যে এমন দিন যদি কখনও আসে সেদিন গোটা শহরের মহা সুনাম তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে। এ কথা মুখ খুলে বলতে পেরে যেন কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছি। আমি একটি ফাঁকিবাজ, সারা জীবন তাই ছিলাম, অথচ তা জানতাম না। কেউ যেন আর আমাকে সৎ লোক না বলে-আমি সৎ নই।"

"আমি-দেখ মেরি, আমারও ঐ এক কথা; সত্যি তাই। সত্যি অবাক কাণ্ড। এ কথা আগে কখনও বিশ্বাস করতাম না-কদাপি না।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। দু'জনই চিন্তামগ্ন। অবশেষে স্ত্রী চোখ তুলে বলল:

"আমি জানি তুমি কি ভাবছ এডোয়ার্ড।"

ধরাপরা লোকের মত বিমূঢ় ভাব রিচার্ডসের মুখে।

"এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে মেরি, কিন্তু-"

"তাতে কি এডোয়ার্ড, আমি নিজেও তো ঐ কথাই ভাবছিলাম।"

"আমিও তাই আশা করি। বলে ফেল।"

" তুমি ভাবছিলে, অপরিচিত লোকটির কাছে গুডসন কি মন্তব্য করেছিল সেটা যদি কেউ অনুমান করতে পারত।"

"ঠিক বলেছ। নিজেকে অপরাধী ও লজ্জিত মনে হচ্ছে। আর তুমি?"

"আমি ও সবের বাইরে! এখানেই একটা বিছানা করা যাক; সকালে ব্যাংকের ভূগর্ভ-কক্ষ খোলার পরে বস্তাটা সেখানে জমা দেওয়া পর্যন্ত তো এটাকে পাহারা দিতে হবে।....আহারে, ঐ ভুলটা যদি আমরা না করতাম!"

বিছানা করা হলে মেরি বলল:

"সেটা একই চিচিং ফাঁক-কথাটা কি হতে পারে? কি মন্তব্য সে করেছিল? কিন্তু এস, শুয়ে পড়া যাক।"

"ঘুমোব?"

"নাঃ চিন্তা করব।"

ইতিমধ্যে কক্স-দম্পতিও তাদের ঝগড়া ও মিটমাটের পালা শেষ করেছে; তারাও ভাবছে আর ভাবছে, উল্টে-পাল্টে দেখছে-আশ্রয়হীন সর্বহারা লোকটির প্রতি গুডসন কিমন্তব্য করেছিল-কি সেই সোনালি মন্তব্য যে মন্তব্যের দাম নগদ চল্লিশ হাজার ডলার।

সেদিন রাতে গ্রামের টেলিগ্রাফ আপিসটা যে অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশী রাত পর্যন্ত খোলা ছিল তার কারণ: কক্স-এর সংবাদপত্রের ফোরম্যান ছিল "এসোসিয়েটেড প্রেস"-এর স্থানীয় প্রতিনিধি। তাকে বলা যায় অনাহারী প্রতিনিধি, কারণ বছরে চারবারও তার পাঠানো ত্রিশটি শব্দ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু এবারে ব্যাপারটা অন্য রকম হল। সংবাদ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল:

"সমস্তটা পাঠাও-সম্পূর্ণ বিবরণ-বারো শ' শব্দ।"

মস্ত বড় অর্ডার! ফোরম্যান বিলটা পূরণ করল; আজ সে যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে গর্বিত লোক। পরদিন প্রাতরাশের সময় নাগাদ সারা আমেরিকায়-মণ্ট্রিল থেকে উপসাগর পর্যন্ত, আলাস্কার তুষার-প্রবাহ থেকে ফ্লোরিডায় কমলা-বন পর্যন্ত-সকলের মুখেই অদূষণীয়-চরিত্র হ্যাড্‌লিবুর্গের নাম ছড়িয়ে পড়ল; লক্ষ লক্ষ লোক আগন্তুক ও তার টাকার থলের কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে অবাক হয়ে ভাবল, সঠিক লোকটি কে কি খুঁজে পাওয়া যাবে; আর অপেক্ষা করতে লাগল, এ বিষয়ে আরও, সংবাদ কতক্ষণে আসবে।

২

হ্যাড্‌লিবুর্গ গ্রামের ঘুম ভাঙল বিশ্বজোড়া খ্যাতির মধ্যে-বিস্মিত, সুখী, গর্বিত। কল্পনাতীত গর্ব! তার উনিশজন প্রধান নাগরিক ও তাদের স্ত্রীরা হাসতে হাসতে পরস্পরের সঙ্গে কর-মর্দন করতে লাগল, অভিনন্দন জানাতে লাগল, আর বলতে লাগল, এ ঘটনার ফলে অভিধানে একটা নতুন শব্দ যুক্ত হল-হ্যাড্‌লিবুর্গ, অদূষণীয় চরিত্রের সমার্থবাচক শব্দ-এ শব্দ অভিধানের পাতায় চিরদিন বেঁচে থাকবে। ক্ষুদে নাগরিক ও তাদের স্ত্রীরাও ঐ একই কাজ করে ফিরতে লাগল। সোনার বস্তাটা দেখবার জন্য সকলেই ব্যাংকে ছুটল; দুপুর হবার আগেই ব্রিক্সটন ও আশপাশের অন্য সব শহরের ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত লোকজন দলে দলে আসতে শুরু করল; সেদিন বিকেলে ও পর দিন নানা জায়গা থেকে প্রতিবেদকরা আসতে লাগল; বস্তা ও তার ইতিহাস খতিয়ে দেখল ও শুনল, নতুন করে তার বিবরণ লিখল, খট্ খট্ করে ফটো তুলল-বস্তাটার, রিচার্ডস্-এর বাড়ির, ব্যাংকের, প্রেস্‌বিটেরিয়ান গির্জার,ব্যাপ্টিস্ট গির্জার, সরকারী বাগানের, যেখানে পরীক্ষা করে টাকাটা দেওয়া হবে সেই টাউন-হলের; এমন কি রিচার্ডস্-দম্পতি, ব্যাংকার পিংকার্টন, কক্স, ফোরম্যান, রেভারেণ্ড বার্জেস, পোষ্ট-মাস্টার, জেলে, শিকারী প্রভৃতি সকলের ছবিই তোলা হল। পিংকার্টন তো যে আসে তাকেই বস্তাটা দেখায় আর গর্ব করে বলে যে এবার এই দৃষ্টান্তের কথা গোটা মার্কিন মুলুকেই ছড়িয়ে পড়বে এবং নৈতিক নবজাগরণের একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সপ্তাহের শেষের দিকে অবস্থা আবার শান্ত হয়ে এল। গর্ব ও আনন্দের উত্তেজনা হ্রাস পেয়ে একটা মিষ্টি-মধুর নীরব আনন্দে সরলে খুসির নিঃশ্বাস ফেলল। সকলের মুখেই দেখা দিল শান্ত পবিত্র মুখের আভাষ।

তারপর আবার পরিবর্তন দেখা দিল। ধীরগতি পরিবর্তন; এতই ধীরগতি যে প্রথমে কারও নজরেই পড়ল না। কিন্তু ক্রমেই মনে হতে লাগল যে লোকজনের মুখে আগেরকার সেই হাসিখুসি ভাবটা নেই; কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে; সকলের চোখেমুখে একটা রুগ্ন ভাব।

আর ঠিক সেই অবস্থায় উনিশটি প্রধান পরিবারের কর্তাদের মুখে শুতে যাবার সময় প্রায় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা কথা উচ্চারিত হতে লাগল: "আহা, গুডসন যে মন্তব্যটি করেছিল সেটা কি হতে পারে?"

আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও শিউরে উঠে বলতে লাগল:

"উঁহু, ও কথা ভেব না। মনের মধ্যে কী ভয়ানক কথার জট পাকাচ্ছে? ঈশ্বরের দোহাই, ও চিন্তা মন থেকে দূর কর।"

কিন্তু পরদিন রাতে তাদের কন্ঠে ঐ একই প্রশ্ন উচ্চারিত হল, আর ঐ একই পাল্টা জবাবই তারা পেল। তবে এবার প্রতিবাদের কন্ঠ ক্ষীণতর।

তৃতীয় রাতেও পুরুষরা আবার ঐ একই প্রশ্ন উচ্চারিত করল-স্ত্রীরা দুর্বল কন্ঠে আপত্তিও জানাল, কিছু একটা যেন বলতেও চাইল, কিন্তু বলল না। তার পরের রাতে তাদের জিভও সোচ্চার হয়ে উঠল:

"আহা! সেটা যদি অনুমান করতে পারতাম!"

এই ভাবে তিনি সপ্তাহ পার হয়ে গেল- আর এক সপ্তাহ বাকি। শনিবার সন্ধ্যায়-আহারাদির পরে। অন্যান্য শনিবারের হৈ-চৈ, ব্যস্ততা, বাজার করা প্রভৃতির বদলে সেদিন রাজপথ ফাঁকা-নির্জন। রিচার্ডস্ ও তার স্ত্রী ছোট বসবার ঘরটিতে দুঃখিত ও চিন্তিত মনে দূরে দূরে

বসে আছে। এখন এটাই তাদের সান্ধ্যকালীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে: সারাটা জীবন তাদের অভ্যাস ছিল পড়াশুনা, সেলাই, খুসিমনে আলোচনা, প্রতিবেশীকে বাড়িতে অভ্যর্থনা করা বা তাদের বাড়িতে যাওয়া-সে সব কিছু অনেক কাল আগেই মরে হেজে গেছে-অর্থাৎ দু'-তিন সপ্তাহ আগেই সে সব তারা একদম ভুলে গেছে, কেউ এখন কথা বলে না, পড়ে না, দেখাসাক্ষাৎ করে না-গোটা গ্রামটাই যার যার বাড়িতে বসে থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দুশ্চিন্তা করে, চুপচাপ থাকে। শুধু সেই মন্তব্যটা কি হতে পারে তাই নিয়ে মাথা ঘামায়।

পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। রিচার্ডস্ উদাসীনভাবে ঠিকানা ও ডাকঘরের ছাপটা দেখল-দুটোই অচেনা-চিঠিটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে আবার নিজের চিন্তায়ই ডুব দিল। দু' তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রী ক্লান্তভাবে উঠে শুভরাত্রি না জানিয়েই-সেটাই এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে-শুতে যাচ্ছিল; কিন্তু কি মনে করে চিঠিটার কাছে গিয়ে থামল, একান্ত অনাগ্রহে একবার তাকিয়ে দেখল, তার পর খামটা ছিঁড়ে চোখ বুলোতে লাগল। চেয়ারটাকে দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে দুই হাঁটুর উপর থুত্নি রেখে রিচার্ডস বসেই ছিল। হঠাৎ একটা কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ কানে গেল। তার স্ত্রী পড়ে গেছে। লাফ দিয়ে তার কাছে যেতেই স্ত্রী চেঁচিয়ে বলল:

"আমাকে একা থাকতে দাও, আমি ভাল আছি। চিঠিটা পড়-পড়ে দেখ!"

পড়ল। গোগ্রাসে গিলল। তার মাথা ঘুরে গেল। অনেক দূর থেকে চিঠিটা এসেছে। তাতে লেখা:

"আমি আপনার অপরিচিত, কিন্তু তাতে কি, আমার কিছু বলবার আছে। এইমাত্র মেক্সিকো থেকে বাড়ি ফিরে ঘটনার কথা সবাই জেনেছি। মন্তব্যটা কে করেছিল তা আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি আর জীবিত লোকদের মধ্যে একমাত্র আমিই জানি। গুডসন। অনেক বছর আগে আমি তাকে ভাল করেই জানতাম। সেই রাতে আমিই আপনাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং মাঝরাতের ট্রেনটা না আসা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অতিথি হয়ে ছিলাম। অন্ধকারে একটি অচেনা লোককে কথাটা বলতে আমি শুনেছিলাম-ঘটনাটা ঘটেছিল হেল্ গলিতে। বাড়ি ফিরবার পথে বাকিটা সময় তিনি ও আমি ঐ কথাটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। তার বাড়িতে বসে ধূমপান করতে করতেও তা নিয়েই কথা হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের গ্রামের অনেকের কথাই তিনি বলেছিলেন-অধিকাংশ সম্পর্কেই মন্তব্যগুলি বিরূপ ছিল, কিন্তু তিনি দু' তিনজন সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য করেছিলেন; তাদের মধ্যে একজন আপনি স্বয়ং। আমি অনুকূল কথাটাই ব্যবহার করলাম, আরও জোরালো কিছু না লিখে। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন শহরের কোন লোককেই তিনি পছন্দ করেন না-একজনকেও না; কিন্তু আপনি-মনে হচ্ছে তিনি আপনার কথাই বলেছিলেন-সে বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিত-এক সময়ে ভাল করে না জেনেই তার খুব উপকার করেছিলেন; তাই তার ইচ্ছা ছিল তার যদি একটি সম্পত্তি থাকত তাহলে মৃত্যুর সময় সে সম্পত্তি তিনি আপনাকে দান করে যেতেন, আর শহরের বাকি লোকদের প্রত্যেকের জন্য রেখে যেতেন একটা করে অভিশাপ। এখন আপনিই যদি তার সেই উপকার করে থাকেন, তাহলে তো ন্যায়ত আপনিই তার উত্তরাধিকারী এবং এই সোনাভর্তি বস্তার মালিক। আমি জানি, আপনার মর্যাদাবোধ ও সততার উপর আমি ভরসা করতে পারি। কারণ হ্যাড্লিবুর্গের একজন নাগরিকের পক্ষে এ গুণগুলি তো অপরিহার্য উত্তরাধিকার, আর তাই সেই মন্তব্যটি আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই, কারণ এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে আপনি যদি আসল লোক না হন তাহলে আপনিই সেই আসল লোককে খুঁজে বের করবেন এবং বেচারি গুডসন-এর কৃতজ্ঞতার ঋণ যাতে যথাযথভাবে শোধ হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। মন্তব্যটা এই:

'আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না: যান, সকলকে সংশোধন করুন।"

হাওয়ার্ড এল, স্টিফেন্সন

"ও: এডোয়ার্ড, টাকাগুলো তো আমাদের; আমি এত কৃতজ্ঞ বোধ করছি-তুমি আমাকে চুমো খাও-কতদিন আমরা চুমো খাই নি-আর এটা আমাদের বড়ই দরকার ছিল-মানে এই টাকাটা-এখন তো পিংকার্টন ও তার ব্যাংকের হাত থেকে তুমি রেহাই পেয়ে গেলে; তুমি আর কারও ক্রীতদাস হয়ে থাকবে না; মনে হচ্ছে আমি যেন খুসিতে এখন উড়ে যেতেও পারি।"

সেটিটাতে বসে আধ ঘন ধরে দু'জন দু'জনকে আদর করতে লাগল; পুরনো দিনগুলি যেন আবার ফিরে এসেছে-যেন দিন শুরু হয়েছিল তাদের পূর্বরাগ থেকে আর একটানা চলেছিল সেই দিনটি পর্যন্ত যেদিন অজানা লোকটি এসেছিল তার মারাত্মক অর্থ-ভাণ্ডার নিয়ে। কথাপ্রসঙ্গে স্ত্রী বলল:

"ও হো এডোয়ার্ড, কী সৌভাগ্য যে বেচারি গুডসন-এর এত বড় একটা উপকার তুমি করেছিলে! তাকে আমি আগে কখনও পছন্দ

করতাম না, কিন্তু এখন তাকে ভালবেসেছি। আর এত দিন এ কথা কাউকে যে বল নি, বা এ নিয়ে বাহাদুরী দেখাও নি, সেটা খুবই ভাল করেছ।" তারপর একটু অনুযোগের সুরে বলল, "কিন্তু আমাকে বলা তোমার উচিত ছিল এডোয়ার্ড; তুমি তো জান, তোমার স্ত্রীকে কথাটা জানানো উচিত ছিল।"

"দেখ, আমি-মানে-দেখ মেরি, অর্থাৎ-"

"ও সব মানে আর অর্থাৎ রেখে দাও। সব কথা আমাকে বল। তোমাকে তো সর্বদাই ভালবেসে এসেছি, কিন্তু এখন আমি তোমার জন্য গর্ববোধ করছি। প্রত্যেকেই মনে করে এ গ্রামে মাত্র একটি সৎ উদার লোক ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তুমিও-এডোয়ার্ড, কেন তুমি আমাকে সে কথা বল নি?"

"দেখ-মানে-আরে মেরি, আমি পারি না!"

"তুমি পার না? কেন পার না?"

"দেখ, সে-মানে-তার কাছে আমি কথা দিয়েছিলাম, কাউকে বলব না।"

স্ত্রী তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল:

"তুমি-কথা-দিয়েছিলে? এডোয়ার্ড, কেন আমাকে এ কথা বলছ?"

"মেরি, তুমি কি চাও যে আমি মিথ্যাবাদী হই?"

স্ত্রী বিচলিত বোধ করল। মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর স্বামীর হাতে হাত রেখে বলল:

"না....না। পরস্পরের কাছ থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি, কিন্তু আর না-ঈশ্বর সে জন্য আমাদের ক্ষমা করুন! সারা জীবন তুমি কখনও মিথ্যা বল নি। কিন্তু এখন-জীবনের ভিত্তিভূমিই যখন পায়ের নীচে ধসে যাচ্ছে তখন আমরা-আমরা-" এক মুহূর্তের জন্য তার কথা বন্ধ হয়ে গেল; তারপর ভাঙা গলায় বলল, "আমাদের নিয়ে না লোভের পথে....আমি মনে করি, তুমি কথা দিয়েছ এডোয়ার্ড। এ বিষয়টা এখানেই শেষ হোক। এখন-সে সব দিন তো পার হয়ে গেছে; এস, আমরা আবার সুখী হই; সন্দেহের মেঘ আর নয়।"

এডোয়ার্ড অনেক চেষ্টা করে ঘাড় নাড়ল, কারণ সেও অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কবে কোথায় গুডসন-এর কি উপকার সে করেছিল।

প্রায় সারাটা রাত দু'জন জেগে কাটাল। মেরি সুখী ও ব্যস্ত, এডোয়ার্ড ব্যস্ত, কিন্তু সুখী নয়। মেরি মনে মনে হিসাব কষছে, কেমন করে টাকাটা খরচ করবে, আর এডোয়ার্ড মনে করবার চেষ্টা করছে, কি উপকারটা সে করেছিল। প্রথমেই বিবেক তাকে দংশন করছিল কারণ মেরিকে সে মিথ্যা বলেছিল-যদি সেটা মিথ্যা হয়ে থাকে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে-যদি সেটা মিথ্যা বলেছিল-যদি সেটা মিথ্যা হয়ে থাকে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে-যদি সেটা মিথ্যা হয়েই থাকে? তাহলে কি হবে? এটা কি এতই বড় কথা? আমরা কি অনেক সময়ই মিথ্যা কাজ করি না? তাহলে মিথ্যা বললে কি হয়? মেরিকেই দেখ-সে কি করেছে দেখ। মুখে সত্যের কথা বলছে, কিন্তু কাজে কি করছে? কাগজটা নষ্ট করে ফেলে টাকাটা হাতিয়ে নেওয়া হয় নি বলে কাঁদছে! চুরি করা কি মিথ্যা বলার চাইতে ভাল?

আবার সেই পুরনো কথাটাই সামনে এসে দাঁড়াল। সত্যি কোন উপকার কি সে করেছিল? স্টিফেন্সন-এর চিঠি অনুসারে গুডসেন-এর নিজের সাক্ষ্যই তো তাই বলছে; তার চাইতে ভাল সাক্ষ্য আর কিছু তো হতেই পারে না-সেটাকে তো প্রমাণই বলা চলে। নিশ্চয়ই। কাজেই ও ব্যাপারটা মিটে গেল। সংকোচের সঙ্গে তার মনে পড়ল, উপকারটা রিচার্ডস্ করেছিল কি অন্য কেউ করেছিল সে বিষয়ে অপরিচিত মিঃ স্টিফেন্সনকেও কিছুটা সন্দেহগ্রস্ত বলে মনে হয়। তাছাড়া, সে তো ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছে রিচার্ডস্-এর সম্মানবোধের উপর। টাকাটা কার হাতে যাবে সেটা তাকেই স্থির করতে হবে-আর সে যদি ভুল লোক হয় তাহলে রিচার্ডস্ যে আসল লোককে খুঁজে বের করবে সে বিষয়েও মিঃ স্টিফেন্সন-এর মনে কোন সন্দেহ নেই। আহা, কোন মানুষকে এ রকম

অবস্থায় ফেলা খুবই অন্যায়-স্টিফেন্সন ঐ সন্দেহটাকে কেন বাদ দিল না। ওটাকে আবার ঢোকাতে গেল কেন?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রিচার্ডস্-এর এমন একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল যাতে সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেক অনেক বছর আগে ন্যান্সি হিউইট নামে একটি সুন্দর মেয়ের সঙ্গে গুডসন-এর বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু যে ভাবেই হোক বিয়েটা ভেঙে যায়, আর মেয়েটিও মারা যায়। তারপর গুডসন আর বিয়ে তো করেই নি, বরং নারী জাতির উপরেই তার একটা ঘৃণা জন্মে যায়। এতক্ষণে রিচার্ডস্-এর আবছা মনে পড়ে গেল, ঐ মেয়েটির দেহে যে যৎ সামান্য নিগ্রো রক্ত ছিল সে কথা সেই প্রথম জানতে পেরে গ্রামবাসীদের জানায় এবং গ্রামবাসীরা কথাটা গুডসনকে বলে। এইভাবেই একটি দো-আঁস্‌লা মেয়েকে বিয়ে করার হাত থেকে প্রকারান্তরে সেই গুডসনকে রক্ষা করেছিল। আর সেই কারণেই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে চেয়েছিল তার কোন সম্পত্তি থাকলে সেটা সে রিচার্ডস্‌কেই দিয়ে যেত। উপকারের ব্যাপারটা এতক্ষণে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, আর সেও খুসিমত ঘুমুতে গেল। ইতিমধ্যে মেরি নিজের জন্য একটা বাড়ি ও স্বামীর জন্য একজোড়া চপ্পল কিনতে ছ' হাজার ডলার খরচ করে মনের সুখে ঘুমুতে গেল।

সেই একই শনিবার সন্ধ্যায় পিওন শহরের উনিশ জন প্রধান নাগরিকের প্রত্যেককে একটা করে চিঠি পৌঁছে দিল। চিঠিগুলোর কোন দুটো খাম এক রকম নয়, কোন দুটো খামের উপরকার লেখা এক হাতের নয়, কিন্তু ভিতরের চিঠিগুলো সব হুবহু এক-শুধু একটি বিষয় ছাড়া। সবগুলি চিঠিই রিচার্ডস্-এর চিঠির প্রতিলিপি-বক্তব্য ও হাতের লেখা সহ-সবগুলোতেই স্টিফেন্সন-এর স্বাক্ষর, কিন্তু প্রতিটি চিঠিতে রিচার্ডস্-এর নামের জায়গায় প্রাপকের নামটা লেখা।

সারাটা রাত ধরে আঠারো জন প্রধান নাগরিক সেই একই কাজ করে চলল যে কাজ করেছে তাদের সগোত্র-ভাই রিচার্ডস্-অর্থাৎ সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা চিন্তা করে বের করতে চেষ্টা করেছে বার্কলে গুডসন-এর কি উপকার তারা করেছে যার জন্য সে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। কাজটা সহজ নয়, তবু তারা সফলতা লাভ করেছে।

তারা যখন এই কঠিন কাজে ব্যস্ত তখন তাদের স্ত্রীরা সারা রাত ধরে অতি সহজে প্রাণ খুলে টাকা খরচ করেছে। সেই এক রাতে উনিশটি স্ত্রী বস্তার ভিতরকার সেই চল্লিশ হাজার থেকে গড়ে সাত হাজার ডলার খরচ করে ফেলল-অর্থাৎ মোট খরচের পরিমাণ একশ' তেত্রিশ হাজার।..

পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জনৈক স্থপতি ও গৃহনির্মাতা সম্প্রতি এই গ্রামে একটি ছোট ব্যবসা খুলেছে; সপ্তাহখানেক হল তার সাইন-বোর্ডটাও ঝোলানো হয়েছে। কিন্তু একটি খদ্দেরও জোটে নি; লোকটি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে; এখানে আসার জন্য দুঃখিতও হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার পক্ষে হাওয়া বদলে গেল। প্রথমে একজন, তারপর আর একজন প্রধান নাগরিকের স্ত্রী তার কাছে এসে গোপনে বলল:

"সোমবার আমার বাড়িতে আসন-কিন্তু আপাতত এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। আমরা বাড়ি তৈরি করার কথা ভাবছি।"

একদিনেই সে পেল এগারোটা প্রস্তাব। সেই রাতেই মেয়েকে চিঠি লিখে তার ছাত্রের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দিতে বলল। আরও জানিয়ে দিল, এবার সে অন্তত মাইল খানের উঁচু কোন ঘরে বিয়ে করতে পারবে।

ব্যাংকার পিংকার্টন ও অপর দু'-তিনজন ধনী লোক গ্রামাঞ্চল থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা ভালেও আপাতত অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের মত লোকরা ডিম ফুটবার আগেই তার হিসাব করে না।

উইলসনরা একটা চমৎকার নতুন জিনিসের কথা ভাবল-একটা ফ্যান্সি-ড্রেস বল-নাচ। কাউকে পাকা কথা দিল না বটে, কিন্তু পরিচিত সকলকেই গোপনে জানিয়ে দিল যে ও রকম একটা নাচের কথা তারা ভাবছে-এবং "সেটা ঠিক হলে আপনাকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানানো হবে।" সকলেই অবাক হল; পরস্পরকে বলল, "আরে, ওদের কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি; গরিব মানুষ উইলসনরা এটা করতেই পারে না।" উনিশ জনের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাদের স্বামীদের বলল, "মতলবটা ভালই; আপাতত আমরা চুপচাপ থাকি; তারপর তাদের এই সস্তার ব্যাপারটা হয়ে গেলেই এমন একটা বল-এর ব্যবস্থা করব যে ওদের চোখ ট্যাঁরা হয়ে যাবে।"

যত দিন যেতে লাগল, টাকা উড়াবার অংক ততই চড়তে লাগল, ততই উদ্দাম, ততই বেপরোয়া ও অর্থহীন হয়ে উঠতে লাগল। ভাবগতিক দেখে মনে হল, প্রতিশ্রুত ডলার পাবার আগেই উনিশ জনের প্রত্যেকেই পুরো চল্লিশ হাজার ডলার তো খচ করবেই,

উপরন্তু বেশ কিছু ধার-কর্জও করবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু স্বল্পবুদ্ধির মানুষ শুধু খরচের পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত হল না, ধারে সত্যি খরচও করে বসল। জমি মর্টগেজ, খামার, শেয়ার, ভাল পোশাক, ঘোড়া ও আরও নানা জিনিস কিনল, কিছুটা আগাম দিল, বাকি টাকা দশ দিনের মধ্যে শোধ করে দেবার ওয়াদা করল।

আরও একটি লোক বড়ই বিপাকে পড়ল-রেভঃ মিঃ বার্জেস। দিনের পর দিন যেখানেই সে যায়, লোকে তার পিছু নেয়, অথবা তাকে খুঁজে বের করে; একটু নিরিবিলিতে পেলেই উনিশ জনের যে কোন একজন তার কাছে হাজির হয়ে গোপনে তার হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "শুক্রবার সন্ধ্যায় টাউন-হলে খুলবেন," আর তারপরেই দোষী মানুষের মত হাওয়া হয়ে যায়। সে ভেবেছিল ঐ বস্তার একজন দাবীদার হয় তো পাওয়া যাবে-যদিও গুডসন-এর মৃত্যুর ফলে সে বিষয়েও তার সন্দেহ ছিল-কিন্তু এতগুলো দাবীদার যে থাকতে পারে এটা সে ভাবতেই পারে নি। অবশেষে মহান শুক্রবার এসে পড়লে সে দেখল, উনিশটা খাম তার হাতে এসে জমেছে।

৩

আগে কখনও টাউন-হলকে এত ভাল করে সাজানো হয় নি। হলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত মঞ্চের পিছন দিকটা পতাকা নিয়ে আগাগোড়া চমৎকারভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে; দেওয়াল জুড়ে ফাঁকে ফাঁকেই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পতাকার মালা; গ্যালারির সামনেটা পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে; প্রতিটি খাম পতাকা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। টাউন-হল লোক সমাগমে পরিপূর্ণ। ৪১২টি স্থায়ী আসন ছাড়াও ৬৮টি বাড়তি আসন দেওয়া হয়েছে। সব পূর্ণ। মঞ্চের সিঁড়িতেও লোক বসেছে; কিছু বিশিষ্ট অভ্যাগতকে মঞ্চের উপরেই স্থান দেওয়া হয়েছে; মঞ্চের সম্মুখভাগে অবস্থিত অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলকে ঘিরে বসেছে দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত বিশেষ সংবাদদাতার দল।

সোনার বস্তাটাকে মঞ্চের সামনে একটা ছোট টেবিলের উপর এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে সমবেত সকলেই সেটা দেখতে পায়। হলের অধিকাংশ লোকই সেটার দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত আগ্রহে, মুখে জল আসা আগ্রহে, সকরুণ তৃষ্ণার্ত আগ্রহে; উনিশটি দম্পতি সেটাকে দেখছে ভালবাসায় ভরা মালিকানার দৃষ্টিতে, আর তাদের পুরুষ সঙ্গীরা মনে মনে সেই বক্তৃতাটির মহলা দিয়ে চলেছে যেটা তাদের একটু পরেই দিতে হবে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের সমর্থন ও অভিনন্দনের উত্তরে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য। মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে কেউ না কেউ পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে লুকিয়ে সেটা দেখে নিয়ে স্মৃতিকে একটু ঝালিয়ে নিচ্ছে।

সারা হলে মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ-এ রকমটাই হয়ে থাকে। কিন্তু অবশেষে রেভাঃ মিঃ বার্জেস যখন উঠে এসে বস্তাটার উপর হাত রাখল, অমনিই সব চুপ হয়ে গেল। বস্তাটির আশ্চর্য ইতিহাস বিবৃত করে সে উল্লেখ করে চলল অকলংক সততার জন্য হ্যাড্‌লিবুর্গ-এর প্রাচীন ও সু-অর্জিত সুখ্যাতির কথা, আর সেই সুখ্যাতির জন্য শহরের সঙ্গত গর্বের কথা। সে বলতে লাগল, এই খ্যাতি একটি অমূল্য সম্পদ; ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার মূল্য আজ অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ সাম্প্রতিক এই ঘটনার ফলে এই খ্যাতি বহু দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, গোটা মার্কিন মুলুকের দৃষ্টি পড়েছে এই গ্রামের উপর, আর তারা আশা ও বিশ্বাস মতে হ্যাড্‌লিবুর্গের নাম চিরদিনের মত ব্যবসায়িক মদূষণীয় চরিত্রের সমার্থবাচক হয়ে বেঁচে থাকবে। [সোল্লাস সমর্থন] "আর এই মহান সম্পদের অভিভাবক হবে কে-গোটা সমাজ কি? না! সে দায়িত্ব ব্যক্তিগত, সামাজিক নয়। আজ থেকে আপনারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে এর একজন বিশেষ অভিভাবক; এর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য আপনারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। এই গুরু দায়িত্ব আপনারা-প্রত্যেকেই গ্রহণ করছেন তো? [সরব সম্মতি] তাহলে তো সবই ঠিক আছে। এই দায়িত্বের ভার আপনাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের দিয়ে যাবেন। আজ আপনাদের সমাজে এমন একটি প্রাণীও নেই যে নিজের নয় এমন একটি কপর্দককেও লোভের বশে স্পর্শ করবে-দেখবেন এই গুণ যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। ["রাখব! আমরা রাখব!"] অন্য সমাজের সঙ্গে আমাদের তুলনা করবার স্থান এটা নয়-তাদের কেউ কেউ আমাদের প্রতি বিরূপ; তারা তাদের পথে চলুক, আমরা চলি আমাদের পথে; তাতেই আমরা তুষ্ট। [সমর্থন] আমার কথা শেষ হল। বন্ধুগণ, আমার হাতের নীচে রয়েছে এমন একটা বস্তু যেটা আমাদের সততা সম্পর্কে একটি অপরিচিত মানুষের সরব স্বীকৃতি; তার হাত দিয়েই জগৎ আজ আমাদের স্বরূপ জানতে পারবে। তার পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু আপনাদের নামে আমি তার প্রতি আপনাদেরই কৃতজ্ঞতার বাণী উচ্চারণ করছি, আর অনুরোধ করছি, আপনারাও এক কণ্ঠে তাকে সমর্থ করুন।"

সকলেই উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ এক মিনিট ধরে তাদের কৃতজ্ঞতার বজ্রগর্জনে ঘরের দেয়াল অবধি কেঁপে উঠল। তারপর সকলে আসন

গ্রহণ করলে মিঃ বার্জেস পকেট থেকে একটা খাম বের করল। ধীরে ধীরে জোর গলায় সে চিঠির বক্তব্যটা পড়তে লাগল-শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই যাদু-দলিলের কথাগুলি শুনতে লাগল-তার প্রতিটি শব্দ যেন এক একটি সোনার পিণ্ড:

"বিপন্ন আগন্তুকের প্রতি যে মন্তব্য আমি করেছিলাম সেটা এই:

'আপনি খুব খারাপ লোক হতে পারেনন না: যান, সকলকে সংশোধন করুন।"

তারপর সে আবার পড়তে শুরু করল:

"এই মুহূর্তেই আমরা জানতে পারব এই মন্তব্যটি বস্তার ভিতরে লুকিয়ে রাখা মন্তব্যের সঙ্গে মেলে কি না,-আর তা যদি মেলে-নিঃসন্দেহে মিলবে-তাহলেই এমন একজন সৎ-নাগরিক এই সোনার বস্তার মালিক হবেন যিনি আজ হতে জাতির সম্মুখে সততার মূর্ত প্রতীক হিসাবে দেখা দেবেন-মিঃ বিল্‌সন!"

সমবেত শ্রোতারা একটা সোচ্চার সমর্থন জানাবার জন্য অনেকক্ষণ থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল; কিন্তু তার বদলে তারা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল; দু'-এক মিনিট গভীর নিস্তব্ধতার পরে শুধু শোনা গেল অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি।

এমন সময় আর এক অবাক কাণ্ড! হলের এক কোণে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ডিয়েকন বিল্‌সন, আর অপর কোণে সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে উকিল উইল্‌সন।

সকলেই বিভ্রান্ত; ঊনিশটি দম্পতি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ।

বিল্‌সন ও উইল্‌সন পরস্পরের দিকে তাকাল। বিল্‌সন তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল, "আপনি দাঁড়ালেন কেন মিঃ উইল্‌সন?

"যেহেতু দাঁড়াবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু আপনি কেন দাঁড়ালেন, আশা করি ভাল মানুষের মত সে কথাটা সকলকে বুঝিয়ে বলবেন?"

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। যেহেতু ওই কাগজটা আমিই লিখেছিলাম।"

"নির্লজ্জ মিথ্যা কথা! ওটা আমি নিজে লিখেছি।"

এবার বার্জেস-এর বিভ্রান্ত হবার পালা। অর্থহীন দৃষ্টিতে সে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল; কি যে করবে বুঝেই উঠতে পারছে না। গোটা হল হতবাক। উকিল উইল্‌সন বলল:

"ঐ কাগজে যে নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে সেটা পড়তে আমি সভাপতিকে অনুরোধ করছি।"

এতক্ষণে সভাপতি আত্মস্থ হল, নামটা পড়ে দিল:

"জন হোয়ার্টন বিল্‌সন।"

"হল তো!" বিল্‌সন চেঁচিয়ে বলল। "এবার নিজের পক্ষে কি বলবেন? আর এখানে যে জোচ্চুরির অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন তার জন্য আমার কাছে এবং অপমানিত সমবেত সকলের কাছে কী ধরনের ক্ষমা চাইবেন বলুন?"

ক্ষমা চাইবার কোন প্রশ্নই ওঠে না; উপরন্তু আমি প্রকাশ্যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি, মিঃ বার্জেস-এ কাছ থেকে আমার চিঠি চুরি করে এনে তারই একটি অনুলিপিতে নিজের নাম সই করে আপনি তাকে পাঠিয়েছেন। অন্য কোন ভাবে ঐ মন্তব্য আপনার হাতে আসতে পারে না। জীবিত লোকদের মধ্যে একমাত্র আমিই এই চিঠির বয়ান জানতাম।"

এ ভাবে চলতে থাকলে নিশ্চয়ই একটা কেলেংকারির সৃষ্টি হত; সকলেই সখেদে লক্ষ্য করল, সংক্ষেপ-লিপিকাররা পাগলের মত

লিখে যাচ্ছে। অনেকে চীৎকার করে বলে উঠল: "সভাপতি! শান্তি! শান্তি!"

মিঃ বার্জেস হাতুড়ি পিটিয়ে বলল:

"যথাযথ সৌজন্য যেন আমরা ভুলে না যাই। বোঝাই যাচ্ছে, কোন জায়গায় একটা ভুল হয়েছে; নিশ্চয়ই তার বেশী কিছু নয়। মিঃ উইল্‌সন যদি আমাকে একটা খাম দিয়ে থাকেন-এখন মনে পড়ছে তিনি দিয়েছিলেন-তো সেটা আমার কাছেই আছে।"

পকেট থেকে একটা খাম বের করে সেটা খুলে চোখ বুলিয়ে সে বিস্মিত ও বিব্রতভাবে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সকলে বলে উঠল: "পড়ুন! পড়ুন! ওতে কি লেখা আছে?"

যেন ঘুমের ঘোরে বিমূঢ়ভাবে সে পড়তে লাগল:

"দুঃখী আগন্তুকের প্রতি আমি যে মন্তব্য করেছিলাম সেটা এই: আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না। [গোটা হল অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল] যান, সকলকে সংশোধন করুন।"

[গুঞ্জন: অবাক কাণ্ড! এর অর্থ কি?] সভাপতি বলল, "এটাতে সই রয়েছে থার্লো জি উইল্‌সন।"

উইলস্‌ন বলল, "ব্যাস! আমি তো মনে করি সব মিটে গেল! আমি জানতাম, আমার চিঠিটা চুরি হয়েছিল।"

বিল্‌সন পাল্টা আক্রমণ করল, "চুরি! আপনাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আপনার বা আপনার জ্ঞাতি-গুষ্টির কারও এত সাহস নেই-"

সভাপতি: "শান্তি! শান্তি! দয়া করে আপনারা দু'জনেই বসে পড়ুন।"

মাথা নেড়ে সক্রোধে আপত্তি জানিয়ে তারা বসে পড়ল। সভাস্থ সকলেই অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল; কেউ বুঝতে পারছে না, এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কি করা হবে। ইতিমধ্যে টম্পসন উঠে দাঁড়াল। টম্পসন জুতো তৈরি করে। উনিশ জনের একজন হবার বাসনা তার ছিল; কিন্তু হতে পারে নি; ওই পদের অধিকারী হবার মত যথেষ্ট টুপির মালিক সে ছিল না। সে বলল:

"সভাপতি মশাই, আমাকে যদি একটা পরামর্শ দেবার অনুমতি দেন তো বলি, এটা কি হতে পারে যে এরা দু'জনেই ঠিক বলছেন? আপনিই বিচার করে দেখুন স্যার, ঘটনাক্রমে দু'জনেই ঠিক বলছেন? আপনিই বিচার করে দেখুন স্যার, ঘটনাক্রমে দু'জনেই কি আগন্তুককে একই কথা বলতে পারে না? আমার তো মনে হয়-"

মুচি উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিল। সেও মনে মনে ক্ষুব্ধ; সেও নিজেকে উনিশ জনের একজন হবার উপযুক্ত বলে ভাবে; কিন্তু তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। সে বলল: "সেটা তো কথা নয়! একশ' বছরে দু'বার হয় তো সে রকমটা ঘটতে পারে-কিন্তু অন্য দিকটা তো তা নয়। তারা কেউই তো কুড়ি ডলার দেন নি!"

[সমর্থনের ঢেউ বয়ে গেল।]

বিল্‌সন: "আমি দিয়েছি।"

উইল্‌সন: "আমি দিয়েছি।"

তখন একজন আরেক জনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুলল।

সভাপতি: "শান্তি! দয়া করে দু'জনেই বসে পড়ুন। কোন চিরকুটই কোন সময় আমার হাতছাড়া হয় নি"

কে যেন বলল: "ভাল-তবে তো মিটেই গেল।"

মুচি: "সভাপতি মশাই, একটা কথা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে: এই দু'জনের একজন নির্ঘাৎ অপর জনের বিছানার নীচে ঘাপটি মেরে থেকে পারিবারিক গোপন কথা শুনে নিয়েছে। কথাটা যদি পার্লামেন্টারী রীতি বিরোধী না হয় তো বলি দু'জনেই এ কাজ করে থাকতে পারেন। [সভাপতি: "শান্তি! শান্তি!"] আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়ে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, মন্তব্যের ব্যাপারটাকে একজন যখন তার স্ত্রীকে বলছিলেন তখন যদি অপর জন লুকিয়ে সেটা শুনে থাকেন তো তাকে বের করতে হবে।"

একটি কণ্ঠস্বর: "কেমন করে?"

মুচি: "সহজেই। মন্তব্যটাকে দু'জন হুবহু একই ভাষায় উদ্ধৃত করেন নি।"

একটি কণ্ঠস্বর: "তফাৎটা কোথায় আছে বলুন।"

মুচি: "বিল্সনের চিঠিতে 'খুব' কথাটা আছে, অন্য চিঠিটাতে নেই।"

অনেক কণ্ঠ: "ঠিক কথা-উনি ঠিক বলেছেন!"

মুচি: "কাজেই সভাপতি মশাই যদি বস্তার ভিতরকার মূল মন্তব্যটা পরীক্ষা করে দেখেন তাহলেই আমরা বুঝতে পারব এই দুই জোচ্চোরেরে-[সভাপতি: "শান্তি!"] এই দুই অতিলোভী দুঃসাহসিকের-[সভাপতি: "শান্তি! শান্তি!"] এই দুই ভদ্রলোকের-[হাসি ও সমর্থন] মধ্যে কোন্টি এই শহরের প্রথম অসৎ পাষণ্ড যে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করে একেই কলংকিত করেছে এবং এখন থেকে যার পক্ষে এখানে বাস করা শক্ত হয়ে উঠবে!" [প্রচণ্ড উল্লাস।]

অনেক কণ্ঠ: "খুলে ফেলুন!-বস্তাটা খুলে ফেলুন!"

মিঃ বার্জেস বস্তার গায়ে একটা ফাঁস সৃষ্টি করে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা খাম বের করে আনল। তার মধ্যে ছিল কয়েকটি ভাঁজ-করা চিরকুট। সে বলল:

"এর মধ্যে একটায় লেখা, 'সভাপতির (যদি কেউ থাকেন) কাছে লেখা সব চিঠিপত্র পড়া সেষ হবার আগে এটা পরীক্ষা করা চলবে না।' অপরটিতে লেখা, 'পরীক্ষা'। আপনারা অনুমতি করুন। এতে লেখা আছে:

"আমার উপকারীরা যে মন্তব্য করেছিলেন তার প্রথম অর্ধংশের যথাযথ উদ্ধৃতির কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ সেটুকু উল্লেখযোগ্য নয় এবং ভুলে গেলেও চলে; কিন্তু তার শেষের পনেরোটি শব্দ খুবই উল্লেখযোগ্য এবং সহজেই মনে রাখবার মত; সেই শব্দগুলি যদি সঠিকভাবে উল্লেখভাবে উল্লেখিত না হয় তাহলে প্রার্থীকে জোচ্চোর মনে করা যেতে পারে। আমার উপকারী গোড়াতেই বলেছিলেন যে তিনি সাধারণত কাউকে পরামর্শ দেন না, কিন্তু যদি কখনও দেন তাহলে সেটা খুবই উঁচু দরের হয়ে থাকে। তারপরেই তিনি এই কথাগুলি বললেন-কথাগুলি কখনই আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি: "আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না-"

পঞ্চাশটি কণ্ঠস্বর: "তাহলে তো মিটেই গেল-উইল্সন! উইল্সন! উইল্সন! বক্তৃতা! বক্তৃতা!"

সকলে লাফিয়ে উঠে উইল্সনকে ঘিরে ধরল, তার হাত চেপে ধরে অতি-উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দন জানাল-আর এদিকে সভাপতি হাতুড়ি ঠুকে চীৎকার করতে লাগল:

"শান্তি, ভদ্রজনেরা, শান্তি! শান্তি! চিঠিটা শেষ করতে দিন।"

সকলে শান্ত হলে আবার চিঠি পড়া শুরু হল:

"যান, সকলকে সংশোধন করুন-অন্যথায়, আমায় কথাগুলি লক্ষ্য করুন-আপনার পাপের জন্য যে কেন দিন আপনার মৃত্যু ঘটবে এবং নরকে অথবা হ্যাড্লিবুর্গ-এ যাবেন-প্রথমটায় যেতেই চেষ্টা করুন।"

একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এল। প্রথমে নাগরিকদের মুখের উপর নেমে এল। প্রথমে নাগরিকদের মুখের উপর নেমে এল ক্রোধের একটা ঘন কালো মেঘ; একটু পরে মেঘটা সরে যেতে লাগল; দেখা দিল একটা হাল্কা হাসির আভাষ; অনেক কষ্টে সকলে সেটাকে চেপে রাখল; প্রতিবেদকরা, ব্রিক্সটনবাসীরা, ও অন্য আগুন্তকরা মাথা নীচু করে দুই হাতে মুখ ঢেকে আপ্রাণ চেষ্টায় ও প্রচণ্ড সৌজন্যবোধে সে হাসিকে চেপে রাখল। তারপর সকলেই উঠে দাঁড়াল-স্বদেশী ও বিদেশী সকলেই। এমন কি মিঃ বার্জেসের গাম্ভীর্যও খসে পড়ল, আর তখনই সমবেত সকলে বুঝল যে সংযমের সরকারী দায় শেষ হয়েছে। আর যায় কোথায়! সে এক দীর্ঘ সময়ব্যাপী হাসি, ঝড়ের গতিতে বয়ে যাওয়া প্রাণ-খোলা হাসি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হাসিও থামল; সকলে চোখ-মুখ মুছে সোজা হয়ে বসল; মিঃ বার্জেসও মুখ খুলতে চেষ্টা করল; তখনই আবার হাসির বাঁধ ভাঙল; তারপর আবার; শেষ পর্যন্ত বার্জেস কোন রকমে এই কথাগুলি বলতে পারল:

"ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই-আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি। আপনাদের শহরের সম্মান এর সঙ্গে জড়িত, এতে শহরের সুনামের মূলে আঘাত করা হয়েছে। মিঃউইল্সন ও মিঃ বিল্সন যে দুটি মন্তব্য পেশ করেছেন তাদের মধ্যে যে একটি শব্দের ফারাক ঘটেছে সেটাই তো যথেষ্ট গুরুতর, কারণ তা থেকে বোঝা যাচ্ছে এই দুটি ভদ্রলোকের যে কোন একজন চুরি করেছেন-"

বিধ্বস্ত, বিকলাঙ্গপ্রায়ভাবে দু'জন বসে ছিল; কিন্তু এই কথা শুনেই তারা বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল-

"বসুন!" সভাপতি কঠোর কণ্ঠে বলল। আর তারাও সে আদেশ মানল।

"আগেই বলেছি, সেটাই যথেষ্ট গুরুতর। তবে তাদের যে কোন একজনের পক্ষে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে, কারণ এখন দু'জনের সম্মানই ভীষণভাবে বিপন্ন। আরও একটু এগিয়ে আমি কি বলব-সে বিপদ থেকে তাদের আর উদ্ধার নেই।? দু'জনেই সেই মোক্ষম পনেরোটি কথাকে বাদ দিয়েছেন।" মিঃ বার্জেস থামল। সেই ফাঁকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত স্তব্ধতা আরও ঘন হলে, আরও গভীর হলে সে আবার মুখ খুলল: "মাত্র একটি পথেই এটা ঘটতে পারে। তাই এই ভদ্রলোকদের আমি জিজ্ঞাসা করি-দু'জনের মধ্যে কি কোন যোগসাজস ছিল??-ছিল কোন চুক্তি??"

একটা মৃদু গুঞ্জন সমস্ত ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল; আর অর্থ: "এবার দু'জনকেই বাগে পেয়েছেন।"

বিল্সন কোন আকস্মিক পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয়; সে নিরাশায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু উইল্সন উকিল মানুষ। চিন্তিত বিবর্ণ মুখে সে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। বলল:

"এই বেদনাদায়ক ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলবার আগে আমি আপনাদের সকলের কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যে কথা বলতে যাচ্ছি সেজন্য আমি দুঃখিত, কারণ তার ফলে মিঃ বিল্সনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আজ পর্যন্ত তাকে আমি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করে এসেছি, আর আপনাদের সকলের মতই আমিও বিশ্বাস করতাম যে সব রকম প্রলোভনের তিনি উর্ধ্বে। কিন্তু নিজের সম্মান রক্ষার জন্য অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে এ কথা বলতে আমি বাধ্য-সেজন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি-যে মূল মন্তব্যের শেষ পনেরোটি মানহারিকর শব্দ সহ সবগুলি কথাই আমি সেই সর্বস্বান্ত আগন্তুককে বলেছিলাম। [চাঞ্চল্য] সাম্প্রতিক ঘোষণাটি প্রকাশিত হতেই কথাগুলি আমার মনে পড়ে যায় আর আমিও স্বর্ণমুদ্রাভর্তি বস্তাটা দাবী করব বলে স্থির করি, কারণ সব দিক থেকেই সেটা পাবার অধিকার আমার ছিল। এবার আপনাদের আমি একটি কথা ভাল করে বিচার বিবেচনা করে দেখতে বলব: সে রাতে সেই আগন্তুকের আমার প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না; সে নিজেই বলেছিল যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা যে খুঁজে পাচ্ছে না এবং কখনও ক্ষমতায় কুলোলে সে-ঋণ সে হাজার গুণ করে ফিরিয়ে দেবে। এবার আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি: আমি আশা করিতে পারি-বিশ্বাস করতে পারি-এমন কি দূরতম কল্পনায়ও আনতে পারি-যে এই মনোভাবের পরেও তার পরীক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এই পনেরোটি শব্দ জুড়ে দেবার মত অকৃতজ্ঞ সে হতে পারে?-আমার জন্য এমন একটা ফাঁদ সে পাততে পারে?-একটি প্রকাশ্য সভায় আমারই আপনার জনদের সম্মুখে আমাকে আমার শহরের কুৎসাপ্রচারকারীরূপে প্রচার করতে পারে? এটা তো অস্বাভাবিক, অসম্ভব। তার পরীক্ষায় থাকা উচিত ছিল শুধু আমার মন্তব্যের গোড়ার দিকটা। সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের ছায়ামাত্র ছিল না। আপনারাও এ অবস্থায় আমার মতই ভাবতেন। যাকে আপনারা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, যার প্রতি কোন অন্যায় আপনারা করেন নি তার কাছ থেকে এই হীন বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই আপনারা আশা করতেন না। আর সরল বিশ্বাসে,

পরিপূর্ণ আস্থায় একটু করো কাগজ শুধু গোড়ার দিককার কথাগুলি লিখেই 'যাও, সকলকে সংশোধন কর' দিয়ে শেষ করে দিয়েছিলাম। চিঠিটা খামে ভরতে যাব এমন সময় পিছনের আপিস থেকে ডাক আসায় কোন কিছু না ভেবেই কাগজটাকে ডেস্কের উপর রেখে চলে গিয়েছিলাম।" সে থামল, ধীরে ধীরে বিল্‌সনের দিকে মাথাটা ঘোরাল, একটু অপেক্ষা করল, তারপর বলতে লাগল: "এই কথাটা টুকে নিন: একটু পরে যখন ফিরে এলাম তখন মিঃ বিল্‌সন আমার ঘরের রাস্তায় দিককার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।"

[চাঞ্চল্য]

মুহূর্তের মধ্যে বিল্‌সন উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল:

"মিথ্যে কথা! জঘন্য মিথ্যে!"

সভাপতি: "আপনি বসুন স্যার! এখন মিঃ উইল্‌সনের বলার পালা।"

বিল্‌সনের বন্ধুরা তাকে টেনে বসিয়ে শান্ত থাকতে বলল। উইল্‌সন বলতে লাগল:

"ঘটনাগুলি খুবই সরল। আমি যেখানে চিঠিটা রেখে গিয়েছিলাম তখন আর সেটা সেখানে ছিল না, টেবিলের উপরেই অন্য জায়গায় ছিল। সেটা আমার নজরে এলেও তখন কোন গুরুত্ব দেই নি; ভেবেছিলাম হাওয়ায় উড়ে গেছে। মিঃ বিল্‌সন যে একটা গোপন চিঠি পড়তে পারেন সেটা আমার মাথায়ই আসে নি; তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি; তাঁর তো এ সবের ঊর্ধ্বে থাকবারই কথা। যদি অনুমতি করেন তো বলি, তাঁর ঐ বাড়তি 'খুব' কথাটারও একটা ব্যাখ্যা আছে; ওটা স্মৃতিশক্তির ত্রুটির ফল। আমার কথা এখানেই শেষ।"

উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতার মত জিনিস পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। উইল্‌সন বিজয়গৌরবে আসন গ্রহণ করল। সোচ্চার সমর্থনের বন্যায় শ্রোতৃবর্গ তাকে ভাসিয়ে দিল; বন্ধুরা এসে ভিড় করে হাত চেপে ধরে তাকে অভিনন্দন জানাল; আর তাদের চীৎকার চেঁচামেচিতে বিল্‌সন একটা কথাও বলতে পারল না। সভাপতি হাতুড়ির পর হাতুড়ি পিটতে লাগল; বারবার চীৎকার করে বলল:

"ভদ্রজনেরা, আমাদের কাজ চালাতে দিন, আমাদের কাজ চালাতে দিন।"

অবশেষে পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলে টুপিওলা বলল:

"টাকাটা দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি কাজ বাকি আছে স্যার?"

অনেক কণ্ঠ:"ঠিক! ঠিক! এগিয়ে এস উইল্‌সন!"

টুপিওলা: "মিঃ উইল্‌সনের জন্য আমি তিনবার জয়ধ্বনি করছি; তিনি সেই বিশেষ গুণের প্রতীক যা-"

তার কথা শেষ হবার আগেই সকলে জয়ধ্বনি করে উঠল; সেই সঙ্গে বারবার শোনা যেতে লাগল হাতুড়ির কর্কশ শব্দ; আর তারই মধ্যে কিছু উৎসাহী ভক্ত উইল্‌সনকে জনৈক বৃষস্কন্ধ বন্ধুর ঘাড়ে চড়িয়ে সগৌরবে মঞ্চের দিকে নিয়ে চলল। এদিকে সেই সব হট্টগোলকে ছাপিয়ে শোনা গেল সভাপতির কণ্ঠস্বর:

"শান্তি! যার যার জায়গায় চলে যান! আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে এই দলিলটি পড়া এখনও শেষ হয় নি।" সকলে শান্ত হলে সে দলিলটা হাতে তুলে নিল; পড়তে গিয়েও সেটাকে নামিয়ে রেখে বলল, "আমি ভুলে গিয়েছিলাম; যে সব চিঠিপত্র আমি পেয়েছি সেগুলো সব পড়া শেষ না করে তো এটা পড়া চলবে না।" পকেট থেকে একটা খাম বের করে তার ভিতর থেকে চিঠিটা হাতে নিয়ে সেটার উপর চোখ বুলিয়ে নিল-তাকে বিস্মিত বোধ হল-সামনে তুলে ধরে চিঠিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

বিশ-ত্রিশটি কণ্ঠস্বর চীৎকার করে বলল:

"ওটা কি? পড়ুন! পড়ুন!"

ধীরে ধীরে বিস্মিত গলায় সে পড়তে লাগল:

আগন্তুকের প্রতি যে মন্তব্য আমি করেছিলাম-[অনেক কন্ঠ: "ওহে! এটা আবার কি?"]-সেটা এই: আপনি খারাপ মানুষ হতে পারেন না," [অনেক কন্ঠ? "মহান স্কট!"] "যান, সকলকে সংশোধন করুন। স্বাক্ষর করেছেন ব্যাংকার পিংকার্টন।"

এবার ফূর্তি চরমে উঠে এমন হৈ-হট্টগোল শুরু হল যে বিবেচনাশীল লোকদের কান্না পেয়ে গেল। গোঁফে তা দেবার বয়স যাদের হয় নি তারা হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল; হাসির দমকে প্রতিবেদকরা এমন সব হিজিবিজি লিখতে লাগল কোন দিন যার পাঠোদ্ধার করা যাবে না; একটা ঘুমন্ত কুকুর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভ্যাবাচেকা খেয়ে ঘেউ-ঘেউ শুরু করে দিল। গোলমালের মধ্যে নানা রকম কথা শোনা যেতে লাগল: "আমরা তো ধনী হতে চলেছি-অদূষণীয় চরিত্রের দুটি প্রতীক!-বিল্‌সনকে না ধরেই!" তিন!-শ্যাডবেলিকের ধরা হোক!-কত বেশী আর ধরা যায়!" "ঠিক আছে-বিল্‌সন নির্বাচিত!" "হায় বেচারি উইল্‌সন-দুই চোরের শিকার!"

একটি জোরালো কন্ঠ: "চুপ করুন! সভাপতি পকেট থেকে আরও মাল বের করছেন।"

অনেক কন্ঠ: "হুর্‌রে! নতুন কিছু কি? পড়ুন! পড়ুন! পড়ুন!"

সভাপতি [পড়তে লাগল]: 'যে মন্তব্য আমি' ইত্যাদি; 'আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না; যান' ইত্যাদি। স্বাক্ষর, গ্রেগরি ইয়েট্‌স্।"

কন্ঠস্বরের ঝড় বেয়ে গেল: "চারটি প্রতীক!" হুররে ইয়েট্‌স!" "আরও কি মাল আছে বের করুন!"

সারা হল হাসি-ঠাট্টায় ফেটে পড়তে লাগল। শুধু মজা আর মজা। উনিশ জনের কয়েকজন গুটি গুটি দরজার দিকে পা বাড়াতে বহু কন্ঠের ধ্বনি উঠল:

"দরজা, দরজা-সব দরজা বন্ধ করে দাও; অদূষণীয় চরিত্রবানদের কেউ এ স্থান ত্যাগ করতে পারবে না! সকলে বসে পড়ুন!"

সে আদেশ সকলে মাথা পেতে নিল।

"আরও মাল বের করুন! পড়ুন! পড়ুন!"

সভাপতি আবার চিঠি বের করল; তার ঠোঁট থেকে সেই পরিচিত কথাগুলিই ঝরে পড়ল-"আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না।"

"নাম! নাম! নামটা কি?"

"এল, ইন্‌গোল্ড স্‌বি সার্জেন্ট।"

"পাঁচ জন নির্বাচিত! প্রতীক বাড়ছে! বলে যান, বলে যান!"

"আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না-"

"নাম! নাম!"

"নিকোলাস হুইট ওয়ার্থ।"

"হুর্‌রে! হুর্‌রে! আজ তো প্রতীক-দিবস!"

একদল লোক হা-হা করে "মিকাডো"র সুরে গান জুড়ে দিল-"পুরুষ যখন ভয়ে ভীত, সুন্দরী তখন-"

এবার ডজনখানেক লোক উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাল। তারা বলল, এই প্রহসন নিশ্চয় কোন দল-ছুট জোকারের কাণ্ড; এটা সমগ্র

সমাজের প্রতি অপমানস্বরূপ। কোন সন্দেহ নেই যে এই স্বাক্ষরগুলি সবই জাল-

"বসে পড়ুন! বসে পড়ুন! মুখ বন্ধ করুন! এ তো আপনাদেরই স্বীকারোক্তি। আপনাদের নামও এর মধ্যেই পাওয়া যাবে।"

"সভাপতি মশাই, এ রকম কতগুলি খাম আপনার কাছে আছে?"

"সব নিয়ে উনিশখানা।"

ঠাট্টা-বিদ্রূপের ঝড় উঠল।

"সবগুলিতেই গোপন কথাগুলি নিশ্চয় আছে। আমি প্রস্তাব করছি, আপনি সবগুলি খুলে ফেলুন আর স্বাক্ষরগুলো পড়ে দিন-চিরকুটের প্রথম আটটি শব্দও পড়বেন।"

"আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।"

প্রচণ্ড হৈ-হল্লার মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হল। বেচারি বৃদ্ধ রিচার্ডস্ উঠে দাঁড়াল তার পাশে। পাছে কেউ দেখে ফেলে যে সে কাঁদছে তাই সে মাথাটা নীচু করে রেখেছে। স্বামী হাতটা বাড়িয়ে তাকে ধরে কাঁপা গলায় বলতে লাগল:

"বন্ধুগণ, আমাদের দু'জনকে-মেরি ও আমাকে-আপনারা আজীবন দেখে আসছেন। আমার ধারণা আপনারা আমাদের পছন্দ করেন, শ্রদ্ধা করেন-"

সভাপতি বাধা দিল:

"আমাকে বলতে দিন। আপনি যে বলছেন সেটা খুবই সত্যি মিঃ রিচার্ডস্: এই শহর আপনাদের দু'জনকে চেনে; আপনাদের পছন্দ করে; আপনাদের শ্রদ্ধা করে; আরও-আপনাদের সম্মান করে, ভালবাসে-"

হ্যালিডে-র গলা শোনা গেল:

"এটা তো স্বীকৃত সত্য! সভাপতি যদি সত্য কথা বলে থাকেন আপনারা সকলে সে কথা বলুন। উঠে দাঁড়ান; বলুন-হিপ! হিপ! হিপ! -সকলে একসঙ্গে!"

সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সাগ্রহে বৃদ্ধ দম্পতির দিকে তাকাল। তুষার-পাতের মত রুমাল নেড়ে ঘরের বাতাস ভরে তুলল, আর সহৃদয় কণ্ঠে তাদের জয়ধ্বনি করে উঠল।

সভাপতি বলতে শুরু করল:

"আমি যা বলছিলাম: আপনাদের সৎ অন্তরের কথা আমরা জানি মিঃ রিচার্ডস্, কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবার সময় তো এটা নয়। [সকলের চীৎকার-"ঠিক! ঠিক!"] আপনাদের মুখেই আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি তো আপনাকে এই লোকগুলির পক্ষ সমর্থনের অনুমতি দিতে পারি না-"

"কিন্তু আমি বলছিলাম-"

"দয়া করে বলুন মিঃ রিচার্ডস্। বাকি চিঠিগুলোও খুলে দেখতেই হবে-যাদের চিঠি ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে তাদের প্রতি ন্যায়-বিচারের খাতিরেই এটা করা দরকার। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এ কাজটা শেষ হলেই আপনার কথা আমরা শুনব।"

অনেক কণ্ঠ: "ঠিক! সভাপতি ঠিকই বলেছেন-এ অবস্থায় কোন রকম বাধা দেওয়া চলবে না! শুরু করুন-নাম! নাম! প্রস্তাবে তাই ছিল!"

বৃদ্ধ দম্পতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল। স্বামী স্ত্রীর কানে কানে বলল, "এখানে বসে থাকা বড়ই বেদনাদায়ক; ওরা যখন জানবে যে আমরা নিজেদের জন্যই কিছু বলতে চেয়েছিলাম সেটা যে আরও লজ্জাকর ব্যাপার হবে।"

নামগুলো যেমন পড়া হতে লাগল, ফূর্তির উচ্ছ্বাসও ততই বাঁধনহারা হয়ে উঠল।

'আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না'-স্বাক্ষর, রবার্ট জে. টিট্মার্শ।

'আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না'-স্বাক্ষর, এলিফ্যালেট উইক্স্।

'আপনি খারাপ লোক হতে পারেন না'-স্বাক্ষর, অস্কার বি. ওয়াইল্ডার।

ঠিক এই সময় একটা নতুন মতলব সকলের মাথায় খেলে গেল। সেই আটটি শব্দকে তারা সভাপতির হাত থেকে নিয়ে নিল। সভাপতিও তাতে অখুশি হল না। তারপর থেকে সভাপতি প্রতিটি চিঠি তুলে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, আর সবাই মিলে একসঙ্গে সেই আটটি শব্দকে একটানা সুরের অনেকটা গির্জার মন্ত্র উচ্চারণের মত করে আওড়াতে লাগল-"আপনি খা-রা-প লোক হ-তে পারেন না" ; তারপরেই সভাপতি বলে উঠল, "স্বাক্ষর, আর্চিবল্ড উইল্কক্স। এই ভাবে নামের পর নাম উচ্চারিত হতে লাগল; হতভাগ্য উনিশজন ছাড়া বাকি সকলেই খুসিতে ডগমগ।

তালিকাটি ক্রমেই ছোট হতে লাগল। বেচারি বুড়ো রিচার্ডস্ নামগুলো গুণতে লাগলো; অপেক্ষা করতে লাগলো কখন সেই ক্ষণটি আসবে যখন তাকে ও মেরিকেও উঠে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের পক্ষ সমর্থনের এই কথাগুলি বলতে হবে: "....কারণ আজ পর্যন্ত আমরা কখনও কোন অন্যায় করি নি, কখনও কারও নিন্দাভাজন হই নি। আমরা খুবই গরিব, আমরা বৃদ্ধ, কোন ছেলেপিলে নেই যে আমাদের সাহায্য করবে; তাই আমরা লোভে পড়লাম, আমাদের পতন হল। এই স্বীকারোক্তি করবার জন্যই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, বলতে চেয়েছিলাম যে আমার নামটা যেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা না হয়, কারণ সে অসম্মান আমরা সইতে পারতাম না; কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয় নি। ঠিক হয়েছে; সকলের সঙ্গে কষ্ট পাওয়াই আমাদের উচিত। আমরা খুবই কষ্ট পেয়েছি। এই প্রথম অন্যের মুখ থেকে আমাদের কলঙ্কিত নাম শুনতে হল। দয়া করুন; আমাদের লজ্জাকে যতটা সম্ভব হাল্কা করুন।" এই সময় মেরির ধাক্কায় তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। হলঘরে তখন মন্ত্রের মত উচ্চারিত হচ্ছে, "আপনি খা-রা-প হতে" ইত্যাদি।

মেরি ফিস ফিস করে বলল, "তৈরি হও। এবার তোমার নাম উঠবে। উনি আঠারোটা পড়েছেন।"

মন্ত্র থামল।

চারদিক থেকে প্রশ্নের গোলা ছুটতে লাগল-"তারপর! তারপর! তারপর!"

বার্জেস পকেটে হাত ঢোকাল। বৃদ্ধ দম্পতি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াতে গেল। বার্জেস এক মূহূর্ত ইতস্তত করে বলল:

"দেখছি সবগুলোই পড়া হয়ে গেছে।"

আনন্দে ও বিস্ময়ে মূর্ছাহতের মত বৃদ্ধ দম্পতি আসনে বসে পড়ল; মেরি ফিস্ফিস্ করে বলল:

"ঈশ্বরের করুণায় আমরা বেঁচে গেলাম!-উনি আমাদেরটা হারিয়ে ফেলেছেন-ও রকম একশ'টা বস্তার বদলেও একথা আমি প্রকাশ করব না।"

সমস্ত হল-ঘরটা "মিকাডো" সুরের হাস্যকর অনুকরণে ফেটে পড়ল; মহা উৎসাহে তিনবার ফিরে ফিরে গেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তৃতীয় বারের শেষ লাইনটি উচ্চারণ করল-

"বাজি রেখে বলছি, সততার একটি প্রতীক তবু রইল!"

সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল।

তখন সহিস উইংগেট উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করল, "শহরের পরিচ্ছন্নতম মানুষ, একমাত্র পদস্থ নাগরিক যিনি টাকাটা চুরি করবার চেষ্টা করেন নি-সেই এডোয়ার্ড রিচার্ডস্-এর জয়ধ্বনি করা হোক।"

উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতার সঙ্গে জয়ধ্বনি উচ্চারণের পরে একজন প্রস্তাব করল, রিচার্ডস্‌কেই পবিত্র হ্যাড্‌লিবুর্গ ঐতিহ্যের একমাত্র অভিভাবক ও প্রতীকরূপে নির্বাচিত করা হোক, এবং ব্যঙ্গমুখর জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করবার ক্ষমতা ও অধিকারও তাকে দেওয়া হোক।

প্রস্তাবটি ধ্বনি-ভোটে গৃহীত হল; সকলে আর একবার "মিকাডো" গেয়ে বলল:

"বাজি রেখে বলছি, সততার একটি প্রতীক তবু রইল!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ; তারপর-

একটি কণ্ঠ: "এখন তাহলে বস্তাটা কে পাবে?"

মুচি: [তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে] "খুব সহজ ব্যাপার। আঠারোজন অদূষণীয় চরিত্রের লোকের মধ্যে টাকাটা ভাগ করে দেওয়া হোক। দুর্দশাগ্রস্ত আগন্তুককে তারা প্রত্যেক কুড়ি ডলার করে দিয়েছিলেন-মোটা দাম ৩৬০ ডলার। তারা তো শুধু সেই ধারটাই ফেরৎ চাইছেন-আসল আর সুদ-মোট চল্লিশ হাজার ডলার।"

অনেক কণ্ঠ: [বিদ্রূপ করে] "ঠিক! গরিবকে দয়া করুন-ওদের বসিয়ে রাখবেন না!"

সভাপতি: "শান্তি! এবার আগন্তুকের দলিলের বাকি অংশটা পড়ছি:

'কোন প্রার্থী যদি হাজির না হয় [সমবেত আর্তনাদ] তাহলে আমার ইচ্ছা, আপনি বস্তাটা খুলবেন, টাকাগুলি গুণে আপনার শহরের প্রধান নাগরিকদের হাতে দেবেন, তারা একটা 'ট্রাস্ট' হিসাবে সে টাকা গ্রহণ করবেন ["ওঃ! ওঃ! ওঃ!" চীৎকার] এবং আপনার সমাজের অদূষণীয় সততার যে মহৎ খ্যাতি আছে তার প্রচার ও সুরক্ষার জন্য তারা যে ভাবে ভাল মনে করবেন সেই ভাবেই টাকাটা ব্যয় করবেন, যাতে তাদের নাম ও প্রচেষ্টা সেই খ্যাতিতে নতুন ও সুদূরপ্রসারী প্রভা যোগ করতে পারে।' [বিদ্রূপাত্মক সমর্থনের সোচ্চার ঘোষণা।] এখানেই শেষ বলে মনে হচ্ছে। না-একটু পুনশ্চ আছে:

'পুনশ্চ-হ্যাড্‌লিবুর্গের নাগরিকগণ: পরীক্ষা-ভিত্তিক কোন মন্তব্যই নেই-কেউ তা করে নি। [বিস্ময় ও আনন্দের গুঞ্জন] অনুমতি করেন তো আমার গল্পটা বলি-দু'একটা কথায়ই হয়ে যাবে। কোন এক সময়ে আমি আপনাদের শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম এব অকারণেই একটা গভীর আঘাত পেয়েছিলাম, অথচ সেটা আমার প্রাপ্য ছিল না। অন্য কেউ হলে আপনাদের দু'-একজনকে খুন করেই খুসি হয়ে যেত এবং ভাবত সে যব চুবেবুকে গেল, কিন্তু আমার কাছে সে প্রতিশোধ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য; কারণ মৃত ব্যক্তিকে কোন দুঃখ সইতে হয় না। তাছাড়া, আপনাদের সব্বাইকে তো আমি খুন করতে পারতাম না-এবং আমার যা স্বভাব, তাতেও আমি সন্তুষ্ট হতাম না। আমি চেয়েছিলাম প্রতিটি পুরুষের-প্রতিটি নারীর ক্ষতি করতে-তাদের দেহের বা সম্পত্তির ক্ষতি নয়, চেয়েছিলাম তাদের অহংকারে আঘাত করতে-দুর্বল ও নির্বোধ লোকদের ঐ স্থানটিতেই সহজে আঘাত করা যায়। তাই ছদ্মবেশে ফিরে এসে আপনাদের কব্জা করে ফেললাম। আপনাদের সততার খ্যাতি যেমন প্রাচীন, তেমনই উত্তুঙ্গ, আর স্বভাবতই সে জন্য আপনারা গর্ববোধ করতেন-সেটাই আপনাদের সব সম্পদের সেরা সম্পদ-আপনাদের চোখের মণি। যেই বুঝতে পারলাম যে আপনারা অতি যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের ও সন্তান-সন্ততিদের প্রলোভন থেকে দূরে রেখে চলেন, তখনই বুঝতে পারলাম আমাকে কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে। আরে, আপনারা তো সরল জীব, সব চাইতে দুর্বল হচ্ছে সেই গুণ যা কখনও পরীক্ষার আগুনে পরিশুদ্ধ হয় নি। একটা মতলব ঠাউরে নিয়ে একটা নামে তালিকা জোগাড় করলাম। আমার লক্ষ্যই ছিল অদূষণীয় চরিত্রের হ্যাড্‌লিবুর্গ-এর চরিত্র হনন করা। আমি চেয়েছিলাম, প্রায় অর্ধশত অকলংক চরিত্রের নারী-পুরুষ যারা জীবনে কখনও মিথ্যা বলে নি অথবা একটা পেনিও চুরি করে নি তাদের মিথ্যাবাদী ও চোর বানিয়ে তুলব। আমার ভয় ছিল গুডসনকে। সে হ্যাড্‌লিবুর্গে জন্মে নি, সেখানে লালিত-পালিতও হয় নি।

আমার ভয় ছিল, আপনাদের হাতে আমার চিঠি ধরিয়ে যদি কাজ শুরু করি তাহলে আপনারা হয় তো ভাববেন, "আমাদের মধ্যে গুডসন একমাত্র লোক যে একটা গরিব শয়তানকে কুড়ি ডলার বিলিয়ে দিতে পারে"-আর সে ক্ষেত্রে আপনারা আমার টোপ নাও গিলতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরই গুডসনকে নিলেন; তখনই বুঝলাম, এবার আমি নিরাপদ এবং ফাঁদ পেতে টোপ ফেললাম। যাদের কাছে তথাকথিত পরীক্ষায় গোপন কথাটা ডাকে পাঠালাম তাদের সকলকে হয় তো আটকাতে পারব না, কিন্তু হ্যাড্‌লিবুর্গ-এর চরিত্র যদি ঠিক মত ধরে থাকি তাহলে তাদের অধিকাংশকেই যে ফাঁদে আটকাতে পারব সেটা আমি জানতাম।...আশা করছি, আপনাদের অহংকারকে চিরদিনের মত ধ্বংস করতে পারব এবং হ্যাড্‌লিবুর্গকে দিতে পারব এমন একটা নতুন খ্যাতি যা তার গায়ে লেগে থাকবে এবং দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আমি যদি সফল হয়ে থাকি তো বস্তাটা খুলবেন এবং হ্যাড্‌লিবুর্গ সুখ্যাতি প্রচার ও সুরক্ষা সমিতিকে ডেকে পাঠাবেন।"

বহু কণ্ঠের সাইক্লোন: "খুলুন! ওটা খুলুন! আঠারোজনকে সামনে নিয়ে আসুন! ঐতিহ্য প্রচার সমিতি! অদূষণীয় চরিত্রেরা আগে বড়ো!"

সভাপতি বস্তাটা ছিঁড়ে এক মুঠো চকচকে, চওড়া, হলদে মুদ্রা তুলে নিল; সেগুলোকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল-

"বন্ধুগণ, এগুলো গিল্‌টি-করা সিসের চাক্‌তি মাত্র!"

এ খবর শুনে সকলে মজার হাসিতে ফেটে পড়ল। সে হাসি থামলে মুচি বলে উঠল:

"এ ব্যাপারের আপাত প্রবীণতার অধিকারে মিঃ উইল্‌সনই ঐতিহ্য প্রচার সমিতির সভাপতি। আমি বলি, সহযোগীদের পক্ষ হয়ে তিনি এগিয়ে আসুন এবং ট্রাস্টি হিসাবে এই অর্থ গ্রহণ করুন।"

একশ' কণ্ঠ: "উইল্‌সন! বক্তৃতা! বক্তৃতা!"

উইল্‌সন: [ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে] "আপনাদের অনুমতি নিয়ে, এবং আমার ভাষার জন্য কোন রকম ক্ষমা প্রার্থনা না করেই বলেছি-এ অর্থ চুলোয় যাক!"

একটি কণ্ঠ: "আঃ, কী পাদরি এলো রে!"

একটি কণ্ঠ: "সতেরোটি প্রতীক এখনও বাকি! এগিয়ে আসুন ভদ্রজনরা, আপনাদের দায় গ্রহণ করুন!"

চুপচাপ-কোন সাড়া নেই।

সহিস: "সভাপতিমশাই, অতীত অভিজাতদের মধ্যে একজন পবিত্র মানুষ এখনও আমাদের মধ্যে আছেন; তার টাকার দরকার; তিনি টাকা পাবার যোগ্য। আমি প্রস্তাব করছি, আপনি জ্যাক হ্যালিডেকে নীলামদার নিযুক্ত করুন; সে ওখানে দাঁড়িয়ে গিল্‌টি-করা কুড়ি ডলার মুদ্রাভর্তি বস্তাটা নীলামে তুলুক, এবং তার থেকে যা আদায় হবে সেটা আসল লোককে দেওয়া হোক-দেওয়া হোক সেই লোককে যাকে হ্যাড্‌লিবুর্গ আজও সানন্দে সম্মান করে-সে লোক এডোয়ার্ড রিচার্ডস্‌।"

মহাউৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাব গৃহীত হল। কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে উঠল; সহিস প্রথম ডাক শুরু করল-এক ডলার। ক্রমে উত্তেজনা বাড়তে লাগল; ডাকও চড়তে লাগল-এক থেকে পাঁচ, তারপর দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশ', তারপর-

নীলামের শুরুতেই বিব্রত রিচার্ডস্‌ স্ত্রীর কানে কানে বলল: "মেরি, আমরা কি এটা মেনে নিতে পারি? বুঝতেই তো পারছ, এটা সম্মান-পুরস্কার, চারিত্রিক সততার স্বীকৃতি, আর-আর-আমরা কি এটা মেনে নিতে পারি? আমি কি উঠে দাঁড়িয়ে-ওঃ মেরি, আমাদের কি করা উচিত? তুমি কি মনে কর-[হ্যালিডের গলা: "পনেরো-বস্তার দাম পনেরো!-কুড়ি!-আঃ, কুড়ি-ধন্যবাদ!-ত্রিশ!-আবার ধন্যবাদ! ত্রিশ! ত্রিশ! ত্রিশ!-কেউ কি চল্লিশ বললেন?-হ্যাঁ, চল্লিশ! চালিয়ে যান ভদ্রজনরা, চালিয়ে যান!-পঞ্চাশ! ধন্যবাদ মহৎ রোমক! পঞ্চাশ, পঞ্চাশ, পঞ্চাশ-সত্তর!-নব্বই!-চমৎকার!-একশ'!-ঠিক সময় মত!-একশ' পঞ্চাশ! দুশো!-সাবাস! কি বললেন! দু'-ধন্যবাদ-দু'শ' পঞ্চাশ!-"]

"এ যে আর এক প্রলোভন এডোয়ার্ড-আমার শরীর কাঁপছে-কিন্তু একটা প্রলোভনের হাত থেকে আমরা বেঁচেছি, আর তাতেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত ["ছয় কি শুনলাম? ধন্যবাদ! ছ'শ' পঞ্চাশ, ছ'শ' ও সাত শ'!] তথাপি এডোয়ার্ড, ভেবে দেখ, কেউ যখন সঙ্গে ["আট শ' ডলার! হুররে! ন'তে তুলুন! মিঃ পার্সন্স, আপনি কি বললেন-ধন্যবাদ ন'শ'! আনকোরা নতুন সিসে ভর্তি এই বস্তা যাচ্ছে মাত্র ন'শ' ডলারে-গিল্টি সমেত আসুন! কি শুনলাম-এক হাজার!-ধন্যবাদ! কেউ কি বললেন এগারো? যে বস্তা সারা জগতের মধ্যে একদিন সব চাইতে বিখ্যাত হয়ে উঠবে-] "ওঃ এডোয়ার্ড [কাঁদতে শুরু করে] আমরা এত গরিব!-কিন্তু-কিন্তু-তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর-তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

এডোয়ার্ড কাবু হল-অর্থাৎ নিশ্চল বসে রইল; তার বিবেক সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু অবস্থার দাস।

ইতমধ্যে একটি অপরিচিত লোক সারা সন্ধ্যার এই সব কার্য-কলাপ গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল আর তার চোখে মুখে একটা খুসির ভাব ফুটে উঠছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজ জমিদারের সাজে সজ্জিত একজন সৌখীন গোয়েন্দা। এবার সে নিজের মনেই বলতে লাগল: "আঠারো জনের কেউ নিলাম ডাকছে না; এটা আমার মনঃপূত নয়; এটাকে বদলাতে হবে-নাটকীয় ঐক্যের জন্য এটা দরকার; যে বস্তাটা তারা চুরি করতে চেয়েছিল সেটা তাদের কিনতে হবে; তার জন্য চড়া দামও তাদের দিতে হবে-তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ধনী। আরও একটা কথা, হ্যাড্‌লিবুর্গ-এর প্রকৃতি সম্পর্কে যখন আমি ভুল করি তখন যে লোক সেই ভুলটা আমার উপর চাপিয়ে দিতে পেরেছিল তার নিশ্চয়ই একটা মোটা দক্ষিণা প্রাপ্য, এবং কোন একজনকে সেটা দিতেই হবে। এই গরিব বৃদ্ধ রিচার্ডস্ আমার বিচার-বুদ্ধিকে লজ্জা দিয়েছে; সে একটি সৎ লোক; এ সততার অর্থ আমি বুঝি না, কিন্তু তাকে আমি স্বীকার করি।"

সে নীলামের ডাক লক্ষ্য করছিল। এক হাজারে ডাক শেষ হল। সে তখন ১২৮২ পাউণ্ডের বস্তাটা ডেকে নিল। প্রবল জয়োল্লাসের মধ্যে সভা ভেঙে যাচ্ছিল,-তখন সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল; কারণ লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলল। কতা বলতে শুরু করল।

"আমি একটা কথা বলতে চাই, আর একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে চাই। আমি দুস্প্রাপ্য জিনিস-পত্রের বেচা-কেনা করে থাকি; সারা পৃথিবীর মুদ্রাতত্ত্ববিশারদদের সঙ্গে আমার লেন-দেন চলে। এখানে যে কিনলাম এমনিতেই তাতে আমার লাভ হবে; কিন্তু আপনাদের সমর্থন পেলে এমন একটা পথ আছে যাতে এখানকার প্রতিটি সিসের বিশ-ডলার মুদ্রার জন্য আমি সমান ওজনের স্বর্ণমুদ্রার দাম বা তারও বেশী পেতে পারি। আপনারা সম্মতি দিন, তাহলেই আমার লাভের একটা অংশ আমি আপনাদের মিঃ রিচার্ডস্‌কে দিতে পারি; তার অংশে প্রাপ্য হবে দশ হাজার ডলার; কাল সকালেই আমি টাকাটা তার হাতে তুলে দেব। [সকলের সমর্থনসূচক উল্লাস-ধ্বনি] একটা ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে-দুই-তৃতীয়াংশ ভোট হলেই চলবে-যদি আপনারা প্রস্তাবটি পাশ করেন তো তাকেই আমি গোটা শহরের সম্মতি বলে মনে করব, আর সেটুকুই আমার প্রার্থনা। কোন উপায়ে কৌতূহল জাগাতে পারলে এবং লোককে মন্তব্য প্রকাশে বাধ্য করতে পারলেই দুস্প্রাপ্য জিনিসের কদর বাড়ে। এই সব নকল মুদ্রা প্রতিটির উপর এই আঠারোজন ভদ্রলোকের নামের ছাপ দেবার অনুমতি যদি আপনারা আমাকে দেন তাহলে...."

দশ ভাগের নয় ভাগ শ্রোতা-কুকুরসহ মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়াল এবং প্রচণ্ড সমর্থন ও হাস্যরোলের মধ্যে প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল।

সকলে বসে পড়ল, কিন্তু ডাঃ ক্লে হার্কনেস ছাড়া অন্য সব "প্রতীক"-রা উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল প্রতিবাদ জানাল, ভীতি প্রদর্শন করে-

আগন্তুক শান্তভাবে বলল, "আপনাদের মিনতি করছি, আমাকে ভয়ে দেখাবেন না। আমার আইনগত অধিকার কতখানি তা আমি জানি, আর ভয়ে কাবু হতে আমি অভ্যস্ত নই। ["উল্লাসধ্বনি] সে বসে পড়ল। ডাঃ হার্কনেস এর মধ্যেই একটা সুযোগ পেয়ে গেল। এখানকার দু'জন ধনীর সে অন্যতম, অপর জন পিংকার্টন। হার্কনেস একটি টাকশালের মালিক; অর্থাৎ তার একটি জনপ্রিয় ওষুধের কারখানা আছে। বিধানসভার নির্বাচনে সে দাঁড়িয়েছে এক টিকিটে, আর পিংকার্টন দাঁড়িয়েছে অন্য টিকিটে। দু'জনের মধ্যে খুব রেষারেষি চলছে; বাজার গরম; প্রতিদিনই আরো গরম হচ্ছে। দু'জনেরই প্রচণ্ড টাকার ক্ষিধে; একই উদ্দেশ্য দু'জনই প্রচুর জমি কিনেছে; একটা নতুন রেলপথ হবার কথা আছে; প্রত্যেকেরই ইচ্ছা বিধানসভার সদস্য হয়ে রেলপথটাকে নিজের সুবিধামত পথে বসাবার ব্যবস্থা করবে; একটিমাত্র ভোটেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে, আর সেই সঙ্গে আসবে দু'-তিনটি সম্পত্তি। ঝুঁকিটা বেশ বড়, কিন্তু হার্কনেস দুঃসাহসী দাওবাজ। আগন্তুকের পাশেই সে বসেছিল। অন্য সব "প্রতীক"রা যখন সভার সামনে প্রতিবাদ ও আবেদন রাখছিল, সে তখন ঘাড় কাৎ করে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল:

"বস্তাটার জন্য কি দাম চান?"

"চল্লিশ হাজার ডলার।"

"কুড়ি দিতে পারি।"

"না।"

"পঁচিশ।"

"না।"

"তাহলে ত্রিশ।"

"দর রইল চল্লিশ হাজার ডলার; এক পেনি কম নয়।"

"ঠিক আছে, তাই দেব। সকাল দশটায় আপনার হোটেলে যাব। আমি চাই, কেউ যেন জানতে না পারে; গোপনে দেখা করব।"

"খুব ভাল।" তখন আগন্তুক দাঁড়িয়ে বলল:

"আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এই ভদ্রলোকের বক্তৃতার মধ্যে গুণের অভাব নেই, আগ্রহের অভাব নেই, সাবলীলতারও অভাব নেই; তবু আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে বলে ক্ষমা করবেন। আমার আবেদন মঞ্জুর করে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সভাপতিকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন আগামী কাল সকাল পর্যন্ত বস্তাটা আমার জন্য রেখে দেন, আর এই পাঁচ-শ' ডলারের নোটগুলি মিঃ রিচার্ডসের হাতে তুলে দেন।" নোটগুলো সভাপতির হাতে দেওয়া হল।

"ন'টার সময় আমি বস্তাটা নিতে আসব, এবং এগারোটার সময় বাকি দশ হাজার মিঃ রিচার্ডসের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে দিয়ে আসব। শুভরাত্রি।"

সে চলে গেল। শ্রোতাদের ভিতর থেকে যে প্রচণ্ড ধ্বনি উঠল তার সঙ্গে মিশে গেল উল্লাস, "মিকাডো' সঙ্গীত, কুকুর-নিনাদ ও মন্ত্রোচ্চারণ-"আপনি খা-রা-প লোক হ-তে পা-রে-ন না-আ-আ-আ-আমেন!"

৪

বাড়িতে মাঝরাত পর্যন্ত রিচার্ডস্-দম্পতিকে অভিনন্দন ও প্রশংসার ধাক্কা সামলাতে হল। তারপর সকলে চলে গেল। মন খারাপ করে তারা ভাবতে বসল। শেষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেরি বলল:

"তুমি কি মনে কর এডোয়ার্ড যে আমরা দোষী-খুব বেশী দোষী?" টেবিলের উপর রাখা বড় ব্যাংক-নোটগুলোর দিকে সে অবাক চোখে তাকাল। এডোয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না; পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু ইতস্তত করে সেও বলল:

"আমাদের-আমাদের কোন গত্যন্তর ছিল না মেরি। এটা-মানে-এটা যেন পূর্ব নির্দিষ্ট। সব কিছুই তো তাই।"

মেরি চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, কিন্তু বৃদ্ধ ফিরে তাকাল না। মেরি বলল:

"আমার ধারণা ছিল অভিনন্দন ও প্রশংসা সব সময়ই ভাল লাগে। কিন্তু-এখন বুঝতে পারছি-এডোয়ার্ড?"

"বল?"

"তুমি কি এখনও ব্যাংকে থাকবে?"

"ন্-না।"

"পদত্যাগ করবে?"

"সকালে-চিঠি লিখে।"

"সেই ভাল।"

দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে রিচার্ডস্ বলতে লাগল:

"এতকাল হাজার হাজার মানুষের টাকা দুই হাতে নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু-মেরি, আজ আমি ক্লান্ত-বড় ক্লান্ত-"

"শুতে চল।"

সকাল ন'টায় আগন্তুক এসে একটা গাড়ি ডেকে বস্তাটাকে হোটেলে নিয়ে গেল। দশটায় হার্কনেস গোপনে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলল। নিজের দাবী অনুসারেই আগন্তুক শহরের একটা ব্যাংকের উপর পাঁচখানা "বেয়ারার" চেক পেল-চারখানা ১,৫০০ ডলারের। আর একখানা ৩৪,০০০ ডলারের। প্রথমোক্ত চেকের একখানা সে নোট-বইতে রাখল, বাকি নোট ৩৮,৫০০ ডলারের চেকগুলি একটা খামে ভরে রাখল, এবং হার্কনেস চলে যাবার পরে একটা চিঠি লিখে তার ভিতরে রেখে দিল। এগারোটার সময় রিচার্ডস্-এর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়ল। মিসেস রিচার্ডস্ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়ে বাইরে গিয়ে খামটা নিল। আগন্তুক একটাও কথা না বলে চলে গেল। কম্পিত পায়ে ফিরে এসে মিসেস রিচার্ডস্ কোন রকমে বলল:

"লোকটিকে যেন চেনা-চেনা লাগল! কাল রাতেই আমার মনে হয়েছিল, এর আগেও কোথায় যেন তাকে দেখেছি।"

"এই লোকটিই বস্তাটা নিয়ে এসেছিল?"

"সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"তাহলে এই লোকটাই ছদ্মবেশী স্টিফেন্সন; একটা বাজে ভেল্কি দেখিয়ে শহরের সব গণ্যমান্য লোকগুলোকে ফাঁসিয়াছে। আর এখানেও যদি নগদ টাকার বদলে চেক পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরও ফাঁসাবে। রাতের বিশ্রামের পরে যাও বা একটু আরাম লাগছিল, এখন ঐ খামটা দেখেই আবার যেন অসুস্থ বোধ করছি। খামটা মোটেই মোটা নয়; যত বড় ব্যাংক-নোটেই হোক, ৮,৫০০ ডলার থাকলে খামটা আরও মোটা হত।"

"তুমি চেকে আপত্তি করছ কেন এডোয়ার্ড?"

"সে চেকে যে স্টিফেন্সন সই করেছে! ব্যাংক-নোটে পেলে ৮,৫০০ ডলার নেওয়াই আমি স্থির করেছিলাম, কারণ সেটাকেই আমি উপরের নির্দেশ বলে মনে নিয়েছিলাম, কিন্তু মেরি-কোন কালেই আমি খুব সাহসী লোক নই; ওই ভয়ংকর লোকটার সই-করা চেক ভাঙাবার সাহস আমার নেই। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। লোকটা আমাকেও গাঁথতে চেয়েছিল; কোন রকমে বেঁচে গিয়েছি; তাই এবার সে নতুন পথ ধরেছে। এই চেকগুলো যদি-"

"ওঃ এডোয়ার্ড, এগুলো তো খুবই খারাপ জিনিস তাহলে," চেকগুলোকে হাতে নিয়ে সে কেঁদে ফেলল।

"ওগুলোকে আগুনে ফেলে দাও! জলদি! আমরা লোভের কাছে ধরা দেব না। অন্যদের মত আমাদের দেখেও যাতে পৃথিবীর মানুষ হাসতে পারে এটা তারই কৌশল। তুমি না পার, ওগুলো আমাকে দাও!" চেকগুলো ছিনিয়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রিচার্ডস্ স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল; কিন্তু সে তো মানুষ, একজন ক্যাশিয়ার; সইটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য এক মুহূর্ত থামল। তখন তার

মূর্ছিত হবার মত অবস্থা।

"বাতাস কর মেরি, বাতাস কর! এগুলো সোনার মতই খাঁটি!"

"খুব ভাল কথা এডোয়ার্ড! কিন্তু ব্যাপার কি?"

"এডোয়ার্ড, তুমি কি মনে কর-"

"তাকিয়ে দেখ-এদিকে দেখ! পনেরো-পনেরো-পনেরো-চৌত্রিশ। আটত্রিশ হাজার পাঁচ শ'! মেরি, বস্তাটার দাম তো বারো ডলারও নয়, আর হার্কনেসই-যতদূর মনে হচ্ছে-টাকাটা দিয়েছে।"

"আর তুমি কি মনে কর, দশ হাজারের বদলে সবটাই আমাদের হাতে এসেছে?"

"আরে, তাই তো মনে হচ্ছে। আর চেকগুলো "বেয়ারার"ও বটে।"

"সেটা ভালতো এডোয়ার্ড? তার উদ্দেশ্য কি?"

"মনে হচ্ছে, দূরবর্তী কোন ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলবার একটা ইঙ্গিত। হয় তো হার্কনেস চায় না ব্যাপারটা জানাজানি হোক। ওটা কি-একটা চিঠি?"

"হ্যাঁ। চেকের সঙ্গে ছিল।"

হাতে লেখা স্টিফেন্সনের, কিন্তু কোন স্বাক্ষর নেই। চিঠিতে লেখা:

"আমি হতাশ হয়েছি। আপনার সততা প্রলোভনের উর্ধ্বে। আমার ধারণাটা অন্যরকম ছিল, কিন্তু তাতে আপনার প্রতি অবিচারই করেছি, আর সে জন্য ক্ষমা চাইছি-আন্তরিকভাবেই চাইছি। আমি আপনার সম্মান করি-সেটাও আন্তরিকভাবেই করি। আপনার পোশাকের এক প্রান্তকে চুমো খাবার যোগ্যতাও এ শহরের নেই। প্রিয় মহাশয়, নিজের মনেই আমি একটা বাজি ধরেছিলাম যে, আপনাদের আত্মতুষ্ট সমাজে উনিশটি ভ্রষ্টচরিত্র মানুষ আছে। আমি হেরে গেছি। বাজির পুরো টাকাটাই গ্রহণ করুন, ওটা আপনারই প্রাপ্য।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রিচার্ডস্ বলল:

"কথাগুলি যেন আগুনের অক্ষরে লেখা-তেমনই এর উত্তাপ। মেরি-আবার আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে।"

"আমারও প্রিয়। ইচ্ছা করে-"

"ভাব তো মেরি, আমার উপর তার কত বিশ্বাস।"

"বলো না এডোয়ার্ড, আমি সইতে পারছি না।"

"এই সুন্দর কতাগুলির উপযুক্ত যদি হতে পারতাম মেরি-ঈশ্বর জানেন, একদিন আমি তার উপযুক্তই ছিলাম-তাহলে তার জন্য চল্লিশ হাজার ডলার দিতেও আমি রাজী। তাহলে সোনা-রূপো, মণি-মানিক্যের মতই দামী এই কাগজখানাকেই চিরদিন কাছে রাখতাম। কিন্তু আজ-এর ভ্রূকুটিকুটিল উপস্থিতির ছায়ার তো বেঁচে থাকতে পারব না।"

সেটাকে আগুনে ফেলে দিল।

একজন পত্রবাহক এসে একখানা খাম দিল।

তার ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে রিচার্ডস্ পড়তে লাগল; বার্জেসের চিঠি।

"একটা সংকটের সময় আপনি আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। কাল রাতে আমি আপনাকে উদ্ধার করেছি।সেটা করেছি মিথ্যার মূল্যে, কিন্তু সেচ্ছায় সকৃতজ্ঞ চিত্তেই সে ত্যাগটুকু স্বীকার করেছি। এ গ্রামের আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি আপনি কত সাহসী, সৎ ও মহৎ। মনে মনে আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না, যেহেতু যে-কারণে আমি একদা অভিযুক্ত হয়েছিলাম এবং সর্বসম্মতিক্রমে দণ্ডিত হয়েছিলাম সেটা তো আপনার অজানা নয়; কিন্তু আপনাকে মিনতি করছি, আপনি অন্তত এটুকু বিশ্বাস করুন যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ; তাহলেই আমার বোঝা আমি বইতে পারব।"

[স্বাক্ষর] বার্জেস

"আরও একবার রক্ষা পেলাম। আর তাও এই শর্তে" চিঠিটাকে সে আগুনে ফেলে দিল। "আমার-আমার মরতে ইচ্ছা করছে মেরি। আহা, যদি এ সব কিছুর বাইরে চলে যেতে পারতাম।"

"ওঃ, দিনগুলি বড় তিক্ত এডোয়ার্ড। উদারতার জন্যই ছুরির আঘাতগুলি এত গভীর-আর এত দ্রুত সেগুলি আসছে!"

নির্বাচনের তিনদিন আগে দু'হাজার ভোটদাতার প্রত্যেকেই হঠাৎ একটা করে মনোরম স্মৃতি-ফলক পেল-বিখ্যাত নকল জোড়া ঈগলের ছবি। তার একদিককার মুখের চারদিকে ছাপ-মারা: "গরিব আগন্তুকের প্রতি যে মন্তব্য আমি করেছিলাম সেটা হল-" অপর দিককার মুখের চারদিকে ছাপমারা "যাও" অন্যদের সংশোধন কর। [স্বাক্ষর] পিংকার্টন।" এই বিখ্যাত তামাসার সম্পূর্ণ আবর্জনার বোঝা একটিমাত্র মাথার উপরেই উপুর করে ঢালা হল, আর তার ফলও ফলল বিপজ্জনক হয়েই। পিংকার্টনের মাথাকে ঘিরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিতে হল প্রচণ্ড হাস্যরোল; আর হার্কনেস অতি সহজেই নির্বাচন-বৈতরণী পার হয়ে গেল।

চেকগুলো পাবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রিচার্ডস্ দম্পতির বিবেক ক্রমে শান্ত হয়ে এল। নিজেদের পাপের সঙ্গে আপোষ করবার শিক্ষা বুড়ো-বুড়ির হয়েছে। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝতে পারল, পাপ যদি কখনও প্রকাশের পথ খুঁজে পায় তো সে নতুন করে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। গির্জার প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে যথারীতি যোগদানের পরে উৎসাহী অভিনন্দনকারীদের হাত এড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিচার্ডস্ দম্পতি বাড়ির পথে পা বাড়াল। কেন কে জানে, একটা আবছা, ছায়া-ছায়া, অনির্দিষ্ট আতংকে তাদের হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। আর ঘটনাক্রমে মিঃ বার্জেস যেই একটা মোড় ঘুরেছে অমনি তার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। তারা মাথা নোয়াল, কিন্তু সে খেয়ালই করল না! সে তাদের দেখতে পায় নি; কিন্তু তারা সেটা বুঝল না। তার এই ব্যবহারের অর্থ কি? এর অর্থ-এর অর্থ-ওঃ, এর তো এক ডজন ভয়ংকর অর্থ হতে পারে। অতীতে একদিন রিচার্ডস্ তাকে দোষের হাত থেকে মুক্ত করতে পারত, অথচ তা না করে ভবিষ্যতে হিসাব মেলাবার আশায় নীরবে অপেক্ষা করেছিল-এ কথাই কি সে ভেবে নিয়েছে?

বাড়ি ফিরেও এ একই দুশ্চিন্তা-সম্ভব-অসম্ভব নানা জল্পনা-কল্পনা। এইভাবে অবস্থা যখন বেশ চরমে উঠেছে তখন একসময় রিচার্ডস্ হঠাৎ আঁতকে উঠল। তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল:

"কি হল?-কি হল?"

"ঐ চিঠি-বার্জেসের চিঠি! এখন বুঝতে পারছি, তার ভাষাটাই ঠাট্টায় ভরা।" সে মুখস্ত বলে গেল: "মনে মনে আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না, যেহেতু যে-কারণে আমি অভিযুক্ত হয়েছিলাম এবং-" "ওঃ, এখন তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন! আমি যে সব জানি তাও সে জানে! ভাষার কারিকুরিটা লক্ষ্য করেছ তো! এটা একটা ফাঁদ-আর এমনই বোকা আমি যে সেই ফাঁদে পা দিয়েছি। আর মেরি-?"

"ওঃ কী সাংঘাতিক-আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ-নকল পরীক্ষার ব্যাপারে তুমি নিজের হাতে যে চিরকুটটা পাঠিয়েছিলে সেটা সে ফেরৎ দেয় নি।"

"না-আমাদের সর্বনাশ করবার মতলবে সেটা রেখে দিয়েছে। মেরি, ইতিমধ্যেই কারও কারও কাছে আমাদের কথা সে ফাঁস করে দিয়েছে। আমি জানি-ভাল করেই জানি। গির্জা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ডজনখানেক মুখে আমি সেটা লক্ষ্য করেছি। উঃ, তাই

তো আমরা তাকে দেখে মাথা নাড়লেও সে জবাব পর্যন্ত দিল না-নিজের মতলবের কথা তখনই তার মনের মধ্যে ছিল।"

সেই রাতেই ডাক্তারকে ডাকা হল। সকালেই চারদিকে খবর রটে গেল যে বৃদ্ধ দম্পতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে-ডাক্তার বলেছে, হঠাৎ এতগুলো টাকা পাবার দরুণ উত্তেজনার চাপ, অভিনন্দন, রাত জাগা-এই সব কারণেই শরীর ভেঙে পড়েছে। গোটা শহর সত্যি সত্যি বিচলিত হয়ে পড়ল, কারণ এখন তো তাদের গর্ব করার মত মানুষ এরাই দু'জন অবিশিষ্ট আছে।

দু'দিনপরে আরও খারাপ খবর। বুড়ো-বুড়ি প্রলাপ বকছে, আর অদ্ভুত সব কাজ করছে। নার্সরা বলেছে, রিচার্ডস্ চেক দেখিয়েছে-৮,৫০০ ডলারের? না-টাকার অংক বিস্ময়কর-৩৮,৫০০ ডলার। তাদেরএই প্রচণ্ড সৌভাগ্য ঘটল কেমন করে?

বড়দিনে নার্সরা আরও খবর দিল-আশ্চর্য খবর। পাছে চেকগুলোর ক্ষতি হয় তাই তারা সুগুলো লুকিয়ে রেখেছিল; কিন্তু পরে খুঁজতে গিয়ে দেখে রোগীর বালিশের তলা থেকে সেগুলো উধাও হয়ে গেছে। রোগী বলছে:

"বালিশ রেখে দাও; কি চাও তোমরা?"

"আমরা ভেবেছিলাম যে চেকগুলো ভালভাবে-"

"সেগুলো আর কখনও দেখতে পাবে না-সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শয়তান সেগুলো দিয়েছিল। সেগুলোর উপর আমি নরকের চাপ দেখেছি; আমি জানি, আমাকে ভুলিয়ে পাপের পথে টেনে নেবার জন্যই সেগুলো পাঠানো হয়েছিল।" তারপরই সে বক্‌বক্ করে এমন সব অদ্ভুত ও ভয়ংকর কথা বলতে লাগল যার কোন অর্থ বোঝাই দায়।

রিচার্ডস্ ঠিকই বলেছিল; চেকগুলো আর পাওয়া যায় নি।

কোন নার্স হয় তা ঘুমের মধ্যেই কথা বলেছিল, কারণ প্রলাপের ঝোঁকে যে সব নিষিদ্ধ কথা উচ্চারিত হয়েছিল দু'দিনের মধ্যে সেগুলি সারা শহরের লোকই জেনে গেল। তারা সবিস্ময়ে জানল যে, রিচার্ডস্ নিজেই বস্তার একজন দাবীদার ছিল এবং বার্জেস তখনকার মত খবরটা চেপে রেখে পরে ঈর্ষাবশত ফাঁস করে দিয়েছে।

বার্জেসকে চেপে ধরলে সে প্রবলভাবে কথাটা অস্বীকার করল। সে আরও বলল, একটি রুগ্ন বুড়ো মানুষ প্রলাপের ঘোরে কি বলেছে না বলেছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নয়। তবু সন্দেহের নিরসন হল না, নানা রকম কথা চলতেই থাকল।

দু'-একদন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, মিসেস রিচার্ডসের প্রলাপ-বকুনিতেও তার স্বামীর কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। সন্দেহক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হল; একটি মাত্র নাগরিকের চারিত্রিক সততা নিয়ে শহরের যে গর্ব ছিল তাও কমতে কমতে এক সময় নিঃশেষ হতে চলল।

ছ' দিন পার হয়ে গেল। আরও খবর এল। বুড়ো-বুড়ি মৃত্যুশয্যায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে রিচার্ডসের মনের ঘোর কেটে গেল। সে বার্জেসকে ডেকে পাঠাল। বার্জেস বলল:

"সকলে ঘরটা খালি করে দিন। মনে হচ্ছে, উনি গোপন কিছু বলতে চাইছেন।"

রিচার্ডস্ বলল: "না! আমি সাক্ষী রাখতে চাই। আমি যাতে মানুষের মত মরতে পারি, কুকুরের মত নয়, সে জন্য আপনারা সকলেই আমার স্বীকারোক্তি শুনুন। অন্য সকলের মতই আমিও সৎ-কৃত্রিমভাবে-ছিলাম; তাই প্রলোভন যখন এল তখনই অন্য সকলের মতই আমারও পতন হল। একটা মিথ্যায় সই করে আমিও সেই হতভাগা বস্তাটা দাবী করে বসলাম মিঃ বার্জেসের মনে পড়ে গেল যে এক সময় আমি তার একটা উপকার করেছিলাম, তাই কৃতজ্ঞতাবশত (অজ্ঞানতাবশতও বটে) আমার দাবীটাকে চেপে দিয়ে তিনি আমাকে উদ্ধার করলেন। অনেক বছর আগে বার্জেসের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল তা আপনারা জানেন। একমাত্র আমার সাক্ষ্যই তাকে অভিযোগমুক্ত করতে পারত; কিন্তু আমি ভীরু, তাই তাকে সেই অসম্মানের মধ্যেই ঠেলে দিয়েছিলাম-"

"না-না-মিঃ রিচার্ডস্ আপনি-"



"আর চাকরই সে গোপন কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল-"

"কেউ আমাকে কিছুই জানায় নি-"

"আর তখনই যা স্বাভাবিক, যা ন্যায়সঙ্গত তাই তিনি করলেন, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য আর অনুতাপ হল এবং আমার সব কথা তিনি ফাঁস করে দিলেন-সেটাই আমার প্রাপ্য ছিল-"

"কখনও না!-আমি শপথ করে বলছি-"

"সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তাকে ক্ষমা করছি।"

বার্জেসের কোন প্রতিবাদই তার কানে পৌঁছল না; মৃত্যুপথযাত্রীর যাত্রা শেষ হল-সে জানতেও পারল না যে বেচারি বার্জেসের প্রতি সে আরও একটি অন্যায় করে গেল। সেই রাতেই তার স্ত্রীও মারা গেল।

পবিত্র উনিশ জনের শেষ মানুটিও সেই শয়তানী বস্তার শিকার হল; শহরটি তার প্রাচীন গৌরবের শেষ চিহ্ন হতেও বঞ্চিত হল। শোকযাত্রায় জাঁকজমক ছিল না, কিন্তু গভীরতা ছিল।

অনেত আবেদন-নিবেদনের ফলে আইন করে হ্যাড্লিবুর্গ-এর নাম বদলে রাখা হল (সে কথা থাক-সেটা আমি বলব না); এবং এই শহরের সরকারী সিল-এ যুগ যুগ ধরে এ নীতি-বাক্যটি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল তা থেকে একটি শব্দও বাদ দেওয়া হল।

শহরটি এখন আবার সততায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে; তাকে পুনরায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে হলে অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়।

পাক্তন নীতি-বাক্যপরিবর্তন নীতি-বাক্য

নিয়ো না আমাদের প্রলোভনের পথেনিয়ো আমাদের প্রলোভনের পথে

|| সমাপ্ত ||